আধুনিক শিক্ষায় ভূগোলের স্বরূপ

মো: আব্দুল আউয়াল খান

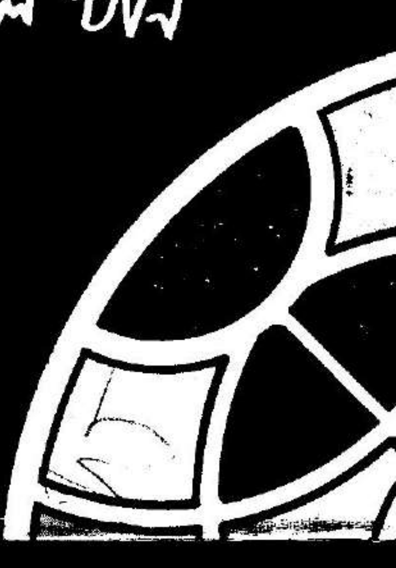

আধুনিক শিক্ষায় ভূগোলের স্বরূপ

ড. মোঃ আবদুল আউয়াল খান

বাংলা একাডেমী : ঢাকা

BANGDOC Library
Accession No. ...
Date ...

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ় ১৪০১
জুন ১৯৯৪

বাএ ৩০৩৪

পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও মুদ্রণ তত্ত্বাবধান
সমাজবিজ্ঞান, আইন ও বাণিজ্য উপবিভাগ

প্রকাশক
গোলাম মঈনউদ্দিন
পরিচালক
পাঠ্যপুস্তক বিভাগ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মুদ্রক
পুনর্মুদ্রণ প্রকল্প
বাংলা একাডেমী'র ব্যবস্থাধীনে
কাশবন মুদ্রায়ণ
১ ভিতরবাড়ি লেন, নবাবপুর, ঢাকা

প্রচ্ছদ
আবিদ-এ-আজাদ

মূল্য
দুইশত পঞ্চাশ টাকা

ADHUNIK SHIKSHAYA VUGOLER SHARUP (The Nature of Geography in Modern Education) by Dr. Md. Abdul Awal Khan. Published by Gholam Moyenuddin, Director, Text Book Division, Bangla Academy, Dhaka, Bangladesh. First Edition : June 1994. Price : Tk. 250.00 only.

ISBN : 984-07-3043-6

উৎসর্গ

আমার পরম শ্রদ্ধেয়া মা
যিনি আমার জ্ঞানচর্চার সার্বক্ষণিক উৎসাহদাত্রী
এবং স্ত্রী জাহান আরা ইয়াসমীন,
কন্যা রোমেলা আফরোজ ও সাদিয়া আফরোজ
এবং পুত্র তানভীর আহমেদ খানকে—

BANSDOC Library
Accession No.

ভূমিকা

আধুনিক যুগে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ভূগোলের স্থান–এর গুরুত্বের বিবেচনা গৃহীত হয়েছে। আমাদের দেশে বর্তমানে ভূগোলের বিষয়বস্তু প্রাথমিক স্তরে 'পরিবেশ পরিচিতি' এবং নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে 'সমাজ বিজ্ঞান ও বাংলাদেশ' নামক আবশ্যিক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করে পড়ানো হচ্ছে। আজ থেকে প্রায় এক যুগ আগে মাধ্যমিক স্তরে ভূগোলকে একটি স্বতন্ত্র আবশ্যিক বিষয় হিসাবে স্কুল শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। এ ছাড়া উচ্চ মাধ্যমিক এবং উচ্চ শিক্ষাস্তরে যথাক্রমে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূগোল পড়ানো হচ্ছে। বিশেষ করে বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষক প্রশিক্ষণের শিক্ষাক্রমেও ভূগোল পাঠদানের ব্যবস্থা রয়েছে। মাধ্যমিক স্কুল পর্যায়ের ভূগোল পাঠদানের সার্বিক অবস্থা জানার নিমিত্তে আমি আমার পি এইচ.ডি থিসিসের জন্য সংগৃহীত তথ্য থেকে এটাই বুঝতে পেরেছি যে শিক্ষার এ স্তরে ভূগোল শিক্ষার মান আদৌ সন্তোষজনক নয়। এজন্য নানাবিধ কারণ দায়ী। এ স্তরে ভূগোল শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য যথাযথ সুপারিশও হয়েছে। সুপারিশগুলো বাস্তবায়িত হলে বিশেষভাবে ভূগোল শিক্ষার মান উন্নত হবে। শিক্ষার্থীদের নিকট বিষয়টি জনপ্রিয়ও হয়ে উঠবে। আমাদের দেশের স্কুলগুলোর ভূগোল শিক্ষকদের জন্য 'শিক্ষক নির্দেশিকা' এখনও রচিত হয় নি। এ কারণে অধিকাংশ প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষক স্কুলে কিভাবে ভূগোল পড়াতে হবে সে সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান, কৌশল ও দক্ষতা অর্জন করতে পারছেন না। সার্থকভাবে ভূগোল শিক্ষাদানের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি ও শিক্ষা উপকরণের ব্যবহারের কৌশল সম্পর্কে তাদের ধারণাও কম।

ভূগোলের বিভিন্ন ব্যবহারিক কাজ বিশেষ করে, মানচিত্র, চার্ট, ছবি ও মডেলসহ বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণ প্রস্তুতকরণের দক্ষতা এদের পর্যাপ্ত নেই বললেই চলে। ভূগোল শিক্ষাদানের সাথে ভৌগোলিক দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য স্থানে শিক্ষা ভ্রমণ পরিচালনাসহ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ভৌগোলিক তথ্য আহরণের কৌশল ও এদের প্রয়োগ সম্পর্কে এসব শিক্ষকের অভিজ্ঞতা কম। এ [illegible] উদ্দেশ্য, [illegible] সাথে ভূগোলের [illegible] শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা এবং [illegible]

"আধুনিক শিক্ষায় ভূগোলের স্বরূপ" বইটি রচনা করেছি। আশা করি এই বইটি শিক্ষক প্রশিক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটসহ দেশের ১১টি শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, ৫৪টি প্রাইমারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকগণ বইটিকে পাঠ্যপুস্তকের মর্যাদায় অধ্যয়ন করে উপকৃত হবেন। এ ছাড়া মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের ভূগোল শিক্ষক শিক্ষার্থীসহ ভূগোল শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সবাই বইটিকে সহায়ক পুস্তক হিসাবে অধ্যয়ন করে স্ব স্ব ক্ষেত্রে উপকৃত হবেন।

বইটি প্রণয়নে আমি বহু দেশী ও বিদেশী লেখকের বইয়ের সাহায্য নিয়েছি। দেশের দৈনিক পত্রিকাসমূহের মধ্য থেকে দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক সংগ্রাম ও দৈনিক ইনকিলাব-এর বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত ভৌগোলিক তথ্য থেকেও সাহায্য নিয়েছি। এজন্য সংশ্লিষ্ট লেখকদের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

পরিশেষে এটুকু বলতে চাই যে, ভূগোলের জ্ঞান আমাদের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও জাতীয় জীবনে অপরিহার্য। জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তিদের ভূগোলের জ্ঞান অর্জনের পথে এই বইটি কিছুটা অবদান রাখলে আমার শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

চৈত্র, ১৪০০
এপ্রিল, ১৯৯৪

আবদুল আউয়াল খান

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় : ভূগোলের স্বরূপ, সংজ্ঞা ও তার ধারণা		১—৩২
১.১	ভূমিকা	১
১.২	ভূগোলের সংজ্ঞা	৩
১.৩	ভূগোলের ধারণা ও উৎপত্তি	৬
১.৪	ভূগোল শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	৭
১.৫	মাধ্যমিক পর্যায়ের ভূগোল শিক্ষার বিশেষ উদ্দেশ্য	১০
১.৬	ভূগোল শিক্ষার কার্যকারিতা	১১
১.৭	ভূগোলের ব্যাকরণ এবং তার কার্যক্রম ও ধর্ম	১২
১.৭.১	ভূগোল শিক্ষায় ব্যাকরণের প্রয়োজনীয়তা অধ্যাপক জেমস ফেয়ার, গ্রিভের বক্তব্য	১৩
১.৭.২	ভূগোলের ব্যাকরণের ক্রমবিকাশের ধারা	১৪
১.৭.৩	আধুনিক ভূগোল পাঠের পরিধি ও নবতর ভূগোলের ব্যাকরণ	১৪
১.৭.৪	আধুনিক ভূগোল ব্যাকরণের প্রকারভেদ	১৫
১.৮	ভূগোলের বিষয়বস্তুর শ্রেণিবিভাগে আমেরিকা ও ইউরোপের ভূ-বিজ্ঞানিদের অভিজ্ঞতা ও ধারণা	১৬
১.৯	ভূগোলের কিছু গুরুত্বপূর্ণ শাখার সংজ্ঞা	১৭
১.১০	স্কুল পর্যায়ে আমাদের দেশের ভূগোল শিক্ষা	২৩
১.১১	গবেষণার আলোকে আমাদের মাধ্যমিক পর্যায়ের ভূগোল শিক্ষা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভূগোল শিক্ষকদের শিক্ষাগত এবং পেশাগত যোগ্যতা	২৪
১.১২	মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যসূচি ও শ্রেণি ঘণ্টা	২৬
১.১৩	আমাদের দেশের নিম্নমাধ্যমিক স্তরের ভূগোল পাঠ্যসূচি	২৯
১.১৪	মাধ্যমিক স্তরে ভূগোল বিষয়টি মানোন্নয়ন ও জনপ্রিয় করে তোলার জন্যে কতিপয় সুপারিশ	৩৩

দ্বিতীয় অধ্যায় : ভূগোল শিক্ষাদান পদ্ধতি ৩৫–৮৯

২.১ পদ্ধতি বলতে কি বুঝি ? ৩৫

২.২ ভূগোল শিক্ষণে আঞ্চলিক পদ্ধতি ৩৬
আঞ্চলিক পদ্ধতির আলোচনার বিষয়বস্তু ; আঞ্চলিক পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য ; আঞ্চলিক পদ্ধতির সুবিধা ; আঞ্চলিক পদ্ধতির অসুবিধা ; আঞ্চলিক পদ্ধতিতে ভূগোল পাঠের উদাহরণ।

২.৩ ভূগোল শিক্ষণে তুলনামূলক পদ্ধতি ৪০
তুলনামূলক পদ্ধতি প্রয়োগের প্রধান শর্তসমূহ ; ভূগোল শিক্ষণের তুলনামূলক পদ্ধতির প্রয়োগ ; তুলনামূলক পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য ; তুলনামূলক পদ্ধতির সুবিধা ; তুলনামূলক পদ্ধতির অসুবিধা।

২.৪ ভূগোল শিক্ষণে বর্ণনামূলক পদ্ধতি ৪৫
ভূগোল শিক্ষায় বর্ণনামূলক পদ্ধতির শিক্ষা উপকরণ ; ভূগোল শিক্ষায় বর্ণনামূলক পদ্ধতি কিভাবে প্রয়োগ করতে হবে ; বর্ণনামূলক পদ্ধতির সুবিধা ; বর্ণনামূলক পদ্ধতির অসুবিধা।

২.৫ ভূগোল শিক্ষণে প্রকল্প পদ্ধতি ৪৯
প্রকল্প পদ্ধতির স্তর ; প্রকল্প পদ্ধতির প্রয়োগ ; প্রকল্প পদ্ধতির প্রকারভেদ ; প্রকল্প পদ্ধতির উপযোগিতা।

২.৬ ভূগোল শিক্ষণে পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি ৫৩
ভূগোল শিক্ষায় পর্যবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ; পর্যবেক্ষণকে কিভাবে শিক্ষার ক্ষেত্রে কাজে লাগানো যায় ; শিক্ষা ভ্রমণের প্রয়োজনীয়তা ; ভ্রমণের মাধ্যমে প্রাকৃতিক ভূগোল পাঠ।

২.৭ ভূগোল শিক্ষণে শিক্ষামূলক ভ্রমণ পদ্ধতি ৫৭
শিক্ষা ভ্রমণের প্রয়োজনীয়তা ; ভ্রমণের মাধ্যমে প্রাকৃতিক ভূগোল পাঠ ; ভ্রমণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ভূগোল পাঠ ; ভ্রমণের মাধ্যমে মানবিক ভূগোল পাঠ ; শিক্ষা ভ্রমণের পরিকল্পনা ও সংগঠন ; শিক্ষা ভ্রমণকে সার্থক করতে হলে যে দিকগুলো বিবেচনায় আনতে হবে ; ভ্রমণের সমস্যাবলি ; শিক্ষা ভ্রমণকে ফলপ্রসূ ও শিক্ষামূলক করে তোলার শর্তাবলি ; উপসংহার।

২.৮ ভূগোল শিক্ষণে রেডিও এবং টেলিভিশন ৬৪
ভূমিকা ; ভূগোল শিক্ষার রেডিও টেলিভিশনের ভূমিকা ; রেডিও টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাদান ; শিক্ষাদানে রেডিও টেলিভিশনের কার্যকারিতা ; রেডিও টিভির ভূগোল শিক্ষা কেমন হওয়া উচিত ; উন্নত বিশ্বে ভূগোল শিক্ষায় রেডিও টিভির ভূমিকা।

২.৯ ভূগোল কক্ষ ও তার সাজ–সরঞ্জাম ৬৮
ভূগোল কক্ষ ; ভূগোল কক্ষের অন্যান্য সাজ–সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি।

২.১০ ভূগোল শিক্ষার সহায়ক উপকরণ ও তার শ্রেণিবিভাগ
স্বল্পমূল্যের মাটির কলসির গ্লোব।

২.১০.১ উপকরণের শ্রেণিবিভাগ

২.১০.২ স্বল্পমূল্যের শিক্ষা উপকরণ তৈরির বিবেচ্য বিষয়

২.১০.৩ ভূগোল শিক্ষণের কিছু গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা
উপকরণের বর্ণনা—
গ্লোব, মডেল, চার্ট, এপিডায়াস্কোপ, প্রোজেক্টর, চলচ্চিত্র যন্ত্র,
ভিসিআর, ভিসিপি , টেপরেকর্ডার,

২.১১ ভূগোলের যাদুঘর
ভূগোল শিক্ষা ও যাদুঘর ; যাদুঘর তৈরি ও ব্যবহার ; ভূগোল যাদুঘর সম্পর্কে পরামর্শ।

তৃতীয় অধ্যায় : প্রাকৃতিক ভূগোল ৯১—২৯৪

৩.০ সৌর জগৎ সৃষ্টির মতবাদ

৩.১ সূচনা

৩.২ সৌরজগৎ কি

৩.৩ সৌরজগৎ সৃষ্টির মতবাদ
সৌরজগৎ সৃষ্ট সম্বন্ধে আলোচিত মতবাদসমূহ ; লা প্লাসের
নীহারিকা মতবাদ, নীহারিকা মতবাদের সমালোচনা ; চেম্বারলিন ও
মৌলটনের গ্রহকণা মতবাদ ; গ্রহকণা মতবাদের সমালোচনা ;
জিনস ও জেফ্রি রিজের জোয়ার মতবাদ ; ড. লিটলটনের
ত্রিনক্ষত্র বাদ ; পৃথিবী সৃষ্টির আধুনিক মতবাদসমূহ ;
সৌরজগৎ সৃষ্টি সম্পর্কে অটো স্মিট এর মতবাদ ;
সৌরজগৎ সৃষ্টি সম্বন্ধে উইজস্যাকারের মতবাদ।

৩.৪ পৃথিবীর আকার ও আবর্তন ১০১
পৃথিবীর আকার অভিগত গোলোকরূপে প্রমাণ ; আহ্নিকগতি ; বার্ষিকগতি।

৩.৪.১ মহাবিশ্ব ও পৃথিবী সম্পর্কিত কতিপয় কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য ১০৭
গ্যালাক্সি কি ; ছায়াপথ কি ; ছায়াপথকে দুধাল পথ বলা হয় কেন ;
রংধনু কি ; আকাশ কেন নীল দেখায় ; নক্ষত্র মিটমিট করে জ্বলে কেন ;
আলোর উদ্ভব হয় কি করে ; সৌরজগতের গ্রহ-উপগ্রহ কি ; শনিগ্রহের
নতুন চাঁদ কি ; মহাবিশ্বের সৃষ্টি কিভাবে হলো ; মহাবিশ্বে প্রাণের সাড়া
সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা কি ভাবছেন ; মহাবিশ্বের পরিণতি নিয়ে বিজ্ঞানীরা
কি ভাবছেন, ধূমকেতু কি ; সূর্যে বসবাস করা যায় না কেন ; সূর্য কেন
সাগরে ডুবে যায় ; আকাশ ও পৃথিবীর সংযোগস্থলে পৌছান যায় কেন ;

চাঁদ কেন রাতে কিরণ দেয় ; উপগ্রহকে গ্রহ বলা যায় না কেন ; প্লুটো গ্রহকে 'X' (এক্স) বলা হয় কেন ; তারা এতো ছোট ; দেখায় কেন, দিনের বেলায় তারা কোথায় যায় ; এ. এম (AM) পিএম (PM) কি ; পৃথিবীতে দিনের অংশ বাড়ছে কিভাবে ; ইংরেজি মাসগুলোর নামকরণ হলো কিভাবে।

৩.৫ দিবারাত্রির হ্রাসবৃদ্ধি ও ঋতু পরিবর্তন ১১৮
ঋতু পরিবর্তন।

৩.৬ অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ ১২২
অক্ষাংশ ; অক্ষাংশ নির্ণয় ; দ্রাঘিমাংশ নির্ণয় ; দ্রাঘিমা নির্ণয় বিষয়ক সমস্যা ; অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশের প্রয়োজনীয়তা।

৩.৭ স্থানীয় সময়, প্রমাণ সময় ও প্রতিপাদ স্থান ১৩০
স্থানীয় সময়, প্রমাণ সময়, প্রমাণ সময়ের প্রয়োজনীয়তা

৩.৮ প্রতিপাদ স্থান ১৩২

৩.৮.১ আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা ১৩৩
বাংলাদেশের প্রমাণ সময় নির্ণয়
আর্ন্তজাতিক তারিখ রেখার প্রয়োজনীয়তা ; আন্তর্জাতিক তারিখ রেখাটি আঁকাবাঁকা কেন।

৩.৯.১ ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগ ১৩৬

৩.৯.২ ভূ-পৃষ্ঠের অভ্যন্তরীণ গঠন ১৩৯
পৃথিবীর ভূ-অভ্যন্তরস্থ স্তর বিন্যাস ; বিভিন্ন স্তরের গঠন ও উপাদান ; কেন্দ্র মণ্ডল, গুরু মণ্ডল, অশ্ব মণ্ডল, ভূ-কম্পন বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ প্রমাণ ; ভূ-অভ্যন্তরীণ তাপীয় অবস্থা ; উপসংহার।

৩.৯.৩ ভূ-পৃষ্ঠের ভূমিরূপ ১৪৪
পর্বত, মালভূমি, সমভূমি, হ্রদ, নদী, হিমবাহ প্রবাহিত ভূ-প্রকৃতি,
চুনা পাথর
অঞ্চসের ভূ-প্রকৃতি, মরুভূমি অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি

৩.১০ ভূ-ত্বকের উপাদান বিভিন্ন প্রকার খনিজ ১৫৯
ভূমিকা, খনিজ কি ; খনিজের বৈশিষ্ট্য ; খনিজের রাসায়নিক সংস্থিতি ; বিভিন্ন প্রকার খনিজ।

৩.১১ ভূ-পৃষ্ঠের পরিবর্তন—ধীর পরিবর্তন ক্ষয়সাধন ১৬৬
বিচূর্ণীভবন, নগ্নীভবন
যান্ত্রিক বিচূর্ণীভবন ; সূর্য উত্তাপের তারতম্য, তুষারের কার্য ; বৃষ্টির পানির সাহায্যে ; নদী ; আদ্যগতি বা পার্বত্য প্রবাহ ; মধ্যগতি বা সমভূমি প্রবাহ ; অগ্রগতি বা নিম্নপ্রবাহ ; হিমবাহ, বায়ুপ্রবাহ।

৩.১২ মৃত্তিকা ১
মৃত্তিকার সংজ্ঞা ; মৃত্তিকার উৎপত্তি ; মৃত্তিকার শ্রেণিবিভাগ, ভূ-তাত্ত্বিক শ্রেণিবিভাগ। রাসায়নিক গঠন ভিত্তিক বিভাগ ; জলবায়ু ভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ।

৩.১৩ হিমবাহ ১
হিমবাহের গতি ; হিমবাহের কাজ।

৩.১৪ অবক্ষেপণ এবং ভূ-পৃষ্ঠের পরিবর্তনের প্রাকৃতিক কারণসমূহ ১
ভূপৃষ্ঠের পরিবর্তনের প্রাকৃতিক কারণ ; অগ্ন্যুৎদগম ও আগ্নেয়গিরি ; অগ্ন্যুৎপাতের ফল ; ভূমিকম্প ; ভূমিকম্পের ফল।

৩.১৫ পর্বত সৃষ্টির মতবাদ ও শ্রেণিবিন্যাস ১
পর্বত সৃষ্টির মতবাদসমূহ ; পর্বতের শ্রেণিবিভাগ ; ভাঁজপর্বত, স্তূপ পর্বত ; ল্যাকোলিথ পর্বত ; ক্ষয়জাত পর্বত ; সঞ্চয়জাত পর্বত।

৩.১৬ শিলা ২
শিলার প্রকারভেদ ; আগ্নেয় শিলা ; বিভিন্ন প্রকার অন্তঃজ আগ্নেয়শিলা ; রাসায়নিক গঠন অনুসারে আগ্নেয় শিলার শ্রেণিবিভাগ ; পাললিক শিলার শ্রেণিবিভাগ ; দ্বিতীয়ত পললের উৎপত্তি অনুসারে পাললিক শিলার শ্রেণিবিভাগ ; রূপান্তরিত শিলা; শিলার অর্থনৈতিক গুরুত্ব ও ব্যবহার।

৩.১৭ ভূমিকম্প ২
ভূমিকম্পের কারণ ; ভূমিকম্পের ফলাফল ; ভূমিকম্পের তীব্রতা ; তীব্রতা পরিমাপের স্কেল ; ভূমিকম্পের তরংগ ; ভূমিকম্পের বলয়

৩.১৮ আগ্নেয়গিরি ২২
আগ্নেয়গিরির বিভিন্ন অংশ ; অগ্নুৎপাতের কারণসমূহ ; বিভিন্ন প্রকার আগ্নেয় গিরি ; আগ্নেয়গিরি হতে উৎক্ষিপ্ত পদার্থসমূহ ; অগ্নুৎপাতের শ্রেণিবিভাগ ; পৃথিবীর প্রধান আগ্নেয়গিরি অঞ্চল ; অগ্নুৎপাতের ফলাফল

৩.১৯ বায়ুমণ্ডল ও এর বিবরণ ২
বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তর।

৩.২০ বায়ুপ্রবাহ ও এর বিবরণ ২
একটি আদর্শ ঘূর্ণবাতের বিভিন্ন অংশের প্রস্থচ্ছেদ।

৩.২১ আবহাওয়া ও এর বিবরণ ২৪
জলবায়ু কি ; আবহাওয়া ও জলবায়ুর পরিবর্তন ;

৩.২২ বারিমণ্ডল ও এর বিবরণ ২৫
স্থল ও জলভাগের বিন্যাস ; বারিমণ্ডলের বিভাগ ও গভীরতা ; মহাসাগরের ভূ-প্রকৃতি ও গভীরতা ; অগভীর সমুদ্রের অবক্ষেপ ; গভীর সমুদ্রের অবক্ষেপ ; উপসংহার।

৩.২৩	জোয়ার ভাটা ও এর বিবরণ জোয়ার ভাটার কারণ ; জোয়ার ভাটা কিরূপে সংগঠিত হয় ; জোয়ার ভাটার শ্রেণিবিভাগ ; জোয়ার ও ভাটার সময় ; জোয়ার ভাটা সম্পর্কিত মতবাদসমূহ ; জোয়ার ভাটার প্রভাব।	২৬৫
৩.২৪	সমুদ্রস্রোত ও এর বিবরণ বাণিজ্যের উপর সমুদ্র স্রোতের প্রভাব ; জলবায়ুর উপর সমুদ্রস্রোতের প্রভাব।	২৭৭
৩.২৫	মহাসাগরের তলদেশের ভূ-প্রকৃতি প্রশান্ত মহাসাগরের তলদেশ ; আটলান্টিক মহাসাগরের তলদেশ ; সুমেরু মহাসাগরের তলদেশ ; কুমেরু মহাসাগরের তলদেশ।	২৮১
৩.২৬	সমুদ্রস্রোত আটলান্টিক মহাসাগরীয় স্রোত ; ল্যাব্রাডর স্রোত ; প্রশান্ত মহাসাগরীয় স্রোত ; ভারত মহাসাগরীয় স্রোত।	২৮৯
চতুর্থ অধ্যায় :	**মানবিক ও অর্থনৈতিক ভূগোল**	২৯৫–৩৩৯
৪.১	পৃথিবীর জনসংখ্যা	২৯৫
৪.১.২	বিশ্ব জনসংখ্যার পরিবর্তন	২৯৫
৪.১.৩	বিশ্ব জনসংখ্যা পরিস্থিতি	২৯৭
৪.১.৪	খাদ্য ও জনসংখ্যা	২৯৮
৪.১.৫	জনসংখ্যা বৃদ্ধির অর্থনৈতিক ও সামাজিক ফলাফল	২৯৯
৪.১.৬	জনসংখ্যা ও পরিবেশ	৩০১
৪.১.৭	উপসংহার	৩০২
৪.২	পৃথিবীর খনিজ সম্পদ	৩০২
৪.২.১	সূচনা	৩০২
৪.২.২	সংজ্ঞা	৩০৩
৪.২.৩	খনিজ সম্পদের বৈশিষ্ট্য	৩০৩
৪.২.৪	খনিজ সম্পদ উত্তোলনের অনুকূল উপাদানসমূহ	৩০৪
৪.২.৫	খনিজ সম্পদের শ্রেণিবিভাগ আকরিক লৌহের শ্রেণিবিভাগ।	৩০৫
৪.২.৬	পৃথিবীর বিভিন্ন খনিজের উৎপাদন ও বণ্টন	৩০৭

	সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ইউরোপের দেশসমূহ; উত্তর আমেরিকার দেশসমূহ; এশিয়ার দেশসমূহ; দক্ষিণ আমেরিকার দেশসমূহ; আফ্রিকা মহাদেশের দেশসমূহ।	
৪.৩	পৃথিবীর শিল্প সম্পদ ও এর বিশ্ববাণিজ্য	৩১৭
৪.৩.১	সূচনা	৩১৭
৪.৩.২	শিল্প কি?	৩১৭
৪.৩.৩	শিল্পের প্রকৃতি	৩১৮
৪.৩.৪	শিল্পের শ্রেণিবিভাগ	৩১৮
৪.৩.৫	পৃথিবীর প্রধান প্রধান শিল্পাঞ্চল	৩১৯
৪.৩.৬	পৃথিবীর প্রধান প্রধান শিল্প লৌহ ও ইস্পাত শিল্প; বয়ন শিল্প; পূর্ত শিল্প; অন্যান্য কতিপয় শিল্প।	৩২০
৪.৩.৭	বাংলাদেশের প্রধান প্রধান শিল্প	৩২৭
৪.৪	পৃথিবীর আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রধান আমদানি ও রপ্তানি দ্রব্য	৩২৯
৪.৪.১	আন্তর্জাতিক বাণিজ্য	৩২৯
৪.৪.২	আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সুবিধা	৩৩১
৪.৪.৩	আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অসুবিধা	৩৩১
৪.৪.৪	প্রধান আমদানি ও রপ্তানি দ্রব্য	৩৩১
৪.৫	মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলির উপর ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব	৩৩৩
৪.৫.১	ভূমিকা	৩৩৩
৪.৫.২	মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলি বলতে কি বোঝায়	৩৩৪
৪.৫.৩	মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলি পরিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়	৩৩৪
৪.৫.৪	মানুষের প্রধান প্রধান অর্থনৈতিক কার্যাবলি	৩৩৫
৪.৫.৫	ভৌগোলিক পরিবেশ কাকে বলে	৩৩৬
৪.৫.৬	ভৌগোলিক পরিবেশের প্রকারভেদ	৩৩৭
৪.৫.৭	মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলির উপর ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব	৩৩৮
৪.৫.৮	উপসংহার	৩৩৯

পঞ্চম অধ্যায় : ব্যবহারিক ভূগোল ৩৪০–৩৫৮

৫.০ মানচিত্র পঠন ৩৪০

৫.১ মানচিত্রের পটভূমি ৩৪০

৫.২ মানচিত্রের সংজ্ঞা ৩৪২

৫.৩ মানচিত্রের প্রকারভেদ ৩৪৩

৫.৪ মানচিত্রাংকন পদ্ধতি ৩৪৭

৫.৫ মানচিত্রের প্রয়োজনীয়তা ৩৫১

৫.৬ মানচিত্রের গুরুত্ব ও ব্যবহার ৩৫২

৫.৭ মানচিত্র ব্যবহারের জন্য সতর্কাবলি ৩৫৪

৫.৮ মানচিত্র অংকনের কতিপয় সমস্যা ৩৫৫

৫.৯ মানচিত্রের স্কেল এবং উদ্দেশ্যভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ ৩৫৫

৫.১০ বন্টন মানচিত্র অংকনের কৌশলভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ ৩৫৭

৫.১১ মানচিত্রে ব্যবহারের জন্য রংসূচি ৩৫৭

৫.১২ মানচিত্রে ব্যবহৃত স্কেল ও উহার শ্রেণিবিভাগ ৩৫৮

ষষ্ঠ অধ্যায় : পাঠ পরিকল্পনা ৩৫৯–৩৭২

৬.১ ভূমিকা ৩৫৯

৬.২ পাঠ–পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা ৩৫৯

৬.৩ সার্থক পাঠ পরিকল্পনার লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্যসমূহ ৩৬০

৬.৪ পাঠ পরিকল্পনার গুণাবলি ৩৬১

৬.৫ পাঠ পরিকল্পনার দোষাবলি ৩৬১

৬.৬ পাঠ পরিকল্পনায় হার্বার্টের সোপানসমূহ ৩৬২

৬.৭ একটি আদর্শ নমুনা ৩৭২

গ্রন্থপঞ্জি ৩৭৩

প্রথম অধ্যায়

ভূগোলের স্বরূপ, সংজ্ঞা ও তার ধারণা

১.১ ভূমিকা

শিক্ষার উদ্দেশ্য হল ব্যক্তিত্বের উন্নয়ন। অন্য কথায় বলা যায় "ব্যক্তির অন্তর্নিহিত সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশই হল শিক্ষা।" শিক্ষার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ সম্পর্কে বিভিন্ন শিক্ষাবিদ বিভিন্ন সময় নানা তথ্য পরিবেশন করেছেন। ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধন এবং সমাজ জীবনের সাথে সুষ্ঠু সুন্দর ও সার্থক অভিযোজন হচ্ছে আধুনিক শিক্ষার সার কথা। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, শিক্ষার এরূপ তাৎপর্য যেমনভাবে বিভিন্ন দার্শনিকের মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত তেমনি সমাজবিজ্ঞানিদের দ্বারা সমর্থিত। আধুনিক শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষালব্ধ ফলাফল শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণে, শিক্ষাক্রম গঠনে ও ক্রমবিন্যাসে, পদ্ধতি প্রয়োগে তথ্য মূল্যায়নসহ শিক্ষার নানা সংগঠনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে। আধুনিক মনোবিজ্ঞানি, সমাজবিজ্ঞানি ও শিক্ষাবিজ্ঞানিদের মতানুসারে মানুষের জ্ঞানভাণ্ডার অখণ্ড অবিভাজ্য এবং অবিভক্ত। খণ্ড জ্ঞান অর্ধসত্যের ন্যায়ই অর্থহীন। জ্ঞানকে টুকরো টুকরো করে ভাগ করে দেখা যায় না। প্রখ্যাত দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ হার্বার্ট স্পেনসারের মতো আরো অনেকেই এই মতের সমর্থক। তাঁরা জ্ঞানের অখণ্ডতাকে স্বীকার করে নিয়ে বর্তমান শিক্ষাদান পদ্ধতির তীব্র সমালোচনা করেছেন। এ ধরণের শিক্ষা ব্যবস্থায় মানুষের চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব সামগ্রিকভাবে বিকশিত হয় না। কেননা মানব জীবনের বিবর্তন খণ্ডিত পথে হতে পারে না। যে কোন ব্যক্তিকে শিক্ষা দিতে হলে সেই ব্যক্তির সমগ্র সত্তাকেই শিক্ষা দিতে হয়। এ কারণেই একদিকে যেমন আছে জ্ঞানের অখণ্ড জগৎ তেমনি অন্য দিকে আছে ব্যক্তির সমগ্র চরিত্র ও সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্ব।

আমাদের আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় বিষয় বিভাজন নীতিকে স্বীকার করা হয়েছে। সমগ্র শিক্ষাক্রমকে (Curriculum) বেশ কয়েকটি বিষয়ে বা শাখায় বিভক্ত করা হয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই সকল বিষয়েই শিক্ষা দেয়

হয়। শিক্ষাবিদগণ এই বিষয় বিভাজনের নীতি সমর্থন করেন প্রধানত তিনটি কারণে। কারণ তিনটি হল ঃ

১. দেশের জাতীয় শিক্ষানীতিকে সহজ পথে কার্যকরী করার জন্য

২. বিদ্যালয় পরিচালনার সুবিধার জন্য এবং

৩. দলগত শিক্ষাদানকে সম্ভব করে তোলার জন্য।

বিষয় বিভাজন নীতি দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। শিক্ষাক্ষেত্রে তাই অনেকগুলো বিষয়ের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। এই বিষয় বিভাজন নীতির জন্যই বর্তমানে ভূগোল একটি স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে যদিও ভূগোলের সঙ্গে অন্যান্য অনেক বিষয়ের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। ভূগোলের জ্ঞান শিক্ষা গ্রহণ সর্বস্তরে প্রয়োজন। ভাষা ও সাহিত্য, জীববিদ্যা, জড়বিদ্যা, ইতিহাস, অর্থনীতি, সমাজবিদ্যা, গণিতশাস্ত্র, পরিসংখ্যান প্রভৃতি কতকগুলো বিষয় আছে যেগুলো সম্পর্কে যথাযথভাবে জ্ঞানার্জন করতে হলে ভূগোলের জ্ঞান অপরিহার্য। ভূগোলের সঙ্গে এতগুলো বিষয়ের যোগসূত্র আছে বলে ভূগোলকে বিজ্ঞানের প্রসূতি বা Mother Science বললে অত্যুক্তি হয় না। আবার অন্যান্য বিষয়ের জ্ঞানও ভূগোলকে সমৃদ্ধ করে। প্রসঙ্গক্রমে এখানে আমাদের জানা দরকার যে ভূগোল কি?

সমাজবিজ্ঞানিদের যুক্তিমতে ভূগোল হচ্ছে সমাজবিজ্ঞানের একটি শাখা। অপরদিকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান (Natural Science) এর বৈশিষ্ট্যের আলোকে বলা যায় ভূগোল প্রাকৃতিক বিজ্ঞানেরই একটি শাখা। যেহেতু উভয় পক্ষের জোরালো যুক্তি রয়েছে সেহেতু বিতর্কের অবসানকল্পে ভূগোলকে উভয়বিজ্ঞানের 'যোগসেতু'রূপ একটি বিষয় বলে ধরে নেয়া যায়। ভূগোলের সংজ্ঞা বিভিন্ন মনীষী বিভিন্নভাবে দিয়েছেন। আলোচনার সুবিধার্থে এখানে একটি সংজ্ঞা নিয়ে ভূগোল কি তা বুঝাতে চাই। হান্টিংটন (Huntington) ভূগোলের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, "মাটি, জল ও বায়ুর প্রভাবে উদ্ভিদ, প্রাণী ও মানুষের জীবনে যে পরিবর্তন আসে তা একস্থানের জীবন যাত্রা থেকে অন্য স্থানের জীবন যাত্রার পার্থক্য নির্দেশ করে তারই ব্যাখ্যা ও আলোচনা ভূগোলের মূল আলোচ্য বিষয়।" কাজেই মানুষের জীবনের সঙ্গে ভূগোলের সম্পর্ক অস্বীকার করার উপায় নেই। প্রকৃতিকে নিয়েই ভূগোলের বিষয়বস্তু। প্রাকৃতিক উপকরণ সংগ্রহের জন্যই মানুষের সর্বপ্রকার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড। মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের সমস্যা সমাধানের জন্য ভূগোলের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি।

এ জন্যই আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ভূগোল একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ভূগোলের জ্ঞান শিক্ষা গ্রহণের সর্বস্তরে প্রয়োজন। কারণ একটু পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে ভাষা ও সাহিত্য, জীববিদ্যা, জড়বিদ্যা, ইতিহাস, অর্থবিদ্যা, সমাজবিদ্যা, গণিতশাস্ত্র, পরিসংখ্যান এমনকি রেডিও, টিভির পরিবেশিত সংবাদসহ আরো কতগুলো বিষয় আছে যেগুলো সম্পর্কে যথাযথভাবে

অর্জন করতে হলে ভূগোলের জ্ঞান অপরিহার্য। বর্তমানের প্রগতিশীল বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হলে প্রত্যেকটি মানুষের প্রয়োজন বিশ্ব পরিস্থিতিকে ভালভাবে জানা ও তদনুসারে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়া। নিত্য পরিবর্তনশীল বিশ্ব পরিস্থিতিকে গভীরভাবে জানার ও স্পষ্টভাবে বুঝবার একটি অন্যতম শিক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে ভূগোল।

তাই এ বিষয়টি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মনে বিপুল আগ্রহ সৃষ্টি করার সম্ভাব্য পদক্ষেপগুলো গ্রহণ না করলে ভূগোল শিক্ষাদান দিন দিন কৃত্রিম, গতানুগতিক ও যান্ত্রিক হয়ে যাবে। এজন্য ভূগোল শিক্ষাদান যাতে ফলপ্রসূ ও অর্থবহ হয় সেজন্য প্রথমে তাদেরকে "ভূগোলের সংজ্ঞা ও তার স্বরূপ" জানতে হবে।

১.২ ভূগোলের সংজ্ঞা

ভূগোল একটি বিজ্ঞান। একে বিজ্ঞান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে অনেকেই অনেক সংজ্ঞা দিয়েছেন। নিচে সেগুলো দেয়া হলো ঃ

"পৃথিবী ও মানব জাতির পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করে ভূগোল "—বলেন জার্মান ভূগোলবিদ Ritter ।

ভূগোলের জন্মের পর থেকে প্রতিদিন ভূগোলে নতুন নতুন জ্ঞান সংযোজিত হয়ে এর পরিধি সম্প্রসারিত হচ্ছে। ফলে ভূগোলের সংজ্ঞারও পরিবর্তন ঘটছে।

"ভূগোল হচ্ছে পৃথিবী আর তার অধিবাসীদের বিবরণ।" —বলেন অধ্যাপক ডাডলি স্ট্যাম্প।

"ভূগোলের কাজ হল পৃথিবীর বিভিন্ন পরিবেশের সাথে মানুষের জীবনধারার সম্পর্ক নির্ণয় করা" বলেন অধ্যাপক ম্যাকিন্ডার।

"ভূগোল হচ্ছে উদ্যোগের বিজ্ঞান, কারণ এর মাধ্যমেই আমরা পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করি, আর এই সম্পর্ক ছাড়া প্রগতি পিছিয়ে পড়তে বাধ্য।" এ সংজ্ঞাটি দিয়েছেন প্রখ্যাত ভূগোলবিদ অধ্যাপক স্টলে। কারণ ভূগোলের জ্ঞান ছাড়া রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়।

"ভূগোলের কাজ হল ভাবীনাগরিককে বিশ্ব রঙ্গমঞ্চের অবস্থা সম্পর্কে সঠিক ধারণা অর্জনের জন্য শিক্ষা দেয়া যা বিশ্বের সর্বত্র যে সকল সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যাদি রয়েছে সে সম্পর্কে সুস্থভাবে চিন্তা করতে সাহায্য করে।" বলেন অধ্যাপক ফেয়ারগ্রিভ।

"আবাসভূমি পৃথিবীপৃষ্ঠের সবখানে অন্যান্য বিজ্ঞানের জ্ঞানকে সার্থকভাবে মানব কল্যাণে ব্যবহার করা।" বলেন অধ্যাপক ফ্রাংক ডিবেনহাম। এখানে তিনি একজন ভূগোলবিদের জন্য

প্রধানত তিনটি কাজের কথা বলেছেন—

(ক) বণ্টন সংক্রান্ত তথ্যের সংব্যাখ্যান দান করা।

(খ) প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক নির্ণয় করা।

(গ) মানবিক ও প্রাকৃতিক উপাদানগুলোর পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা করা।

অধ্যাপক ডিবেনহামের এই বক্তব্য অনেকখানি সন্তোষজনক।

"মানুষ ও তার পরিবেশের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াই হচ্ছে ভূগোল। এই পরিবেশ হলো জলবায়ু, মৃত্তিকা, প্রাকৃতিক অঞ্চল, উদ্ভিদ, প্রাণী প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়।" হালফোর্ড ম্যাকিন্ডারের ভূগোলের এ সংজ্ঞা মানুষের স্বাধীন সত্তাকে অনেকখানি প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করেছে।

"Description according to time is history and according to space is geography" সংজ্ঞাটি দেন প্রখ্যাত দার্শনিক ও ভূগোলবিদ ইমানুয়েল কান্ট। ভূগোলের সংজ্ঞা হিসেবে এটি পূর্ণাঙ্গ না হলেও আংশিক সত্য।

"ভূগোল হচ্ছে এমন একটি বিষয় যা মানুষের প্রাকৃতিক, সামাজিক পরিবেশের সাথে সম্পর্ক রেখে তার কার্যাবলি পর্যালোচনা করে।" বলেন অধ্যাপক ই.এ. ম্যাকী। এখানে ভূগোলকে পরিবেশের সাথে মানুষের সম্বন্ধ নির্ণায়ক হিসেবে দেখানো হয়েছে।

"ভূগোলের বিষয় হচ্ছে মানুষের সেই প্রাকৃতিক পরিবেশ পর্যবেক্ষণ, যে প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে মানুষ তার জীবনধারণের প্রধান প্রধান চাহিদাগুলো মেটানোর জন্য কাজ করে চলেছে।" এ সংজ্ঞাটিও দেন অধ্যাপক ই.এ. ম্যাকনি।

"ভূগোল এমনই এক বিজ্ঞান যা স্থলজ সজীব প্রাণির অবস্থা প্রণিধান করে এবং অবস্থাভেদে সাংগঠনিক উপাদানসমূহের সম্পর্ক নির্ণয় করে।" বলেন অধ্যাপক আনস্টিড।

ভূগোলের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে অন্যান্য প্রসিদ্ধ ভূগোলবিদগণ উল্লেখ করেছেন—

"পৃথিবীর বিবরণকে ভূগোল বলা হয়।"

"ভূ-পৃষ্ঠে যে সকল পদার্থ ও জীবজন্তু একত্র রয়েছে যে বিজ্ঞান শাস্ত্রে তাদের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় ও ব্যাখ্যা করা হয়, তার নাম ভূগোল।"

"পৃথিবীর পৃষ্ঠের উঁচু নিচু বা বন্ধুরতার কথা ও তার (বন্ধুরতার) ফলে পৃথিবীর অন্যান্য অবস্থার কি পরিণতি ঘটেছে, বিশেষত মানব জাতির উপর তার কি প্রতিক্রিয়া ঘটেছে তাদের আলোচনা ভূগোলে থাকে।"

"পৃথিবীর ও মানবের সঙ্গে সম্পর্ক বিষয়ে যে শাস্ত্রে আলোচনা করা হয় তার নাম ভূগোল।"

"প্রতিবেশের দিক দিয়ে বিবেচনা করে যে শাস্ত্রে মানবজাতির বিষয়ে আলোচনা থাকে তার নাম ভূগোল।"

"পৃথিবীর প্রাকৃতিক সংস্থান মানুষের উপর কিরূপে প্রভাব বিস্তার করে বা করেছে—কিরূপে মানুষ তার কর্মতৎপরতাকে প্রাকৃতিক সংস্থানের উপযোগী করে আপন জীবন যাত্রার প্রয়োজনে খাটায়, ভূগোলে তার আলোচনা থাকে।"

"পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন অবস্থায় মানুষ কিরূপে তার সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের উপযোগী করে জীবনযাত্রার পদ্ধতি গড়ে তুলেছে তার খবর আমরা ভূগোল হতে পাই।"

"ভূগোলে অন্যান্য বিজ্ঞানশাস্ত্র একত্রীভূত হয়েছে প্রধানত অন্যান্য বিজ্ঞানশাস্ত্রের মাল মশলা গ্রহণ করে ভূগোল বিজ্ঞানের কাজ চলে। অবশ্য ঐ সকল মাল মশলা ব্যবহারের জন্য ভূগোলের নিজস্ব পদ্ধতি রয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ের ভিতর পরস্পর সম্পর্ক স্থাপন এবং বিশেষত মানুষের উপর ঐ সকল বিষয়ের প্রভাব বা প্রতিক্রিয়া আলোচনা করা ভূগোলের কাজ।"

"পৃথিবীপৃষ্ঠে অবস্থিত অজৈব পদার্থ (যেমন পাহাড়, পর্বত, উপত্যকা, নদীনালা, মৃত্তিকা ইত্যাদি) অর্থাৎ মানুষ, জীবজন্তু, গাছপালা প্রভৃতির উৎপত্তি ও জীবনযাত্রার উপর কি প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া বিস্তার করে তার আলোচনা ভূগোলে পাওয়া যায়।"

ভূগোলের আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে উপরিউক্ত সংজ্ঞাগুলো পরস্পর বিরোধী বা একেবারে সম্পর্কহীন নয় বরং একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে, এ সংজ্ঞাগুলোর কোন কোনটি অপর কোনটির প্রায় ভাষান্তর মাত্র।

ভূগোলের সংজ্ঞা বহু পণ্ডিত ব্যক্তি বিভিন্নভাবে দিয়েছেন। এ কথার প্রতিফলন Kingsland এবং Cornish এর ভাষায় পাই, "Geography has however been defined in many different ways. Here are a few definitions chosen at random from of prominent geographers."

১. "Geography is the science which interprets relationships between all the different things that exist together on the face of the earth."

২ "Geography is the exact and organised knowledge of the distribution of phenomena of the surface of the earth culminating in the explanation of the interaction of man with his terrestrial environment."

৩. "Geography deals with surface relief of the earth and with influence which that relief exercises upon the distribution of their phenomena and specially upon the life of man."

৪. "Geography is the study of men in their environment."

উপরোক্ত চারটি সংজ্ঞার উৎস ঃ

Kingsland, J.C. and W.B. Kornish, Teach yourself Geography, Bungay, Richard Clay and Company Ltd. Great Britain, 1939.

উপরোক্ত সংজ্ঞা থেকে একথা বলা যেতে পারে যে, ভূগোলবিদদের সম্পর্কে ধারণা সুস্পষ্ট হলেও বিষয়টি সংব্যাখ্যানে এখনও যথেষ্ট জটিলতা বিদ্যমান।

"ভূগোল পঠন পাঠনের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা শুধু ভূ-প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন করবে না, মানুষ ও পৃথিবীর পারস্পরিক সম্বন্ধ এবং মানুষ ও অন্যান্য প্রাণি এবং মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক নির্ণয়ও ভূগোল শিক্ষাদানের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।"

নিঃসন্দেহে ভূগোলের এই সংজ্ঞাটি ভূগোল শিক্ষাদানের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে নির্দিষ্ট করেছে। অন্যান্য অনেক সংজ্ঞায় ভূগোলের ক্ষেত্রে মানবজাতির স্বাধীন সত্তার মূল স্বীকৃত হয় নি। ভূগোলের এ সংজ্ঞাটি তাই ভূগোল শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

মানুষের জীবনের সঙ্গে ভূগোলের সম্পর্ক অস্বীকার করার উপায় নেই। প্রকৃতিকে নিয়েই ভূগোলের বিষয়বস্তু। প্রাকৃতিক উদাহরণ সংগ্রহের জন্যই মানুষের সর্বপ্রকার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড। মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের সমস্যা সমাধানের জন্য ভূগোলের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি।

১.৩ ভূগোলের ধারণা ও উৎপত্তি

প্রাচীন মিশরীয় পণ্ডিত ইরাতোসথেনিস সম্ভবত "ভূগোল" শব্দটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন। তিনি প্রায় দু'হাজার বছর পূর্বে বহু চেষ্টা করে পৃথিবীর পরিধি নির্ণয় করে ভূগোলবিদ হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত ভূগোল বিষয়টির স্বতন্ত্র কোন মর্যাদা ছিল না। আগে একে ভূ-তত্ত্বের অংশ হিসেবে দেখানো হত। ইংল্যান্ডের খ্যাতনামা ভূ-তত্ত্ববিদ Sir Archlibald Geikie ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দে মন্তব্য করেছিলেন, "In its true sense geography is a part of geology."

ভূগোল শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Geograpy' যা দু'টো গ্রিক শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। গ্রিক শব্দটি Geographia এর প্রথমটি "ge" যার অর্থ পৃথিবী এবং দ্বিতীয়টি

"Graphein" অর্থ বর্ণনা। তাই ব্যুৎপত্তিগত অর্থে Geogrphy অর্থাৎ ভূগোল বলতে পৃথিবীর বর্ণনাকে বুঝায়।

ভূগোল শব্দটির বিশ্লেষণ দিতে গিয়ে J.C. Kingsland এবং W.B. Cornish বলেছেন, "The word geography is of Greek origin. It is derived from two words meaning 'The earth' and 'to write about' hence its literal meaning is a written description of the earth."

জেমস ফেয়ারগ্রিভের মতে, "ভূগোল বিষয়টি পাঠক্রমে একটি বিশেষ স্থান দাবি করে এর অবদানের জন্যই নয়, বরং ভূগোল ছাড়া আমরা সত্যিকার জ্ঞান লাভ করতে পারি না।"

মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি বিকাশের ক্ষেত্রে ভূগোল শিক্ষার এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে ভূগোল শিক্ষার ফলে প্রকৃতির নানা কৌতূহল উদ্দীপক অজানা বিষয়ের সঙ্গে শিক্ষার্থীর পরিচয় ঘটে। ফলে শিক্ষার্থী নতুন নতুন বিষয় সম্বন্ধে আরও জানতে চায়। তার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি তাকে যুক্তিবাদী করে তোলে। ফলে তার মনে জাগে আবিষ্কারের স্পৃহা।

ভূগোল ব্যক্তিত্ব বিকাশের শিক্ষাদান করে। প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে কিভাবে জীবন যাপন করছে তার অনুশীলনই ভূগোলের প্রতিপাদ্য বিষয়। আন্তর্জাতিকতার দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলাও ভূগোল শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে 'রয়েল ভূগোল সমিতিতে' একদল ভূগোলবিদ একত্রিত হয়ে আলোচনা শেষে সিদ্ধান্তে পৌঁছুন যে, "জ্ঞানের সুষম উৎকর্ষ সাধনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় পাঠক্রমে ভূগোলকে স্থান দেয়া প্রয়োজন।"

১.৪ ভূগোল শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ভূগোল শিক্ষার লক্ষ্য আর উদ্দেশ্য কি তা শিক্ষাদানের পূর্বে শিক্ষার্থীদের জানিয়ে দেয় দরকার। কারণ বিষয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্থির না থাকলে শিক্ষার্থীর মানসিক প্রস্তুতি গড়ে উঠে না সুতরাং শিক্ষার্থীকে প্রথমেই জানতে হবে বিষয়টি কেন তাদের পড়তে হবে? এর বিষয়বস্তু কি? তার লক্ষ্য কি? কোন উদ্দেশ্যে বিষয়টি পাঠ্য তালিকাভুক্ত করা হবে ইত্যাদি। শিক্ষার্থী বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারলে বিষয়টি সম্পর্কে তার কৌতূহল স্বভাবতই জাগ্রত হয়, আর কৌতূহলের উন্মেষ সাধনই হল শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য।

সাধারণত শিক্ষার ক্ষেত্রে সকল বিষয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য মোটামুটি এক। তবে অনেক ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক আর সামাজিক প্রয়োজনীয়তার দিক থেকে এক একটি বিষয়ের গুরুত্ব বেশি করে দেখা হয়। মানুষের জীবনযাত্রা ও জীবিকা অর্জনের সঙ্গে ভৌগোলিক পরিবেশের রয়েছে

অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। তাই শিক্ষাকে যদি মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ বলা হয় তাহলে ভূগোল শিক্ষার এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ভূগোল শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলো এভাবে আলোচনা করা যায়। যেমন—

(১) **মানসিক চেতনার উন্মেষ সাধন :** শিক্ষার উদ্দেশ্য হল সব দিক দিয়ে শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন করা। মানসিক চেতনার উন্মেষ সাধনও শিক্ষার অপর এক লক্ষ্য। কারণ মানসিক চেতনা জাগ্রত করতে না পারলে শিক্ষার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়। মানসিক চেতনা শিশুর মনে জাগিয়ে তুলতে পারলে সে সুষ্ঠু সামাজিক জীবন যাপন করতে সমর্থ হয়, কারণ মানসিক চেতনা মানুষের মনে ভাল মন্দের বিচার শক্তি জাগিয়ে তোলে। ভূগোল শিক্ষা শিশুর মানসিক চেতনার বিকাশ সাধনে বিশেষভাবে সহায়তা করে।

(২) **জাতীয় সংহতির মনোভাব গড়ে তোলা :** ভূগোল দেশের বিবরণ প্রকাশ করে। দেশের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মনকে আকর্ষণ করে, দেশের নদী প্রান্তর মনের কোণে কোণে বইয়ে দেয় কত নিত্য নতুন ভাবধারা। জাগিয়ে তোলে তাদের প্রতি ভালবাসা। পাহাড়, পর্বত মালভূমি, গাছপালা, শস্যক্ষেত্র দেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রকম, এরা মনের কোণে কোণে বাসা বাঁধে, ভালবাসার বীজ অংকুরিত করে দেয়। দেশের এক প্রান্তের সঙ্গে অন্য প্রান্তের মিলনেই কত রকমের মানুষ কত রকমের জাতি গোষ্ঠী, তাদের কত রকমের সভ্যতা আর সংস্কৃতি, এরাও মনের কোণে রঙিন রঙ ধরায়। প্রকৃতি আর মানুষ একটি হৃদয়-আত্মার মধ্যে বিঁধে গিয়ে এক অপূর্ব সমবেদনার ভাব গড়ে তোলে। তখন মনে হয় সারা দেশে কোন বিভেদ নেই, আছে শুধু বৈচিত্র্য, এরা কেউ পর নয় সবাই আপন। সারাদেশের মানুষের মধ্যে এই সুসম্পর্কের মনোভাব গড়ে তোলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই মনোভাব জাতীয় সংহতির সোপান। ভূগোল পাঠ দেশের মানুষের মধ্যে এই জাতীয় সংহতির মনোভাব গড়ে তোলার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করছে।

৩. **পৃথিবী সম্পর্কে তথ্য পরিবেশন ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত করা আর আন্তর্জাতিক মনোভাব গড়ে তোলা :** ভূগোল নানা বিষয় সম্বন্ধে নানা তথ্য পরিবেশন করে। ফলে দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত হয়। ভূগোল পাঠ করে আমরা নানা দেশের বিভিন্ন মানব গোষ্ঠীর কথা জানি। তাদের জীবনযাত্রার সঙ্গে আমরা পরিচিত হই। ফলে অপর দেশের মানুষের সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে এক প্রীতির ভাব জেগে ওঠে, আর তা থেকেই বিশ্ব নাগরিকতার মনোভাব গড়ে ওঠে।

শিক্ষার্থীরা নানা দেশের মানুষের জীবনযাত্রার কথা, ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের কথা ভূগোল থেকে জানতে পারে। ভূগোল ও তার পরিবেশের কথা পরিবেশন করে এবং এর ফলে শিক্ষার্থীর মনে এক আন্তর্জাতিকতার মনোভাব গড়ে ওঠে। এই আন্তর্জাতিকতার মনোভাব গড়ে তোলা ভূগোল শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য।

৪. সহযোগিতা, সমবেদনা ও উদারতা প্রভৃতি গুণগুলোর বিকাশ সাধন করা : ভূগোলে আমরা নানা দেশের নানান ধরনের সভ্যতা ও সংস্কৃতির কথা পড়ি। এর ফলে আমাদের মনে অপরের সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে উদার মনোভাব গড়ে ওঠে। ভূগোল শিক্ষা শিক্ষার্থীর মনে অপর দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে সমবেদনা ও সহানুভূতির ভাব গড়ে তোলে। ফলে শিক্ষার্থী সুনাগরিক হয়। শিক্ষার্থীর মধ্যে সহযোগিতা, সমবেদনা, উদারতা প্রভৃতি গুণগুলো বিকশিত হওয়ার সুযোগ পায়। এই গুণগুলো যদি মানুষের মধ্যে অধিক পরিমাণে গড়ে ওঠার সুযোগ পায় তাহলে বিশ্ব গণতন্ত্র এবং সারা পৃথিবী জুড়ে একটি মাত্র সরকার গঠনের স্বপ্ন হয়তো সফল হবে, আর তার ফলে বিশ্ব শান্তি হয়ত কোনদিনই বিঘ্নিত হবে না।

৫. পরিবেশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার মনোভাব গড়ে তোলা : ভূগোল নানা দেশের নানা মানুষ আর বৈচিত্র্যময় পরিবেশের কথা পরিবেশন করে। প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে কিভাবে মানিয়ে নিয়ে মানুষ বাস করে, তার শিক্ষা থেকে শিক্ষার্থীর মনে পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলার গুণগুলো বিকশিত হয়। সামঞ্জস্যবোধের মনোভাব গড়ে উঠলে শিক্ষার্থী ভবিষ্যৎ জীবনে যে কোন সমস্যার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে পারে।

৬. প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করা : আজকে যে শিশু, কালকে সে নাগরিক। ভূগোল তাকে দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ, সম্পদ ও অর্থনৈতিক অবস্থার কথা জানিয়ে দেয়। এ জ্ঞান তার পরিণত জীবনে কাজে লাগে এবং মাতৃভূমির অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য তার উন্নততর মানসিক চেতনা গড়ে তোলে।

৭. মানুষের উপর প্রাকৃতিক প্রভাব সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করা : ভূগোল শিক্ষার ফলে মানুষের উপর প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব উপলব্ধি করা সহজ হয়। ভূগোল শিক্ষার ফলেই একথা বুঝা যায় যে, তুন্দ্রা অঞ্চলের এসকিমোরা কেন শুধু মাংস খায় আর পশুর চামড়া পরিধান করে। মানুষের উপর প্রাকৃতিক পরিবেশের এই প্রভাবের কথা সকলেরই জানা প্রয়োজন।

(৮) সভ্যতা বিকাশে ভূগোলের গুরুত্ব উপলব্ধি করা : কি কি ভৌগোলিক কারণে সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে তা অনুশীলন করাও ভূগোল শিক্ষার লক্ষ্য। ভৌগোলিক কারণেই কোন একটি সভ্যতার উত্থান বা পতন ঘটে। এই কারণগুলো উপলব্ধি করাও ভূগোল শিক্ষার লক্ষ্য।

অধ্যাপক Holtz ভূগোল শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন (ক) বাস্তব দিক (খ) সামাজিক দিক।

(ক) বাস্তব দিক

১। ভূগোল শিক্ষার মাধ্যমে দেশের প্রাকৃতিক বিষয় যেমন ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু স্বাভাবিক উদ্ভিদ, উৎপন্ন দ্রব্য প্রভৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা যায়।

২। ভূগোল শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের উপর প্রাকৃতিক বিষয়ের কার্যকরী প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করা।

৩। ভৌগোলিক জ্ঞানের মাধ্যমে কৃষি উন্নয়ন ও শিল্প উন্নয়নের পরিকল্পনা করা।

(খ) সামাজিক দিক

ভূগোল শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সামাজিক দিক Holtz ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে—

১। দেশপ্রীতি জাগিয়ে তোলা।

২। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রতি ভালবাসা গড়ে তোলা।

৩। সহযোগিতা, সমবেদনা ও বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধের মনোভাব গড়ে তোলা।

৪। দেশ ও মানুষের পরিপ্রেক্ষিতে সভ্যতা ও সংস্কৃতি মূল্যায়ন উপলব্ধি করতে শেখা।

পরিশেষে, ভূগোল শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে অধ্যাপক James Fairgrieve-এর মন্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে, "ভূগোলের কাজ হচ্ছে ভবিষ্যৎ নাগরিকগণকে এমনভাবে শিক্ষিত করে গড়ে তোলা, যাতে তারা পৃথিবীরূপ রঙ্গমঞ্চের অবস্থাগুলো সঠিকভাবে বুঝতে পারে এবং পৃথিবীর রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাগুলো সম্বন্ধে সঠিকভাবে চিন্তা করতে পারে।"

১.৫ মাধ্যমিক পর্যায়ের ভূগোল শিক্ষার বিশেষ উদ্দেশ্য

বিভিন্ন মনীষী, বিভিন্ন কমিশন বা কমিটি বিভিন্ন সময়ে ভূগোল শিক্ষার উদ্দেশ্যাবলি বর্ণনা করেছেন। উদ্দেশ্যাবলিতেও বিভিন্নতা রয়েছে। নিচে ভূগোল শিক্ষার চারটি উদ্দেশ্য লিপিবদ্ধ করা হল। এই উদ্দেশ্য চারটি প্রণীত হয় ১৯৫০ সালে ইউনেস্কো কর্তৃক আয়োজিত 'ভূগোল শিক্ষা' বিষয়ক একটি সম্মেলনে আগত ভূগোল শিক্ষাবিদগণ কর্তৃক। সম্মেলনটি কানাডার মন্ট্রিলে অনুষ্ঠিত হয় এবং এতে ইউনেস্কোভুক্ত ২৩টি দেশের প্রতিনিধিবৃন্দ যোগদান করেন। প্রতিনিধিদের সকলেই ছিলেন খ্যাতনামা ভূগোলবিদ। উদ্দেশ্য চারটি হলো—

১. শিক্ষার্থীদেরকে তাদের নিজের সম্পর্কে জানার জন্য উৎসাহিত করা।

(To encourage children to think for themselves)

২. তাদেরকে এমনভাবে একটি পেশা গ্রহণ করার জন্য তৈরি করা যেখানে তাদের কাছে ভূগোলের জ্ঞান প্রয়োজনীয় হয়।

(To prepare them for one of the many careers which demand a knowledge of geography).

৩. অবসর সময়টুকুতে তারা যেন তাদের পড়াশুনা কিংবা ভ্রমণকাল অধিক আনন্দময় করতে পারে তার ব্যবস্থা করা। (To increase their leisure time occupations such as reading or travel).

৪. শিক্ষার্থীদেরকে এমনভাবে প্রশিক্ষণ দান করা যাতে তাদের মধ্যে বিশ্ব নাগরিকত্ববোধ জেগে উঠে, অন্যকথায় তাদের মধ্যে যেন আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া এবং সম্পর্ক গড়ে ওঠে

(To provide a training in world citizenship or in other words to create a spirit of international understanding and good will).

১.৪ ভূগোল শিক্ষার কার্যকারিতা

(১) আমরা যেখানেই বাস করি না কেন আমাদের নিজস্ব পরিবেশ রয়েছে। সেই পরিবেশ গ্রামীণ অথবা শহুরে হতে পারে। আবার সেই গ্রাম বা শহর কোন সমতল ভূমিতে, মালভূমিতে, পর্বত্যভূমিতে বা সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত হতে পারে। এক কথায় বলা যেতে পারে যে, আমাদের বাসভূমির প্রাকৃতিক পরিবেশ রয়েছে। এই প্রাকৃতিক পরিবেশে আমরা আবার নানা প্রকার অন্য ধরনের পরিবেশের যথা—সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি সৃষ্টি করেছি। ভূগোল বিষয়ের আলোচনার মাধ্যমে আমরা প্রথমেই জানব "প্রাকৃতিক পরিবেশকে তারপর দেখব এর প্রভাব অন্যান্য পরিবেশ রচনার ক্ষেত্রে কিরূপ কার্যকর হচ্ছে।

(২) ভূগোলে এমন সব বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয় যার উপযোগিতা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে রয়েছে। আমাদের বাসস্থানের রকম, পোশাক পরিচ্ছেদের ধরন, আহার ইত্যাদি আলোচনা কালে অনেক তথ্যই জানা যায় যা ভূগোল বিষয়ের আলোচনার আওতায় পড়ে। অর্থাৎ ভৌগোলিক ধারণা ব্যতিরেকে ঐ সবের সঠিক ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব নয়।

(৩) বিদ্যালয় জীবনে যে শিক্ষা শুরু হয়, তা পরবর্তী জীবনে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগের মধ্যমেই সার্থকতা লাভ করে। আমরা অনেক ক্ষেত্রে দেখি, সাধারণ নাগরিক দিকনির্দেশে ভুল করছে। ভুল করছে কোন স্থানের সঠিক অবস্থান জানতে বা বলতে। ভূগোল আলোচনার মধ্যমে কতকগুলো বিশেষ দক্ষতা শিক্ষার্থীরা লাভ করতে পারে, যেমন—মানচিত্র পঠন, পর্যবেক্ষণ প্রভৃতি। আজকের তরুণ শিক্ষার্থীই ভাবীকালের নাগরিক। বিভিন্ন পেশাদারী, যেমন—ডাক্তার প্রকৌশলী, প্রশাসক, ব্যবসায়ী, শিক্ষক যাই হোন না কেন ভৌগোলিক জ্ঞান তার অবশ্যই হবে দরকার। শিক্ষার্থীদের এরূপ দক্ষতা পরবর্তী জীবনে যে বিশেষ সহায়ক সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই।

(৪) শিক্ষার্থীদের বিচারকরণ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে ও কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয়ে ভূগোল পাঠ বিশেষভাবে সহায়ক। একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি পরিষ্কার হতে পারি। চট্টগ্রাম বন্দর বিদেশে পাট ও পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি করে। এই ভৌগোলিক ঘটনার বিশ্লেষণে কারণগুলোর সন্ধান খুঁজে পেতে অসুবিধা হবে না। কোন নির্দিষ্ট বাজার কেন একটি বিশেষ স্থানে বসে মনে এরূপ প্রশ্ন জাগলে অনেক ভৌগোলিক তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব। অন্যদিকে একটি বাজার আলোচনা করলে অনেক ভৌগোলিক তথ্য জানা সম্ভব যা হয়তো একাধিক বই মুখস্ত করেও সম্ভবপর হয় না।

পরিশেষে বলা যায় যে, বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে পৃথিবীর মানুষ আজ নিকট আত্মীয়। পৃথিবীর এক প্রান্তে এই মুহূর্তে কি ঘটলো তা বেতার যন্ত্র জানিয়ে দিচ্ছে অপর প্রান্তের মানুষকে। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে এই নৈকট্য আরও সুদৃঢ় হবে। ভূগোল বিষয়ের চর্চার একদিকে যেমন স্থানের চিত্র চোখের সামনে ভেসে ওঠে, অন্যদিকে তেমনি বিভিন্ন দেশের মানুষেরও। তাদের সম্বন্ধে সহনশীল ও সহানুভূতিপূর্ণ মনোভাব সৃষ্টি হলে বিশ্বের অনেক সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান হতে পারে। বলা বাহুল্য যে, বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধ আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া সব কিছুই নিছক শব্দ সমষ্টিতেই সীমাবদ্ধ থাকবে যদি সত্যিকারের ভৌগোলিক ধারণা ও তার পঠনের প্রশিক্ষণ শিক্ষার্থীদের দেয়া না হয়।

১.৭ ভূগোলের ব্যাকরণ এবং এর কার্যক্রম ও ধর্ম

ভূগোলের বিভিন্ন সংজ্ঞা, ভূগোলের সঠিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য আমাদেরকে একজন দক্ষ ভূগোল শিক্ষক হিসাবে প্রথমেই ভূগোলের ব্যাকরণ সঠিকভাবে অনুসরণ করতে হবে।

এ প্রসঙ্গে প্রথমেই দেখা যাক ভূগোলের ব্যাকরণ বলতে আমরা কি বুঝি? এ প্রশ্নের জবাব পেতে হলে আমাদের 'ব্যাকরণ' শব্দটির প্রকৃত অর্থ জানতে হবে। ব্যাকরণের ইংরেজি প্রতিশব্দটি হল 'Grammar'। এ ইংরেজি গ্রামার শব্দটি গ্রিক ভাষা থেকে আগত যার অর্থ—"The study of the right use of word." অর্থাৎ শব্দশাস্ত্র। কিন্তু আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় এ Grammar শব্দটির পরিধি প্রকৃত পক্ষে খুব ব্যাপক ও তাৎপর্যপূর্ণ। এ ব্যাকরণ শব্দটি বিভিন্ন জন বিভিন্নভাবে প্রয়োগ করেছেন। তবে তাঁদের সবার ব্যাকরণ প্রয়োগের অন্তর্নিহিত অর্থ প্রায় এক। তাই ব্যাকরণের ধারণা সংক্ষেপে নিম্নভাবে দেওয়া যেতে পারে।

'ব্যাকরণ' একটি সংস্কৃত শব্দ। এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল কোন বিষয়ের বিশেষরূপে বা সম্যকরূপে বিশ্লেষণ করা। ব্যাকরণ যে কোন শিক্ষণীয় বিষয়ের বিভিন্ন স্বরূপ বিশ্লেষণ করে এবং ভিতরের নিয়মকানুন ও রীতিনীতিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে থাকে।

এখানে আমাদের একটি কথা মনে রাখা দরকার যে, কোন বিষয়ের 'বিষয়বস্তু' আগে আসে। তার "ব্যাকরণ" আসে পরে। তাই ব্যাকরণের ধারণা সংক্ষেপে নিম্নভাবে দেয়া যেতে পারে।

উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে, ভূগোলের প্রাপ্ত তথ্যসমূহ একটি কাঠামোতে আনার পর ব্যাকরণের মাধ্যমে তার স্বরূপ ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা হয়। ব্যাকরণ বিষয়কে কোন নির্দেশ দান না করে বরং বিষয়টি যে নিয়মে বা যেভাবে জন্মলাভ করে সে মৌলিক নিয়মটিকে বলে দেয়। এ জন্য যে যেমন খুশি তেমনভাবে বিষয়টি আলোচনা বা বর্ণনা করতে পারে না। সবাইকে অবশ্যই ভূগোল বিষয়ের ব্যাকরণের নিয়মকানুন মানতে হয়। ভূগোলের ব্যাকরণ যে কোন প্রাণীর দেহের কঙ্কালের সাথে তুলনা করা যায়, যা দেহকে সঠিক, সবল ও সুন্দরভাবে ধরে রাখার জন্য অতীব প্রয়োজনীয়। দেহের বৃদ্ধির সাথে সাথে এটাও বৃদ্ধি পায়। দেহের ভিতরের কংকাল বাহিরে দেখা যায় তা আমরা চাই না। তেমনি কোন বিষয় শেখাতে সে বিষয়ের ব্যাকরণ যত কম প্রয়োগ করা যায় ততই উত্তম। শুধু ব্যাকরণ হিসাবে ভূগোলের ব্যাকরণ শেখার প্রয়োজন নেই।

আধুনিক ভূগোল ব্যাকরণ হিসেবে প্রাথমিক স্তরে শেখাতে হলে যুক্তিমূলক ক্রম পরিহার করে মনোবিজ্ঞানসম্মত ক্রমকেই প্রাধান্য দেয়া উচিত। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে যুক্তিমূলক ক্রমের গুরুত্ব থাকলেও বিদ্যালয়ে তা অপেক্ষাকৃত কম।

১.৭.১ ভূগোল শিক্ষায় ব্যাকরণের প্রয়োজনীয়তা : যে কোন বিষয়ের নানাবিধ কার্যাবলি সুচিন্তিত নিয়মাবলির মাধ্যমেই সুশৃঙ্খলভাবে গড়ে উঠে। ব্যাকরণ ছাড়া ভূগোল পড়তে গেলে ভৌগোলিক তথ্যগুলো এলোমেলো বা অগোছালো হয়ে পড়ে। শিক্ষককে ভূগোলের ব্যাকরণে সব নিয়ম কানুন জানতে হবে এবং সেগুলোর প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধাবোধ থাকতে হবে। ব্যাকরণ অনুসারে যথাযথ তথ্যসূচি প্রণয়ন করে ভূগোল শিক্ষাকে সহজ ও বোধগম্য করার জন্য সব শিক্ষককে সচেষ্ট হতে হবে।

অতএব ভূগোল বিষয়টি সুনিয়ন্ত্রিত করে খুব সুন্দরভাবে গুছিয়ে পড়তে হলে সব শিক্ষক শিক্ষিকাকে ভূগোলের ব্যাকরণ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা রাখতে হবে। ফলে শিক্ষক সাফল্যের সাথে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করতে পারবেন। ব্যাকরণ ভিত্তিক ভূগোল শিক্ষায় শিক্ষক ও ছাত্র উভয়েরই প্রেরণা জাগ্রত হয়।

অধ্যাপক জেমস ফেয়ারগ্রিভের বক্তব্য :

ভূগোল শিক্ষায় ব্যাকরণের প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে অধ্যাপক জেমস ফেয়ারগ্রিভ তাঁর "Geography in School" নামক বইয়ে বলেছেন, "Grammar is the orderly arrangement of the body of knowledge with which we are concerned in any subject therefore, we must have some principles of classification of grammar we have had more recently the grammar of science, which

means, the scheme in which science is arranged. In the same way we require to have grammar of geography."

অধ্যাপক জেমস ফেয়ারগ্রিভের উপরিউক্ত বক্তব্যগুলো থেকে সংক্ষেপে বলা যায় যে, ব্যাকরণ হল যে কোন বিষয়ের প্রাপ্ত তথ্যসমূহের সুশৃঙ্খল ও ধারাবাহিক শ্রেণিবদ্ধকরণ।

আমরা যা জানি তা সুশৃঙ্খলভাবে শিখাতে হলে আমাদের শিক্ষণীয় বিষয়টির তথ্যসূচি শ্রেণিবদ্ধকরণের জন্য একটি সুচিন্তিত নীতিমালা অবশ্যই থাকতে হবে। সে জন্যই প্রয়োজন ব্যাকরণের। সম্প্রতি বিজ্ঞান বিষয়ের ব্যাকরণ তৈরি করা হয়েছে যা বিজ্ঞান শিক্ষাকার্যক্রমকে একটি কাঠামোতে সুশৃঙ্খল ও ধারাবাহিকভাবে সাজিয়েছে। বিজ্ঞানের মতো ভূ-বিজ্ঞানের বিষয়গুলো সুন্দর ও ধারাবাহিকভাবে সাজানোর জন্য ভূগোলের ব্যাকরণ দরকার।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, ভূগোলের ব্যাকরণ হল ভৌগোলিক জ্ঞানের স্বরূপ, প্রকৃতি ও প্রয়োগনীতির বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা প্রদান এবং ভৌগোলিক কার্যক্রম ও বিষয়বস্তুর সুশৃঙ্খল বিন্যাস।

১.৭.২ ভূগোলের ব্যাকরণের ক্রমবিকাশের ধারা : ভূগোলবিদগণ কখন কোথায় ভূগোল শিক্ষায় ব্যাকরণ প্রয়োগ শুরু করেছিলেন তা আজও সঠিকভাবে বলা কঠিন। শিক্ষাদান কার্যক্রমে বিভিন্নস্তরে সময় সময় বিভিন্ন প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। আর তার সমাধানে এবং আরও নতুন তথ্য সন্ধানের জন্য ক্রমাগত চেষ্টা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলে। মানুষ তার বিরামহীন প্রচেষ্টাকে সার্থক করে তুলতে পেরেছেন। আমাদের এ পৃথিবীর সৌরজগতের নিত্যনতুন রহস্য উদঘাটিত করে।

আমরা আগেই জেনেছি যে যুগে যুগে ভূগোলের জ্ঞানের পরিধি সম্প্রসারিত হয়েছে। ফলে ভূগোলের সংজ্ঞারও পরিবর্তন ঘটেছে। সে জন্য বিভিন্ন সময় ভূ-বিজ্ঞানিগণ যেমন বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ভূগোলের সংজ্ঞা দিয়েছেন তেমনি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ভূগোলের নবতর ব্যাকরণের উপর গুরুত্ব আরোপ করে আধুনিক ভূগোলের তথ্যসূচি তৈরি করেছেন।

১.৭.৩ আধুনিক ভূগোল পাঠের পরিধি ও নবতর ভূগোলের ব্যাকরণ : আধুনিক ভূগোল পাঠের পরিধি ক্রমশই বিস্তৃত হচ্ছে। বিষয়টির স্বরূপ আলোচনায় দেখা যায় যে সনাতন কালের ভূগোল শুধু কতকগুলো ঘটনার তালিকার সম্বলিত বিষয় ছিল। বর্তমানে এটি একটি কার্যকারণ সম্পর্কযুক্ত বিশ্লেষণমূলক বিজ্ঞান বিষয়।

ভূগোলের প্রয়োজনীয় তত্ত্ব ও তথ্য সংগ্রহে অন্যান্য বিষয়ের উপর নির্ভর করতে হলেও এর আলোচনার ধরন, উদ্দেশ্য ও ধারা সম্পূর্ণ পৃথক।

ভূগোল বিষয়টি অত্যন্ত গতিশীল। আমাদের এ পৃথিবী পৃষ্ঠে নানাবিধ পরিবর্তন অবিরামভাবে চলছে। এসব পরিবর্তনের ফলে ভৌগোলিক বিষয়বস্তুর স্বরূপ ও পরিধি পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হচ্ছে এবং ভূগোল শিক্ষার নিত্য-নতুন কৌশল উদ্ভাবিত হচ্ছে।

আধুনিক ভূগোলের শাখা প্রশাখার বিস্তৃতি ও পরিধি এত ব্যাপক যে মানব জীবনের এমন কোন দিক বা জ্ঞান ভাণ্ডার নেই যেখানে ভৌগোলিক উপাদানের প্রভাব পড়ে নি।

প্রসিদ্ধ ভূগোলবিদ কার্ল রিটার ভূগোল আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে প্রাকৃতিক ভূগোল ও মানবীয় শাখাকে চিহ্নিত করেছেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাবে ভূগোল শিক্ষায় যে সব তথ্য জানা যায় তাতে দেখা যায় যে বিভিন্ন দেশের সীমা, পাহাড়, পর্বত, নদী-নালা, সাগর, উপসাগর, নগর, বন্দর ইত্যাদি ছিল ভূগোলের প্রধান আলোচ্য বিষয়।

ভূগোলের সে ব্যাকরণ ছিল অসম্পূর্ণ, কারণ আমাদের জন্য সেটা ছিল সংকীর্ণ আকারে এবং প্রকার উভয় ক্ষেত্রেই এ তথ্যসূচি বা ভূগোলের ব্যাকরণ ছিল সম্পূর্ণ অনুপযোগী। মানুষের জ্ঞান বিজ্ঞানের নতুন আবিষ্কার ও প্রয়োগের বিস্তার তখনও শুধু বর্ণনাতেই সীমাবদ্ধ ছিল মানবীয় বিষয় হিসাবে শিক্ষাক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি তখনও ভূগোলের তথ্যসূচিতে স্থান পায় নি।

১৯২০ সাল থেকে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণমূলক, ধারাবাহিক ভৌগোলিক আলোচনা শুরু হয় পশ্চিম ইউরোপ ও আমেরিকার উন্নত দেশগুলোতে যে হারে ভৌগোলিক ধ্যান ধারণার পরিবর্তন হয় সে তুলনায় উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এ গতি ছিল খুব মন্থর। ভূগোল শিক্ষার ক্ষেত্রে নতুন ধারণা, শিক্ষা কলা কৌশল ও বিষয়ের বিস্তৃতির জন্য আমেরিকা ও ইউরোপের ভূ-বিজ্ঞানীদের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১.৭.৪ আধুনিক ভূগোল ব্যাকরণের প্রকারভেদ : শিক্ষাক্ষেত্রে আধুনিক ভূগোলের বিষয়বস্তুর শ্রেণীবিভাগ ও পরিবেশনের জন্য প্রধানত দু'টি মনোবিজ্ঞানসম্মত নীতির অনুসরণ করা হয়

হয় —

(ক) আমেরিকার ভূ-বিজ্ঞানিদের নীতি।

(খ) ইউরোপের ভূ-বিজ্ঞানিদের নীতি।

(ক) আমেরিকার ভূ-বিজ্ঞানিগণ আলোচনার সুবিধার্থে বিষয়বস্তুর প্রকৃতি ও কার্যক্ষেত্র বিভিন্ন পরিধি অনুযায়ী তুলনামূলক ভিত্তিতে ভূগোল বিষয়কে কয়েকটি শাখায় ভাগ করেছেন

(খ) আধুনিক ভূগোল পাঠের উল্লেখযোগ্য অপর নীতিটি হলো ইউরোপের ভূ-বিজ্ঞানিগণের আঞ্চলিক ভূগোলের ধারণা।

অধ্যাপক জেমস ফেয়ারগ্রিভের মতে, বর্তমান বিশ্বের আধুনিক ভূগোলের দু'প্রকার ব্যাকরণ প্রচলিত আছে। যথা—

(১) আমেরিকার ভূ-বিজ্ঞানিদের ভূগোলের ব্যাকরণ।

(২) ইউরোপের ভূ-বিজ্ঞানিদের ভূগোলের ব্যাকরণ।

১.৮ ভূগোলের বিষয়বস্তুর শ্রেণিবিভাগে আমেরিকা ও ইউরোপের ভূ-বিজ্ঞানিদের অভিজ্ঞতা ও ধারণা

(ক) আমেরিকার ভূগোলবিদগণ যে ব্যাকরণের প্রাধান্য দেন সেটাই পৃথিবীর বেশির ভাগ স্থানে ব্যবহৃত হচ্ছে।

পৃথিবীর ও তার বসবাসকারী মানুষকে কেন্দ্র করে আলোচনার সুবিধার্থে বিষয়বস্তু, প্রকৃতি ও কার্যক্ষেত্রের পরিধি অনুযায়ী ভূগোলের ব্যাকরণ ভূগোল বিষয়কে সুশৃঙ্খল ও ধারাবাহিকভাবে সাত (৭)টি শাখায় ভাগ করে। যথা—

ভূগোলের শ্রেণিবিভাগ

↓

↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
প্রাকৃতিক ভূগোল	গাণিতিক ভূগোল	রাজনৈতিক ভূগোল	অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল	ঐতিহাসিক ভূগোল	মানবীয় ভূগোল	ব্যবহারিক ভূগোল

উপরে উল্লিখিত ভূগোলের প্রতিটি শাখাকে আবার বিভিন্ন প্রশাখায় ভাগ করা যায়। যথা— প্রাকৃতিক ভূগোল শাখাকে ভাগ করা হয়—ভূ-গঠন (Geomorphology), ক্ষয়ীভবন (Erosion), ভূ-তত্ত্ব (Geology), নদী প্রবাহ (River flow), সমুদ্রবিজ্ঞান ((Oceanography), আবহাওয়া বিজ্ঞান (Meteorology) ইত্যাদি প্রশাখায়।

(খ) ইউরোপের ভূ-বিজ্ঞানিগণ যে তথ্যসূচিকে প্রাধান্য দেন তা হচ্ছে আঞ্চলিক ভূগোলের ধারণা।

ভৌগোলিক অঞ্চলের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ যদিও বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভূগোলবিদ বিভিন্ন ভা... করেছেন তবু তাদের আলোচনায় একটি সাধারণ মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

প্রতিটি অঞ্চলের নিজস্ব বিশেষত্ব আছে। ভূ-বিজ্ঞানিগণের কাজ হল এ সমস্ত অঞ্চলে নিজ... বিশেষত্বকে আবিষ্কার করা, ব্যাখ্যা করা ও বর্ণনা করা।

অঞ্চলমূলক তথ্যগুলোর মধ্যে বিভিন্ন তথ্যের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ ও ঐক্যসূ... আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য, সর্বোপরি অঞ্চলের একটি সামগ্রিক রূপ ও অবস্থা সম্পর্কে ধারণা করা যায়।

বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে কতটুকু সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য আছে, অঞ্চলমূল... তথ্যসূচির সাহায্যে খুব সহজেই সে সম্পর্কে ধারণা করা যায়।

ইউরোপীয় ভূগোলবিদদের ব্যাকরণ নীতি অনুসরণ করে ভূ-প্রকৃতি, ভূ-গঠন, জলবা... ইত্যাদির দিক থেকে মানুষের বাসভূমি এ পৃথিবীকে বিভিন্ন অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে। যথা— প্রাকৃতিক ভূগোলের ব্যাকরণের ভিত্তিতে—

(১) ভূ-পৃষ্ঠের গঠন

(২) বন্ধুরতা

(৩) জলবায়ু

(৪) উদ্ভিজ্জ

মানবীয় ভূগোলের ব্যাকরণ অনুসারে—

(১) বসতি (২) স্থানান্তর (৩) অর্থনৈতিক দিক (৪) ঐতিহাসিক দিক (৫) রাজনৈতিক দিক...

১.৯ ভূগোলের কিছু গুরুত্বপূর্ণ শাখার সংজ্ঞা

(১) Analytical geography (বিশ্লেষণমূলক ভূগোলে) : ভূগোলের যে শাখায় ভূগোলে... বিষয়–এর বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা করা হয়, তাকে Analytical Geography বলে।

(২) Aerial Geography (বায়বীয় ভূগোল) : ভূগোলের যে শাখা বায়বীয় অবস্থা... সম্পর্কে আলোচনা করে তাকে Aerial Geography বলে।

(৩) Applied Geography (ফলিত ভূগোল) : ভূগোলের যে শাখা বিভিন্ন ক্ষেত্রে... ভূগোলের ব্যবহারিক দিক নিয়ে আলোচনা করে তাকে Applied Geography বলে।

(৪) Archeological Geography (প্রত্নতাত্ত্বিক ভূগোল) : যে শাখা পৃথিবীর বিভিন্ন... স্থানে প্রাচীন কালের গুরুত্বপূর্ণ স্থান, বস্তু ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করে তাকে Archeological Geography বলে।

(৫) Anthropological Geography (নৃতত্ত্ব ভূগোল) : ভূগোলের যে শাখা মানুষের উৎপত্তি ও বিকাশ সম্বন্ধে আলোচনা করে তাকে Anthropological Geography বলে।

(৬) Astronomical Geography (জ্যোতির্বিদ্যাবিষয়ক ভূগোল) : ভূগোল শাস্ত্রের যে শাখায় মহাশূন্যের জ্যোতিষ্ক অর্থাৎ সূর্য, চন্দ্র, তারা, গ্রহ, উপগ্রহ ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করে তাকে Astronomical Geography বলে।

(৭) Bio-Geography (জৈবিক ভূগোল) : পৃথিবীর প্রাণী ও উদ্ভিদ কেমন করে বিস্তৃতি লাভ করে তার বিবরণ যে গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তাকে Bio-Geography বলে।

(৮) Cartography (মানচিত্র অংকন বিদ্যা) : যে শাখায় স্কেল, অভিক্ষেপ, মানচিত্র ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয় তাকে Cartography বলে।

(১০) Continental Geography (মহাদেশ সম্বন্ধীয় ভূগোল) : ভূগোলের যে শাখা পৃথিবীর মহাদেশগুলির উৎপত্তি আকার আকৃতি ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করে তাকে Continental Geography বলে।

(১১) Commercial or Economic Geography (বাণিজ্যিক বা অর্থনৈতিক ভূগোল) : ভূগোলের যে শাখা পাঠ করলে পৃথিবীর কোথায় কি উৎপন্ন হয় এবং কোথায় কি উৎপন্ন হয় না, মুনাফা লাভের নিমিত্ত কোন কোন দেশের মধ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পাদিত হয় এবং বাণিজ্যের জন্য ব্যবহৃত পরিবহণ ব্যবস্থাই বা কি ইত্যাদি সম্পর্কে জানা যায় তাকে Commercial or Economic Geography বলে।

(১১) Cultural Geography (সাংস্কৃতিক ভূগোল) : ভূগোলের যে শাখায় মানব সমাজে প্রচলিত আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, চাল-চলন, কথা-বার্তা, ভাষা, কারিগরি দক্ষতা, হাতিয়ার, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করে তাকে সাংস্কৃতিক ভূগোল বলে।

(১২) Climatology (জলবায়ু তত্ত্ব) : যে বিষয় পাঠ করলে বায়ু, বায়ু-স্তর, বায়ুর উপাদান, বায়ুর ধর্ম, বায়ুর প্রবাহ ইত্যাদি বিষয় জানা যায় তাকে Climatology বলে।

(১৩) Communication Geography (যোগাযোগ ভূগোল) : ভূগোলের যে শাখা পৃথিবীর যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করে তাকে Communication Geography বলা হয়।

(১৪) Demography (জনমিতি) : জনমিতি জনসংখ্যার পরিসংখ্যানগত উপাত্তের পার্থক্য, ভবিষ্যদ্বাণী এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিকে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করে।

(১৫) Descriptive Geography (বিবরণমূলক ভূগোল) : ভূগোলের যে শাখা ভূগোল এর বিষয়বস্তুকে বিবরণের মাধ্যমে প্রকাশ করে তাকে বিবরণমূলক ভূগোল বলে।

(১৬) Educational Geography (শিক্ষা বিষয়ক ভূগোল) : ভূগোলের যে শাখায় পৃথিবীর শিক্ষামূলক স্থান-এর বর্ণনা এবং ভূগোলের বিষয়কে কিভাবে পাঠদান করতে হবে তার আলোচনা করে তাকে Educational Geography বলে।

(১৭) Environmental Geography (পরিবেশগত ভূগোল) : 'প্রাকৃতিক পরিবেশ কিভাবে গাছপালা ও জীবজন্তুকে প্রভাবিত করছে এবং কেমন করে পরিবেশ সুনিয়ন্ত্রণের দ্বারা উন্নতি করা যায় তা যে শাস্ত্রে আলোচনা করা হয় তাকে Environmental Geography বলে।

(১৮) Geomorphology (ভূ-ত্বক পরিচয় বিদ্যা) : যে বিষয় পাঠ করলে পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ অবস্থা, ভূ-ত্বক ও তার উপাদানসমূহের বিষয় জানতে পারা যায় তাকে Geomorphology বলে।

(১৯) Human Geography (মানবীয় ভূগোল) : পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের জনগণ, জনবসতি, বসতির ঘনত্ব ইত্যাদি বিষয় যে শাখায় আলোচনা করে তাকে Human Geography বলে। বিভিন্ন গোষ্ঠী মানুষের শিক্ষা, সংস্কৃতি পেশা, কারিগরি উৎকর্ষ ইত্যাদি সম্পর্কেও মানবীয় ভূগোল জ্ঞানদান করে।

(২০) Historical Geography (ঐতিহাসিক ভূগোল) : বিভিন্ন মানবগোষ্ঠী ও তাদের ভৌগোলিক পরিবেশের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক মনুষ্য সমাজ, তার ক্রিয়াকলাপ চিন্তাধারা ও মানসিক উৎকর্ষকে স্থান কাল নির্বিশেষে কতখানি প্রভাবিত করছে তার অনুসন্ধান ভূগোলের যে শাখায় করা হয় তাকে Historical Geography বলে।

(২১) Industrial Geography (শিল্প ভূগোল) : ভূগোলের যে শাখাটি পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের শিল্প, শিল্পের উৎপাদন, শিল্প স্থাপনের নিয়মাবলি প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে তাকে Industrial Geography বলে।

(২২) InternationalGeography (আন্তঃরাষ্ট্রীয় ভূগোল) : যে শাখা আন্তঃরাষ্ট্রের ভৌগোলিক বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করে তাকে International Geography বলে।

(২৩) Local Geography (স্থানীয় ভূগোল) : যে শাখা কোন দেশের স্থানীয় ভৌগোলিক বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করে তাকে Local Geography বলে।

(২৪) Mathematical Geography (গাণিতিক ভূগোল) : ভূগোলের যে শাখা পাঠ করলে সৌরজগৎ, পৃথিবীর আকার, আয়তন ও গতি, অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ, ঋতু পরিবর্তন, দিবা-রাত্রির হ্রাস-বৃদ্ধি ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করে তাকে Mathematical Geography বলে

(২৫) Meteorology (আবহবিদ্যা/বায়ুবিদ্যা) : যে শাখা বায়ুমণ্ডলের আবহাওয়া সংক্রান্ত বিষয় আলোচনা করে তাকে Meteorology বলে।

(২৬) Mineral Geography (খনিজ ভূগোল) : ভূগোলের যে শাখা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের খনিজের আলোচনা করে তাকে Mineral Geography বলে।

(২৭) Oceanography (সমুদ্রবিদ্যা) : যে শাস্ত্র পাঠ করলে সাগর ও সমুদ্রের উৎপত্তি, জোয়ারভাটা, সমুদ্রের তলদেশের অবস্থা, সমুদ্রের পানির বৈশিষ্ট্য, সমুদ্র স্রোত ইত্যাদি বিষয় জানা যায় তাকে Oceanography বলে।

(২৮) Physical Geography (প্রাকৃতিক ভূগোল) : ভূগোল শাস্ত্রের যে শাখা পাঠ করলে পৃথিবীর জন্ম, ভূ-প্রকৃতি অর্থাৎ পাহাড়, পর্বত, নদ-নদী, বায়ুমণ্ডল প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করে তাকে Physical Geography বলে।

(২৯) Population Geography (জনসংখ্যা ভূগোল) : জনসংখ্যা ভূগোল প্রকৃতিগতভাবে একস্থান থেকে অন্যস্থানের যে পার্থক্য রয়েছে তার সঙ্গে কি করে জনসংখ্যার বিস্তরণ, কাঠামো, অভিগমন ও জনসংখ্যার ক্রমবৃদ্ধি নিয়ে আলোচনা করে তাকে Population Geography বলে।

(৩০) Political Geography (রাজনৈতিক ভূগোল) : ভূগোলের যে শাখায় পৃথিবীর রাজনৈতিক অবস্থা, ধর্ম, লোকবসতি, সরকার ও শাসন পদ্ধতি ইত্যাদি সম্যকভাবে জানতে পার যায় তাকে Political Geography বলে।

(৩১) Practical Geography (ব্যবহারিক ভূগোল) : ভূগোলের যে শাখা স্কেল, মানচিত্র, অভিক্ষেপ, জরিপ ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করে তাকে Practica Geography বলে।

(৩২) Plant Geography (উদ্ভিজ্জ ভূগোল) : ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু, অন্যান্য প্রাকৃতি পরিবেশের তারতম্যের কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ধরনে উদ্ভিদ জন্মায়। তাই যে শাস্ত্র পাঠ করলে পৃথিবীর কোন কোন স্থানে কি উদ্ভিজ্জ জন্মে, বে জন্মে এবং উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল শিল্পের বিবরণ বিস্তারিতভাবে জানা যায় তাকে Pla Geography বলে।

(৩৩) Regional Geography (আঞ্চলিক ভূগোল) : ভূগোলের যে শাখা পৃথিব বিভিন্ন দেশের অবস্থান এবং পরিচয় দেয় তাকে Regional Geography বলে।

(৩৪) Soil Geography (মৃত্তিকা ভূগোল) : ভূগোলের যে শাখা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে মাটির বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে তাকে Soil Geographyবলে।

(৩৫) Social Geography (সামাজিক ভূগোল) : যে শাখা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে সমাজের রূপ, রীতিনীতি, ধর্মীয় অবস্থা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করে তাকে S... Geography বলে।

(৩৬) Statistical Geography (পরিসংখ্যান ভূগোল) : ভূগোলের যে শাখা পৃথিবী জনসংখ্যা, জনসংখ্যার ঘনত্ব, উৎপাদন, আয়–ব্যয় ইত্যাদি সম্পর্কে পরিসংখ্যানগত হিসেব নিব করে তাকে Statistical Geography বলে।

(৩৭) Settlement Geography (বসতি ভূগোল) : ভূগোলের যে শাখা পৃথিবীর বিভি অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি, স্থানীয় জলবায়ু ও নির্মাণোপযোগী উপকরণের সহজলভ্যতার উপর মনু বসতি ও বাসগৃহের বিন্যাস ও বৈচিত্র্য নিয়ে আলোচনা করে তাকে Settlement Geograp বলে।

(৩৮) Topographical Geography (ভূ-প্রকৃতিক ভূগোলে) : যে শাখা পৃথিবী বিভিন্ন স্থানের ভূ-পৃষ্ঠের উন্নতি, অবনতি অর্থাৎ পাহাড়, পর্বত, মালভূমি, সমভূমি, নদ-ন সাগর, মহাসাগর ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করে তাকে Topographical Geography ব হয়।

(৩৯) Town Planning (শহর পরিকল্পনা): যে শাখা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের শহর পরিকল্পনা এবং বর্তমানকালে কিভাবে একটি সর্বোৎকৃষ্ট শহরের পরিকল্পনা করা যায় তা Town planning বলে।

(৪০) Urban Geography (নগর ভূগোল) : এই শাখাটির Town Planning এ সাথে অনেকটা মিল আছে। এই শাখাতে নগরের অধিবাসীদের সুযোগ সুবিধা, নগরের উৎপ নগরবাসীদের কর্মকাণ্ড নিয়ে আলোচনা করে।

(৪১) Zoo Geography (প্রাণী ভূগোল) : জলচর, খেচর, স্থলচর প্রভৃতি নানা প্রা জন্ম, বৃদ্ধি ও বংশবিস্তার এবং তাদের সাথে সম্পর্কিত শিল্পের বিস্তারিত বিবরণ ভূগোলের শাখায় পাওয়া যায় তাকে Zoo Geography বলে।

(৪২) Medical Geography (চিকিৎসা ভূগোল) : ভূগোল শাস্ত্রের মুখ্য আলোচ বিষয় যেহেতু মানব জাতিকে কেন্দ্র করে তখন জ্ঞান ভাণ্ডারের নানা দিকে ভৌগোলিক উপাদা প্রভাব স্পষ্টতই লক্ষ্য করা যায়, বর্তমানকালে কোন কোন বিদেশী ভূগোলবিদ ডাক্তারি শা সঙ্গে ভূগোল বিষয়ের সম্পর্ক খুঁজে বের করেছেন এবং একটি নতুন শাখা চিকিৎসা ভূ Medical Geography) নামে ভূগোলের আরেকটি শাখা বের করেছেন সম্ভবত এ ভূগোলের সর্বাধুনিক শাখা হিসেবে বিবেচিত। বস্তুতপক্ষে বিশেষ বিশেষ রোগ পৃথিবী পৃষ্ঠে বি অঞ্চলে সীমাবদ্ধ যেমন ক্রান্তীয় অঞ্চলে কলেরা, টাইফয়েড, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি নাতিশী

অঞ্চলে চর্মরোগ ইত্যাদি বহুলাংশে দেখা যায়। অতএব ভূগোলের যে শাখা চিকিৎসা বিজ্ঞানের উপর প্রভাব বিস্তার করে আলোচিত হয় তাকেই চিকিৎসা ভূগোল বলে। ইংরেজিতে একে Clinical Geography ও বলা হয়ে থাকে।

ভূগোল বিষয়ের উপরোক্ত বিষয় বিভাজন ছাড়াও নিত্য নতুন শাখা–প্রশাখার জন্ম লাভ করছে। এক নজরে দেখার জন্য নিম্নে ভূগোলের বিভিন্ন শাখা–প্রশাখার একটি তালিকা দেয়া হল

DIFFERENT BRANCHES OF GEOGRAPHY AT A GLANCE

A ANALYTICAL GEOGRAPHY AERIAL GEOGRAPHY APPLIED GEOGRAPHY ARCHEOLOGICAL GEOGRAPHY ASTRONOMICAL GEOGRAPHY ANIMAL GEOGRAPHY	**I** INDUSTRIAL GEOGRAPHY INTERNATIONAL GEOGRAPHY INSTRUCTIONAL GEOGRAPHY	**R** RIGIONAL GEOGRAPHY
B BIO-GEOGRAPHY	**L** LOCAL GEOGRAPHY	**S** SOIL GEOGRAPHY SYNTHETICAL GEOGRAPHY SOLAR GEOGRAPHY SOCIAL GEOGRAPHY STATISTICAL GEOGRAPHY SETTLEMENT GEOGRAPHY SURVEY GEOGRAPHY
C CARTOGRAPHY COMMERCIAL GEOGRAPHY CULTURAL GEOGRAPHY CLIMATOLOGY CO-RELATIONAL GEOGRAPHY COMPARATIVE GEOGRAPHY CLINICAL GEOGRAPHY COMMUNICATIONAL GEOGRAPHY	**M** MATHEMATICAL GEOGRAPHY METEOROLOGY MINERAL GEOGRAPHY MACRO GEOGRAPHY MICRO GEOGRAPHY MEDICAL GEOGRAPHY MILITARY GEOGRAPHY	**T** TOURISM GEOGRAPHY TROPICAL GEOGRAPHY TRANSPORT GEOGRAPHY TOPOGRAPHY
D DEMOGRAPHY DESCRIPTIVE GEOGRAPHY	**N** NATURAL GEOGRAPHY NAVIGATOR'S GEOGRAPHY	**U** URBAN GEOGRAPHY
E ECONOMIC GEOGRAPHY EDUCATIONAL GEOGRAPHY ENVIRONMENTAL GEOGRAPHY	**O** OCEANOGRAPHY OROGRAPHY / OROLOGY	**V** VEGETATIONAL GEOGRAPHY
G GEOMORPHOLOGY	**P** POPULATION GEOGRAPHY POLITICAL GEOGRAPHY PRACTICAL GEOGRAPHY PHRENOLOGY	**W** WORLD GEOGRAPHY
H HUMAN GEOGRAPHY HISTORICAL GEOGRAPHY HYDROGRAPHY	**Q** QUALITATIVE GEOGRAPHY QUANTITATIVE GEOGRAPHY	**Z** ZOO GEOGRAPHY

১.১০ স্কুল পর্যায়ে আমাদের দেশের ভূগোল শিক্ষা

আমাদের দেশে ভূগোল শিক্ষা কখন শুরু হয় তার সঠিক তারিখ সুনির্দিষ্টভাবে বলা সম্ভব নয়। তবে ভূগোলশাস্ত্রের জন্ম-ইতিহাস পর্যালোচনা হতে জানা যায় যে, উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত ভূগোল বিষয়টির স্বতন্ত্র আলোচনার মর্যাদা ছিল না। সে সময় ভূ-তত্ত্ব বিজ্ঞানের অংশ হিসাবে ভূগোল বিবেচিত হত।

আমাদের দেশে ভূগোলচর্চা শুরু হয় ভূগোল শাস্ত্রের জন্মের অনেক পরে। আজ থেকে প্রায় দু'শ বছর আগে ইংরেজরা এদেশে এসে ধীরে-ধীরে এখানে শিক্ষার প্রসার ঘটাতে শুরু করে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ১৮০০ সালের গোড়ার দিক থেকে এদেশের বিদ্যালয়গুলোতে ভূগোলের বিষয়বস্তু সংযোজিত হতে থাকে। বিষয় হিসাবে স্কুল শিক্ষাক্রমে ভূগোলের উত্থান পতনের ইতিহাস রয়েছে। কখনও স্কুল পর্যায়ে ভূগোলকে অন্য কোন বিষয়ের সাথে জড়িত করে আবার কখনও স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে পড়ানো হতো। কখনও আবশ্যিক আবার কখনও ঐচ্ছিক কিংবা নৈর্ব্যচনিক বিষয় হিসেবে পড়ানো হতো। শিক্ষাক্ষেত্রে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কারণ যে কোন ব্যক্তির পক্ষে তার অন্তর্নিহিত সত্তার বিকাশের জন্য ভূগোলের জ্ঞান প্রয়োজন

আমাদের দেশে ভূগোল শিক্ষাদানের ব্যবস্থা শিক্ষাক্ষেত্রের বিভিন্ন স্তরে রয়েছে। শিক্ষাদানের জন্য যে শিক্ষাক্রম রচনা করা হয় তার মধ্যে ভূগোলের স্থান অনিবার্য এবং বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাক্রম প্রণয়নের যে সব রীতি ও নীতি আছে তা যথাযথভাবে পালন করতে গেলে শিক্ষাক্ষেত্রে ভূগোলকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে স্বীকার করতে হয়। ১৮৫০ সালের দিক থেকে আমাদের দেশে সে কথাকে স্বীকার করে শিক্ষাক্রম রচিত হয়েছে। আমাদের দেশ ১৯৪৭ সনের পূর্বে ব্রিটিশদের দ্বারা প্রায় পৌনে দু'শ বছর, এরপর পাকিস্তানিদের দ্বারা প্রায় ২৪ বছর ধরে শাসিত হয়েছে। মোটের উপর প্রায় দু'শ বছর বিদেশীদের দ্বারা শাসিত হওয়ায় এ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় জাতীয় আশা আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয় নি। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তন আসতে শুরু করেছে। সম্প্রতি স্কুল পর্যায়ে ভূগোল একটি অবশ্যিক বিষয় হিসেবে শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। প্রাথমিক স্তরে (প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত) বিষয়টিকে "পরিবেশ পরিচিতি" এবং নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে (ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত "সমাজ বিজ্ঞান ও বাংলাদেশ" বলে শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রাথমিক স্তরের শিশুরা এই বই থেকে সম্পূর্ণরূপে মনস্তাত্ত্বিক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তাদের পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত হবে। এই পরিবেশের প্রভাবই তাদের জীবনে বর্তমান। নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে এই পরিবেশের গণ্ডীকে ক্রমশঃ বিস্তৃত করে তাদের শিক্ষাজীবন এগিয়ে চলবে। আমরা জানি যে, "জ্ঞান শিক্ষার নিকট থেকে দূর এবং পরিচিত হতে অপরিচিতের দিকে অগ্রসর হয়।" শিশুরা প্রাথমিক স্তরে তাদের পরিবেশের ভূগোল পড়বে। পরবর্তীকালে ভূগোলের আরও জ্ঞান সংগ্রহ করে তাদের ব্যক্তিজীবনকে সার্থক ও সমৃদ্ধ করবে।

১.১১ গবেষণার আলোকে আমাদের মাধ্যমিক পর্যায়ের ভূগোল শিক্ষা

স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৭৪ সনের কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে আমাদের দেশের মাধ্যমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে যে পুনর্গঠন করা হয় তার প্রায় অর্ধযুগ পরে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে ভূগোল শিক্ষাদান আবশ্যকীয় করা হয়। তখন থেকে এই বিষয়টির উপর মাধ্যমিক স্তরে পরীক্ষা গ্রহণের পূর্ণমান হয়েছে ১০০। শিক্ষার্থীরা মাধ্যমিক পর্যায়ের শ্রেণিগুলোতে (নবম ও দশম শ্রেণি) বিশেষ করে 'গাণিতিক', 'প্রাকৃতিক' ও 'রাজনৈতিক' ভূগোলের জ্ঞান অর্জন করছে। ভূগোলের জ্ঞানই এই স্তরে কেবল তাত্ত্বিকভাবেই দেয়া হয় যদিও ভূগোলের শিক্ষাক্রমে ব্যবহারিক শিক্ষার (Practical Geography) ব্যবস্থা রয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে, শিক্ষার্থীরা মানচিত্র অংকন, চার্ট তৈরি, ছবি আঁকা, জরিপ করা, মডেল করা প্রভৃতি কাজের মাধ্যমে ভূগোল সম্পর্কে সক্রিয় এবং প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জন করতে পারে। যদি এভাবে ভূগোল শিক্ষা দেয়া হয় তবে ভূগোল সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের ধারণা স্বচ্ছ হওয়ার কথা।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভূগোলের যে শিক্ষাক্রম প্রচলিত আছে শিক্ষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এবং মনোবিজ্ঞানের ভিত্তিতে তা স্বীকার করে নেয়া যায়। এই শিক্ষাক্রম সুচিন্তিত এবং শিক্ষার্থীদের জন্য খুবই উপযোগী একথা নির্দ্বিধায় বলতে পারা যায়।

তবে আমাদের দেশের পরিপ্রেক্ষিতে মাধ্যমিক স্তরে ভূগোল শিক্ষাদানের যে চিত্র ফুটে উঠেছে তার আলোকে সংক্ষেপে এটুকুই বলা যায় যে, ভূগোল শিক্ষাদানের বিভিন্ন পদ্ধতি ও ব্যবস্থা সম্পূর্ণ কৃত্রিম, যান্ত্রিক এবং বাস্তববিমুখ। এর দু-চারটি কারণ এখানে সংক্ষেপে তুলে ধরা হল।

ভূগোল শিক্ষাকে সাফল্যমণ্ডিত করে যিনি শ্রেণিতে শিক্ষা দিবেন তিনি হচ্ছেন ভূগোল শিক্ষক। আমাদের বিদ্যালয়গুলোতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মেধাবী এবং সুযোগ্য শিক্ষকের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। নিচের সারণি ১-এ প্রদত্ত মাধ্যমিক পর্যায়ে ভূগোল শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কিত তথ্য হতে এটাই প্রতীয়মান হয়।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভূগোল শিক্ষকদের শিক্ষাগত এবং পেশাগত যোগ্যতা

(শতকরা হিসেবে)*

শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতক এবং পেশাগত প্রশিক্ষণ পর্যায় পর্যন্ত	সরকারি বিদ্যালয়		বেসরকারি বিদ্যালয়		মোট
	পল্লি	শহর	পল্লি	শহর	
সকল পর্যায়ে ১ম বিভাগ প্রাপ্ত	—	—	—	—	—
সকল পর্যায়ে ২য় বিভাগ প্রাপ্ত	—	১১.১১	১৬.০৫	৩৫.২৯	৩.২০
সকল পর্যায়ে ৩য় বিভাগ প্রাপ্ত	২৮.৫৭	২২.২২	৩৫.৮৭	১৭.৬৫	২৪.৮০
যারা উপরের কোন পর্যায়ে পড়েন নি	৭১.৪৩	৬৬.৬৭	৪৮.০৮	৭.০৬	৭২.০০
যারা উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত ভূগোল পড়েছেন	২৫.০০	২৮.৫৭	২৩.৫৩	৩৪.১০	৩১.৬৭
স্নাতক ডিগ্রিতে ভূগোল পড়েছেন	—	১২.৫০	২০.৪৫	২৩.৫৩	১৯.১৭
বি.এড অথবা এর সম-পর্যায়ের ডিগ্রিধারী	৭১.৪২	৬৬.৬৭	৩৫.৮৭	৫২.৯২	৪৮.৮০
পেশাগত প্রশিক্ষণকালে ভূগোল পড়েছেন	৭১.৪২	৬৬.৬৭	৩২.৭০	৫৮.৮০	৩৬.৪০

উৎস : খান মোঃ আবদুল আউয়াল ও নির্মলচন্দ্র সরকার, সাধারণ ভূগোল, (১ম খণ্ড), ঢাকা : হাসান বুক হাউস, ১৯৮৮, পৃ. ১০

বিদ্যালয়গুলোতে ভূগোল শিক্ষাদানের জন্য যথেষ্ট শিক্ষা উপকরণও (Teaching Aid) নেই। ফলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা উপকরণ ও সুব্যবস্থাপনার অভাবে ভূগোলের বিষয়বস্তু যথাযথভাবে অনুশীলন করার সুযোগ পাচ্ছে না। ভূগোলের শিক্ষাক্রমে ব্যবহারিক শিক্ষার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু পরীক্ষা হয় না। শিক্ষকদের ভূগোলের উপর বিশেষ প্রশিক্ষণ দেয়া নিয়মিত ব্যবস্থা কোন সরকারি কিংবা বেসরকারি সংগঠন থেকে করা হয় না। দেশের দশটি শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, ৫৪টি প্রাইমারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এমন কি শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট হতে যে সকল শিক্ষার্থী শিক্ষক প্রশিক্ষণ ডিগ্রি অর্জন করে শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত হয়ে থাকে তারাও এ পর্যায়ে ভূগোলকে আবশ্যিক বিষয় হিসাবে পড়ার সুযোগ পায় না। অর্থাৎ এ দেশে শিক্ষক প্রশিক্ষণের কোন স্তরেই ভূগোলকে পদ্ধতি বিষয় (Method Subject) কিংবা স্কুল টিচিং বিষয় হিসেবে পড়ান হয় না। ফলে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ভূগোল শিক্ষকের যথেষ্ট অভাব আমাদের বিদ্যালয়গুলোত থেকেই যাচ্ছে।

আমাদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে যে সকল শিক্ষক ভূগোল পড়িয়ে থাকেন তাদের প্রায় শতকরা ৪৪ ভাগই তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে শ্রেণিতে ভূগোল পড়িয়ে থাকেন। এ সকল শিক্ষকগণ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকগণ কর্তৃক নির্দেশিত হয়ে ভূগোল পড়ান, যদিও বিষয়টি সম্পর্কে তাদের যথেষ্ট ধারণা নেই। কাজেই ভূগোল বিষয়টি খুবই অবহেলার সাথে পড়ান হয়। আমাদের দেশে শতকরা ৯৮ ভাগ বিদ্যালয়ে ভূগোল শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণসহ ভূগোল কক্ষ নেই। বর্তমানে মাধ্যমিক ভূগোলের সিলেবাসটি যথেষ্ট দীর্ঘ হওয়ায় শতকরা ৭২ ভাগ শিক্ষক তাদের তৃপ্তিমত পড়িয়ে তা সমাপন করতে পারেন না। ভূগোল শিক্ষার জন্য শিক্ষা ভ্রমণ কিংবা ফিল্ডট্রিপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অথচ নানাবিধ কারণে শতকরা ৯৮ ভাগ বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা এ সুযোগ পায় না। তাছাড়া ভূগোল শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট বইপত্র, ম্যাগাজিনসহ লাইব্রেরির অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা আমাদের বিদ্যালয়গুলোতে খুবই অপর্যাপ্ত।

১.১২ মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যসূচি ও শ্রেণিঘণ্টা

পাঠ্যসূচি : মাধ্যমিক স্তরে বিভিন্ন পাঠ্যসূচির মধ্যে একদিকে অখণ্ডতা, অন্যদিকে শিক্ষার্থীর জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রের মধ্যে পারস্পরিক সম্পৃক্ততা রক্ষা করার চেষ্টা করা হয়। এরূপ প্রেক্ষাপটের বিবেচনায় ভূগোল বিষয়ের নিম্নোক্তরূপ বিষয়বস্তুর নির্বাচন রয়েছে। যথা—

(শুধু পাঠ্যসূচির প্রধান অংশ উল্লেখিত)

১. মহাবিশ্ব ও সৌরজগৎ

২. ভূমিরূপ

৩. পৃথিবী

৪. বায়ুমণ্ডল

৫. বারিমণ্ডল

৬. স্বাভাবিক উদ্ভিদ শ্রেণি

৭. অর্থনৈতিক সম্পদ ও কার্যাবলি

৮. ব্যবসা বাণিজ্য ও যোগাযোগ

৯. জনসংখ্যা

১০. পৃথিবীর প্রধান রাজনৈতিক অঞ্চলসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণী ও অঞ্চলসমূহের অন্তর্গত দেশসমূহের তথ্য–পরিচিতি।

১১. বাংলাদেশ

১২ ব্যবহারিক

(বিস্তারিত জানার জন্য জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটি রিপোর্ট [illegible] পরিমার্জিত ১৯৮৬ দেখুন।)

মানবণ্টন :	অধ্যায়	নম্বর
১. গাণিতিক অংশ	(১, ২)	১০
২. প্রাকৃতিক অংশ	(৩, ৪, ৫, ৬)	২০
৩. অর্থনৈতিক অংশ	(৭, ৮, ৯)	১৫
৪. আঞ্চলিক অংশ	(১০)	১৫
৫. বাংলাদেশ অংশ	(১১)	৩০
৬. ব্যবহারিক অংশ	(১২)	১০

সর্বমোট = ১০০

উপরোক্ত বিষয়বস্তু, পাঠ্যসূচি ও মান বণ্টনে বিবৃত যে, বিষয়বস্তুতে ১২ নং অধ্যায় ব্যবহারিক বিষয় এবং মানবণ্টনেও উক্ত অধ্যায়ের জন্য ১০ নম্বর নির্ধারিত। কিন্তু বাস্তবে পরীক্ষাকালীন সময়ে কোন ব্যবহারিক পরীক্ষা নেয়া হয় না এবং বোর্ডের প্রশ্নগুলো পূর্ণ ১০০ নম্বরের নিয়মে করা হয়।

শ্রেণিঘণ্টা :

"মাধ্যমিক স্তরে আবশ্যিক বিষয়গুলোর জন্য সপ্তাহে সর্বমোট ৪৪ শ্রেণিঘণ্টা নির্ধারিত। এর মধ্যে ভূগোল বিষয়ের জন্য নির্ধারিত মাত্র ৩ (তিন) শ্রেণিঘণ্টা" (বাংলাদেশ এডুকেশনাল স্ট্যাটিস্টিকস, ১৯৯১) যা একটি ঐচ্ছিক বিষয় (অর্থনীতি, গণিত, বুককিপিং ও পুষ্টিবিজ্ঞান) বিষয় পাঠদানের সময়ের সমান। একটি ১০০ নম্বরের আবশ্যিক পূর্ণ পত্রের জন্য সপ্তাহে ৩ (তিন) শ্রেণিঘণ্টা অত্যন্ত অপর্যাপ্ত। এ ক্ষেত্রে একটি মতামত জরিপে দেখা গেছে, মাধ্যমিক স্তরের ভূগোল পাঠ্যসূচি অত্যন্ত দীর্ঘ এবং বিষয়টি পাঠদানের জন্য সপ্তাহে যে শ্রেণিঘন্টা নির্ধারিত তাতে মাধ্যমিক ভূগোলের পাঠ্যসূচি যথাসময়ে শেষ করা যায় না।

সারণী—২ : মাধমিক স্তরের বিষয়ভিত্তিক পূর্ণমান ও সাপ্তাহিক ক্লাস সংখ্যা বণ্টন

বিষয়	পূর্ণমান	প্রতি সপ্তাহে ক্লাস সংখ্যা (নবম ও দশম শ্রেণি)
আবশ্যিক :		
১. ইংরেজি—১ম পত্র	১০০	৬
২. ইংরেজি—২য় পত্র	১০০	৪
৩. বাংলা—১ম পত্র	১০০	৬
৪. বাংলা—২য় পত্র	১০০	৪
৫. গণিত (সাধারণ)	১০০	৬
৬. সমাজবিজ্ঞান	১০০	৪
৭. সাধারণ বিজ্ঞান	১০০	৪
৮. ইসলামিয়াত	১০০	৪
৯. ভূগোল*	১০০	৩*
১০. ইতিহাস	১০০	৩
ঐচ্ছিক :		
১১. অর্থনীতি	১০০	৩
১২. গণিত	১০০	৩
১৩. বুককিপিং	১০০	৩
১৪. পুষ্টিবিজ্ঞান	১০০	৩

১.১৩ আমাদের দেশের নিম্নমাধ্যমিক স্তরের ভূগোল পাঠ্যসূচি

আমাদের দেশে ভূগোল শিক্ষাদানের ব্যবস্থা শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে আছে। শিক্ষাদানের জন্য যে পাঠ্যসূচি রচনা করা হয় তার মধ্যে ভূগোলের স্থান অনিবার্য ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাক্রম রচনার যে সমস্ত রীতিনীতি আছে তা যথাযথভাবে পালন করতে গেলে শিক্ষা ক্ষেত্রে ভূগোলকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে স্বীকার করতে হয়। আমাদের দেশেও সে কথাকে স্বীকার করা হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে নিম্নমাধ্যমিক স্তরে ভূগোল একটি আবশ্যকীয় বিষয় হিসেবে পাঠ্যক্রমের অন্তর্গত। এ বিষয়টিকে সেখানে "সমাজ বিজ্ঞান ও বাংলাদেশ" বলে পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা এই বই থেকে সম্পূর্ণ মনস্তাত্ত্বিক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তার পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত হবে। এই পরিবেশের প্রভাবই তার জীবনে বর্তমান। এই পরিবেশের গণ্ডীকে ক্রমশ বিস্তৃত করে তার শিক্ষা জীবন এগিয়ে চলবে। জ্ঞান শিক্ষা নিকট থেকে দূরে ও পরিচিত হতে অপরিচিতের দিকে অগ্রসর হয়। তাই বলা যায়—প্রাথমিক নিম্নমাধ্যমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে ভূগোল বিষয়ের যথার্থ সিলেবাস এবং ব্যবহারিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। বিশেষ করে আমাদের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশে ভূগোল শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক। নিচে নিম্নমাধ্যমিক স্তরে "সমাজবিজ্ঞান ও বাংলাদেশ" এই পাঠ্য বইতে যতটুকু ভূগোল সম্পর্কে দেয়া আছে তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো—

<u>ষষ্ঠ শ্রেণি (পঞ্চম অধ্যায়)</u> : ষষ্ঠ শ্রেণির "সমাজবিজ্ঞান ও বাংলাদেশ" পাঠ্যপুস্তকে ইতিহাস, অর্থনীতি, পৌরনীতি ও ভূগোল সম্পর্কে দেয়া আছে। তার মধ্যে পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে ভূগোল সম্পর্কে সম্পূর্ণ আলোচনা যেমন "দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর সাধারণ পরিচিতি।"

এর মধ্যে দক্ষিণ এশিয়ার ৭টি দেশ ১৯৮৫ সালে আঞ্চলিক সহযোগিতার উদ্দেশে একটি সমিতি গঠন করে এবং এ সমিতি 'সার্ক' নামে পরিচিত।

দেশগুলোর ভৌগোলিক ও সামাজিক অবস্থান কোথায়—

অবস্থান : দক্ষিণ এশিয়ার বেশিরভাগ অঞ্চল ১০° উত্তর অক্ষাংশ থেকে ৩৫° উত্তর অক্ষাংশে এবং ৬৫° পূর্ব দ্রাঘিমাংশ থেকে ৯৫° ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত।

সীমা : দক্ষিণ এশিয়ার উত্তরে বিশাল হিমালয় পর্বতশ্রেণি, পূর্বে মায়ানমার (বার্মা), পশ্চিমে আফগানিস্তান, ইরান ও আরব সাগর এবং দক্ষিণে আরব সাগর, বঙ্গোপসাগর ও ভারত মহাসাগর অবস্থিত।

আয়তন : দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মোট আয়তন ৪৪ লাখ ৬৮ হাজার বর্গ কিলোমিটার

ভূ-প্রকৃতি : উত্তর ও পূর্ব দিকের পার্বত্য অঞ্চল মধ্যবর্তী নদী বিধৌত সমভূমি অঞ্চল এবং দক্ষিণাংশের মালভূমি অঞ্চল।

নদ-নদী : যেমন সিন্ধু, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, যমুনা।

জলবায়ু : দক্ষিণ এশিয়ার জলবায়ুকে ক্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ু অঞ্চল বলা হয়। শ্রীলংকায় সারা বছরই বৃষ্টিপাত হয়। ভারতের চেরাপুঞ্জিতে বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হয়। পাকিস্তানের জেকোবাবাদ বিশ্বের উষ্ণতম স্থান।

উদ্ভিজ ও জীবজন্তু : যেমন শাল, সেগুন, মেহগিনি, গর্জন ইত্যাদি উদ্ভিদ এবং জীবজন্তু— গরু, মহিষ, ছাগল, গাধা, খচ্চর ইত্যাদি দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে আছে এবং পাকিস্তান ও ভারতে আছে উট, ভেড়া, ছাগল ইত্যাদি এবং এসবের বিস্তৃত বর্ণনা।

সপ্তম শ্রেণি (পঞ্চম অধ্যায়) : দক্ষিণ এশিয়া, ভৌগোলিক ও সামাজিক রূপরেখা—

দক্ষিণ এশিয়ার অবস্থান ও আয়তন জনসংখ্যা ভূ-প্রকৃতি, নদ-নদী, জলবায়ু, উদ্ভিদ ও জীবজন্তু, প্রাকৃতিক সম্পদ ও অর্থনৈতিক কার্যাবলি, কৃষিজ সম্পদ, খনিজ সম্পদ, মৎস্য সম্পদ, শিল্প সম্পদ, ব্যবসা বাণিজ্য, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ও রাজনৈতিক কাঠামো।

ষষ্ঠ অধ্যায় (বাংলাদেশ) : বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ, মাটি, বন, পাহাড়িয়া বনাঞ্চল, মধুপুর ও ভাওয়াল গড় এবং বরেন্দ্রভূমির বনাঞ্চল, সুন্দরবন, পানি, মৎস্য, খনিজ সম্পদ।

কৃষিজ ও শিল্প : প্রধান প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য, কৃষিজাত দ্রব্য সংরক্ষণ ও পরিবহণ। কৃষি পদ্ধতি ও কৃষি নির্ভর কার্যকলাপ কৃষি আধুনিকিকরণ ও সম্ভাবনা, কৃষিতে পানি সম্পদের ব্যবহার, কৃষিতে সমবায় ও প্রধান প্রধান রপ্তানি দ্রব্য।

পরিবহণ ও যোগাযোগ : রেলপথ, অভ্যন্তরীণ নৌপথ, সড়ক ও জনপথ, বিমানপথ, ডাক যোগাযোগ, টেলিফোন, রেডিও , টেলিভিশন ও সংবাদপত্র।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ (দক্ষিণ এশিয়ার প্রাকৃতিক সম্পদ এবং অর্থনৈতিক কার্যাবলি) ।

সম্পদ : যা কিছু মানুষের অভাব মেটায় তাকে সম্পদ বলে। যেমন—খনিজ দ্রব্য, কৃষিজ দ্রব্য, শিল্পজাত দ্রব্য ইত্যাদি।

অর্থনৈতিক কাজ : প্রকৃতি থেকে সম্পদ সংগ্রহ, উৎপাদন এবং বন্টনের জন্য মানুষ যে সব কর্মকাণ্ড চালায় তাকে অর্থনৈতিক কাজ বলে।

কৃষিজ সম্পদ, খনিজ সম্পদ, সমুদ্রজাত সম্পদ, শিল্পজাত সম্পদ, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এ পরিচ্ছেদে।

ষষ্ঠ অধ্যায় : এ অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বাংলাদেশের অবস্থান, আয়তন, সীমা ভূ-প্রকৃতি, নদ-নদী,

জলবায়ু উদ্ভিদ ও জীবজন্তু, শিক্ষার্থীদের বাংলাদেশ সম্পর্কে একটা পূর্ণ ধারণা জন্মে গেল ভূগোলের যে অংশে আলোচনা করা হয়েছে তা সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বয়স ও মেধার প্রতি দৃষ্টি রেখে করা হয়েছে। এই আলোচনায় সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের আরও বেশি ধারণা জন্মেছে পৃথিবী সম্পর্কে। তারা ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভূগোল সম্পর্কে যে ধারণা অর্জন করেছে ক্রম অনুযায়ী সপ্তম শ্রেণিতে ভূগোল বিষয়ের আলোচনা পরিষ্কার হয়েছে। এর পরে আসব আমরা অষ্টম শ্রেণির "সমাজ বিজ্ঞান ও বাংলাদেশ" এই পাঠ্যপুস্তকটিতে ভূগোল যে সব অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে তার বিস্তারিত আলোচনা সম্পর্কে।

অষ্টম শ্রেণি (সপ্তম অধ্যায়) : ভৌগোলিক ও সামাজিক রূপরেখা : এশিয়া মহাদেশ

অবস্থান : এশিয়া মহাদেশ ৭৮ ° উত্তর অক্ষাংশ হতে প্রায় ১৩ ° দক্ষিণ অক্ষাংশ এবং ২৫ ° পূর্ব দ্রাঘিমা হতে আরম্ভ করে ১৮০ ° পূর্ব দ্রাঘিমা রেখা অতিক্রম করে আরও ৫ ° পর্যন্ত গিয়েছে অর্থাৎ ১৭৫ ° পশ্চিম দ্রাঘিমা রেখা পর্যন্ত বিস্তৃত। এ মহাদেশের প্রায় মধ্য দিয়ে ৯০ ° পূর্ব দ্রাঘিমা রেখা চলে গিয়েছে।

আয়তন : এশিয়া মহাদেশের আয়তন ৪ কোটি ৪০ লক্ষ্য বর্গ কি: মি:। এটি সব চেয়ে বৃহত্তম মহাদেশ।

অধিবাসী ও জনসংখ্যা : বর্তমানে এ মহাদেশের লোক সংখ্যা ২৮০ কোটি। প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৪১ জন লোক বাস করে। এশিয়া মহাদেশে জনসংখ্যার দিক দিয়ে চিন প্রথম ও ভারত দ্বিতীয়।

এশিয়ার বৈশিষ্ট্য : পৃথিবীর বৃহত্তম পর্বতমালা হিমালয়, সর্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গ এভারেস্ট, উচ্চতম মালভূমি পামির, বিস্তৃততম মালভূমি তিব্বত।

প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সম্পদ : ভূ-প্রকৃতি অনুসারে এশিয়া মহাদেশকে পাঁচভাগে ভাগ করা হয়।

১. উত্তর এশিয়ার নিম্নভূমি ; ২. মধ্য এশিয়ার পার্বত্য উচ্চভূমি ; ৩. দক্ষিণ ও পূর্বদিকের নদীবিধৌত সমভূমি ; ৪. দক্ষিণাংশের মালভূমি ; ও ৫. পূর্বদিকের আগ্নেয়গিরিময় দ্বীপমালা

হ্রদ : বৈকাল গভীরতম হ্রদ, এর গভীরতা ১৬২০ মি:। অন্যান্য হ্রদের কথাও উল্লেখ আছে

নদ-নদী : আলতাই, আমুর নদী, সিন্ধু নদ, ব্রহ্মপুত্র নদ, উরাল নদী ইত্যাদি।

জলবায়ু :

(১) নিরক্ষীয় জলবায়ু : ৫ ° থেকে ৭ ° উত্তর ও দক্ষিণে এ জলবায়ু বিরাজ করে।

(২) মৌসুমী জলবায়ু : বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড, কম্পুচিয়া, তাইওয়ান, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ ও চিনের দক্ষিণাংশে মৌসুমী জলবায়ু বিরাজমান।

(৩) মরু অঞ্চলের জলবায়ু—পৃথিবীর উষ্ণতম স্থান পাকিস্তানের জেকোবাবাদ এ অঞ্চলে অবস্থিত।

(৪) ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু : এশিয়া মাইনর, সিরিয়া, লেবানন, ইসরাইল, জর্ডান ইরাক ইরানের কিয়দংশ ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর অন্তর্গত।

(৫) মহাদেশীয় জলবায়ু : পশ্চিম সাইবেরিয়া ও মঙ্গোলিয় মালভূমির কতকাংশে মহাদেশীয় জলবায়ু দৃষ্ট হয়।

(৬) শীতল নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু : সাইবেরিয়ার অধিকাংশ ভূ–ভাগ এ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত।

(৭) মেরুদেশীয় জলবায়ু : উত্তর মহাসাগরের তীরবর্তী মেরু অঞ্চলে প্রায় সারা বছর জলবায়ু শীতল। এখানে লোকবসতি খুবই কম।

উদ্ভিদ ও প্রাণী

উদ্ভিদ ও প্রাণী : ভূ-প্রকৃতিগত ও জলবায়ুর ভিত্তিতে এশিয়াকে ৭টি উদ্ভিদ অঞ্চলে ভাগ করা হয়।

১. নিরক্ষীয় বন অঞ্চল
২. মৌসুমী বন অঞ্চল
৩. মরু অঞ্চল
৪. ভূমধ্য সাগরীয় অঞ্চল
৫. স্টেপস বা তৃণভূমি অঞ্চল
৬. শীতল অরণ্য অঞ্চল ও
৭. তুন্দ্রা অঞ্চল।

অর্থনৈতিক সম্পদ ও কার্যাবলি

কৃষিজ সম্পদ— একে দুভাগে ভাগ করা হয়।

১. খাদ্য শস্য

২. অর্থকরী ফসল।

খাদ্যশস্য—ধান, গম, ভুট্টা ইত্যাদি।

অর্থকরী ফসল—পাট, তুলা, রবার, রেশম ইত্যাদি।

খনিজ সম্পদ—লৌহ, খনিজ তৈল, তামা, টিন, সোনা, রূপা, অভ্র, ম্যাঙ্গানিজ, প্রাকৃতিক গ্যাস।

সমুদ্রজাত সম্পদ—মুক্তা, মৎস্য।

শিল্প সম্পদ—কুটির শিল্প, কাগজ শিল্প, ইস্পাত শিল্প ইত্যাদি।

ব্যবসা বাণিজ্য/যাতায়াত ব্যবস্থা—সমুদ্রপথ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ও রাজনৈতিক কাঠামো।

এই তিনটি শ্রেণির সমাজ বিজ্ঞান ও বাংলাদেশ এর মধ্যে দেখা যায় ভূগোলের অংশ যেভাবে রাখা হয়েছে তা শিক্ষাক্রম অনুযায়ী শ্রেণি উপযোগী।

অতএব দেখা যায় নিম্নমাধ্যমিক স্তরে বিশেষভাবে ভূগোল পাঠের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে

১.১৪ মাধ্যমিক স্তরে ভূগোল বিষয়টির মানোন্নয়ন ও জনপ্রিয় করে তোলার জন্য কতিপয় সুপারিশ

(১) মাধ্যমিক স্তরে যে সকল শিক্ষক ভূগোল বিষয় পাঠদান করেন অথচ বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই সে সকল শিক্ষকদের প্রত্যেককে পাঠদান ও পদ্ধতি নিয়ে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

এ জন্য করণীয়—বাংলাদেশের মাধ্যমিক স্তরে ভূগোল শিক্ষকের সংখ্যা স্কুল প্রতি গড়ে ১.৩৩ জন এবং বর্তমানে এদের সংখ্যা ১১,৫৯১ জন। এদের ৫২ শতাংশ অর্থাৎ ৬০২৭ জন প্রশিক্ষণবিহীন (সূত্র খান, ১৯৮৫)। দেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আই.ই.আর)সহ শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় রয়েছে ১১টি। এ সকল প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ধরা যাক প্রতি পঞ্চাশ জনকে একমাস সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। এতে সময় লাগবে ৬০২৭÷৫৫০ = ১০ মাস মাত্র। এতে সকল প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষকগণ প্রশিক্ষিত হবে।

(২) শিক্ষকতার ক্ষেত্রে পেশাগত প্রশিক্ষণের দিকে এম.এড. সর্বোচ্চ এবং বি.এড. পরবর্তী পর্যায়ের ডিগ্রি। এ ক্ষেত্রে যে সকল শিক্ষক উপরোক্ত ডিগ্রিধারী তাদের অতিরিক্ত বিভিন্ন প্রকার ভাতা (উৎসাহ ভাতাসহ) দেয়া যেতে পারে। এতে দক্ষ শিক্ষকগণ পেশায় আগ্রহী হবেন।

(৩) শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠাগার ভূচিত্রাবলি, এটলাস, ভৌগোলিক তথ্য সম্বলিত রিভিউ রিপোর্ট রাখা যেতে পারে।

(৪) দেশব্যাপী ভূগোল বিষয়ের ওপর সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, বিদ্যালয় পর্যায়ে ভূগোল শিক্ষক সমিতি, প্রদর্শনী, মেলা প্রভৃতি আয়োজন করে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের আগ্রহী করা যেতে পারে। ছাত্রদের মধ্যে ভৌগোলিক জ্ঞানসম্পন্ন কুইজ, প্রতিযোগিতা এবং তজ্জন্য পুরস্কার সনদপত্র প্রভৃতির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। শিক্ষক ছাত্রদের দিয়ে ভূগোল বিষয়ে শিক্ষাপোকরণ তৈরি করতে পারেন।

(৫) বিদ্যালয় প্রশাসনকে ভূগোল পাঠদানে সহায়ক শিক্ষাপোকরণ সংগ্রহে উৎসাহিত করতে হবে।

(৬) শ্রেণিঘন্টার সময় (অধুনা টেলিভিশনে যেরূপ 'উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের' শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান প্রচার করে তদ্রূপ ভূগোল বিষয়ের অনুষ্ঠান দেখানো যেতে পারে কিংবা রেডিওতে প্রচারিত ভূগোল অনুষ্ঠানগুলো আরো অধিক হারে শোনানো যেতে পারে।

(৭) শিক্ষক নির্দেশিকা প্রস্তুত (Teacher's Guide) করে তা শিক্ষকদের কাছে দেয়া যেতে পারে। অনেকগুলো বিষয়ে এরূপ গাইড তৈরি হয়েছে। কিন্তু ভূগোলের উপর শিক্ষক নির্দেশিকা করা হয় নি।

(৮) জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটির রিপোর্টের সুপারিশ মোতাবেক ব্যবহারিক পরীক্ষার প্রবর্তনের ব্যবস্থা করতে হবে। এতে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার নম্বর বাড়বে এবং পরবর্তী স্তরে ভূগোল বিষয়ে অধ্যয়ন ও বিষয় নির্বাচনে সহায়ক হবে।

(৯) বর্তমানে মাধ্যমিক স্তরে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেকস্ট বুক বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক প্রবর্তিত পুস্তকটি নিয়ে গবেষণা করা যেতে পারে।

উপরোক্ত আলোচনা ও মানোন্নয়ন প্রস্তাবগুলোর যুক্তিসঙ্গত পরামর্শ ও বাস্তবায়নে প্রয়াস পেলে ভূগোল বিষয়ে পাঠদানসহ যাতীয় উন্নয়ন পথ আরো সুগম হবে। অন্যথায় বিষয়টির তিমিরাবস্থা তিমিরেই থেকে যাবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভূগোল শিক্ষাদান পদ্ধতি

২.১ পদ্ধতি বলতে কি বুঝি

পদ্ধতি হলো এরূপ প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষার্থীর সঙ্গে শিক্ষণীয় বিষয়ের ঘনিষ্ঠ সংযোগ সাধন করতে পারেন। শিক্ষার্থীর মানসিক বোধগম্যতার স্তর বিবেচনা করে এবং তার দৈহিক পরিগমনের কথা স্মরণ রেখে শিক্ষক সেইভাবে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করবেন যাতে শিক্ষার্থীর শিখন সহজ হয়। সুতরাং পদ্ধতি হলো শিক্ষকের সুস্পষ্ট ও বাস্তব কৌশল যার দ্বারা কোন এক শ্রেণির শিক্ষার্থীকে তিনি শিক্ষা লাভে সাহায্য করতে পারেন।

ভূগোল বিষয়টি শিক্ষাদানকালে বিষয়টির স্বরূপ, শিক্ষার্থীর উন্নয়নের স্তর ও নির্দিষ্ট স্তরে পাঠের কথা শিক্ষকের মনে রাখা প্রয়োজন। ভূগোল বিষয়টি যেহেতু বিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে সংযোগ সেতু রক্ষা করে চলেছে তাই বিষয়টির অবতারণাকালে শিক্ষকের বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করা প্রয়োজন।

প্রথমত, বিদ্যালয়ের নিম্নশ্রেণির শিক্ষার্থীদের নিকট এমনভাবে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করতে হবে যেন মূর্ত থেকে বিমূর্ত জানা থেকে অজানা হয়। বস্তুর প্রত্যক্ষ প্রতিমূর্তি গঠনে দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন।

দ্বিতীয়ত, শিক্ষার্থী তার আর পাশে যে সমস্ত বস্তু প্রত্যক্ষণ করে তার মধ্যে থেকে উপকরণ এনে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করতে হবে।

ভূগোল পাঠের বিষয়গুলো এমনভাবে সন্নিবিষ্ট হওয়া প্রয়োজন যার মাধ্যমে শিক্ষার্থী কোন মূর্ত বিষয় হতে ক্রমশ বিমূর্ত বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের প্রত্যেকটিকে সক্রিয় রেখে শিক্ষাদান কার্য পরিচালনা করতে পারলে শিক্ষার্থীর শিক্ষালাভ সার্থক হয়ে ওঠে।

ভূগোল পাঠে একই সঙ্গে যদি মৌখিক নির্দেশনা, মানচিত্র পঠন, প্রত্যক্ষণ, মডেল প্রস্তুতকরণ সম্ভব হয় তাহলে সার্থক শিক্ষালাভ হতে পারে।

অতএব পদ্ধতি সম্বন্ধে কোন কথাই চরম হতে পারে না। শিক্ষক প্রতিটি ক্ষেত্রে নিজস্ব উদ্ভাবনী দক্ষতার প্রয়োগ করতে পারেন। তাই এ ক্ষেত্রে শিক্ষক নিজেই ভাল পদ্ধতি। তবুও পদ্ধতি শিক্ষণ শিখন পদ্ধতি সার্থক করে তোলে। কোন পদ্ধতি কতটা সার্থকতা লাভ করল, তা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে শিক্ষণীয় বিষয়, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর উপর।

২.২ ভূগোল শিক্ষণে আঞ্চলিক পদ্ধতি

উনবিংশ শতাব্দী হতে আঞ্চলিক পদ্ধতিতে ভূগোল শিক্ষাদান বিদ্যালয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। কোনো দেশ, মহাদেশ প্রভৃতি আলোচনাকালে রাজনৈতিক সীমারেখাকে গুরুত্ব না দিয়ে প্রাকৃতিক অঞ্চলে বিভক্ত করে পড়ানোর রীতি অধুনা স্বীকৃত। আঞ্চলিক পদ্ধতি আলোচনার পূর্বে আমাদের জানা উচিত, অঞ্চল কি?

অধ্যাপক E.A. Macnee-এর ভাষায়, "যে অঞ্চল স্বাভাবিকভাবে অন্য অঞ্চল থেকে পৃথক তাই স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক অঞ্চল।"

খ্যাতনামা বৃটিশ ভূগোলবিদ হার্বার্টসন বলেন, "ভূ-পৃষ্ঠে একই রকম প্রাকৃতিক ও আর্থিক মানুষের কর্মধারা অনুরূপ, সেইরূপ স্থানগুলো এক একটি অঞ্চল রচনা করে। "A natural region is an area of the earth's surface which is essentially homogeneous with respect to the condition that effect human life."

এরূপ প্রাকৃতিক অঞ্চলের সীমারেখা সমুদ্র পর্বত বা মরুভূমি দ্বারা নির্ধারিত হয়ে থাকে।

ব্রিটিশ গ্লোসারি কমিটি স্বাভাবিক অঞ্চল বলতে এক বা একাধিক বৈশিষ্ট্য সম্বলিত এক একটি অঞ্চলের কথা বলেছেন। বৈশিষ্ট্যভেদে প্রাকৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অঞ্চলে ভাগ করা যায়। (An area of the earth's surface differentiate from adjoining areas by one or more features which give it a measure of unity.)

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, এক একটি অঞ্চল একটি একক এবং সাধারণ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। আয়তনের দিক দিয়ে অঞ্চলকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

(১) অতি বৃহৎ অঞ্চল (Macro-Region)

মহাদেশ বা ব্যাপক এলাকা। মানচিত্র ও পুস্তক–এর উপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীকে পরিবেশন করা সম্ভব। কিন্তু এতে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সম্ভব নয়।

(২) মাঝারি ধরনের অঞ্চল (Meso-Region)

দেশ বা প্রদেশের ভৌগোলিক আলোচনায় পড়ে। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে উপরোক্ত পদ্ধতিতে ধারণা দেয়া সম্ভব।

(৩) ক্ষুদ্র অঞ্চল (Micro-Region)

শিক্ষার্থীর চারপাশের পরিবেশ থেকে শুরু করে জেলা স্তর পর্যন্ত এ ধরনের অঞ্চলের আওতায় পড়ে। এরূপ অঞ্চলের আলোচনায় শিক্ষার্থীর পক্ষে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব ও সহজ। তবে বই ও মানচিত্রের সাহায্য নেয়া যায়।

এই অঞ্চলগুলোকে এক একটি একক (Unit) ধরে আলোচনার সুবিধার জন্য ও খুঁটিনাটি বিষয় অবহিত হওয়ার জন্য এগুলোকে আবার Sub-Unit –এ ভাগ করা যায়।

আঞ্চলিক পদ্ধতির আলোচনার বিষয়বস্তু

১. ভূ-প্রকৃতি (Physiography)
২. ভূমির বন্ধুরতা (Relief)
৩. ভূ-গঠন (Structure)
৪. জলবায়ু (climate)
৫. স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ (Natural Vegitation)
৬. খনিজ দ্রব্য (Minerals)
৭. মানবীয় কর্মপ্রচেষ্টা (Human Activities)

আঞ্চলিক পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য

(১) এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী তার পরিবেশ ও প্রকৃতি সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান লাভ করতে পারে

(২) এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি পায়। নিজ দেশ ও তার বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে।

(৩) দেশপ্রেম বৃদ্ধি পায় ও আত্মনির্ভরশীল হয়।

(৪) রাজনৈতিক সীমারেখার উপর জোর না দিয়ে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের উপর জোর দেয়া হয়। ফলে শিক্ষার্থীর মধ্যে আন্তর্জাতিকতা বৃদ্ধি পায়।

(৫) এই পদ্ধতিতে মুক্তচিন্তা ও সৃজনশীলতা এবং কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

(৬) এখানে পড়া জীবন্ত হয় ফলে আগ্রহ বাড়ে।

আঞ্চলিক পদ্ধতির সুবিধা

(১) আঞ্চলিক পদ্ধতিতে ভূগোল পাঠের সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো মানবীয় কর্ম প্রচেষ্টা, যেমন কৃষিকাজ, শিল্প, নগর, বাজার, যোগাযোগ ইত্যাদি একই সাথে আলোচনা করা সম্ভব। কি ধরনের প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষ বসবাস করছে এবং কিরূপ প্রতিক্রিয়া করে চলেছে তার সমগ্র চিত্রটি শিক্ষার্থীর নিকট সুস্পষ্ট হয়ে থাকে।

(২) বিদ্যালয়স্তরে ভূগোল শিক্ষা বিশ্লেষণমূলক না হয়ে সংশ্লেষণমূলক হওয়া বাঞ্ছনীয়। সেক্ষেত্রে আঞ্চলিক পদ্ধতিতে ভূগোল পাঠ সহায়ক হয়।

(৩) রাজনৈতিক সীমারেখার সাথে প্রাকৃতিক অঞ্চলের অনেক সময় মিল থাকে না। বিভিন্ন অঞ্চলের আলোচনাকালে এর পার্থক্যগত বৈশিষ্ট্য ভৌগোলিক দৃষ্টিকোণ দিয়ে যাচাই করার ক্ষমতা শিক্ষার্থীর জন্মে।

(৪) এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর দৃষ্টিভঙ্গির সম্প্রসারণ ঘটে ও আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক।

(৫) এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর প্রথমে একটি সমষ্টিগত ধারণা জন্মে তারপর আরো ব্যাপক জানার সুযোগ ঘটে।

আঞ্চলিক পদ্ধতির অসুবিধা

(১) অনেক ক্ষেত্রে অঞ্চলগুলোর সীমারেখা সুস্পষ্ট নয়। এক একটি অঞ্চলের সীমারেখা পার্শ্ববর্তী অন্যটির সাথে এমনভাবে মিশে থাকে যে, অনেক ক্ষেত্রে পৃথক করা সম্ভব হয় না।

(২) বৃহৎ ও মাঝারি অঞ্চল আলোচনাকালে অনেক সময় খুঁটিনাটি বিষয়গুলো বাদ পড়ে যায়।

(৩) অতিরিক্ত সামান্যীকরণের ফলে অনেক সময় অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনায় আসে না।

(৪) এই পদ্ধতি নিম্নশ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য উপযোগী নয়।

(৫) আঞ্চলিক পদ্ধতিতে ভূগোল পাঠদানকালে কোন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলগুলো আলাদাভাবে আলোচিত হয়। যার ফলে শিক্ষার্থী সামগ্রিক ধারণা লাভে ব্যর্থ হয়।

আঞ্চলিক পদ্ধতিতে ভূগোল পাঠের উদাহরণ

আঞ্চলিক পদ্ধতিতে বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি কিরূপ হতে পারে তা আলোচনা করা হলো।

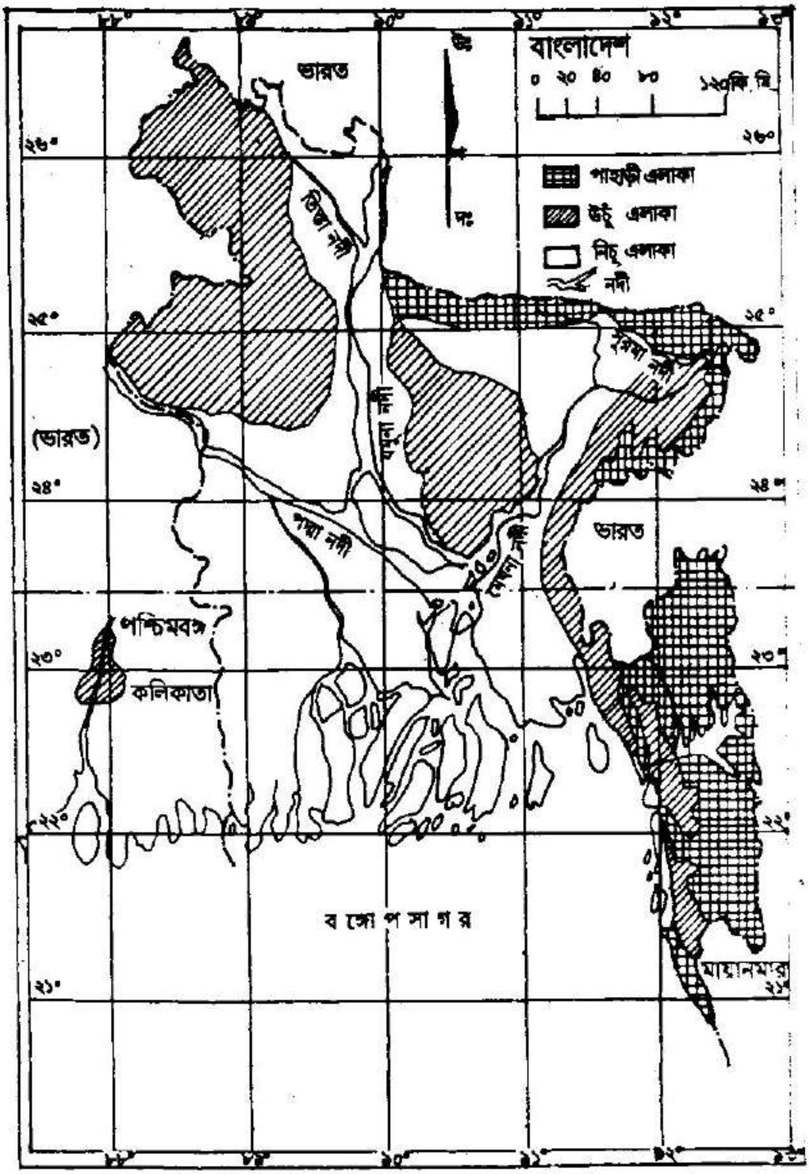

চিত্র–১ : বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি

সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশ নদীবাহিত পলি দ্বারা গঠিত এক বৃহৎ সমভূমি। তবে দেশের পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকের কিছু অংশে পাহাড় দেখা যায়। পশ্চিম ও মধ্যভাগে কিছু অংশ পুরাতন পলল গঠিত চত্বর ভূমি।

আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে বাংলাদেশের ভূমিরূপকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথা—

(১) পাহাড়িয়া অঞ্চল
(২) পুরাতন পলল গঠিত চত্বর অঞ্চল
(৩) নতুন পলি গঠিত সমভূমি অঞ্চল।

১. **পাহাড়ি অঞ্চল :** বাংলাদেশে পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব দিকে পাহাড়গুলো অবস্থিত। এই পাহাড় টারশিয়ারি যুগে সৃষ্টি হয়েছে। উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত পাহাড়গুলোকে আসামের লুসাই ও বার্মার (মায়ানমার) আরাকান পাহাড়ের সমগোত্রীয় বলে ধরা হয়। বেলে পাথর ,সেল পাথর ও কর্দম দ্বারা এই পাহাড়গুলো গঠিত। ফেনি, মাতামুহুরি, সাঙ্গু ও কর্ণফুলি উল্লেখযোগ্য নদী। গভীর নদীখাত, বৃষ্টিপাত বেশি। চাষের উপযোগী নয়। অরণ্যে আবৃত লোক বসতি কম।

২. **পুরাতন পলল গঠিত চত্বর ভূমি :** উত্তর পশ্চিমাংশের বরেন্দ্রভূমি, মধ্য ভাওয়ালের গড় এলাকা ও কুমিল্লার লালমাই পাহাড় নিয়ে এ অঞ্চল গঠিত। আজ থেকে ২৫,০০০ বছর আগে লাইস্টোসিল যুগে এই সোপান গঠিত হয়েছিল। এখানকার মাটি লাল ও কংকরযুক্ত। বৃষ্টিপাত কম। গাছপালাও কম। তাই এখানে লোকবসতি মাঝারি ধরনের।

৩. **নতুন গঠিত পলল সমভূমি :** টারশিয়ারি যুগের পাহাড় ও প্লাইস্টোসিন যুগের সোপান ছাড়া সমগ্র বাংলাদেশটাই নদী দ্বারা বাহিত পলি দ্বারা গঠিত সমভূমি অঞ্চল। এই সমভূমিকে আবার কয়েকটি উপবিভাগে ভাগ করা হয়। যথা—

(ক) পাদদেশীয় সমভূমি অঞ্চল।
(খ) সিলেট অববাহিকা অঞ্চল।
(গ) ত্রিপুরার সমভূমি অঞ্চল।
(ঘ) প্লাবন সমভূমি অঞ্চল।
(ঙ) ব-দ্বীপ সমভূমি অঞ্চল।
(চ) উপকূলীয় সমভূমি অঞ্চল।

২.৩ ভূগোল শিক্ষণে তুলনামূলক পদ্ধতি

ভূমিকা : ভূগোল শিক্ষণে তুলনামূলক পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করার পূর্বে প্রথমে দেখ যাক শিক্ষা ভূগোল ও তুলনামূলক পদ্ধতি কাকে বলে।

শিক্ষা হচ্ছে তাই 'যা ব্যক্তির দেহ ও মনের সকল ক্ষমতাকে বিকশিত মার্জিত করে তাকে বর্তমানের ও ভবিষ্যতের উপযোগী করে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সফল জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা, নৈপুণ্য এবং দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী হতে সাহায্য করে বা দৃষ্টিভঙ্গির অর্জন করতে শেখায়।"

মানুষ আর পৃথিবী এই দুটি বিষয় হলো ভূগোলের মূল উপাদান। এ বিষয়ে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নানা পণ্ডিত নানা রকম মত রেখেছেন। তাই যুগে যুগে ভূগোলের সংজ্ঞার পরিবর্তন হয়েছে বিভিন্ন সংজ্ঞার মধ্যে "Geography is the study of man in relation to earth" এই সংজ্ঞাটি বেশি যুক্তিযুক্ত। বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে প্রাকৃতিক উপাদানগুলোকে ঘিরে মানুষের যে কর্মকাণ্ড বা কর্মচক্র আবর্তিত হয় তার আলোচনাই ভূগোলের বিষয়বস্তু।

ভূগোল শিক্ষণে যে সকল পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় তার মধ্যে তুলনামূলক পদ্ধতি একটি তুলনামূলক পদ্ধতি সম্বন্ধে সংজ্ঞা দিতে গিয়ে Levi-Strauss বলেছেন, "The comparative method consists precisely in integrating a particular phenomenon into a larger whole, which the progress of the comparison makes more and more general"।

এই পদ্ধতির মূল লক্ষ্য হলো প্রকৃতি সম্পর্কে উদ্ভাবনের উদ্দেশ্যে কোন বিষয়ের একই বৈশিষ্ট্যের এককসমূহের (Unit) মধ্যে পদ্ধতিভিত্তিক তুলনার মাধ্যমে অনুমিত সিদ্ধান্ত পরখ করে নেয়া। অধ্যাপক E. A. Freeman দাবি করেছেন যে, "পরীক্ষা-নিরীক্ষার তুলনামূলক পদ্ধতি আমাদের যুগের বৃহত্তম বুদ্ধিবৃত্তিক সাফল্য।" তিনি বিশেষত ভাষা গবেষণার ক্ষেত্রে এই প্রয়োগের সাফল্যের প্রতি নির্দেশ করেছেন। তিনি আরও বলেন যে এই পদ্ধতির সবচেয়ে বড় অসুবিধা হচ্ছে এই যে পর্যাপ্ত পরিমাণ তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ সম্ভব নাও হতে পারে।

তুলনামূলক পদ্ধতি প্রয়োগের প্রধান শর্তসমূহ

(১) তুলনামূলক পদ্ধতি সে সকল ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা যায় যখন দুই বা ততোধিক বিষয়বস্তুর মধ্যে এমন কোন সাধারণ বৈশিষ্ট্য 'ক' থাকে যেটি প্রত্যেকটি বিষয়বস্তুর মধ্যেই বিদ্যমান।

(২) দ্বিতীয় কোন বৈশিষ্ট্য 'খ' প্রথম সাধারণ বৈশিষ্ট্য 'ক' এর কারণ বা ফলাফল হতে পারবে না যদি না 'ক' এর পাশাপাশি সেটিও 'খ' উপস্থিত না থাকে।

(৩) কোন বৈশিষ্ট্য 'খ' মোট অন্য কোন বৈশিষ্ট্য 'ক' এর কারণ বা ফলাফল সেটি বিষয়বস্তুসমূহের মধ্যে উপস্থিত থাকতে পারবে না যদি 'ক' ও উপস্থিত না থাকে।

(৪) দ্বিতীয় কোন বৈশিষ্ট্য 'খ' অবধারিতভাবেই কোন বৈশিষ্ট্য 'ক' এর কারণ বা ফলাফল হতে পারবে না। যদি এমন কোন বৈশিষ্ট্য 'গ' থেকে থাকে যেটি 'খ' এর সাথে একই সময় উপস্থিত বা অনুপস্থিত থাকে।

ভূগোল শিক্ষণে তুলনামূলক পদ্ধতির প্রয়োগ

এবার প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক, অর্থাৎ ভূগোল শিক্ষণে তুলনামূলক পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায় কিনা। শিক্ষাবিদ হার্বার্ট বলেছেন, শিক্ষার্থীর ভাবজট (Apperceptive mass) এর তথ্যের অনুষঙ্গ ঘটালে শিক্ষালাভ সার্থক হয়ে ওঠে। পদ্ধতি বিজ্ঞানের নীতিবাক্যে একে শিক্ষার্থীর পরিচিত বিষয়ে থেকে অপরিচিত বিষয়ে অগ্রসর হওয়া বলে। অর্থাৎ জানা এবং অজানার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষালাভ হয়ে থাকে। এই যোগসূত্র স্থাপনের জন্য বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়ে থকে এবং তার মধ্যে তুলনামূলক পদ্ধতি একটি। পরিচিত বিষয় থেকে অপরিচিত দিকে অগ্রসর হওয়া, এই নীতিকথা ভূগোলের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। কোন শিক্ষার্থী তার চারিপার্শ্বস্থ, পরিবেশের বিভিন্ন জিনিস সম্পর্কে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ধারণা সৃষ্টি করে। বলাবাহুল্য, এরূপ সাধারণ ধারণা সৃষ্টি বিদ্যালয়ের আসার পূর্বেই শিক্ষার্থী সংঘটিত হয়ে থাকে। প্রকৃতি নিজেই তাকে অনেক কিছু শিখিয়ে থাকে। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষাদানকালে শিক্ষক শিক্ষার্থীর পূর্বজ্ঞান যাচাই করার মাধ্যমে নতুন জ্ঞানের প্রয়োজন ঘটিয়ে থাকেন।

তুলনামূলক পদ্ধতির মূল কথাই হলো শিক্ষার্থী তার নিজস্ব বিদ্যালয় পরিবেশ ও গৃহ পরিবেশের চতুষ্পার্শ্বে যে সব ভৌগোলিক দৃশ্য ও ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে ও জ্ঞানলাভ করে তার পরিপ্রেক্ষিতে দূর অঞ্চলের অদৃষ্ট কোন বস্তু বা ঘটনার তুলনা করে নতুন জ্ঞান লাভে অগ্রসর হতে পারে।

যেমন ধরা যাক স্থানীয় অঞ্চলে প্রবাহিত নদী অনেক শিক্ষার্থীই দেখে থাকে সারা বছর ধরে। কিন্তু নদীর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলো তারা পর্যবেক্ষণ নাও করতে পারে। নদীর গতিপথ, বাঁক, উপত্যকা, নদীগর্ভ ইত্যাদির সঙ্গে শিক্ষার্থীকে পরিচয় ঘটিয়ে দেয়া শিক্ষকের সর্বপ্রথম কাজ। শিক্ষার্থীর পক্ষে নিজস্ব পরিবেশে এসব বৈশিষ্ট্যগুলো নজরে না এলে এবং সেই সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ না হলে অন্য অঞ্চলের অনুরূপ ভৌগোলিক দৃশ্য ও তার প্রক্রিয়া হৃদয়ঙ্গম করা সহজ কাজ নয়। প্রাকৃতিক ভূগোলের অপরাপর দিকগুলোর প্রসঙ্গে একই বক্তব্য। ধরা যাক, তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাত প্রসঙ্গ। তাপমাত্রা পর্যবেক্ষণ ও লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন এবং এজন্য তাপমাত্রা মাপক যন্ত্র ব্যবহার করা দরকার। শিক্ষার্থীর নিজস্ব পরিবেশে গ্রীষ্মকালে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা যদি ৯৫° ফা: পর্যবেক্ষণ করে তাহলে অন্য স্থানের ৬০° ফা: তাপমাত্রার অর্থ তার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। বৃষ্টিপাতের পরিমাপ মাপার জন্য যন্ত্রটির ব্যবহার জানা না থাকলে এবং সারা বছরের মোট

বৃষ্টিপাত কত ইঞ্চি বা সেন্টিমিটার লিপিবদ্ধ করলে শিক্ষার্থীর নিকট অন্য যে কোন স্থানের বৃষ্টিপাতের পরিসংখ্যান অর্থবহ হয়ে উঠবে।

জনসংখ্যার পরিসংখ্যান সম্বন্ধে শিক্ষার্থীর সঠিক ধারণা পেতে হলে প্রথমেই তার নিজস্ব পরিবেশের জনসংখ্যা কিরূপ, সে সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া প্রয়োজন। উদাহরণ হিসাবে ধরা যাক, ঢাকা শহরের লোকসংখ্যা ৬০/৭০ লক্ষ। এই তথ্য জানা থাকলে এখানকার জনসংখ্যার চাপ অন্যান্য শহরগুলোর তুলনায় কিরূপ অত্যধিক সে সম্বন্ধে উপলব্ধি করা সম্ভব হবে।

তুলনামূলক পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য

(১) তুলনামূলক পদ্ধতির সাফল্যের পূর্বশর্ত হিসাবে শিক্ষার্থীর পূর্বজ্ঞান যথাযথ হওয়া অবশ্য কর্তব্য : এখানে পূর্বজ্ঞান বলতে শিক্ষার্থীর জানা বা পরিচিত বিষয়কে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ এখানে হার্বার্ট এর appreciative mass এর কথা বলা হয়েছে। তিনি বলেছেন, "আমরা পুরানো জ্ঞানের আলোকে নতুন জ্ঞান আহরণ করি।" উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশের জনসংখ্যার সাথে জার্মানির জনসংখ্যা তুলনা করার সময় আমাদেরকে অবশ্যই জানতে হবে যে বাংলাদেশের জনসংখ্যা তার আয়তনের তুলনায় বেশি। এই জ্ঞান থাকলে তবেই আমরা বলতে পারবো যে জার্মানি অথবা পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের তুলনায় বাংলাদেশের জনসংখ্যা অনেক বেশি।

(২) তুলনামূলক পদ্ধতি শিক্ষণের স্থানান্তর ঘটে : বর্তমান শিক্ষণের উপর অতীত শিক্ষণের প্রভাবকে শিক্ষণের স্থানান্তর বলা হয়। সকল শিক্ষানীতির মূল ভিত্তি হচ্ছে শিক্ষণের স্থানান্তর James Deese বলেন, "Practically all educational and training programmes are built upon the fundamental premise that human beings have the ability to transfer what they have learnt from one situation to another."

বহু প্রাচীনকাল থেকে স্কুল কলেজের শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষণের স্থানান্তর তত্ত্বটি যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে এসেছে। এই তত্ত্বের উপর ভিত্তি করেই স্কুল কলেজের পাঠ্যক্রম রচনা হতো।

১৯৪৯ সালে Osgood শিক্ষণের স্থানান্তরের সর্বাধুনিক তত্ত্বের জন্ম দিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন স্থানান্তর কতটুকু হবে তা নির্ভর করে বিষয়বস্তুর সামঞ্জস্যতার উপর। বিষয়বস্তু যত বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ হবে শিক্ষণের স্থানান্তর তত বেশি ঘটবে।

(৩) তুলনামূলক পদ্ধতি সমস্যা সনাক্তকরণে সহায়ক : এই পদ্ধতির সাহায্যে আমরা বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরতে পারি। যেমন, বাংলাদেশ এবং চিনের তুলনামূলক ভৌগোলিক বিশ্লেষণে দেখা যায় উভয় ভূ-ভাগই নদীমাতৃক। কিন্তু যখন তুলনামূলক অর্থনৈতিক ভূগোল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে জলপথে অর্থনৈতিক ব্যবহার চিনে বেশি তখন নদীমাতৃক বাংলাদেশে জলপথের উন্নয়নের

অবহেলা এবং সামগ্রিক উন্নয়ন কাঠামোতে জলপথ বিকাশে বিনোয়োগের স্বল্পতা আরও প্রকটভাবে ধরা পড়ে।

তুলনামূলক পদ্ধতির সুবিধা

(১) এই পদ্ধতিতে পুনরালোচনা অনুশীলন করার সুবিধা রয়েছে।

(২) উচ্চ শ্রেণির জন্য তুলনামূলক পদ্ধতি বেশি উপযোগী।

(৩) শিক্ষার্থীদের বিশ্লেষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

(৪) জানা বিষয়ের উপর গভীরতর জ্ঞান অর্জন সম্ভব হয়।

(৫) জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা স্থায়িত্ব লাভ করে।

তুলনামূলক পদ্ধতির অসুবিধা

(১) এই পদ্ধতির সবচেয়ে বড় অসুবিধা হচ্ছে পর্যাপ্ত পরিমাণ তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ সম্ভব নাও হতে পারে।

(২) শিক্ষার্থীর নিজস্ব পরিবেশলব্ধ জ্ঞান সবক্ষেত্রে অন্য পরিবেশে প্রযোজ্য নাও হতে পারে। তাছাড়া নিজস্ব পরিবেশের জ্ঞান লাভ করা সহজসাধ্য কাজ সবক্ষেত্রে নাও হতে পারে।

(৩) সব ঘটনা বৈশিষ্ট্য সব শিক্ষার্থীর নিজ নিজ অঞ্চলের মধ্যে দৃষ্ট হয় না।

(৪) শ্রম সময় ও অর্থ ব্যয়ের দরকার হয়।

(৫) নিচু শ্রেণিতে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায় না।

উপসংহারে বলা যায় তুলনামূলক পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের ভৌগোলিক বিষয়ে তুলনামূলক আলোচনা করা হয়। প্রথমে তাদের স্থানীয় ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য শেখানো হয় এবং পরে তাদের চারপাশের শহর ও গ্রামের সঙ্গে তার তুলনা করতে বলা হয়। একটি দেশের সাথে অপর একটি দেশের ও ভৌগোলিক বিষয়গুলো তুলনামূলক আলোচনা করা যায়। এই পদ্ধতির মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান শিক্ষার্থীদের মনে রাখার জন্য বিশেষ উপযোগী। এর মাধ্যমেই শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জানা থেকে অজানায় পাড়ি দিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। শিক্ষার্থীদের সকলেরই কিছু কিছু পূর্ব জ্ঞান থাকে। এই জ্ঞানের সঙ্গে নতুন জ্ঞান যুক্ত হয়। উভয়ের তুলনামূলক আলোচনার ফলেও জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা স্থায়িত্ব লাভ করে।

এই পদ্ধতির প্রধান অসুবিধা হলো নিম্ন শ্রেণির জন্য এই পদ্ধতি বিশেষ উপযোগী নয় তবে উচ্চ শ্রেণিতে তুলনামূলক শিক্ষাদান খুব কার্যকরী। এর কারণ নিম্নশ্রেণির শিক্ষার্থীদের মানসিক বিকাশ এবং উচ্চ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মানসিক বিকাশ এক নয়। উচ্চ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মধ্যে Reasoning করার ক্ষমতা থাকে যা কিনা তুলনা করার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন কিন্তু নিম্ন শ্রেণির শিক্ষার্থীরা imagination-oriented হয়, তাদের মধ্যে reasoning এর বিকাশ ঘটে না।

তাই কোনো পদ্ধতি প্রয়োগ করার সময় যেমন তার অসুবিধার দিক লক্ষ্য রাখতে হবে তেমনি শিশুর বা শিক্ষার্থীর মানসিক দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে।

২.৪ ভূগোল শিক্ষণে বর্ণনামূলক পদ্ধতি

বর্ণনামূলক পদ্ধতি কি ?

বর্ণনামূলক পদ্ধতি এমন একটা পদ্ধতি যার ব্যবহারে শিক্ষককে মৌখিক বিবৃতির সাহায্যে শিক্ষাদানের বিষয়বস্তু বিবরণের মাধ্যমে এমনভাবে উত্থাপন করা হয় যাতে শিক্ষার্থীর কল্পনাশক্তি প্রসার লাভ করে।

ভূগোলে এমন অনেক জিনিস আছে যার ছবি শিক্ষার্থীর মনের মাঝে একে দিতে হয় এই ব্যাপারটি বিবরণের সাহায্যে কল্পনা জাগিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পরিবেশন করা সম্ভব বিবরণের ভাষা হবে সহজ, কখনও গল্পের আকারে কখনও বা ভ্রমণকাহিনী ও কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে বিষয়ের বর্ণনা দেয়া যেতে পারে।

শিক্ষাদানের কাজে শিক্ষক ছবি, মডেল বা চার্ট ব্যবহার করবেন। এতে বিষয়ের প্রতি শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও আকর্ষণ জন্মায়। বিবরণের মাধ্যমে শিক্ষক বিষয়ের সঙ্গে শিক্ষার্থীর সেতুবন্ধ রচনা করতে চেষ্টা করেন। নিম্নশ্রেণির আকাঙ্ক্ষা উচ্চ শ্রেণিতে এই পদ্ধতি কার্যকরী

ভূগোল শিক্ষায় বর্ণনামূলক পদ্ধতির শিক্ষা উপকরণ

ভূগোল শিক্ষায় বর্ণনামূলক পদ্ধতির ক্ষেত্রে বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করা যেতে পারে যেমন—

১. মানচিত্র ; ২. চার্ট ; ৩. মডেল ; ৪.ছবি ; ৫. গ্লোব।

ভূগোল শিক্ষায় বর্ণনামূলক পদ্ধতি কিভাবে প্রয়োগ করতে হবে

শিক্ষক যখনই কোন বিষয়ের বর্ণনা করবেন তখনই তিনি এমন একটি মৌখিক চিত্র ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে তুলে ধরবেন যাতে ছাত্র-ছাত্রীরা তা শুনে আরও জানবার আগ্রহ বোধ করে কারণ

তারা যা তাদের শিক্ষকের মুখ হতে শোনে তা বোধগম্য হয় সহজেই। বর্ণনার মাধ্যমে শিক্ষাকে ফলপ্রসূ করতে হলে শিক্ষককে নিম্নলিখিত পন্থা অবলম্বন করতে হবে :

১. অজানা জিনিসকে জানা জিনিসের পরিপ্রেক্ষিতে বর্ণনা করতে হবে। জানিত জিনিসকে খুব সাবধানতার সঙ্গে শিক্ষককে বেছে নিতে হবে। ছাত্র-ছাত্রীরা পূর্ব জ্ঞানের স্তরে যেয়ে যদি নতুন জিনিস শিক্ষকের মুখ হতে শ্রবণ করে তাহলে ছাত্র-ছাত্রীরা বুঝতে পারবে এবং মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করবে।

যেমন : এস্কিমো জাতি সম্বন্ধে পাঠদান কালে শিক্ষক ছাত্রদের পূর্বজ্ঞান পরীক্ষা করবেন এবং তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে নতুন পাঠ ঘোষণা করবেন। পাঠ উপস্থাপনকালে এরূপ প্রশ্নের অবতারণা করা যেতে পারে।

যেমন—

(১) এস্কিমোরা কোথায় বাস করে?

(২) সেখানে শীত উত্তাপ কিরূপ?

(৩) তারা কিরূপ ঘরে বাস করে?

(৪) তারা কি খেয়ে জীবন ধারণ করে?

নতুন পাঠ বর্ণনার সময় বলতে হবে, তোমাদিগকে আর এক দেশের কথা বলব, যে দেশ এস্কিমোদের দেশের ঠিক বিপরীত। সারা বৎসর বরফে ঢাকা থাকে না, এটি মরুভূমির দেশ।

২. শিক্ষককে বিষয়বস্তু বুঝাতে অনেক কথা বলতে হয়, শিক্ষক বেশি কথা না বলে যদি বক্তব্য বিষয় উপস্থাপনের সময় ছবি, মানচিত্র নক্শা ইত্যাদির সাহায্য নিয়ে বর্ণনা দেন, তাহলে ছাত্র-ছাত্রীরা সহজে ঐ সব কথাগুলো মনে রাখতে পারবে।

যেমন : ভূগোলে এস্কিমোদের দেশ দেখাবেন ও নানা চিত্রের সাহায্যে বর্ণনা দিবেন। এস্কিমোদের ছবি দেখাবেন।

৩. শিক্ষকের স্বর প্রয়োজনমতো উচ্চ, নীচ হবে এবং বিশুদ্ধ ও সুস্পষ্ট উচ্চারণ করবেন।

৪. বর্ণনার ভাষা সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল হবে, তাছাড়া শিক্ষক যে শ্রেণিতে পাঠদান করবেন সেই শ্রেণির উপযুক্ত করে তার বিষয়বস্তুর বর্ণনা দান করবেন।

৫. বর্ণনার ফলে বিষয়বস্তুটি যাতে ছাত্র-ছাত্রীদের মানসপটে ফুটে ওঠে এমনভাবে বর্ণনা করতে হবে।

৬. শিক্ষক আন্তরিক অনুরাগের সঙ্গে বর্ণনার বিষয়গুলোর বিবরণ দিবেন। শিক্ষকের অনুরাগের অভাব থাকলে তা ছাত্র-ছাত্রীদের অন্তর স্পর্শ করবে না

৭. বিবরণের মধ্যে প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ কথার উপর শিক্ষক জোর দিবেন এবং প্রয়োজনীয় অংশ বোর্ডে লিখে দিবেন।

যেমন : বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতির বর্ণনা দিতে গেলে তার শ্রেণি বিভাগগুলো শিক্ষক বোর্ডে লিখে দিবেন।

৮. বর্ণনা একটানা দীর্ঘ হবে না, তাহলে বর্ণনা একঘেয়ে হয়ে দাঁড়াবে। বর্ণনার সাথে সাথে প্রদীপন বা শিক্ষা সরঞ্জাম দেখিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের কৌতূহল বর্ধিত করা প্রয়োজন।

(৯) পাঠের উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে বর্ণনা দান করতে হবে এবং অবান্তর ও অপ্রয়োজনীয় বিষয় বর্জন করতে হবে।

(১০) বর্ণনামূলক পদ্ধতির ক্ষেত্রে শিক্ষকই শুদ্ধ কথা বলবেন তা নয় শিক্ষার্থীকে কথা বলার জন্য আগ্রহী ও কৌতূহলী করে তুলবেন। শিক্ষক মাঝে মাঝে প্রশ্ন করতে পারেন।

(১১) সবশেষে বলা যায় যে, ভূগোল শিক্ষায় বর্ণনামূলক পদ্ধতিকে কার্যকরী করতে হলে হার্বার্টের পঞ্চ সোপান প্রয়োগ করতে হবে। যেমন :

(১) প্রস্তুতীকরণ ; (২) উপস্থাপন ; (৩) অনুষঙ্গ স্থাপন ; (৪) সামান্যীকরণ ; (৫) অভিযোজন।

(১) প্রস্তুতীকরণ : এ পর্যায়ের শিক্ষক এমন একটি বিষয় নিয়ে তাঁর পাঠ শুরু করবেন যার স্বরূপ সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পূর্ব থেকেই পরিষ্কার জ্ঞান থাকে।

যেমন : শিক্ষা সম্বন্ধে পড়াতে গেলে শিক্ষার্থীদের মাটি, কাঁকর, বালি ইত্যাদি সম্বন্ধে পূর্ব থেকেই পরিষ্কার জ্ঞান দিয়ে রাখতে হবে।

(২) উপস্থাপন : এই সোপানে শিক্ষক ভূগোলের নতুন বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থিত করেন।

(৩) অনুষঙ্গ স্থাপন : এই পর্যায়ে শিক্ষক পূর্বের সোপান দু'টির বিবরণবস্তুর মধ্যে তুলনা করবেন এবং তাদের মধ্যে কোথায় সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য আছে তা দেখিয়ে দেবেন। এভাবে অনুষঙ্গ স্থাপন বা তুলনার সাহায্যে শিক্ষক পুরাতন জ্ঞান ও নতুন জ্ঞানের মধ্যে একটা সমন্বয় সৃষ্টি করবেন।

(৪) সামান্যীকরণ : এখানে শিক্ষার্থী যে সব তথ্য বা ধারণা আহরণ করে শিক্ষক তাকে সেগুলো সাধারণ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে শেখাবেন, অর্থাৎ সেগুলোর অন্তর্নিহিত মৌলিক তত্ত্বগুলোকে বেছে নিয়ে সেগুলো থেকে সামান্য সত্য গঠন করতে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করবেন প্রকৃতপক্ষে এই ধাপেই শিক্ষাদান কাজটি শেষ হয়।

যেমন : আগ্নেয় বা শিলা পড়ানোর পর এ সম্বন্ধে একটা সাধারণ সূত্র গঠন করতে পারা যায় যে এটা অ-স্তরীভূত, কেলাসিত, জীবাণুবিহীন ইত্যাদি।

(৫) অভিযোজন : পূর্বের সোপানে শিক্ষার্থী যে সব সত্য বা মৌখিক তত্ত্ব আহরণ করলে এই সোপানে সমাধান করার কাজ শিক্ষার্থীকে দেয়া হয়, অর্থাৎ এই সোপানে শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞানের পরিমাপ করা হয়।

বর্ণনামূলক পদ্ধতির সুবিধা

(১) ভূগোল শিক্ষায় বর্ণনামূলক পদ্ধতিটি হলো পরোক্ষ পদ্ধতি। এই পদ্ধতি শিক্ষার উচ্চ পর্যায়ে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ পদ্ধতিতে ছাত্র-ছাত্রীরা ধৈর্যশীল ও মনোযোগী। কারণ তারা উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষার্থী এবং শিক্ষার্জনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সজাগ।

(২) এই পদ্ধতিতে অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীকে একসাথে পড়ানো যায়।

(৩) এই পদ্ধতিতে খরচ কম। কেননা মানচিত্র, চার্ট, নক্সা ইত্যাদি নিজেরাই তৈরি করে নিতে পারেন।

(৪) বর্ণনামূলক পদ্ধতির সাহায্যে পৃথিবীর ও ভূ-পৃষ্ঠের নানা দেশ ও বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষার্থীদের স্পষ্ট ধারণা গড়ে ওঠে এবং ভূগোল শিক্ষার ভিত্তি সুদৃঢ় হয়।

(৫) এই পদ্ধতিতে বর্ণনার মাধ্যমে জটিল বিষয়কে সহজে ছাত্রদের হৃদয়ঙ্গম করানো যায়।

(৬) শিক্ষার্থীদের মধ্যে আগ্রহ ও কৌতূহল জেগে উঠে বর্ণনামূলক পদ্ধতিতে।

বর্ণনামূলক পদ্ধতির অসুবিধা

(১) এ পদ্ধতিতে শিক্ষকই একমাত্র বক্তা আর শিক্ষার্থীরাই শ্রোতা, সময় উত্তীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তাদের শুধু শিক্ষকের কথাই ধৈর্যসহকারে শুনতে হয়। এতে শিক্ষার্থীদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটার সম্ভাবনা বেশি।

(২) প্রশিক্ষণ বিহীন শিক্ষকেরা অনেক সময় বর্ণনার মাধ্যমে বিষয়বস্তুকে ভালভাবে বুঝতে পারেন না। অনেক সময় দুর্বল শিক্ষক মানচিত্র, চার্ট, গ্লোব ইত্যাদি ব্যবহার না করে বই-এ যা আছে তা গড় গড় করে বলে যান কিছু বুঝান না। এতে শিক্ষার্থীদের অসুবিধা হয়।

(৩) বর্ণনামূলক পদ্ধতির ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা একান্তভাবে শিক্ষকের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে ও তাদের স্বাধীনভাবে বিষয় অনুশীলনের ক্ষমতা লোপ পায়।

(৪) এই পদ্ধতিতে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীর মানসিক ধারণ ক্ষমতা, ব্যক্তিগত গুণাবলি, এমনকি পাঠ্যবিষয় সম্পর্কে লব্ধ অভিজ্ঞানের কোন প্রকার মূল্যায়ন করা সম্ভব হয় না।

২.৫ ভূগোল শিক্ষণে প্রকল্প পদ্ধতি

সূচনা : উইলিয়াম কিল প্যাট্রিক ডিউই প্রদত্ত প্রয়োগবাদের বাস্তব রূপ দিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। তার মতে, "বিশেষ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আন্তরিকতার সঙ্গে সামাজিক পরিবেশে কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে শিক্ষাকর্মে অগ্রসর হওয়ার প্রণালীই হচ্ছে প্রকল্প পদ্ধতি।"

ড: স্টিভেনসন (Stevenson) আবার সমস্যা ও পটভূমির উপর গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন "প্রকল্প হলো একটি সমস্যামূলক কর্ম যাকে স্বাভাবিক পরিবেশ সম্পন্ন করা হয়।"

উপরোক্ত ব্যাখ্যায় দেখা যাচ্ছে যে, প্রথমটা "কোন উদ্দেশ্য প্রণোদিত কাজ যা সমাজের অনুকূল পরিবেশে আন্তরিকতার সঙ্গে সম্পাদন করা হয়।" অর্থাৎ প্রত্যেকটি প্রকল্প সম্পাদনের পশ্চাতে একটি সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য থাকবে। শিক্ষার্থীর স্বত:স্ফূর্ত কর্ম প্রচেষ্টা প্রকল্প রূপায়নে সক্রিয় হয়ে উঠবে এবং এরূপ কর্ম সম্পাদন শ্রেণিকক্ষের চার দেওয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে সামাজিক পরিবেশে সম্পন্ন হবে। এরূপ কর্ম কি প্রকৃতির হবে তা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে Stevenson এর সংব্যাখ্যায়। Stevensonএর সংব্যাখ্যায় একটি জিনিস উল্লেখযোগ্য যা হলো "সমস্যামূলক কাজ" কোন সমস্যার উদ্ভব হলে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের সহযোগিতায় তা সমাধানের জন্য সচেষ্ট হবে।

এ দু'টি সংজ্ঞার পরিপূরক হিসাবে বসিং (Bossing) কর্তৃক প্রদত্ত সংজ্ঞাটিও প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, "প্রকল্প হলো তাৎপর্যপূর্ণ সমস্যাসূচক কর্মের ব্যবহারিক বিষয় শিক্ষার্থীরা স্বাভাবিকভাবে সক্রিয় পরিকল্পনা ও পরিচালনার দ্বারা প্রকল্পিত কর্ম সম্পাদন করে তাদের অভিজ্ঞতার পরিপক্বতার জন্য বাস্তব সামগ্রী ব্যবহারেরও প্রয়োজন হয়।"

পূর্বোক্ত সংজ্ঞাগুলোর ভিতর দিয়ে গতানুগতিক শিক্ষণ পদ্ধতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। শিক্ষক নির্দিষ্ট শিক্ষালাভের পরিবর্তে শিক্ষার্থীর উদ্দেশ্যমূলক সমস্যাসূচক কর্ম সম্পাদনের জন্য স্বকীয় প্রচেষ্টায়, পরিকল্পনা ও পরিচালনায় শিক্ষালাভের পদ্ধতিটিও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে প্রকল্পভুক্ত কর্ম হবে আনন্দ বর্ধক ও উদ্দেশ্য সঠিক। তাই এলোমেলো যে কোন কর্মকে প্রকল্প বলা যায় না। প্রকল্প হলো সেই জাতীয় কর্ম যা শিক্ষার্থীর উদ্দেশ্য সঠিক সুপরিকল্পিত কর্ম সম্পাদনার মাধ্যমে সূত্র নির্ধারণ এবং জ্ঞান ও দক্ষতা লাভে সাহায্য করা।

প্রকল্প পদ্ধতির সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে তিনটি মৌলিক নীতির সন্ধান পাওয়া যায়। (১) এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা সৃষ্টিমূলক কর্মে উদ্বুদ্ধ হয়ে বাস্তব পরিবেশে কর্মের মাধ্যমে উদ্দেশ্য সিদ্ধ

করে। (২) প্রকল্প পদ্ধতি জীবন, সমাজ ও কর্ম প্রচেষ্টায় অভিব্যক্ত। (৩) এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা বাহ্যিক প্রভাব (যেমন—শিক্ষকের প্রভাব) থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে স্বীয় কর্তব্য সাধনে অগ্রসর হতে পারে।

প্রকল্প পদ্ধতির সংজ্ঞা এবং বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, ভূগোল শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা সৃষ্টিমূলক কর্মে উদ্বুদ্ধ হয়ে ভৌগোলিক পরিবেশে কর্মের মাধ্যমে উদ্দেশ্য অর্জন করতে পারে। সামাজিক জীবন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারে। তাছাড়া শিক্ষার্থীরা শিক্ষকদের প্রভাবমুক্ত হয়ে নিজ কর্ম সম্পাদনে অগ্রসর হতে পারে।

প্রকল্প পদ্ধতির স্তর

প্রকল্প পদ্ধতি মূলত চারটি স্তর রয়েছে। স্তরগুলো হলো (১) উদ্দেশ্য নির্ধারণ (২) পরিকল্পনা (৩) কর্ম সম্পাদনা এবং (৪) সূত্র নির্ধারণ ও ফলশ্রুতি বিচার।

অর্থাৎ প্রথমেই যে কোন বিষয়ের বিশেষ পাঠটির কি উদ্দেশ্য হবে, তা নির্ধারণ করা। দ্বিতীয়ত, এই উদ্দেশ্যে পৌঁছতে হলে পাঠটির খসড়া প্রস্তুত করা। কারণ পাঠটি যথাযথ ক্রম অনুযায়ী বিষয়বস্তু সন্নিবিষ্ট থাকে। তৃতীয়ত, শিক্ষক মহাশয়কে তার পরিকল্পনা অনুযায়ী পাঠ টিকাটি শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীর উপর কার্য সম্পাদন করতে হয়। চতুর্থত, শিক্ষার্থীর নবলব্ধ জ্ঞানের যাচাই বা পরিমাপ।

শিক্ষক সমস্যামূলক কাজটি নিয়ে শিক্ষার্থীর সঙ্গে দলবদ্ধভাবে আলোচনা করবেন এর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে। তারপর ঐ উদ্দেশ্য সফল করতে হলে কিভাবে কার্য সম্পাদন করা হবে, তা নিয়ে আলোচনা করবেন। এর পরেই আসে প্রত্যক্ষ কর্ম সম্পাদন ও কতটা সার্থকতা লাভ করল তার পরিমাপ করা। মনে রাখা প্রয়োজন যে, প্রতিটি ক্ষেত্রেই শিক্ষক শিক্ষার্থীর সঙ্গে থাকবেন বন্ধু, পথ প্রদর্শক ও সহায়ক হিসাবে। প্রকৃত পক্ষে শিক্ষকের উপযুক্ত নির্দেশনার উপরই এর কার্যকারিতা নির্ভর করে।

প্রকল্প পদ্ধতির প্রয়োগ

প্রকল্প পদ্ধতির সার্থক প্রয়োগের জন্য কয়েকটি স্তর অতিক্রম করা প্রয়োজন। প্রথম স্তর হলো উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি। শ্রেণিকক্ষে পঠন পাঠন ও আলাপ আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষক এমন পরিবেশ গড়ে তুলবেন যেন কোন কাজ সম্পর্কে শিক্ষার্থীর মনে স্পষ্ট ধারণার সৃষ্টি হয়। পাঠ্য বিষয়ের কোন অংশ বা সমগ্র পাঠ্য বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীর মনে যেন আগ্রহ জেগে ওঠে।

এইরূপ পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গে পদ্ধতিটির দ্বিতীয় স্তর অর্থাৎ প্রকল্প নির্বাচন আপনা থেকে এসে পড়ে। নির্বাচিত প্রকল্প বা কর্মের সঙ্গে পাঠ্য বিষয়ের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকা নিতান্ত

প্রয়োজন। অন্যথায় মূল পাঠ্যবিষয়ের পঠন পাঠন প্রক্রিয়া অগ্রসর হতে পারে না। এর ফলে শিক্ষাবর্ষের মধ্যে নির্দিষ্ট পাঠ শেষ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

এরপর প্রকল্পের মৌলিক চারটি স্তর (যা পূর্বে বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়েছে) অতিক্রম করা সহজ হয়ে পড়ে।

সবশেষে বলা যায়, প্রকল্প বা কর্ম সম্পাদনার পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ করা যুক্তিযুক্ত। বিবরণটি যেমন একদিকে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রচেষ্টার অবদান, অন্যদিকে তেমনি এর দ্বারা মূল্যায়নসূচক কার্যাদি যথাযথ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়। এইভাবে কয়েক বছরের সংগৃহীত বিবরণ পরবর্তী শিক্ষার্থীদের শিক্ষালাভের উৎসাহ বৃদ্ধির পরম সহায়ক হবে এতে সন্দেহ নেই।

প্রকল্প পদ্ধতির প্রকারভেদ

প্রয়োগ পদ্ধতির দিক থেকে বিচার করে প্যাট্রিক বিভিন্ন প্রকল্পকে ৪টি শ্রেণিতে ভাগ করেছেন।

(১) উৎপাদকের প্রকল্প : এই প্রকল্পে উৎপাদনমূলক কর্মের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় এর দ্বারা বস্তু ও চিন্তা উভয়বিধ উৎপাদন হতে পারে। যেমন—কুটির নির্মাণ, রাস্তা বা পুল নির্মাণ কোন অভিনয়ের ব্যবস্থাপনা, উৎসব অনুষ্ঠানের প্রয়োজন ও ব্যবস্থাপনা এ ধরনের প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত। একে আমরা সংগঠন বা সৃষ্টিমূলক প্রকল্পও বলতে পারি।

(২) ভোগকারীর প্রকল্প : উৎপাদিত সামগ্রী যেমন ভোগ্যপণ্য বলে গণ্য তেমনি ক্রেতারা ভোগকারী হিসাবে গণ্য হয়। এ ধরনের প্রকল্পে মূলত শিক্ষার্থীরা ভোগকারীর ভূমিকা পালন করে। তাই এদেরকে উপভোগমূলক প্রকল্পও বলা হয়। যেমন—থিয়েটার দেখা ও শোনা, গল্প শোনা ইত্যাদি।

(৩) সমস্যাসূচক প্রকল্প : চিন্তা ও কর্ম উভয় ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। শিক্ষার্থী এখানে স্বকীয় প্রচেষ্টায় সে সব সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট হয়। যেমন—দিন রাত্রির হ্রাস বৃদ্ধি ও শীত গ্রীষ্ম আইন কিভাবে ও কারা তৈরি করে ইত্যাদি এই প্রকল্পের শ্রেণিভুক্ত।

(৪) নৈপুণ্য অর্জনমূলক প্রকল্প : এ ধরনের প্রকল্পে মুখ্যত শিক্ষার্থীরা দক্ষতাবৃদ্ধি ও বিকাশপ্রাপ্ত হয়। যেমন—সাইকেল, মোটরগাড়ি চালনা শিক্ষণ, মনে রাখার কৌশল শিক্ষণ, অঙ্কের অনুশীলন ইত্যাদি এই শ্রেণির প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত।

প্রকল্পকে পাঁচভাবে ভাগ করেছেন। যথা—(১) আবিষ্কারের জন্য প্রথম (২) সৃজন বা গঠন (৩) সমাযোজন (৪) ক্রীড়া এবং (৫) নৈপুণ্য। তবে প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত কর্মের প্রকৃতি অনুসারে বিভিন্ন প্রকল্পকে মোট দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা—(১) বুদ্ধিমূলক (২) কর্মমূলক

প্রথমটি মানসিক চিন্তার উপর গুরুত্ব আরোপ করে, আর দ্বিতীয়টি শিক্ষার্থীদের হাতে কলমে কর্মসম্পাদনার উপর গুরুত্ব আরোপ করে।

প্রকল্প পদ্ধতির উপযোগিতা

প্রকল্প পদ্ধতি আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ও শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় বিপ্লব সৃষ্টি করেছে। পুঁথিগত বিদ্যার কর্মহীন পরিবেশে এনেছে ক্রিয়াশীল সজীব প্রচেষ্টা। প্রকল্প পদ্ধতির উপযোগিতার বিচারে নিম্নরূপ বিষয়গুলো সর্বদা উল্লেখযোগ্য।

প্রথমত, প্রকল্প পদ্ধতি নিজেই শিক্ষণের বা শিক্ষালাভের সূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। শিক্ষার জন্য আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানে পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে। শিক্ষার্থীদের শিক্ষার জন্য শিক্ষক এই পদ্ধতি প্রয়োগ করেন। এইরূপ পদ্ধতি শিখনের মূল সূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই এর উপযোগিতা অনস্বীকার্য। প্রকল্পের মধ্যে আছে প্রস্তুতির সূত্র। অনুশীলনের সূত্র এবং ফলভোগের সূত্র। তাই শিক্ষার্থীরা প্রকল্প পদ্ধতি দ্বারা আগ্রহ সহকারে কর্মে প্রবৃত্ত হয়। বার বার প্রচেষ্টার মাধ্যমে কর্ম সম্পাদন করে এবং সাফল্য থেকে পরম পরিতৃপ্তি লাভ করে।

দ্বিতীয়ত, প্রকল্পের তিনটি ধাপে শিক্ষার্থীদের মনন, চিন্তন, কর্ম সম্পাদন ও অনুধাবন শক্তির বিকাশ সাধিত হয়। প্রকল্প নির্বাচন, উদ্দেশ্য নির্ধারণ, কর্ম সম্পাদন, সিদ্ধান্তে পৌঁছানো প্রভৃতি প্রতিটি স্তরের জন্য শিক্ষার্থীকে যথেষ্ট চিন্তাশীল হতে হয়। আবার প্রকল্পকে সার্থক করে তোলার জন্য ব্যক্তিগত ও যৌথভাবে শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ শক্তি প্রয়োগ করতে হয়। এর দ্বারাই শিক্ষার্থীর ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব হয়।

তৃতীয়ত, প্রকল্প পদ্ধতির একটি সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য গণতান্ত্রিক উপায়ে শিক্ষা দেয়া হয়। এই শিক্ষামূলক কর্ম সম্পাদনের জন্য দল ও উপদল নির্বিশেষে সকলের পারস্পরিক সক্রিয় সহযোগিতার প্রয়োজন হয়। প্রকল্পের কর্মের মধ্যে আছে শিক্ষার্থীর পূর্ণ স্বাধীনতা। স্বাধীনভাবে শিক্ষার্থীরা স্ব স্ব দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে। ফলে, এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা সামাজিক ও নাগরিক জীবনযাত্রায় অভ্যস্থ হয়ে ওঠে। তাদের মধ্যে স্বনির্ভরতা ও দায়িত্বশীলতা গড়ে ওঠে। পরবর্তীকালে আদর্শ নাগরিক হিসাবে শিক্ষার্থীরা অনেকগুলো গুণ অর্জন করে। অনেকেই পরিকল্পনা রচনা করতে পারেন কিন্তু তার বাস্তব রূপদানের জন্য প্রকল্প পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হয়। এককথায় শিক্ষার্থীর ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক ও নাগরিক সত্তার পূর্ণ বিকাশ সম্ভব হয়।

চতুর্থত, এই পদ্ধতিতে একদিকে যেমন শিক্ষার্থীরা শ্রেণি পাঠের একঘেয়েমী থেকে রেহাই পায়, তেমনি গ্রন্থভুক্ত নির্জীব বিষয়ের সঙ্গে বাস্তব জীবনের সম্পর্ক অনুধাবন করতে পারে। তাই পাঠ্য বিষয়ের সহজ জীবন ও কর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে উঠে। ফলে শিক্ষার্থী স্ব স্ব অভিজ্ঞতার পূর্ণ প্রয়োগের সুযোগ পায় এবং বিষয় শিক্ষার জন্য অধিক আগ্রহী হয়ে ওঠে। গতানুগতিক মুখস্ত

বিদ্যার পরিবর্তে যুক্তি ও নৈপুণ্য দ্বারা শিক্ষার্থীরা যেমন পাঠ্য বিষয়ের সমস্যা সমাধান করতে শেখে তেমনি বাস্তব জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ায় প্রতিটি শিক্ষার্থীর মনে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি স্থাপনের অনুকূল প্রবণতা গড়ে ওঠে। তাই এর ফলে শিক্ষা হয় ক্রিয়াশীল, জীবন্ত ও সার্থক।

উপসংহারে আমরা বলতে পারি যে, প্রকল্প পদ্ধতির সুবিধা এবং অসুবিধার দুটি দিক আছে। এই পদ্ধতির উপরোক্ত আলোচনার বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, আমাদের দেশে ভূগোল শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা সৃষ্টিমূলক কর্মে উদ্বুদ্ধ হয়ে ভৌগোলিক পরিবেশের কর্মের মাধ্যমে উৎকর্ষ সাধন করতে পারে। সামাজিক জীবন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারে। তাছাড়া শিক্ষার্থীরা চার দেওয়ালের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে নিজকর্ম সম্পাদনে অগ্রসর হতে পারে। যেখানে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের প্রভাব অতি মাত্রায়, সেখানে তারা পাঠ্যপুস্তকের নির্জীব জ্ঞান ছাড়া অন্য কিছুর সাথে সম্পর্কিত হতে পারে না। কিন্তু এই প্রকল্প পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষাদান বা শিক্ষালাভে শিক্ষার্থীর বাস্তব জীবনের সাথে পাঠ্য বিষয়ের সম্পর্ক নির্ণয় করতে সক্ষম হয়, যা বাস্তব জীবনেও অনেক কাজ দেয়। তাই আমাদের দেশে ভূগোল শিক্ষাকে প্রকল্প পদ্ধতির মাধ্যমে শিখানো হলে আমাদের শিক্ষাদানটা অনেকখানি না হলেও কিছুটা সার্থক হবে।

২.৬ ভূগোল শিক্ষণে পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি

সূচনা : ভূগোলের বিষয়বস্তু পরিবেশন করার জন্য নানা প্রকার শিক্ষা পদ্ধতি প্রচলিত। শিশুর মনের ভাব বুঝে শিক্ষা দেওয়া উচিত। তাই শিক্ষাদান পদ্ধতি সকলের পক্ষে এক হতে পারে না। শিশুর মনের ভাব বুঝে শিক্ষাদান মনোবিজ্ঞানসম্মত। সেজন্য শিক্ষাবিদগণের নানা প্রকার শিক্ষণ পদ্ধতির অবদান অপরিসীম।

যখন শিক্ষার্থীদেরকে কোন একটা স্থানে নিয়ে যাওয়া হয় তখন তারা নানা জিনিস প্রত্যক্ষভাবে দেখার সুযোগ পায়। এর ফলে ভৌগোলিক বিষয়ে তারা প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করে। এই জ্ঞান তাদের কাছে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট। পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে যে জ্ঞান লাভ হয় তার বাস্তব মূল্যও যথেষ্ট। ভূগোল শিক্ষার সর্বস্তরে তাই এই পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তা সর্বাধিক। অবশ্য এই পদ্ধতিতে শিক্ষাদান ব্যয় সাপেক্ষ, কিন্তু বিদ্যালয়ের পরিবেশ ও শিক্ষার্থীর পারিপার্শ্বিক পরিবেশ থেকে বিনা খরচে এই পদ্ধতিতে কিছু কিছু শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে।

ভূগোল শিক্ষায় পর্যবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

ভূগোলের বাস্তব অভিজ্ঞতা গড়ে তোলার জন্য পর্যবেক্ষণের মূল্য সীমাহীন। একমাত্র পর্যবেক্ষণেই কোন একটা স্থানের বাস্তব পরিচয় দান করতে পারে। কোন অঞ্চলের ভৌগোলিক বিষয় সম্বন্ধে সামগ্রিক পরিচয় লাভ করতে হলে সেই অঞ্চল পর্যবেক্ষণ করা দরকার। কোন

অঞ্চলের খুঁটিনাটি বিষয়ে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে পরিচিত হলে সেখানকার পূর্ণ চিত্র পাওয়া যায়। তাই ভূগোল শিক্ষার ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। প্রথমত, ভূগোল একটি জীবনকেন্দ্রিক বিষয়। বিদ্যালয়ের সীমাবদ্ধ গণ্ডির মধ্যে ভূগোল শিক্ষা সম্ভব নয়। ভূগোল সম্পর্কিত অসংখ্য বিষয় জানতে হলে এবং এ সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান অর্জন করতে হলে দেশ-বিদেশের নানা স্থানে পর্যবেক্ষণ করার একান্ত প্রয়োজনীয়তা আছে। সুতরাং সঠিক ভৌগোলিক বিষয়ের ব্যাখ্যা অনুধাবন ও অনুশীলনী করতে হলে বিভিন্ন ভৌগোলিক তথ্যসমৃদ্ধ অঞ্চল পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন।

দ্বিতীয়ত, বাস্তব জ্ঞান আহরণের জন্য পর্যবেক্ষণ এক সার্থক মাধ্যম। ভূগোলের বিষয়বস্তুর পরিপূর্ণ জ্ঞান একমাত্র পর্যবেক্ষণের মাধ্যমেই অর্জিত হয়। পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে হাতেকলমে শিক্ষার সুযোগ আসে। ফলে বাস্তব অভিজ্ঞতা জন্মে। এই বাস্তব অভিজ্ঞতা ভূগোলের মতো বিমূর্ত এবং তথ্যবহুল বিষয়ের অনুশীলনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। পুঁথিগত শিক্ষায় ভূগোলের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায় না। কল্পনা অনেক সময় ভুল পথে চালিত করে। তাই ভূগোলের বিষয়বস্তু জানার জন্য চাই বাস্তব অভিজ্ঞতা। এই অভিজ্ঞতা পর্যবেক্ষণের ফলেই গড়ে ওঠে।

তৃতীয়ত, কোন একটি অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতির পূর্ণ বিবরণ, মাটির প্রকৃতি, নদ-নদীর গতি প্রকৃতি, কৃষি, খনি ও শিল্পের বিস্তৃত বিবরণ, লোকবসতি, অধিবাসীদের জীবন যাত্রা, প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে তাদের জীবনযাত্রার পারস্পরিক সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয়ের সঠিক পরিচয় লাভ করার জন্য সেই অঞ্চল পর্যবেক্ষণ করতে হবে। পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে উপরোক্ত বিষয়ের বিবরণ সংগ্রহ করতে পারলে ভৌগোলিক বিষয়ের বাস্তব পরিচয় পাওয়া যায়। একমাত্র পর্যবেক্ষণের মাধ্যমেই ভৌগোলিক বিষয়ের প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভ করা সম্ভব। এই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের মাধ্যমে শিক্ষা জীবন্ত ও আনন্দময় হয়ে ওঠে।

চতুর্থত, কোন বিষয়ে চাক্ষুস অভিজ্ঞতা অর্জন করলে যে জ্ঞান জন্মে, বই পড়ে সেই জ্ঞান আহরণ করা যায় না। পুঁথিসর্বস্ব জ্ঞান আর বাস্তব জ্ঞানের মধ্যে অনেক পার্থক্য। বই পড়ে কল্পনা করে কিছু জানা যায় বটে, তবে নিজের চোখে দেখে যে শেখা তার গভীরতা অনেক বেশি। তাই ভূগোলের মতো অমূল্য ও জটিল বিষয়কে জানার জন্য পর্যবেক্ষণের শিক্ষামূল্য অপরিসীম।

পঞ্চমত, ভূগোল একটি গতিশীল বিষয়। দেশের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভৌগোলিক অনেক বিষয়ের, যেমন—লোকবসতি, মানুষের জীবনযাত্রা, জলসেচ ব্যবস্থা, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতির পরিবর্তন সাধিত হয়। বইয়ে ছাপার অক্ষরে যে তথ্য পরিবেশিত হয় তা অনেক দিনের পুরাতন হতে পারে। তাই বই থেকে কোন এলাকার বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থার কথা পুরোপুরি নাও জানা যেতে পারে, কিন্তু সেই এলাকাটি যদি পর্যবেক্ষণ করে আসা যায় তাহলে সেখানকার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা জন্মে। অতীত ও বর্তমানের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে কোন কোন ভৌগোলিক বিষয় সক্রিয়ভাবে কাজ করেছে তার

অনুশীলন করা যাবে। আর তা থেকে এই উন্নয়নে ভৌগোলিক বিষয়ের অবদান সম্পর্কে জানতে বিশেষ সুবিধা হবে।

ষষ্ঠত, পর্যবেক্ষণ ভৌগোলিক বিষয়ের গূঢ় তত্ত্বগুলো চোখের সামনে তুলে ধরে এবং তার কার্যকারণ বুঝতে সহায়তা করে। তাই পর্যবেক্ষণের মাধ্যমেই ভৌগোলিক বিষয় অনুশীলনের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও যুক্তিপূর্ণ বিচারশক্তি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে গড়ে ওঠে বলে ভূগোল শিক্ষায় পর্যবেক্ষণের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আজ সর্বজনস্বীকৃত।

পর্যবেক্ষণকে কিভাবে শিক্ষার ক্ষেত্রে কাজে লাগানো যায়

(ক) শিক্ষার্থী কোন এলাকা পরিভ্রমণ করে সেখানকার পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করবে, শিক্ষক এ সম্পর্কে তাদের নানা তথ্য সরবরাহ করে সহায়তা করবেন। এলাকাটি যদি সমভূমি হয় তাহলে সমভূমির প্রকৃতি, কিভাবে সমভূমি গঠিত হয়, সমভূমির মাটি কি রকম হয় প্রভৃতি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে।

(খ) কোন নদ-নদী পর্যবেক্ষণের সময় প্রথমেই নদী কোন দিক থেকে বয়ে আসছে, নদীর গতি ও প্রকৃতি কিরূপ প্রভৃতি বিষয় শিক্ষার্থীদের প্রত্যক্ষভাবে বুঝিয়ে দেয়া হবে ; এ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ঐ এলাকার একটি নকশা বা মানচিত্র তৈরি করতে বলা হবে। মানচিত্রে বিষয়গুলোর অবস্থান নামসহ শিক্ষার্থীরা আঁকতে শিখবে। এর থেকে মানচিত্র সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের একটি বাস্তব অভিজ্ঞতা গড়ে উঠবে।

(গ) জলবায়ু পর্যবেক্ষণে শিক্ষার্থীরা যেমন উৎসাহিত হবে তেমনি জলবায়ুর উপাদান সম্বন্ধে তারা বাস্তব পরিচয় লাভ করবে। শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ের তাপমান যন্ত্র দেখে পর্যবেক্ষণ অঞ্চলের তাপের পরিমাপ, বিভিন্ন ঋতুতে তাপের প্রভেদ ও ঋতু পরিবর্তন সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা করে নিতে পারে। বায়ু তাপমান যন্ত্র দেখে সারা বছর কোন সময়ে বায়ুর তাপ কেমন থাকে সে সম্পর্কে ধারণা গড়ে তুলতে পারে। আবার বৃষ্টিমাপক যন্ত্রেও।

শিক্ষাভ্রমণের প্রয়োজনীয়তা : শ্রেণিকক্ষে প্রকৃত বিষয়ের অবর্তমানে ছবি, মডেল, স্কেচ, মানচিত্র প্রভৃতির উপস্থাপনা দ্বারা শিক্ষার্থীকে এই বিষয়ের ধারণা দেয়া হয়ে থাকে। কিন্তু শিক্ষার্থী যদি বাস্তব জিনিস বা বস্তু, প্রকৃত ঘটনা নিজে প্রত্যক্ষ করতে পারে, তবে যে শিক্ষালাভ হবে, তার মূল্য আরও বেশি, তার স্থায়িত্ব দীর্ঘদিনের। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক তরুনকুমার বলেন, "ভূগোল বিষয় পাঠে শিক্ষার্থীকে আগ্রহী করে তোলা বিদ্যালয়ের শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। কারণ ভ্রমণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে যত কার্যকরভাবে আগ্রহী করে তোলা সম্ভব, অন্য কোন পদ্ধতিতে সেরূপ সম্ভব নয়। সে ক্ষেত্রে ভৌগোলিক জ্ঞানলাভে ভ্রমণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তরুণ শিক্ষার্থীর

অফুরন্ত শক্তির আধার। চঞ্চলতা ও সক্রিয়তা তার বৈশিষ্ট্য। ভূগোল শিক্ষক তার সুষ্ঠু পরিচালনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর এই বৈশিষ্ট্যের সদ্ব্যবহার করতে পারেন।"

আধুনিক যুগে শিক্ষাবিদগণ স্বীকার করে নিয়েছেন যে, "শিক্ষামূলক ভ্রমণ শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের পরিপূরক হিসাবে বিবেচিত হওয়া দরকার। শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে সাধারণ আলোচনার মাধ্যমে যা শিখবে, তাকে প্রত্যক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের দ্বারা অনুবন্ধ রচনায় সচেষ্ট হতে হবে। অতএব ভৌগোলিক ভ্রমণ অথবা Field Trip-কে শ্রেণিকক্ষে ভূগোল পাঠের অঙ্গীভূত বিষয় হিসেবে গণ্য করা দরকার।"

ভূগোল শিক্ষাকে সাফল্যমণ্ডিত করে যিনি শ্রেণিতে শিক্ষা দিবেন তিনি হচ্ছেন ভূগোল শিক্ষক। "আমাদের দেশের বিদ্যালয়গুলোতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, মেধাবী এবং সুযোগ্য শিক্ষকের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। যে সকল শিক্ষক ভূগোল পড়িয়ে থাকেন, তাদের প্রায় শতকরা ৪৪ ভাগই তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে শ্রেণিতে ভূগোল পড়িয়ে থাকেন। এ সকল শিক্ষকগণ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকগণ কর্তৃক নির্দেশিত হয়ে ভূগোল পড়ান যদিও তাদের যথেষ্ট ধারণা ভূগোল সম্পর্কে নেই। ফলে বিদ্যালয়গুলোতে ভূগোল বিষয়টি খুব অবহেলার সঙ্গে পড়ান হয়। ভূগোল শিক্ষার জন্য শিক্ষা ভ্রমণ কিংবা ফিল্ড ট্রিপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অথচ নানাবিধ কারণে শতকরা ৯৮ ভাগ বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা এ সুযোগ পায় না।"

ভ্রমণের মাধ্যমে প্রাকৃতিক ভূগোল পাঠ : প্রাকৃতিক ভূগোলের আলোচনা অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীর নিকট নীরস ও অর্থহীন হয়ে শুধু মুখস্থ বিদ্যায় পর্যবসিত হয়। তার কারণ বাস্তব অবস্থার সঙ্গে অর্জিত জ্ঞানের সম্পর্ককরণের অভাব। যে শিক্ষার্থী কোন দিন পার্বত্য অঞ্চলে যায় নি, অথবা যে কোন দিন পাহাড় চোখে দেখে নি, তাকে যতই পাহাড়ের ছবি, মডেল ইত্যাদির সাহায্যে ভৌগোলিক ধারণা দেওয়া হোক না কেন, তার যথার্থ শিক্ষালাভ হওয়া কঠিন। বিষয়টি অনেক শিক্ষার্থীর নিকট নীরস হওয়ায় স্বত:স্ফূর্ত আগ্রহ জন্মায় না। এখন যদি সেরূপ শিক্ষার্থীকে শ্রেণিকক্ষের আলোচনার শেষে কোন পার্বত্য এলাকায় নিয়ে যাওয়া যায় তবে চাক্ষুষ পরিচয়ে তার শিক্ষা সার্থকতা লাভ করবে। শিক্ষার্থী সম্পর্কিত করতে পারবে তার তাত্ত্বিক ধারণার সঙ্গে বাস্তব জ্ঞানের। পর্বত আলোচনার বিভিন্ন দিক রয়েছে। গাঠনিক ক্ষেত্রে কোনটি ভঙ্গিল জাতীয় অর্থাৎ নানা রকম ভাঁজ দেখা যায়, কোনটি বা স্তূপ, কোনটি গম্বুজ ইত্যাদি। পাহাড়টি কি ধরনের শিলাস্তর দ্বারা গঠিত, ঢাল কিরূপ, উদ্ভিদ দ্বারা আবৃত কিনা?

বৃষ্টির পরিমাপ অনুশীলন করে বৃষ্টিপাত সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জন করতে পারে। এই বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ করতে শিক্ষার্থীরা উৎসাহ পায় এবং ভূগোল শিক্ষায় তাদের আগ্রহ জেগে ওঠে। এই বাস্তব অভিজ্ঞতা তাদের পরবর্তীকালে ভূগোলের জটিল বিষয়বস্তু সম্পর্কে উপলব্ধি করতে সহায়তা করে।

(ঘ) কোন অঞ্চলের গাছপালা দেখে জলবায়ুর সঙ্গে স্বাভাবিক উদ্ভিদের সম্পর্কের কথা শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারে। লোকবসতি কিভাবে বনভূমি ধ্বংস করে, বনভূমি মানুষের কিভাবে উপকার করে, উপযুক্ত সময়ে সে কথাও শিক্ষার্থীদের জানিয়ে দিতে হবে।

(ঙ) পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বিভিন্ন উৎপন্ন দ্রব্য, কৃষিকার্য সম্পর্কে প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটে শিল্প, কল-কারখানা বা কুটিরশিল্প সম্বন্ধেও শিক্ষার্থীরা বাস্তব জ্ঞান লাভ করে। বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে বিশেষ বিশেষ শিল্প গড়ে ওঠার কারণ সম্পর্কে আলোচনা করলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিচার বুদ্ধি দিয়ে ভৌগোলিক কারণগুলো বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা সৃষ্টি হয়। এইভাবে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ভূগোলের মৌলিক বিষয় সম্বন্ধে শিক্ষার্থীরা বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করে। ভূগোলের বিষয়বস্তু তাদের কাছে পরিচিত হয় এবং বৃহত্তর ভৌগোলিক পরিবেশ সম্পর্কে ধারণা জন্মায় ও কল্পনা শক্তি বৃদ্ধি পায়।

(চ) পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিকে কার্যকরী করে তুলতে হলে আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে, তার সঙ্গে স্থানীয় ভূগোল আলোচনা ও ভৌগোলিক ভ্রমণ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বহির্বিভাগীয় কাজের সঙ্গে শ্রেণিকক্ষের পাঠদান কার্যের সম্পর্ক এরূপ পদ্ধতির সার্থক রূপায়ন সম্ভব। বৃহত্তর পরিবেশে সামাজিক ও অন্যান্য প্রক্রিয়া যে কার্যকরী হচ্ছে, তার স্বরূপ উপলব্ধি করা তরুণ শিক্ষার্থীর পক্ষে অনেক ক্ষেত্রে সম্ভবপর নাও হতে পারে।

২.৭ ভূগোল শিক্ষণে শিক্ষামূলক ভ্রমণ পদ্ধতি

শিক্ষাক্ষেত্রেও ভূগোল একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ যে কোন ব্যক্তির পক্ষে তার অন্তর্নিহিত সত্তার বিকাশের জন্য ভূগোলের জ্ঞান প্রয়োজন। ভূগোল শিক্ষার জন্য শিক্ষা ভ্রমণ কিংবা ফিল্ডট্রিপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভূগোলের আলোচনার পরিধি ব্যাপক। দৃশ্যমান বস্তু বা স্থানের খুঁটিনাটি তথ্য শিক্ষার্থীর আহরণ করা প্রয়োজন। বিজ্ঞানের অপরাপর শাখায় আলোচনা ও পরীক্ষা নিরীক্ষা প্রয়োগশালায় সম্ভব হলেও ভূগোল বিষয় চর্চার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ঘটে। গোটা পৃথিবীই যেন ভূগোলের প্রয়োগশালা। খুঁটিনাটি ঘটনা পর্যবেক্ষণ, বাস্তব পরিবেশ পর্যালোচনা ব্যতিরেকে ভূগোল আলোচনা অপূর্ণ থেকে যায়। সত্যিকারের ভৌগোলিক ধারণা গঠনে সহায়তা করতে হলে শিক্ষার্থীকে বিদ্যালয় কক্ষের বাইরে নিয়ে যেতে হবে। তা না হলে যতই আধুনিক পদ্ধতি অবলম্বন করা হোক না কেন, যতই ভাল সরঞ্জাম থাক না কেন, সত্যিকারের ভৌগোলিক ধারণা

লাভে শিক্ষার্থী ব্যর্থ হতে বাধ্য। পঞ্চ–ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে সত্যিকারের শিক্ষালাভ হয়। আবার এই পঞ্চ–ইন্দ্রিয়কে সক্রিয় রাখতে হলে শুধু শ্রেণিকক্ষের পাঠদান পর্যাপ্ত নয়। বাইরের ঘটনাবলি চোখে দেখে সম্ভাব্য ক্ষেত্রে নাড়াচাড়া করে সক্রিয়তার মাধ্যমে শিক্ষার্থী ভূগোল পাঠে অগ্রসর হবে।

শিক্ষা ভ্রমণের প্রয়োজনীয়তা : শ্রেণিকক্ষে প্রকৃত বিষয়ের অবর্তমানে ছবি, মডেল, স্কেচ, মানচিত্র প্রভৃতির উপস্থাপনা দ্বারা শিক্ষার্থীকে এই বিষয়ের ধারণা দেয়া হয়ে থাকে। কিন্তু শিক্ষার্থী যদি বাস্তব জিনিস বা বস্তু, প্রকৃত ঘটনা নিজে প্রত্যক্ষ করতে পারে, তবে যে শিক্ষালাভ হবে, তার মূল্য আরও বেশি, তার স্থায়িত্ব হবে দীর্ঘদিনের। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক তরুণকুমার বলেন, "ভূগোল বিষয় পাঠে শিক্ষার্থীকে আগ্রহী করে তোলা বিদ্যালয়ের শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। কারণ ভ্রমণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে যত কার্যকরভাবে আগ্রহী করে তোলা সম্ভব, অন্য কোন পদ্ধতিতে সেরূপ সম্ভব নয়। সে ক্ষেত্রে ভৌগোলিক জ্ঞানলাভে ভ্রমণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তরুণ শিক্ষার্থীরা অফুরন্ত শক্তির আধার। চঞ্চলতা ও সক্রিয়তা তার বৈশিষ্ট্য। ভূগোল শিক্ষক তার সুষ্ঠু পরিচালনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর এই বৈশিষ্ট্যের সদ্ব্যবহার করতে পারেন।"

আধুনিক যুগে শিক্ষাবিদগণ স্বীকার করে নিয়েছেন যে, "শিক্ষামূলক ভ্রমণ শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের পরিপূরক হিসাবে বিবেচিত হওয়া দরকার। শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে সাধারণ আলোচনার মাধ্যমে যা শিখবে, তাকে প্রত্যক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের দ্বারা অনুবন্ধ রচনায় সচেষ্ট হতে হবে। অতএব ভৌগোলিক ভ্রমণ অথবা Field Trip–কে শ্রেণিকক্ষে ভূগোল পাঠের অঙ্গীভূত বিষয় হিসেবে গণ্য করা দরকার।"

ভূগোল শিক্ষাকে সাফল্যমণ্ডিত করে যিনি শ্রেণিতে শিক্ষা দিবেন তিনি হচ্ছেন ভূগোল শিক্ষক। "আমাদের দেশের বিদ্যালয়গুলোতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, মেধাবী এবং সুযোগ্য শিক্ষকের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। যে সকল শিক্ষক ভূগোল পড়িয়ে থাকেন, তাদের প্রায় শতকরা ৪৪ ভাগই তাদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে শ্রেণিতে ভূগোল পড়িয়ে থাকেন। এ সকল শিক্ষকগণ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকগণ কর্তৃক নির্দেশিত হয়ে ভূগোল পড়ান যদিও তাদের যথেষ্ট ধারণা ভূগোল সম্পর্কে নেই। ফলে বিদ্যালয়গুলোতে ভূগোল বিষয়টি খুব অবহেলার সাথে পড়ান হয়। ভূগোল শিক্ষার জন্য শিক্ষা ভ্রমণ কিংবা ফিল্ড ট্রিপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অথচ নানাবিধ কারণে শতকরা ৯৮ ভাগ বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা এ সুযোগ পায় না।"

ভ্রমণের মাধ্যমে প্রাকৃতিক ভূগোল পাঠ : প্রাকৃতিক ভূগোলের আলোচনা অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীর নিকট নীরস ও অর্থহীন হয়ে শুধু মুখস্ত বিদ্যায় পর্যবেসিত হয়। তার কারণ বাস্তব অবস্থার সঙ্গে অর্জিত জ্ঞানের সম্পর্ককরণের অভাব। যে শিক্ষার্থী কোন দিন পার্বত্য অঞ্চলে যায় নি, অথবা যে কোন দিন পাহাড় চোখে দেখে নি, তাকে যতই পাহাড়ের ছবি, মডেল ইত্যাদির সাহায্যে ভৌগোলিক ধারণা দেয়া হোক না কেন, তার যথার্থ শিক্ষালাভ হওয়া কঠিন। বিষয়টি

অনেক শিক্ষার্থীর নিকট নিরস হওয়ায় স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ জন্মায় না। এখন যদি সেরূপ শিক্ষার্থীকে শ্রেণিকক্ষের আলোচনার শেষে কোন পার্বত্য এলাকায় নিয়ে যাওয়া যায় তবে চাক্ষুষ পরিচয়ে তার শিক্ষা সার্থকতা লাভ করবে। শিক্ষার্থী সম্পর্কিত করতে পারবে তার তাত্ত্বিক ধারণার সঙ্গে বস্তুর জ্ঞানের। পর্বত আলোচনার বিভিন্ন দিক রয়েছে। গাঠনিক ক্ষেত্রে কোনটি ভঙ্গিল জাতীয় অর্থাৎ নানা রকম ভাঁজ দেখা যায়, কোনটি বা স্তূপ, কোনটি শঙ্কু আকৃতি, কোনটি গম্বুজ ইত্যাদি পাহাড়টি কি ধরনের শিলাস্তর দ্বারা গঠিত, ঢাল কিরূপ, উদ্ভিদ দ্বারা আবৃত কিনা, জনবসতি কিরূপ প্রভৃতি বহু তথ্য শিক্ষার্থীর দৃষ্টিগোচরে আনা প্রয়োজন। অনুরূপভাবে প্রাকৃতিক ভূগোলের অন্যান্য ক্ষেত্রে যথা মালভূমি, মরুভূমি, নিম্নভূমি, সমুদ্র-উপকূল, নদ-নদী পর্যালোচনা একইভাবে শিক্ষার্থীর ধারণা সুস্পষ্ট করতে শিক্ষক মহাশয় ভ্রমণের মাধ্যমে সচেষ্ট হতে পাতেন। নদনদীর পর্যালোচনায় একটু সতর্ক দৃষ্টি দিলে অনায়াসে ও স্বল্প অর্থ ব্যয়ে শিক্ষক কার্যকরভাবে শিক্ষার্থীকে শেখাতে পারেন।

আবহাওয়া ও জলবায়ু সম্পর্কিত ধারণা দিতে হলে শিক্ষার্থীদের স্থানীয় আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। শিক্ষার্থীদের সেখানে নিয়ে গেলে প্রভূত উপকার হবে এবং অনেক নতুন তথ্যের সঙ্গে তারা পরিচিত হবে।

ভ্রমণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ভূগোল পাঠ : অর্থনৈতিক ভূগোল আলোচনার ক্ষেত্রেও প্রাকৃতিক ভূগোলের মতো একই রূপ পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে। শহরে তরুণ শিক্ষার্থী যে তার নিজস্ব বসবাসের গণ্ডীর বাইরে কোনদিন যায় নি, তার নিকট কৃষিজাত উৎপন্নদ্রব্যের যতই তাত্ত্বিক আলোচনা করা ও ব্যাখ্যা দেওয়া যাক না কেন, অবশেষে হয়তো এরূপ বিশ্বাস জন্মাবে 'ধান গাছের কাঠে তক্তা হয়।' নিজ নিজ কৃষি খামারে শিক্ষার্থীদের নিয়ে গেলে কৃষি সম্বন্ধীয় অনেক ধারণাই সুস্পষ্ট হবে। শিক্ষার্থী জানবে পাটের চাষ কিরূপ জমিতে কোন সময় করতে হয়, বীজ কিভাবে ছড়াতে হয়, পাটের প্রকারভেদ আছে কি না, কোন প্রকার পাট ভালো, কিভাবে পাটগাছ পঁচানো হয় ও পাটের আঁশ আলাদা করা হয় ইত্যাদি। আবার ধানগাছ সম্বন্ধে শিক্ষার্থী বিভিন্ন তথ্য আহরণ করবে। যেমন বাংলাদেশে কত প্রকার ধান চাষ হয়, কোন প্রকার ধান কখন কিরূপ জমিতে চাষ হয়ে থাকে, কিরূপ জলসেচের প্রয়োজন, কি কি পদ্ধতিতে ধানের চাষ হয়, উচ্চ ফলনশীল ধানের বীজ কোন কোন জমিতে ফসলের উৎপাদন বাড়ানোর কি কি প্রচেষ্টা চলছে ইত্যাদি । গম চাষের প্রচলন আজকাল আমাদের দেশে খুবই বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু কোন প্রকার গম কোন সময় জন্মায়, কিরূপ মাটি, উত্তাপ, বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন, বাংলাদেশের কোন কোন জেলায় গমের চাষ বেশি হয় ইত্যাদি বহু প্রশ্নের সঠিক উত্তরদানে অনেকেই অপারগ। অপরাধ তাদের ঘাড়ে চাপালেই চলবে না। শিক্ষক হিসাবে আমাদেরও কিছু করণীয় আছে। বিভিন্ন কৃষি খামারে উৎপাদিত ফসল সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের অবহিত করানো অবশ্যই কর্তব্য। গ্রামাঞ্চলে

শিক্ষার্থীরা এ ব্যাপারে কিছুটা অগ্রণী। কিন্তু তারা আবার শিল্প দ্রব্য, খনিজ দ্রব্য, ডক বন্দরের কাজকর্ম ইত্যাদি প্রসঙ্গে শহরাঞ্চলের শিক্ষার্থীর তুলনায় পশ্চাদপদ।

কলকারখানায় যে সব শিল্প দ্রব্য উৎপাদিত হয় সে সম্বন্ধে শিক্ষার্থীকে সঠিক ধারণা দেওয়া প্রয়োজন। এ কারণেই তাদের শিল্পাঞ্চলগুলো পরিভ্রমণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

ভ্রমণের মাধ্যমে মানবিক ভূগোল পাঠ : মানবিক ভূগোল আলোচনায় শহর ও গ্রামাঞ্চলের ভিন্ন পরিবেশ, মানুষের পেশা, যানবাহন চলাচল, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে শিক্ষার্থীকে ভ্রমণের মাধ্যমে সঠিক ধারণা দেয়া সম্ভব । গ্রামাঞ্চল পরিভ্রমণকালে শিক্ষার্থীরা জানতে সচেষ্ট হবে সেখানকার জনবসতি সম্বন্ধে। আমাদের দেশে শতকরা ৭০ ভাগ লোকই গ্রামে বাস করে।। তাই গ্রামের জনসংখ্যা শহরের তুলনায় বেশি। গ্রামের বাড়ি–ঘরের বৈশিষ্ট্য কিরূপ, কি ধরনের মাল মসলা দিয়ে তৈরি, গ্রামগুলো গায়ে গায়ে লাগানো না ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত ইত্যাদি বিষয়গুলো শিক্ষার্থীর নজরে আনা দরকার।

আবার শহরের জনবসতির বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন শহরে পাকা বাড়ির সংখ্যাই বেশি। বাড়িগুলো গায়ে গায়ে লাগা, লোকসংখ্যা অত্যধিক, ফাঁকা মাঠ বা খোলা জায়গার একান্তই অভাব।

যানবাহন চলাচলের চিত্রটি শিক্ষার্থীর সম্মুখে প্রথমে শ্রেণিকক্ষে মানচিত্র স্কেচম্যাপ ও মডেলের সাহায্যে তুলে ধরা প্রয়োজন। তারপর ভ্রমণকালে তারা নিজেরাই উপলব্ধি করতে পারবে কিরূপ যানবাহনে তারা চলাচল করছে কোন কোন স্থান এক একটি মুখ্য যোগাযোগ কেন্দ্রের সৃষ্টি করেছে ইত্যাদি। তারা আরও জানবে, যানবাহনের দ্রুতগামিতার জন্যও সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থা রক্ষিত হওয়ায় কি কি সুবিধা হয়েছে। এক স্থানের উৎপাদিত দ্রব্য অন্যস্থানে কিভাবে দ্রুত পাঠানো হয় এবং এর ফলে কি কি সুবিধা হয়েছে, কোন কোন দ্রব্য পচনশীল এবং কতখানি প্রভৃতি। এভাবে প্রাকৃতিক, অর্থনৈতিক, আঞ্চলিক ও মানবিক ভূগোলের বিভিন্ন বিষয় শিক্ষামূলক ভ্রমণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর নিকট পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করা সম্ভব। কেন না এর শিক্ষাগত মূল্য অপরিসীম।

শিক্ষাভ্রমণের পরিকল্পনা ও সংগঠন : Field Trip বা Excursion শ্রেণিশিক্ষার অঙ্গ হিসাবে অবশ্যই বিবেচিত হওয়া প্রয়োজন। সে ক্ষেত্রে শিক্ষকের কর্তব্য হবে প্রথমেই শ্রেণিকক্ষে পাঠ্যসূচিটির অন্তর্গত বিষয়টি সম্বন্ধে মোটামুটি ব্যাখ্যা দেয়া ও ধারণা সৃষ্টিতে সহায়তা করা। তারপর উক্ত বিষয় পাঠে সহায়ক এরূপ স্থান নির্বাচন করা। স্থান নির্বাচনের প্রসঙ্গটি শিক্ষকের সুবিবেচনার সঙ্গে ভেবে রাখা দরকার। বর্তমান দশম শ্রেণির পাঠ্যসূচিতে আঞ্চলিক ভিত্তিতে পড়ানোর রীতি গৃহীত হয়েছে। সে ক্ষেত্রে শিক্ষকের কর্তব্য হবে এমন স্থান নির্বাচন করা, যেখান থেকে শিক্ষার্থীগণ সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়।

স্থান নির্বাচনের পর যে প্রশ্নটি শিক্ষককে ভাবতে হবে, তাহল দল ঠিক করা। এক একটি শ্রেণিকে নিয়ে আলাদাভাবে দল গঠন করা যেতে পারে। ভ্রমণ কতদিনের জন্য অনুষ্ঠিত হবে এবং এর দুরত্ব কতখানি হবে, তা বিদ্যালয়ের সময় নির্ঘণ্টের উপর নির্ভর করে। সাধারণত গ্রীষ্মবকাশ ও শারদাবকাশে ভ্রমণ অনুষ্ঠিত হলে বেশি সময় পাওয়া যায়।

শিক্ষা ভ্রমণকে সার্থক করতে হলে যেদিকগুলো বিবেচনায় আনতে হয়

(১) সাংগঠনিক দায়িত্ব মুখ্যত ভূগোল শিক্ষকের উপর ন্যস্ত থাকবে। অবশ্য প্রয়োজনমতে তিনি বিদ্যালয়ের অন্যান্য সহকর্মীর সাহায্য নিবেন।

(২) যে স্থানটি ভ্রমণের জন্য নির্দিষ্ট হবে, সেখানকার যোগাযোগ কিরূপ ও সহজভাবে কোন পথে যাওয়া হবে ইত্যাদি পূর্বেই শিক্ষক মহাশয় স্থির করবেন।

(৩) ভ্রমণকালে থাকবার ব্যবস্থা পূর্বেই শিক্ষকের করা প্রয়োজন। অতিথিশালা, হোটেল, বাংলো বা কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের একাংশ এবং প্রয়োজনবোধে তাঁবু খাটিয়ে থাকার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

(৪) সমুদয় কার্য পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত অর্থের সংস্থান প্রয়োজন।

(৫) বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সহৃদয়তা, অভিভাবকের দৃষ্টিভঙ্গী অনুকূল করে শিক্ষামূলক ভ্রমণ কার্যকর করার পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন।

ভ্রমণের সমস্যাবলি : শিক্ষামূলক ভ্রমণ ভূগোল শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে অপরিহার্য, এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এরূপ ভ্রমণ অনুষ্ঠান বহুবিধ সমস্যার সঙ্গে জড়িত

সমস্যাগুলো নিম্নরূপ :

(১) যে সমস্যা প্রকট হয়ে দাঁড়ায় তা হল সময়। আমাদের দেশের বিদ্যালয়গুলোতে যে সময় নির্ঘণ্ট বর্তমান, তাতে সপ্তাহে প্রতিদিন ৩৫ থেকে ৫০ মিনিটের বেশি একটি করে পিরিয়ড এক একটি শ্রেণিতে থাকে না। ঐ নির্দিষ্ট সময়সূচির মধ্যে নির্ধারিত পাঠ্যসূচি সমাপ্ত করা শিক্ষকের কর্তব্য। অথচ ভ্রমণ অনুষ্ঠান কার্যকর করতে হলে ঐ সময় পর্যাপ্ত নয়। তাছাড়া অনেক ক্ষেত্রেই একটি মাত্র ভ্রমণ অনুষ্ঠান শিক্ষার্থীদের পক্ষে পর্যাপ্ত নাও হতে পারে। গ্রীষ্মাবকাশে ভ্রমণ অনুষ্ঠান আবহাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সব স্থানে অনুকূল নয়।

(২) পর্যাপ্ত অর্থের সমস্যা। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অর্থভাণ্ডারের স্বল্পতা, অভিভাবকের উদাসীনতা ও শিক্ষা পরিচালকবর্গের অনীহা অনেক ক্ষেত্রেই ভ্রমণের আশা অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে

অনেক বিদ্যালয়েই যোগ্য শিক্ষকের প্রেরণা ও সদিচ্ছা অর্থের অভাবে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। সাধারণ দরিদ্র অভিভাবকের নিকট ভ্রমণ, যা যতই শিক্ষামূলক হোক, বিলাসিতারই নামান্তর।

(৩) আমাদের বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষক শিক্ষার্থীর অনুপাত সুসামঞ্জস্যপূর্ণ না হওয়ায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিক্ষকের পক্ষে ব্যক্তিগত যত্ন নেওয়া সম্ভব হয় না। বিদ্যালয়ে উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব ভূগোল শিক্ষায় ভ্রমণের ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

(৪) বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, অভিভাবক ও পরিচালকবৃন্দের অনীহা অনেক ক্ষেত্রেই ভ্রমণকে শিক্ষা কর্মসূচির আওতায় আনা সম্ভব হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে ভূগোল শিক্ষককে সচেতন হতে হবে। কয়েকটি ক্ষেত্রে Demonstration-এর মাধ্যমে এ সত্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে যে, ভ্রমণ শিক্ষার্থীর অনেক কিছু নতুন তথ্যের বা ধারণার সৃষ্টিতে সহায়তা করে। ভূগোল শিক্ষকের কর্তব্যনিষ্ঠা, সততা ও কর্মযোগ্যতার দ্বারা প্রতিবন্ধককারী শক্তিগুলোর বিরূপ মানসিকতার পরিবর্তন ঘটানো যেতে পারে।

শিক্ষাভ্রমণকে ফলপ্রসূ ও শিক্ষামূলক করে তোলার শর্তাবলি

ভূগোল শিক্ষার ক্ষেত্রে Field Trip বা Excursion কার্যকর করে তোলার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখা অবশ্য কর্তব্য।

(১) বিদ্যালয়ে ভূগোল শিক্ষার পাঠ্যসূচিটি পরিবর্তনশীল হবে এবং স্থানীয় বৈশিষ্ট্যের কথা স্মরণ রেখে শিক্ষক প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তন ও পরিবর্ধনে সচেষ্ট থাকবেন। স্বভাবতই বিদ্যালয়ের সময়সূচিতে বহির্বিভাগীয় কাজের জন্য যথেষ্ট সংস্থান থাকবে।

(২) বহিঃপরীক্ষার মাপকাঠিই শিক্ষার্থীর সফলতার একমাত্র পন্থা হিসাবে বিবেচিত না হয়ে বিদ্যালয় কর্তৃক অনুষ্ঠিত কার্যাবলির উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপিত হবে। এজন্য মোট নম্বরের শতকরা পাঁচভাগ নির্দিষ্ট রাখা দরকার।

(৩) ভূগোল শিক্ষক বিদ্যালয়ের অব্যবহিত চারিপার্শ্বস্থ অঞ্চল হতে ভৌগোলিক তথ্য আহরণের সম্পর্কে সচেতন থাকবেন। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, বহু অর্থ ব্যয়, সময় নষ্ট, দূরবর্তী স্থানে ভ্রমণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করে শিক্ষার্থীদের যে ভৌগোলিক ধারণা দেয়া যায়, তার অর্ধেক শ্রম, অর্থ ও সময় ব্যয় করে বিদ্যালয়ের কাছাকাছি কোন স্থান থেকেই সেইরূপ ভৌগোলিক ধারণা লাভ করা যায়। কাজেই ভূগোল শিক্ষকের এ বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

(৪) শিক্ষামূলক ভ্রমণকে সফল করে তুলতে হলে পর্যাপ্ত অর্থের সংস্থান অবশ্যই থাকা প্রয়োজন। এজন্যে বিদ্যালয়ে একটি যৌথ অর্থভাণ্ডার শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সহযোগিতায় গঠন করা

যেতে পারে। পাক্ষিক, মাসিক বা বাৎসরিক দেয় চাঁদার মাধ্যমে এই অর্থভান্ডারটি পরিপুষ্ট থাকবে অবস্থা অনুযায়ী শিক্ষক মহাশয়কে খুঁজে বের করতে হবে কোন কোন দিক দিয়ে অর্থ সমাগম হতে পারে।

(৫) এরূপ ভ্রমণ বিদ্যালয়ের উচ্চ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের পক্ষে বিশেষ সহায়ক। কেন না, পরিবেশের বিশালতা উপলব্ধিতে সমস্যা খুঁজে বের করতে ও সমাধানে সচেষ্ট হতে মানসিক বিকাশ স্তরের পরিপক্বতা প্রয়োজন। অবশ্য নিম্ন শ্রেণির শিক্ষার্থীদের পক্ষেও ভ্রমণ ফলপ্রদ হতে পারে। সে ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করছে বিষয়টির প্রকৃতির উপর, শিক্ষক মহাশয়ের উপস্থাপনার এবং বিষয় পাঠের উদ্দেশ্যের উপর।

(৬) প্রতিটি ভ্রমণ অনুষ্ঠানের শেষে যাতে শিক্ষার্থীরা এককভাবে অথবা দলগতভাবে এক একটি প্রতিবেদন রচনা করে, সেদিকে শিক্ষকের অবশ্যই দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। প্রতিবেদন রচনায় তাদের ভৌগোলিক ধারণা কতটা গঠিত হল, তা ধরা পড়বে। প্রতিবেদনটির আসল উদ্দেশ্য হবে শিক্ষার্থীর তাত্ত্বিক ভৌগোলিক জ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগমূলক ব্যাখ্যা।

উপসংহার

আধুনিক যুগে ভূগোল পাঠে Excursion বা Field Trip এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও শিক্ষাগত মূল্যের কথা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। আমরা জানি যে, উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে এই বিষয়টির উপর বিশেষ প্রাধান্য দেয়া হয়ে থাকে। স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর শ্রেণির শিক্ষার্থীকে অবশ্যই Excursion-এ অংশগ্রহণ করতে হয়। প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে হয়, তার উপর নম্বর থাকে। কিন্তু বিদ্যালয় স্তরে এই বিষয়টির গুরুত্ব অবহেলিত। অথচ বিদ্যালয় স্তরে ভ্রমণ ব্যবস্থার মাধ্যমে জ্ঞানার্জনের সুযোগ থাকা উচিত।

নিঃসন্দেহে অর্থাভাব ভ্রমণের মাধ্যমে জ্ঞানার্জন প্রচেষ্টাকে ফলপ্রসূ করার পশ্চাতে মস্তবড় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। কলেজ ও উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের দেশে যেরূপ শিক্ষামূলক ভ্রমণের নিমিত্ত কিছু অর্থ মঞ্জুরির ব্যবস্থা রয়েছে, তদ্রূপ বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রেও অনুরূপ অর্থ মঞ্জুরি ব্যবস্থা অচিরেই প্রবর্তিত করা উচিত হবে। শিক্ষক, অভিভাবক, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষানুরাগীর সম্মিলিত প্রচেষ্টা শিক্ষামূলক ভ্রমণকে কার্যকর করে তুলতে পারে। শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য নিঃসন্দেহে সর্বাধিক। তাঁর উন্নত মনোভাব, পড়ার প্রতি একাগ্রতা ও শিক্ষার্থীর প্রতি স্নেহ যত্ন—এরূপ কার্যে ব্রতী হতে বিশেষভাবে সহায়ক এতে সন্দেহ নেই।

২.৮ ভূগোল শিক্ষণে রেডিও এবং টেলিভিশন

ভূমিকা

বিংশ শতকে রেডিও ও টেলিভিশন আমাদের দৈনন্দিন জীবনের এক অপরিহার্য বাস্তবতা। আমাদের শ্রুতি ও দৃষ্টি শক্তির সীমানায় রেডিও টেলিভিশন এনে দেয় বাইরের গোটা পৃথিবী। গণযোগাযোগের বিভিন্ন মাধ্যমের তুলনায় এ দু'টি মাধ্যমের বিশেষ কার্যকারিতা অবশ্যই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বস্তুতপক্ষে রেডিও, টেলিভিশন আমাদের শিক্ষাদাতা, স্কুল কলেজের বাইরে এ দু'টি প্রতিষ্ঠান যেন ব্যাপক শিক্ষাঙ্গণ। গণশিক্ষা বিস্তারে রেডিও, টেলিভিশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এদেশে যদিও ঘরে ঘরে এখন টেলিভিশন বিস্তার লাভ করে নি, তবে রেডিও এদেশের গ্রামেগঞ্জে জনপদে প্রায় প্রতিটি স্থানে ছড়িয়ে পড়ছে। তবে ইদানিং টেলিভিশনও ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে। অর্থাৎ এ দু'টি গণ মাধ্যম এখন দেশব্যাপী বিস্তার লাভ করে আরও বৃহত্তর ভূমিকা নেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

বর্তমানে বাংলাদেশ রেডিও ও টেলিভিশন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক উচ্চ শিক্ষার বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে ছাত্র–ছাত্রীদের জন্য বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রচার করে থাকে। এসব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ছাত্র–ছাত্রীরা শিক্ষার ক্ষেত্রে রেডিও ও টেলিভিশনের সঙ্গে এক নিবিড় যোগাযোগ অনুভব করে। তবে ছাত্র–ছাত্রীদের এ অনুষ্ঠান দেখা ও শোনার প্রতি আগ্রহ কতখানি তার উপরই নির্ভর করে অনুষ্ঠান প্রচারের সার্থকতা।

আমাদের দেশে বিদ্যালয়ে একটা পাঠ্যক্রম বিশেষ সময়ের মধ্যে শিক্ষা দেয়া হয়। কাজেই এই নিয়মিত সময়ের মধ্যে পর্যাপ্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভের অবকাশ কম। কিন্তু যদি শ্রেণিকক্ষের বাইরে অবসর বিনোদনের মাধ্যমে হৃদয়গ্রাহী করে কোন শিক্ষা অভিজ্ঞতা দেয়া যায় তবে সেটা হয় স্থায়ী ও ফলপ্রসূ এবং তা সবচেয়ে বেশি সম্ভব হয় বাংলাদেশ রেডিও ও টেলিভিশনের মাধ্যমে।

ভূগোল শিক্ষায় রেডিও টেলিভিশনের ভূমিকা : শিক্ষাক্ষেত্রে ভূগোল একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বস্তুতপক্ষে এই বিশ্বলোকের জ্ঞান চর্চার ইতিহাসে ভূগোলের বিশেষ স্থান রয়েছে। রেডিও টেলিভিশন ভূগোল শিক্ষায় একটিকার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। বিশেষ করে এক্ষেত্রে টেলিভিশনের স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ টেলিভিশন শুধু শ্রুতি মাধ্যম নয়, ইহা দৃষ্টি মাধ্যমও বটে। ভৌগোলিক দিক দিয়ে বিশ্বলোকের যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক অবস্থান, তারকালোকের বিচিত্র তথ্যরাজি, পাহাড়, নদী, সমুদ্র, আগ্নেয়গিরি, জলপ্রপাত, মরুভূমি, তুষারাচ্ছাদিত ভূমি, মালভূমি, উপত্যকা তথা যাবতীয় স্থান টেলিভিশনের মিনি পর্দায় উদ্ভাসিত করে ভূগোল শিক্ষাকে বিশেষভাবে জীবন্ত করে তোলা সম্ভব। শুধু বই পুস্তকের মাধ্যমে যে ভূগোলের জ্ঞান অর্জিত হয় তা নিতান্তই অসম্পূর্ণ। ক্লাসে পুঁথিগত যে বিদ্যা অর্জিত হচ্ছে, তার সঙ্গে চাক্ষুস পরিচয় না হলে সে শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। ধরা যাক, একটি ছাত্র বা ছাত্রী ক্লাসে আগ্নেয়গিরি কিংবা মরুভূমি সম্পর্কে বিস্তর পুঁথিগত জ্ঞান অর্জন করলো, কিন্তু এ দু'টোর কোন কিছুই সে প্রত্যক্ষ করলো না।

এর ফল দাঁড়াবে এই যে, দু'টো বিষয়েই তার অর্জিত জ্ঞান হবে ভাসাভাসা। অপরদিকে একজন ছাত্র-ছাত্রীর পক্ষে তার জ্ঞানের সম্পূর্ণতা সাধনের জন্য আগ্নেয়গিরি বা মরুভূমি দেখতে যাওয়া সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে একমাত্র সহায় হচ্ছে টেলিভিশন। টেলিভিশনের ছোট পর্দাটিতে যদি ফুটিয়ে তোলা হয় অগ্নুৎপাতের সচিত্র বিবরণ। মরুভূমির বিশাল বালুকারাশির বিস্তরণ, তবে মুহূর্তের মধ্যেই তার পক্ষে এ দু'টি ভৌগোলিক বিষয় সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব। অর্থাৎ যদি ভূগোল শিক্ষাকে পূর্ণাঙ্গ করে তুলতে টেলিভিশন নামক গণমাধ্যমটির কোন তুলনা নেই। রেডিওতে যদিও দৃষ্টিকে ব্যবহার করার সুযোগ নেই, তবুও বর্ণনার মধ্য দিয়েই ভূগোলের বিভিন্ন বিষয়কে জীবন্ত করে তুলে ধরে এই গণমাধ্যমটিও এক্ষেত্রে বিশাল ভূমিকা পালন করতে পারে।

রেডিও টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাদান : জনশিক্ষা বিস্তারে রেডিও টেলিভিশনের বৃহত্তর ভূমিকা নিঃসন্দেহে সর্বজন স্বীকৃত। তবে সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায়ও এই দুটি গণমাধ্যম যথার্থ ভূমিকা পালন করতে পারে। এই লক্ষ্যে রেডিও টেলিভিশন নির্দিষ্ট সময়ে বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষাদানের দায়িত্ব পালন করছে। রেডিও বাংলাদেশের স্কুল ব্রডকাস্টিং প্রোগ্রামের ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত অনুষ্ঠান প্রচার করছে। এ অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিষয় শিক্ষাদান করা হয়। দেশের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের খ্যাতনামা শিক্ষক শিক্ষিকাবৃন্দ এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাদান করেন। টেলিভিশনেও শিক্ষাঙ্গণ নামে একটি অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়। এতে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। বর্তমানে টেলিভিশন নিয়মিত উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষার শিক্ষার্থীদের জন্য প্রোগ্রাম করছে।

শিক্ষাদানে রেডিও টেলিভিশনের কার্যকারিতা : Robert E. de Kieffer শ্রেণিকক্ষে শিক্ষাদানে রেডিও টেলিভিশনের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। তাঁর মতে, "শ্রেণিকক্ষের কতিপয় শিক্ষাদানে রেডিও টেলিভিশন ওতপ্রোতভাবে জড়িত।" শিক্ষায় কিংবা শিক্ষাদানে রেডিও টেলিভিশন কতখানি উপযোগী এই বিষয়ে গবেষণা করে দেখা গেছে যে, প্রথাগতভাবে শিক্ষা পদ্ধতিতে রেডিও টেলিভিশন খুব উপযোগী। এ বিষয়ে কতগুলো জুনিয়র বিদ্যালয়ের উপর গবেষণা করে জানা যায় যে, সমকক্ষ দু'টি দলের মধ্যে যে দল রেডিও, টিভির উপর নির্ভর করে। চলতি শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান দেখে বা শুনে যতটুকু শিখে তারা শ্রেণিকক্ষে প্রথাগত পদ্ধতিতে শিক্ষাদান প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর চেয়ে বেশি লিখতে পারে।

বিদ্যালয়সমূহে রেডিও টিভি'র ব্যবহারের অর্থ এই নয় যে, স্থানীয় কেন্দ্রগুলো থেকে প্রচারিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানই শুধু শোনাতে বা দেখাতে হবে। শিক্ষার্থীদের নিজস্ব কর্মসূচি প্রচার ও শিক্ষার্থীদের এতে অংশগ্রহণ করারও সুযোগ এতে করে অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত করে তোলা যায়।

তিনি আরো বলেন, "ছাত্রদের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিভিন্ন মূল্যবোধ সৃষ্টিসহ অন্যান্য সুফলও লাভ করা যায়। এগুলো হলো :

(১) শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা ও মেধা পরিমাপ করা যায়।

(২) শিক্ষার্থীদের সুন্দর ও সাবলীল বক্তা হিসাবে গড়ে তোলা যায়।

(৩) বিভিন্ন শিক্ষার্থীদের মধ্যে সহযোগিতা ও দায়িত্ববোধ সৃষ্টি করা যায়।

(৪) শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা বৃদ্ধি করা যায়।

(৫) শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বৃদ্ধি করা যায়।

(৬) শিক্ষার্থীদের অনুষ্ঠান বা কর্মসূচি সংগঠনের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

(৭) শিক্ষার্থীদের ক্রমোন্নতির মনোভাব সৃষ্টি হয়।

(৮) শিক্ষার্থীরা অধ্যবসায়ী ও সময়ের সদ্ব্যবহার সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে।

আমেরিকায় জন জীবনে রেডিও, টিভি একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ মাধ্যম। হিসাব করে দেখা গেছে যে, প্রতিটি আমেরিকাবাসী গড়ে প্রতিদিন ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিট থেকে ১ ঘণ্টা ২০ মিনিট রেডিও টিভি অনুষ্ঠান দেখেন। তথ্য পরিবেশেন শিক্ষা ও চিত্তবিনোদনের জন্য রেডিও টিভি অনুষ্ঠান দেখেন। তথ্য পরিবেশন শিক্ষা ও চিত্ত বিনোদনের জন্য রেডিও–টিভি'র গুরুত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। আনুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য রেডিও, টিভিকে আরও উন্নত করতে হবে। বিদ্যালয় শিক্ষা কর্মসূচিকে আরো বাস্তবমুখী ও আকর্ষণীয় করার জন্য প্রতিটি প্রশাসক ও শিক্ষককে রেডিও টিভি'র শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

A-V Instruction and Materials গ্রন্থে James W. Brown, Richard B. Lewise, Fred F. Hardle বলেন, "শিক্ষকেরা টিভি, রেডিও এর কারিগরি উৎকর্ষতার সাহায্য গ্রহণে বেশি উৎসাহী, কেননা এসবের মধ্য দিয়ে তারা শ্রেণিকক্ষে শ্রবণ, দর্শন, পরিবেশকে ভালভাবে উপস্থাপিত করতে পারেন, এটি প্রশংসনীয় পদ্ধতি।"

রেডিও–টিভি কিংবা এ জাতীয় শ্রবণ, দর্শন, শিক্ষা উপকরণসমূহ বহু শিক্ষাগত লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করে। শিক্ষার্থীদের আকর্ষণ উদ্বুদ্ধকরণের ফলশ্রুতিতে এই শিক্ষা উপকরণের সাহায্যে বিষয়বস্তু সম্পর্কে আরও গভীরভাবে জ্ঞান লাভ করতে পারেন। এ ছাড়া শ্রবণ, দর্শন উপকরণসমূহ নিম্নোক্ত বিষয়সমূহে অবদান রাখতে পারে।

(১) শ্রবণের দক্ষতা বৃদ্ধি করা ও শ্রুত বিষয়ের মূল্যায়ন করতে পারা।

(২) দূর প্রবাসী বিশেষজ্ঞের মতামত পরিবেশন করে আলোচনা বা বিতর্কের পরিবেশ সৃষ্টি করা।

(৩) বক্তৃতা বা সংগীতের দক্ষতা এবং তার ব্যাখ্যার আদর্শরূপ উপস্থাপন করা যায়। তার অনুকরণে শিক্ষার্থীরা অনুপ্রাণিত হতে পারে।

(৪) বিষয় ও সমস্যার বিশ্লেষণে আকর্ষণীয় বৈচিত্র ও পরিবর্তন আনয়ন করা যেতে পারে।

(৫) বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বিষয় উপস্থাপন ও প্রকাশভঙ্গী অনুকরণের মাধ্যমে জ্ঞানার্জন করা যায়।

(৬) বিমূর্ত বা অদর্শনীয় কোন বিষয়ের কোন বাস্তব যুক্তিসঙ্গত সমাধান পাওয়া সম্ভবে থাকে।

(৭) অনুষ্ঠান উপস্থাপনার কৌশল বা টেকনোলজি সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করা যায়।

James S. Kinder তাঁর Audio Visual and Technique গ্রন্থে শ্রেণিকক্ষে রেডিও টিভি'র ব্যবহার ও শিক্ষাক্ষেত্রে রেডিও টিভির অবদান প্রসঙ্গে বলেছেন, রেডিও টিভি'র বহু শিক্ষাগত মূল্য রয়েছে। যেমন—

(১) তড়িৎ প্রয়োগ ও সহজলভ্যতা।

(২) সকল বিষয়ের আবেদন বৃদ্ধি।

(৩) শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিতকরণ।

(৪) জ্ঞানের ক্ষেত্রে নতুন দিগন্তের উন্মোচন।

(৫) বিশ্বাসযোগ্যতা ও বাস্তবতা আনয়ন।

(৬) জ্ঞান সঞ্চালন।

(৭) সৃজনশীলতায় উৎসাহদান।

(৮) পৃথকীকরণ শিক্ষাদান।

Willium B. Levenson এবং Edward Stasheff তাঁদের Teaching Through Radio and Television নামক গ্রন্থে শিক্ষাক্ষেত্রে রেডিও টিভির অবদানের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন যে, "রেডিও টিভি অনুষ্ঠান শিক্ষার্থীদের উৎসাহী এবং আগ্রহী করে তুলতে পারে। প্রত্যেক শিক্ষকই জানেন যে, শিক্ষাক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ জ্ঞান পরোক্ষ জ্ঞান থেকে অধিক কার্যকরী। তথাপি বর্তমান বিশ্বে ক্রমবর্ধমান সমস্যার জন্যে সেই প্রত্যক্ষ জ্ঞান দেওয়া সম্ভব হয় না। ফলে পরোক্ষ জ্ঞানের জন্য বিবিন্ন আনুষঙ্গিক উপকরণ ও শিক্ষকের মৌখিক ভাষ্যের উপর নির্ভর করতে হয়। এতে বহু ভুল শিক্ষার সম্ভাবনা থেকে যায়। রেডিও টিভির অনুষ্ঠান শিক্ষার্থীদের এ সমস্ত অসুবিধা থেকে রক্ষা করতে পারে।"

উদাহরণস্বরূপ—

কোন দেশের ভৌগোলিক অবস্থান জলবায়ু ও প্রাকৃতিক সম্পদের বিবরণ যদি শিক্ষক নিজের মুখে বর্ণনা না করে সরাসরি রেডিও টিভি'র মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের দেখতে বা শুনতে দেন তবে শিক্ষার্থীরা অনেকাংশে উপকৃত হবেন। আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, প্রাচীনপন্থী শিক্ষকগণ কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে ভুল শিক্ষা দিয়ে থাকেন। অধিকাংশ শিক্ষার্থী সেই শিক্ষা আদর্শ হিসাবে ধরে নেয়। কিন্তু যদি শিক্ষার্থীদের নিয়মিত রেডিও টিভি'র অনুষ্ঠান দেখতে দেওয়া হয় তবে শিক্ষার্থীরা বহুলাংশে সেইসব বিষয়ে সংস্কার মুক্ত হয়ে শিক্ষকের ত্রুটি ধরতে পারবে।

রেডিও টিভি'র ভূগোল শিক্ষা কেমন হওয়া উচিত?

আমাদের দেশে রেডিও টিভি'র ভূগোল শিক্ষার জন্য বিশেষ কোন ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। অথচ সত্যি কথা বলতে কি, ভূগোল শিক্ষার ক্ষেত্রেই এ দু'টি গণমাধ্যমের বিশেষ অবদার রাখার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু আমাদের রেডিও, টিভিতে এই সুযোগের যথাযথ ব্যবহার হচ্ছে না। মাধ্যমিক উচ্চ মাধমিক পর্যায়ে শুধু নয়। বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য ভূগোল শিক্ষার ব্যবস্থা করা দরকার। অনেকেরই ধারণা ভূগোল একটা নিরস বিষয়। ভূ–সংস্থানের বিভিন্ন বর্ণনা দিয়ে এই শাস্ত্রে নিরস বিবরণ দেয়া হয়। কিন্তু যদি উপযুক্ত শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করে বিভিন্ন প্রামাণ্য চিত্রের মাধ্যমে ভূগোল শিক্ষা প্রদান করা যায় তাহলে এই নিরসতা ঘুচে যাবে। এবং 'ভূগোল' ছাত্র–ছাত্রীদের কাছে একটি আকর্ষণীয় বিষয় হয়ে ধরা দিবে।

উন্নত বিশ্বে ভূগোল শিক্ষায় রেডিও-টিভি'র ভূমিকা

উন্নত বিশ্বে এই দু'টি গণমাধ্যম ভূগোল শিক্ষায় বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। সেখানে অধিকাংশ জ্ঞানই হাতে কলমে দেয়া হয়। চাক্ষুষ পরিচিতির ব্যবস্থা করা হয়। ভূগোল যে কেবল মানচিত্র সম্পর্কিত কোন বিষয় নয় এ দু'টি গণমাধ্যমই তা প্রমাণ করতে পারে। উন্নত বিশ্বে একথা যথার্থই প্রমাণিত হয়েছে। আমাদের দেশেও তদ্রূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে ভূগোল শিক্ষাকে বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ এবং অর্থবহ করে তোলা যেতে পারে। এ জন্য রেডিও টিভিকে কার্যকর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে। Alvin B. Roberts-এর মতে "অনেক বিশেষ উদ্দেশ্য ও সাধারণ উদ্দেশ্যকে রেডিও টিভি'র মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য ও উপযুক্তভাবে প্রচার করা সম্ভব। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে রেডিও টিভি'র ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।"

২.৯ ভূগোল কক্ষ ও তার সাজ-সরঞ্জাম

ভূগোল কক্ষের প্রয়োজনীয়তা : শিক্ষার বিভিন্ন মূলনীতি যেমন আগ্রহভিত্তিক, অভিজ্ঞতাভিত্তিক ও কর্মভিত্তিক মূল নীতিগুলো বাস্তবায়িত করার জন্য প্রয়োজন হয় উপযুক্ত

শিক্ষা উপকরণ এবং শিক্ষার পরিবেশ। সুতরাং প্রত্যেক বিষয়ের জন্য একটি পৃথক বিষয়-কক্ষ থাকা উচিত। বিশেষ করে ভূগোল শিক্ষার জন্য ও শিক্ষাদানের জন্য পৃথক ভূগোল কক্ষ থাকা অত্যাবশ্যকীয়। কেননা বর্তমান কালের ভূগোলের লক্ষ্য পৃথিবী ও বহির্বিশ্বের সব কিছুকে জানা, পরিবেশের সঙ্গে মানুষের পারস্পরিক সম্বন্ধের অনুশীলন করা। বর্তমানকালের ভূগোল প্রাচীনকালের ভূগোলের মতো 'Geography of Capes and Bays' নয়। বর্তমানকালের ভূগোলের কাজ হল ভবিষ্যৎ নাগরিককে এমনভাবে শিক্ষিত করে তোলা যাতে তারা পৃথিবী রঙ্গমঞ্চের সব স্থান সঠিকভাবে বুঝতে পারে এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাগুলো সম্যক উপলব্ধি করতে পারে। এ কথার প্রতিফলন আমরা জেমস ফেয়ারগ্রিভ এর এই উক্তি হতে পাই— "The function of Geography is to train the future citizens to imagine accurately the conditions of the great world stage and to help them to think sanely about political and social problems of the world around." তাই ভূগোল শিক্ষাদানের জন্য সুনির্দিষ্ট পরিবেশ দরকার এবং নির্দিষ্ট ও সুসজ্জিত ভূগোল কক্ষের মধ্যেই এই পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব। একটি আদর্শ ভূগোলকক্ষকে বলা যায় সমগ্র পৃথিবীর ক্ষুদ্র সংস্করণ (অর্থাৎ epitome of the world)।

ভূগোল শিক্ষাদানের জন্য ভূগোল কক্ষের প্রয়োজনীয়তা সর্বাধিক কেননা ভূগোলের বিষয় হল বিজ্ঞানভিত্তিক। ১৯৫০ সালে কানাডার মন্ট্রিল-এ ২৩টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। তারা সকলেই এই সেমিনারে একমত হয়েছিলেন যে, ভূগোল শিক্ষাদানের জন্য একটি পৃথক বিষয়-কক্ষ থাকা একান্ত প্রয়োজনীয়। তাঁরা বলেন যে, ভূগোলের জন্য একটি নির্দিষ্ট বিষয়-কক্ষ ছাড়া ভূগোল শিক্ষাদান মোটেই কার্যকরী হবে না। কারণ শিক্ষাদানকালে মানচিত্র, গ্লোব, মডেল, চার্ট প্রভৃতি বিষয়গুলো যদি ঠিকভাবে ব্যবহার না করা যায় বা উপস্থাপন না করা যায় তবে ভূগোল শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। অন্যদিকে প্রতিটি জিনিস একটি কক্ষে সঠিকভাবে সাজানো থাকলে শিক্ষাদানের সময় সেগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করা যায়। বিজ্ঞানের অন্যান্য বিষয় যেমন রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ের ক্ষেত্রে যেমন নানা রকম সাজ-সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয় তেমনি ভূগোলের ক্ষেত্রেও নানারকম যন্ত্রপাতি ও শিক্ষার উপকরণ একান্ত প্রয়োজন। মানচিত্র, গ্লোব, রেখাচিত্র, ছবি ও নক্সা, নানা বিষয়ের মডেল, নমুনা প্রভৃতি উপকরণগুলো ভূগোল শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। নির্দিষ্ট ভূগোলকক্ষ না থাকলে এসব সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ সুষ্ঠুভাবে রাখার ক্ষেত্রে অসুবিধা সৃষ্টি হয়। তাছাড়া শিক্ষাদানের সময় এগুলো এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যাওয়া খুবই অসুবিধাজনক। সুতরাং ভূগোল শিক্ষাদানকে সার্থক করে তুলতে হলে একটি সুসজ্জিত পৃথক ভূগোল কক্ষের অবশ্যই প্রয়োজন আছে।

ভূগোল কক্ষ : আমাদের দেশে কিছু উচ্চ বিদ্যালয় ব্যতীত নিম্নস্তরের বিদ্যালয়ে ভূগোল কক্ষ বড় একটা দেখা যায় না। পৃথক ভূগোল কক্ষ না থাকার অসুবিধাগুলো পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আরও যোগ করা যেতে পারে যে পৃথক ভূগোল কক্ষ না থাকলে জিনিসগুলো অর্থাৎ উপকরণগুলো টানা হেঁচড়া করে আনা নেওয়ার সময় নষ্ট হয়ে যায় এবং এক পর্যায়ে সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে যায়। তাছাড়া হাতের কাছে উপকরণগুলো না থাকলে এগুলো ব্যবহার করার স্পৃহাও জাগে না। আলাদা ভূগোল কক্ষ থাকলে এই অসুবিধাগুলো অতি সহজেই দূর করা যায়।

ভূগোল কক্ষ দুইরকমের হয়ে থাকে। শ্রেণিকক্ষরূপে ও ল্যাবরেটরিরূপে। ভূগোল কক্ষ ল্যাবরেটরিরূপে যখন ব্যবহৃত হয় তখন প্রধানত নিচের কাজগুলো সম্পাদিত হয়। (১) মানচিত্র, নকশা, রেখাচিত্র প্রভৃতি তৈরি করা (প্রদত্ত উপদেশ থেকে), (২) মডেল প্রস্তুত করা, (৩) বড় বড় মানচিত্র, নকশা ও চার্ট দেখে শেখা, (৪) সূর্য ও আকাশের অন্যান্য জ্যোতিষ্ক পর্যবেক্ষণ, (৫) ভূ-তত্ত্বমূলক, উদ্ভিদবিজ্ঞান সংক্রান্ত ও অর্থনৈতিক নমুনাসহ পর্যবেক্ষণ। আর শ্রেণিকক্ষরূপে যখন ভূগোল কক্ষ ব্যবহৃত হয় তখন নিচের জিনিসগুলো তাতে রাখা হয়।

(১) ভূগোলের পাঠ্যবই ও ভূচিত্রাবলিসমূহ।

(২) বড় দেয়াল মানচিত্র

(৩) ব্লাকবোর্ড

(৪) একটি বড় ব্লাকবোর্ড গ্লোব

(৫) ম্যাজিক লন্ঠন ও পর্দা

(৬) রেফারেন্স বই পুস্তকাদি

(৭) নানা ধরনের যন্ত্রপাতি যেমন স্টেরিওস্কোপ ও স্লাইডসমূহ।

ভূগোলকক্ষের অবস্থান : একটি আদর্শ ভূগোলকক্ষ সাধারণত বিদ্যালয়ের দক্ষিণ দিকে খোলামেলা জায়গায় হওয়া উচিত। কক্ষটিতে অনেকগুলো জানালা থাকার ব্যবস্থা থাকা উচিত। ভূগোলকক্ষের সামনে খোলা মাঠ থাকা উচিত যাতে সূর্যের অবস্থান ও আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ, সাধারণ Field work প্রভৃতি কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যায়।

ভূগোলকক্ষের আকার ও আয়তন : ভূগোলকক্ষের আকার ও আয়তন সাধারণ শ্রেণিকক্ষের চেয়ে বড় হবে যাতে শিক্ষার্থীরা সহজভাবে চলাফেরা করতে পারে। ত্রিশ জন শিক্ষার্থীর জন্য একটি আদর্শ ভূগোল কক্ষ হবে ৪০ ফুট × ৩০ ফুট। এর উচ্চতা হবে ১৮ ফুট। বিদ্যুতের ব্যবস্থা থাকা একান্ত প্রয়োজন। বিশেষ করে ট্রেসিং টেবিলে কাজ করার সময় অথবা এপিডায়াস্কোপ ব্যবহারের সময় বিদ্যুতের প্রয়োজন অপরিহার্য।

শিক্ষার্থীদের বসার জন্য টেবিল ও চেয়ারের ব্যবস্থা থাকবে। চারজন বসতে পারে এমন বেঞ্চও দেয়া যেতে পারে। এ ছাড়া ট্রেসিং টেবিল, সাধারণ টেবিল, আলমারি, শো-রুম, মডেল তৈরির সাজ-সরঞ্জামও থাকবে। জানালাগুলোতে কাল পর্দা টাঙানোর ব্যবস্থা থাকবে।

ভূগোল কক্ষের দেয়াল : ব্লাকবোর্ড, ম্যাজিক লন্ঠনের পর্দা, মানচিত্র এবং চিত্রাদির জন্য ভূগোলকক্ষের দেয়াল যতটা সম্ভব খোলা রাখতে হবে। দেয়ালে এক বা একাধিক গড়ানো (Sliding) ব্লাকবোর্ড থাকাও সুবিধাজনক। বোর্ডের কতকাংশ বর্গক্ষেত্র (২˝ বর্গসমূহ) বিভক্ত থাকবে। বর্গগুলো সূক্ষ্মভাবে দাগ কাটা থাকলে ভাল হয়।

ভূগোলকক্ষ কিভাবে সাজানো হবে :

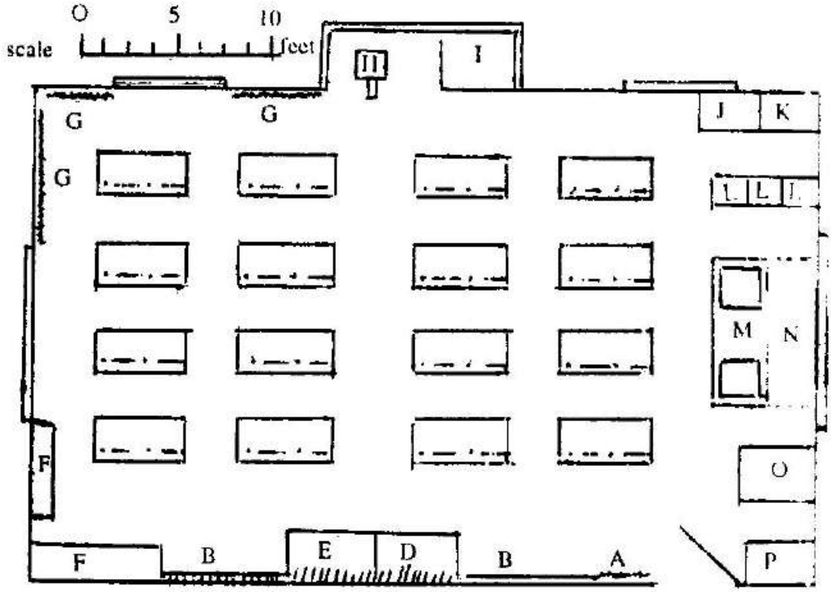

চিত্র : ২ একটি আদর্শ ভূগোল কক্ষ

(১) ভূগোল কক্ষের প্রধান নোটিশ বোর্ড টাঙ্গানো থাকবে দরজার পাশে।

(২) মানচিত্রসহ ব্ল্যাকবোর্ড দুটি স্ক্রিনের পাশে দেয়ালের সঙ্গে লাগানো থাকবে।

(৩) সাদা দেওয়াল—এটি একটি স্ক্রিন হিসাবে কাজ করে।

(৪) শো-কেস বা প্রদর্শনী বাক্স।

(৫) কৃষিজ দ্রব্যের প্রদর্শনী বাক্স।

(৬) বই রাখার কাঁচের আলমারি।

(৭) ছবির প্রদর্শনীসহ নোটিশ বোর্ড।

(৮) স্থানান্তরযোগ্য এপিডায়াস্কোপ বা প্রজেক্টর থাকবে।

(৯) সমতল পর্যবেক্ষণ বেঞ্চ এপিডায়া স্কোপের পাশে থাকবে।

(১০) মডেল তৈরির জন্য নানা উপকরণ ও স্লেট পাথরের টুকরো।

(১১) ঠাণ্ডা ও গরম পানির কলযুক্ত বেসিন।

(১২) ছোট ছবি, ম্যাজিক লন্ঠন, মানচিত্র, স্লাইড ফিল্ম রাখার জায়গা।

(১৩) শিক্ষকের টেবিল এর উপর থাকবে কাঁচের প্লেট ও ড্রয়ারযুক্ত কাপবোর্ড।

(১৪) মানচিত্র রাখার জন্য বড় কাপবোর্ড

(১৫) শিক্ষার উপকরণ রাখার জন্য তাকযুক্ত আলমারি।

(১৬) ভূগোলকক্ষের চার দেওয়ালে বিভিন্ন আবিষ্কারকদের ছবি।

ভূগোল কক্ষের অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি :

এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল মানচিত্র। মানচিত্র আঁকার জন্য নিম্নলিখিত জিনিসগুলো থাকবে।

(১) প্লেন টেবিল
(২) কম্পাস
(৩) স্কেল
(৪)লেড পেন্সিল ও রঙিন পেন্সিল
(৫) ড্রইং বোর্ড
(৬) ড্রইং কালি ও রঙ প্রভৃতি।

এ ছাড়া ভূগোল কক্ষে থাকবে গ্লোব। আবহাওয়ার যন্ত্রপাতিও থাকবে। যেমন—

(১) ফারেনহাইট তাপমান যন্ত্র
(২) সেন্টিগেড তাপমান যন্ত্র
(৩) ব্যারোমিটার বা চাপমান যন্ত্র
(৪) লঘিস্ট ও গরিষ্ঠ তাপমান যন্ত্র
(৫) বাতপতাকা

(৬) বৃষ্টিমাপক যন্ত্র

(৭) শুষ্ক ও আর্দ্র কুণ্ডযুক্ত হাইগ্রোমিটার।

এ ছাড়া ভূগোলকক্ষে একটি পাঠাগার ও একটি সংগ্রহশালার ব্যবস্থা রাখলে ভাল হয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে ভূগোলকক্ষ শিক্ষাদানের এক আদর্শ পরিবেশ সৃষ্টি করে। সুতরাং সঙ্গত কারণেই বলা হয়, "The Geography room is a workshop and its general atmosphere should be such as to stimulate the imagination and give inspiration to the pupil in a manner which is impossible when many subjects are taken in the same room."

২.১০ ভূগোল শিক্ষার সহায়ক উপকরণ ও তার শ্রেণিবিভাগ

শিক্ষা উপকরণ কি : যে উপকরণের সাহায্যে শিক্ষা নির্মাণ আনন্দদায়ক, কার্যকর ও ফলপ্রসূ হয় তাকে শিক্ষা উপকরণ বলে। ভূগোলপাঠে শিক্ষা উপকরণের ব্যবহার অপরিসীম গুরুত্ব বহন করে। যেহেতু ভূগোল পাঠের পরিধি ব্যাপক ও বিস্তৃত সেহেতু একমাত্র শিক্ষা সহায়ক উপকরণের মাধ্যমেই উপকরণ ব্যবহার এর পূর্বেই শিক্ষককে নিচের বিষয়গুলো অবশ্যই মনে রাখতে হবে।

(১) ভূগোলের সব ক্লাশে একই বিষয়বস্তুর জন্য একই রকম শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করা যাবে না। কারণ—

ক. শিক্ষার্থীদের বয়স

খ. শিক্ষার্থীদের পূর্ব অভিজ্ঞতা এবং

গ. স্কুলের অবস্থান (শহরে কিংবা গ্রামে)।

(২) শ্রেণিতে শিক্ষাদানের জন্য যে উপকরণ ব্যবহার করা হবে তা শিক্ষাদানের সাথে সম্পর্কযুক্ত কিনা অর্থাৎ উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়ক কিনা।

(৩) শিক্ষা উপকরণের সুপরিকল্পিত ব্যবহার শিক্ষাকে আনন্দদায়ক, কার্যকর ও ফলপ্রসূ করে। পক্ষান্তরে শিক্ষা উপকরণের অপরিকল্পিত ব্যবহার শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য অর্জনে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে বা শিক্ষণীয় বিষয় সম্পর্কে ভুল ধারণা দিতে পারে।" অতএব শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারের যাবতীয় কলাকৌশল আয়ত্ত করে নিতে হবে।

(৪) উপকরণ যথাসম্ভব বাস্তব, সুস্পষ্ট সঠিক ও জ্ঞানদায়ক হতে হবে। একসঙ্গে অনেকগুলো উপকরণের ব্যবহার করা উচিত নয়।

(৬) তৈরি নকশা, মানচিত্র ও অন্যান্য চিত্র প্রদর্শনের চেয়ে হাতে এঁকে দিতে পারলে শিক্ষাদান অধিক ফলপ্রসূ হবে।

(৭) ছবি ও নকশার আপেক্ষিক আয়তন ও আকৃতির দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।

(৮) উপকরণ যতদূর সম্ভব যেন সত্য ও সহজলভ্য হয়।

(৯) শিক্ষক উপকরণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে যথাসম্ভব কম সময় ব্যবহার করবেন।

২.১০.১ উপকরণের শ্রেণিবিভাগ

ভূগোল পাঠে শিক্ষা সহায়ক উপকরণসমূহকে নিচের ছকে শ্রেণিবিভাগ করে দেখান হল :

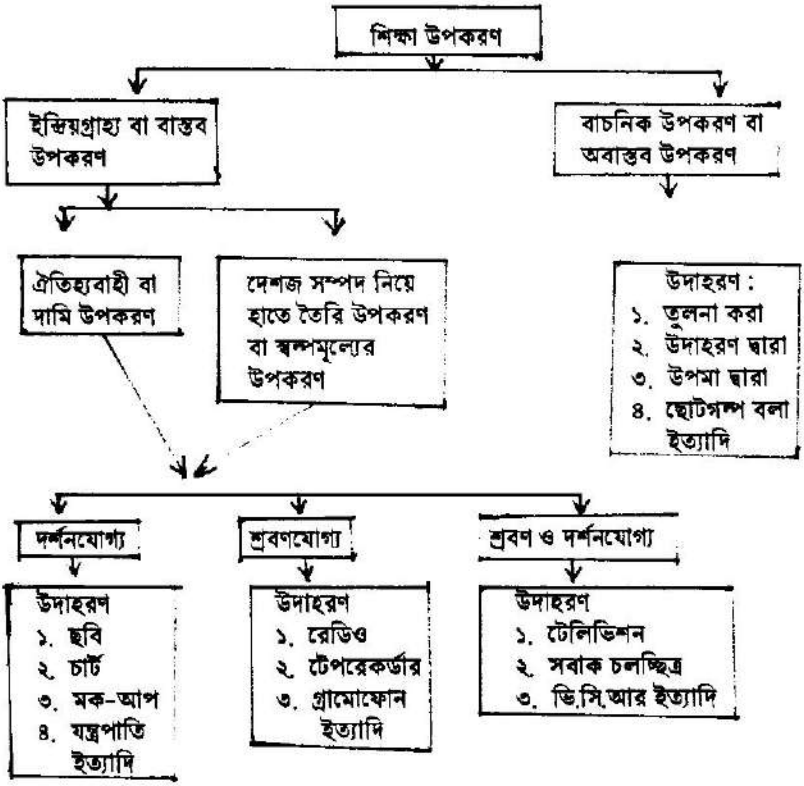

২.১০.২ স্বল্পমূল্যের শিক্ষা উপকরণ তৈরির বিবেচ্য বিষয়

স্বল্পমূল্যের দেশজ সম্পদ দিয়ে শিক্ষা উপকরণ হাতে তৈরি ও পরিকল্পনাকালে শিক্ষককে যে দিকগুলো অবশ্যই বিবেচনায় আনতে হবে তা হচ্ছে :

(১) কাদের জন্য উপকরণ ডিজাইন তৈরি করা হচ্ছে।

(২) শিক্ষার্থীদের বয়স, পূর্বজ্ঞান, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, শিক্ষা গ্রহণের ক্ষমতা ও ইচ্ছা আছে কিনা।

(৩) বিষয়বস্তুর দিক বিবেচনা করে নির্দিষ্ট পাঠে আদৌ শিক্ষা উপকরণ তৈরির প্রয়োজন আছে কিনা।

(৪) যে জিনিসটি তৈরি হবে তা দিয়ে কতটুকু শেখানো যাবে।

(৫) কোন পন্থা অবলম্বন করলে এবং কিভাবে তৈরি করলে শিক্ষার্থীদের শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বাড়বে।

(৬) প্রয়োজনে বিভিন্ন বিষয়ের জন্য তা ব্যবহার করা যাবে কিনা।

(৭) উপকরণটির কাঠামো ও ব্যবহার কি রকম হবে।

(৮) স্থানীয়ভাবে উপকরণের কাঁচামাল সহজলভ্য হবে কিনা।

(৯) শিক্ষক একাই উপকরণটি তৈরি করতে পারবেন কিনা। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থী, অভিভাবক বা বাইরের কারিগরের সাহায্য লাগবে কিনা।

(১০) সাধারণভাবে হাতের নির্মিত যন্ত্রের সাহায্যে এবং কম সময়ে তৈরি করা সম্ভব কিনা

২.১০.৩ ভূগোল শিক্ষণের কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা উপকরণের বর্ণনা

১. গ্লোব (Globe) :

ভূমিকা : 'গ্লোব' ভূগোল শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে একটি প্রধান সহায় ও অবলম্বন। ভূগোল শিক্ষাদানে গ্লোব শ্রেষ্ঠ উপকরণ। তাই ভূগোল ক্ষেত্রে গ্লোবের ভূমিকা ও গুরুত্ব অপরিসীম। গ্লোব পৃথিবীর একটা মডেল স্বরূপ। এটা দেখতে অনেকটা কমলালেবুর মতো গোলাকার। মাঝখানে কিছুটা ফাঁকা। এর সাহায্যে পৃথিবীর আকার সম্বন্ধে ভুল ধারণা হবার সম্ভাবনা অনেকটা কম হয় মহাদেশ সমূহের স্থলভাগের আকার ও অবস্থান বুঝাবার জন্য ও গ্লোব আবশ্যক হয়। গাণিতিক ভূগোলের (Mathematical Geography) অনেক তথ্য ভূ-গোলকের (Globe) সাহায্যে শিক্ষার্থীকে পরিস্কারভাবে ব্যক্ত করা সম্ভব। গ্লোব দেখা শিক্ষার্থীদের দক্ষতাকে আরো

উন্নত করে। গ্লোব থেকে আমরা পৃথিবী সম্পর্কে অনেক তথ্য পাই। বিশেষ করে রাজনৈতিক ও বিভিন্ন স্থানের নাম জানতে সাহায্য করে। ভূগোল শিক্ষায় গ্লোব বা ভূ-গোলকের আবশ্যিকতা সকলেই স্বীকার করেন। স্কুলে ভূগোলের ক্লাসে আরম্ভ হতে শেষ পর্যন্ত অনেক স্থলেই শিক্ষক গ্লোব ব্যবহার করে শিক্ষার্থীর অস্পষ্ট ধারণাকে সুস্পষ্টতর করতে পারেন।

বর্ণনা : 'গ্লোব' পৃথিবীর আকৃতি, আহ্নিক ও বার্ষিক গতি ও তার ফলাফল সম্বন্ধে শিক্ষার্থীর জ্ঞান লাভে সহায়ক। পৃথিবী আপন মেরুদণ্ডে ৬৬$\frac{১}{২}^\circ$ কোণ করে পশ্চিম থেকে পূর্বে ঘোরে এবং এর ফলে যে সূর্যকিরণ পৃথিবী পৃষ্ঠে একই সঙ্গে সমানভাবে পড়ে না—এ তথ্যটির ব্যাখ্যা ভূ-গোলকের মাধ্যমে ব্যক্ত করা যায়। আবার মাঝখানে আলো রেখে বছরের বিভিন্ন সময়ের পৃথিবীর অবস্থানও ফলস্বরূপ ঋতু পরিবর্তন দেখানো সম্ভব। অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখা তারের গোলকের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সুস্পষ্টভাবে বোঝানো যায়। সবচেয়ে বড় অক্ষ বৃত্তটি প্রকৃতপক্ষে বিষুব রেখা বা নিরক্ষরেখা। উত্তরে বা দক্ষিণে ক্রমশ বৃত্তের আকৃতি ছোট হতে হতে বিন্দুতে পরিণত হয়েছে। যথাক্রমে উত্তরমেরু ও দক্ষিণমেরু, আবার অক্ষবৃত্তগুলো পরস্পর নিরক্ষরবৃত্তের সমান্তরাল রেখা দ্রাঘিমা রেখাগুলো উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত এক-একটি অর্ধবৃত্তের সৃষ্টি করে।

ভূ-গোলকে মহাদেশসমূহের শুধু বহিঃরেখা অঙ্কিত থাকতে পারে। আবার প্রতি মহাদেশ বা দেশের রাজনৈতিক সীমারেখা, প্রধান শহর বন্দর, নদনদী, সাগর, মহাসাগর ইত্যাদির অবস্থান অঙ্কিত থাকতে পারে। যে কোন দেশের অবস্থানগত বৈশিষ্ট্য ভূ-গোলকের মাধ্যমে সঠিক চিত্রটি শিক্ষার্থীর সামনে তুলে ধরা যায়। ভূগোলকের মাধ্যমেই পৃথিবীর আকৃতি বিকৃত না করে বহুলাংশে সঠিক চিত্রটি শিক্ষণীর সামনে তুলে ধরা যায়। আকৃতি ও গতির ফলের পৃথিবী পৃষ্ঠে এক স্থানে দিন, অন্য স্থানে রাত্রি হয়। আবার পৃথিবীর বার্ষিক গতির ফলেই ঋতু পরিবর্তন হয়। সূর্য কিরণ পৃথিবীর ২৩$\frac{১}{২}^\circ$ এবং উঃ ২৩$\frac{১}{২}^\circ$ দঃ অক্ষরেখা যথাক্রমে কর্কট ক্রান্তি ও মকর ক্রান্তিতে লম্বভাবে পড়ে। কারণ পৃথিবী নিজ মেরুদণ্ডে ৬৬$\frac{১}{২}^\circ$ কোণ করে ঘুরছে। চন্দ্র গ্রহণ ও সূর্য গ্রহণ কেন হয়, পৃথিবী ও তার উপগ্রহ চন্দ্র (যার নিজস্ব আলো নেই) এবং সূর্যের পারস্পরিক অবস্থানের ফলে যে চন্দ্র গ্রহণ ও সূর্য গ্রহণ হয়, এই তথ্যটি ভূ-গোলকের মাধ্যমে উপস্থাপন করা সম্ভব।

আঞ্চলিক ভূগোলের আলাচনা ভূ-গোলকের মাধ্যমে হওয়া সম্ভব নয়। কারণ ভূ-গোলক আকৃতিতে ছোট, ইহাতে বিশদ বিবরণ বা খুঁটি নাটি থাকা সম্ভব নয়। তথাপি আঞ্চলিক ভূগোল বিশেষ কোন দেশ বা মহাদেশের আলোচনার প্রারম্ভে ভূগোলকে তার অবস্থান নির্দেশ করা যেতে পারে। শিক্ষার্থীরা সহজেই বুঝবে যে অন্যান্য দেশের বা মহাদেশের সঙ্গে বিশেষ গঠিত অংশের সম্বন্ধ কিরূপ বিশেষত অবস্থানের ক্ষেত্রে। এরূপ আলোচনা মানচিত্রের পরিপূরকরূপে ব্যবহৃত হতে পারে।

শিশুর সামনে যখন নানা বস্তুর মডেল স্থাপন করা হয় তখন পৃথিবীর মডেলস্বরূপ একটি খেলনা গ্লোব আজকাল উন্নত শিশু বিদ্যালয়ে দেওয়া হয়। এতে পৃথিবীর আকার সম্বন্ধে ভুল ধারণা হবার সম্ভাবনা অনেকটা কম হয়। গল্পচ্ছলে যখন শিশুদেরকে ভূ-গোলকের পাঠ দেওয়া হয় শিক্ষক তখনও একটা উপযুক্ত গ্লোব কাছে রাখবেন যা সব সময়ই নির্দিষ্টভাবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে নয়। কোন সময় কোন শিশু হয়ত এমন প্রশ্ন করে বসবে যার সদুত্তর গ্লোব দেখিয়ে না দিলে শিশুর কাছে তা দুর্বোধ্যই থেকে যাবে।

গ্লোব ব্যবহার করতে গিয়ে শিক্ষক ঠিক কোন অবস্থায় গ্লোবের অক্ষাংশ রেখা ও মধ্যরেখাগুলো সম্বন্ধে শ্রেণিকে ধারণা দিবেন তা শ্রেণির অবস্থা অনুসারে তাঁকে বিবেচনা করতে হবে। কোন কোন শিক্ষার্থী হয়ত সহজেই এই সকল রেখার প্রয়োজনীয়তা ব্যবহার বুঝতে পারে আবার অনেকেই হয়ত অল্পায়াসে তা পারবে না। ছেলেদের প্রশ্ন ব্যতিরেকে ভূগোল পাঠের প্রথম দিকে শিক্ষক এ সকল রেখা সম্পর্কে আলোচনা না করলেও ভাল হবে। কিন্তু তা হলেও তিনি রেখার অস্তিত্ব অস্বীকার করে চলবেন না। রেখাগুলো আমাদের বুঝবার সুবিধার জন্যই গ্লোবের উপর অংকিত হয়েছে। বস্তুত পক্ষে পৃথিবী পৃষ্ঠে এগুলোর অস্তিত্ব নেই। এ কথার উল্লেখ করা যথাশীঘ্র বাঞ্ছনীয় হবে। গ্লোবের ব্যাস ১২ ইঞ্চি হওয়া উচিত। বড় হলে আরও ভাল। কোন কোন শিক্ষকের মতে যে গ্লোবে রঙের দ্বারা সীমারেখা ও উচ্চতা চিহ্নিত থাকে তার ব্যবহার বাঞ্ছনীয়। আবার কেহ কেহ এমন কালবর্ণের গ্লোব বেশি পছন্দ করেন যার উপর মহাদেশগুলোর সীমারেখা এবং কতগুলো অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমার রেখা খুব সামান্যভাবে চিহ্নিত থাকে।

গ্লোবের মেরু রেখাটি পৃথিবীর মেরু রেখার সমান্তরাল করে স্থাপন করা হবে। দিগন্তের সঙ্গে ঐ মেরুরেখা তখন ঐ স্থানের অক্ষাংশের সমান কোণ প্রস্তুত করবে এবং মেরু রেখাটি ধ্রুব নক্ষত্রের দিক নির্দেশ করবে। এরূপভাবে স্থাপিত গ্লোব বৎসরের বিভিন্ন সময়ে রৌদ্রে পর্যবেক্ষণ করে গ্লোবের উপর সূর্যালোক ও ছায়ার পরিমাণ দেখে শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারবে শীতকালে কেন দিন ছোট হয় গ্রীষ্মকালে কেন দিন বড় হয়। সঙ্গে সঙ্গে তারা বুঝবে বিভিন্ন ঋতুতে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে দিবালোকের কেন বেশিকম হয়। তাছাড়া বিভিন্ন সময় সূর্য দিগন্তের বিভিন্ন বিন্দুতে কেন উদিত হয় এবং বিভিন্ন সময়ে দ্বিপ্রহরে সূর্যের উচ্চতার পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় কেন

বিভিন্ন ধরনের গ্লোবের নাম নিচে প্রদত্ত হলো :

(১) ক্রেডেল গ্লোব

(২) টেবিল স্ট্যান্ড গ্লোব

(৩) ফ্লোর পেডেস্টাল গ্লোব

(৪) সাসপেনশান গ্লোব

(৫) বেরিয়েটান অব দি টেবিল স্ট্যান্ড গ্লোব

(৬) সেটেলাইট মাউনটিং গ্লোব।

মহাদেশ ও মহাসাগরগুলোর অবস্থান ও পরস্পরের মধ্যে অবস্থানগত সম্পর্ক, পৃথিবীর একস্থল হতে অপর দূরবর্তী স্থলের দিক নির্ণয় এবং তার মধ্যে ক্ষুদ্রতম পথ নির্ণয়ের কাজে গ্লোবের সাহায্যে সহজসাধ্য হয়। পৃথিবী পৃষ্ঠের জলবায়ু ও উদ্ভিদের প্রধান সংবিভাগগুলো ও গ্লোব দ্বারা ভালরূপে দেখানো সম্ভব হয়।

উপরোক্ত আলোচনা হতে বুঝা যায়, 'Globe is the tool of the Geographers' অর্থাৎ গ্লোব ভূগোলবিদদের যন্ত্রপাতি। আর একটি ভূগোল শিক্ষার ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ উপকরণ অর্থাৎ প্রধান সহায় ও অবলম্বন। গ্লোব ভূগোল শিক্ষকের পাঠদানে সহায়তা করার ক্ষেত্রে মস্তবড় হাতিয়ার। ভূগোল শিক্ষার অনেক তথ্যাবলি ভূ-গোলক বা গ্লোবের সাহায্যে ভালভাবে বোঝান সম্ভব। বিশেষ করে গাণিতিক বা প্রাকৃতিক ভূ-গোলের বহু ধারণা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে ভূগোলকের মাধ্যমে।

রাজনৈতিক ভূগোল আলোচনার ক্ষেত্রেও এর অবদান যথেষ্ট। যে কোন দেশের অবস্থানগত বৈশিষ্ট্য বিকৃত না করে বহুলাংশে শিক্ষার্থীদের নিকট তুলে ধরা সম্ভব। অতএব, বলা যায় ভূগোল শিক্ষাদানের উপকরণ হিসেবে গ্লোব এর ভূমিকা ও গুরুত্ব অপরিসীম।

১.১ স্বল্পমূল্যের মাটির কলসির গ্লোব

বর্ণনা : এই হাতে তৈরি গ্লোবের সাহায্যে পৃথিবীর অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ এবং তার কার্যকারিতা সম্বন্ধে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা যায়।

উদ্দেশ্য : হাতে তৈরি শিক্ষা উপকরণটি অক্ষাংশ এবং দ্রাঘিমাংশ নামক কাল্পনিক রেখাগুলো সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।

উপকরণ : মাটির কলসি, পেন্সিল, রং এবং তুলি ;

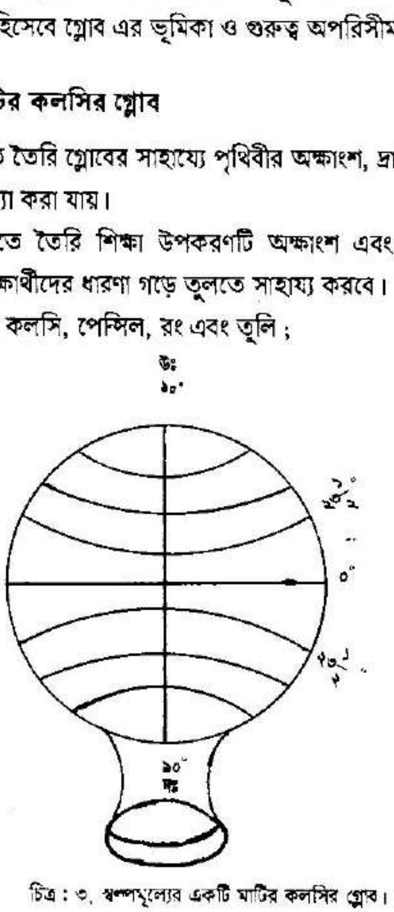

চিত্র : ৩. স্বল্পমূল্যের একটি মাটির কলসির গ্লোব।

প্রস্তুতপ্রণালী : হালকা রং এর বেশ গোল ধরনের একটা কলসির উপর পেন্সিল দিয়ে চিত্র অনুযায়ী অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ প্রভৃতি রেখাগুলো এঁকে নিয়ে স্পষ্ট করে রেখাগুলো রং করতে হবে বিষুবরেখা, প্রধান মধ্যরেখা (০°) এবং ১৮০° দ্রাঘিমা রেখা ভিন্ন ভিন্ন রং দিয়ে চিহ্নিত করতে হবে।

ব্যবহৃত পদ্ধতি : হাতে তৈরি সাধারণ গ্লোবের সাহায্যে যে কোন স্থানের অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ বা অক্ষাংশ দ্রাঘিমাংশের সাহায্যে কোন স্থানের ভৌগোলিক অবস্থান এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিবেশন করা যায়। বিষুবরেখা বা প্রধান মধ্যরেখার অবস্থান দেখিয়ে এগুলোর বিশেষ কাজ কি তা ব্যাখ্যা করে বুঝানো যায়।

২ মডেল (Model)

প্রাকৃতিক ভূগোলের (physical Geography) আলোচনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার মডেল বিশেষ কার্যকর। শুধু বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রেই নয় মডেল উচ্চতর ভূগোল শিক্ষার ক্ষেত্রেও বিশেষভাবে প্রযোজ্য। নানা প্রকার পাহাড়, পর্বত, আগ্নেয়গিরি, ভূ-পৃষ্ঠের চ্যুতি, শিলাস্তর, ভূ-অভ্যন্তরের বিভিন্ন অবস্থা নানা প্রকার ভাঁজ (Fold) যেমন সাধারণ ভাঁজ (Simple fold, Symmetrical fold, Assymmetrical fold. Recumbent fold) ঊর্ধ্বভঙ্গ (Anticlinal fold) অর্ধভঙ্গ (Synclinical fold) ইত্যাদি মডেলের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ধারণা সুস্পষ্টভাবে তৈরি হতে পারে। তাই বলা যায় ভূগোল শিক্ষাদানের উপকরণ হিসেবে মডেল এর ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ।

মডেল তৈরি ও ব্যবহার : নদীর বিভিন্ন গতিতে নানা প্রকার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চিত্র যেমন জলপ্রপাত, গিরিখাত, ক্যানিয়ন, অশ্ব ক্ষুরাকৃতি, নদীর বাঁকা গতি, ঝুলন্ত উপত্যকা নদী-তীরের উচ্চ ভূমির দ্বীপ ইত্যাদি মডেলের মাধ্যমে ব্যক্ত করা সম্ভব। উপরিউক্ত মডেল প্লাস্টিক সাইন অথবা চিনামাটির তৈরি হওয়াই বাঞ্ছনীয়। অনেক সময় কাগজের ও কাঠের মণ্ডের সাহায্যেও মডেল তৈরি করা যেতে পারে। মডেলটি শিক্ষার্থীর নিকট ফলদায়ক ও আকর্ষণীয় করার জন্য নানা রঙের মাধ্যমে পরিস্ফুট হওয়া অবশ্য প্রয়োজন।মডেলটির গায়ে নাম লেখা থাকলে ভাল হয় ভূগোল কক্ষের (Geography room) কাঁচের আলমারিতে মডেলগুলো সাজিয়ে রাখলে শিক্ষার্থীরা সব সময়ই দৃষ্টি দিতে পারে। মডেল বড় আকৃতির হলে শিক্ষকের Demonstration টেবিলে এমনভাবে রাখা প্রয়োজন, যাতে প্রতিটি শিক্ষার্থীর দৃষ্টি পড়ে। মডেল ব্যবহারে শিক্ষকের নজর রাখা প্রয়োজন, এটা যেন পাঠের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়। একাধিক মডেল ব্যবহারের ক্ষেত্রে পারস্পরিক (sequences) পরম্পরা যেন রক্ষিত হয়। মডেলের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা প্রাকৃতিক ভূগোলের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে ধারণা (concept) লাভে সমর্থ হয়। কিন্তু পৃথিবী পৃষ্ঠে এরূপ ঘটনা বা চিত্র (feature) কোন কোন স্থানে ঘটছে সে সম্বন্ধে সঠিক ধারণা অনুধাবনের জন্য মানচিত্রে নির্দেশ সহকারে ব্যক্ত হওয়া প্রয়োজন। প্রয়োজনবোধে

ছবির সাহায্য নিলে বাস্তব অবস্থার সঙ্গে মিল খুঁজে নিতে পারে এবং সার্থক ভূগোল শিক্ষা হতে পারে। যেমন জলপ্রপাতের ছবি দেখে মডেলে জলপ্রপাত সৃষ্টির কারণটি জানতে পারলে এবং সবশেষে পর্যবেক্ষণ করলেও ধারণা সুস্পষ্ট হবে। বিদ্যালয়ে ভূগোল শিক্ষকের পরিচালনায় শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন মডেল প্রস্তুত করতে পারে।

ভূগোল শিক্ষাদানে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করার জন্য বিভিন্ন প্রকার মডেল বিশেষভাবে উপকারী অর্থাৎ কার্যকর। শিক্ষার্থীদের বাস্তব জ্ঞান আহরণে অনেকটা সহায়তা করে। পরিশেষে বলা যায়, শিক্ষার্থীদের ভূগোল শিক্ষাদানের উপকরণ হিসেবে মডেলের ভূমিকা যথেষ্ট অবদান রাখে।

৩. চার্ট (Chart) :

ভূগোল শিক্ষাদানে সহায়তা করার ক্ষেত্রে উপকরণ হিসেবে চার্টের ভূমিকা অপরিহার্য। এর দ্বারা বিষয়টিকে জীবন্ত করে তোলা সম্ভব হয়। অর্থনৈতিক মানবিক ও আঞ্চলিক ভূগোলের বহু তথ্য চার্টের মাধ্যমে প্রকাশ করা সম্ভব। ভূগোল শিক্ষার ক্ষেত্রে চার্ট একটি সহায়ক অবলম্বন। ভূগোল শিক্ষার ক্ষেত্রে চার্টের ভূমিকা সম্পর্কে কোন দ্বিমত নেই।

বর্ণনা : বিদ্যালয়ের অপেক্ষাকৃত উচ্চশ্রেণির শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে চার্টের ব্যবহার বিশেষ কার্যকর বলে বিবেচিত। কারণ অধিকাংশ চার্টের মাধ্যমেই পরিসংখ্যানগত তথ্য ও চিত্র বিভিন্ন পদ্ধতিতে প্রকাশ করা হয়। যেমন, বাংলাদেশের লোকসংখ্যা বিগত পঞ্চাশ বছরে কত বেড়েছে তা যদি বার গ্রাফের সাহায্যে প্রকাশ করা হয় এবং এক একটি আদম শুমারীর ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৬১, ১৯৭১, ১৯৮১ ও ১৯৯১ বছরকে এক একটি আনুভূমিক কলামে ধরা হয়, অপর দিকে উলম্বভাবে ১″ কে ৫০ লক্ষ লোক ধরা হয়, তাহলে যে চিত্রটি পাওয়া যাবে, তাই একটি চার্ট বলে বিবেচিত হবে। অর্থনৈতিক, মানবিক ও আঞ্চলিক ভূগোলের বহু তথ্য চার্টের মাধ্যমে প্রকাশ করা সম্ভব।

যেমন বাংলাদেশে প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদনে কোন কোন জেলা উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে, এটা চার্টের মাধ্যমে প্রকাশ করা সম্ভব। কোন স্থানের বারো মাসের গড় বৃষ্টিপাত ও তাপমাত্রা চার্টের মাধ্যমে তুলে ধরে জলবায়ু সম্বন্ধে ধারণা দেয়া হয়। আবার বিভিন্ন জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য তুলে তার তুলনামূলক চার্ট তৈরি করা যেতে পারে।

শিক্ষকগণ দৃষ্টি রাখবেন যেন চার্ট আয়তনে বড় হয়, সুষ্ঠুভাবে ব্যক্ত থাকে, রঙের ব্যবহার যথারীতি হয় এবং পাঠের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়। শিক্ষকের নির্দেশে ছাত্ররা নিজেরাই বিভিন্ন চার্ট তৈরি করতে পারে। শ্রেণিকক্ষের অথবা Display Board এমনভাবে চার্ট টাঙিয়ে রাখতে হবে যাতে সর্বদাই নজরে পড়ে।

বিভিন্ন ধরনের চার্টের নাম—

(১) ফ্লো চার্ট

(২) ট্রি চার্ট

(৩) টেবুলার চার্ট

(৪) টাইম চার্ট

(৫) স্ট্রিপ চার্ট

(৬) ফ্লিপ চার্ট, ইত্যাদি।

শিক্ষার্থীদের ভূগোল শিক্ষাদানে সহায়তা করার জন্য বিভিন্ন প্রকার চার্ট বিশেষভাবে কার্যকর। ইহা যে কোন পরিসংখ্যানগত তথ্য ও চিত্র প্রকাশ করতে বিশেষ সহায়ক। তাই বলা যায় শিক্ষার্থীদের ভূগোল শিক্ষাদানের উপকরণ হিসেবে চার্টের ভূমিকা অপরিসীম গুরুত্ববহন করে।

৪. এপিডায়াস্কোপ (Epidiascope)

স্বচ্ছ কাচ পাতে আঁকা ছবি আলোকের সম্মুখে রাখলে তার দ্বারা আকারে বড় হয়ে আলোকের বিপরীত দিক গিয়ে পড়ে, এ নিয়ম বুঝতে পেরে মানুষ লণ্ঠন (Lantern) নামে এক প্রকার যন্ত্র তৈরি করে তা ছবি দেখাবার জন্য ব্যবহার করতে থাকে। লণ্ঠনের উন্নত সংস্করণ ডায়াস্কোপ (Diascope) নামে অভিহিত হয়।

লণ্ঠন ডায়াস্কোপ যন্ত্রের সাহায্যে কাঁচপাত বা অনুরূপ কোন পাতে আঁকা ছবি ছাড়া অন্য কোন ছবি দেখান সম্ভবপর নয়। তাই মানুষ আরও উন্নত ধরনের যন্ত্র বের করে, যার সাহায্যে কাগজে অঙ্কিত রঙিন ছবি, তালিকা, এমন কি বাস্তব পদার্থের ছায়া, আকারে বড় করে দেখান সম্ভবপর। সে যন্ত্রের নাম এপিস্কোপ (Episcope)। এরপর মানুষ এপিস্কোপ ও ডায়াস্কোপ যন্ত্র দুটির মূল কলাকৌশল মিলিয়ে এমন এক প্রকার যন্ত্র তৈরি সম্ভবপর করে তোলে, যার সাহায্যে কাঁচপাত অথবা অনুরূপ কোন পাতে আঁকা ছবি, তালিকা, এমন কি কাগজে আঁকা রঙিন ছবি ও বাস্তব পদার্থের ছায়া সব কিছুই আকারে বড় করে দেখান যায়, সে যন্ত্রের নাম এপিডায়াস্কোপ। ডায়াস্কোপ, এপিস্কোপ ইত্যাদি যন্ত্রে বৈদ্যুতিক আলোক ব্যবহার করতে হয় এ সব যন্ত্রযোগে দেখাবার ছবি ইত্যাদি সাধারণ ও অন্ধকার ঘরে সাদা পর্দা অথবা দেয়ালের গায়ে প্রতিফলিত করে দেখাতে হয়। তা না হলে সেগুলো স্পষ্ট দেখা যায় না।

লণ্ঠন, ডায়াস্কোপ, এপিস্কোপ এবং এপিডায়াস্কোপ এ সব যন্ত্র ভূগোল শিক্ষার সাহায্যকারী উপকরণ। ভূগোলের পাঠ সংশ্লিষ্ট ছবি, চিত্র ইত্যাদি দেখাবার ব্যাপারে এ সব যন্ত্র ভূগোল শিক্ষার সাহায্যকারী উপকরণ। ভূগোলের পাঠ সংশ্লিষ্ট ছবি, চিত্র ইত্যাদি দেখবার ব্যাপারে এসব যন্ত্রের সাহায্য নিলে সে ছবি বা চিত্র দেখান বেশ সার্থক হয়, ছবি আকারে বড় ও স্পষ্ট দেখা যায় বলে সেগুলো দেখে শিক্ষার্থী বেশ অল্প সময়ের মধ্যে বহু তথ্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে

পারে। তাছাড়া, এসব যন্ত্রের সাহায্যে একটি মাত্র ছবি বা বাস্তব পদার্থের ছায়া এক সঙ্গে শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীকে দেখান সম্ভবপর। সুতরাং লণ্ঠন, ডায়াস্কোপ, ইত্যাদি যন্ত্র ভূগোল শিক্ষার প্রয়োজনীয় উপকরণ।

এখন লণ্ঠন, ডায়াস্কোপ ইত্যাদি যন্ত্রের ব্যবহারবিধি সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। এসব যন্ত্র ব্যবহার করবার সময় দরজা জানালা বন্ধ করে ঘর অন্ধকার করে নিতে হয়। ঘর অন্ধকার করে যন্ত্রের নির্দিষ্ট স্থানে ছবি সম্বলিত কাঁচপাত ইত্যাদি বসিয়ে প্রয়োজনীয় আলো জ্বালালে ছবি, চিত্র ইত্যাদি যথাস্থানে বিস্তৃত সাদা পর্দা বা দেয়ালের গায়ে গিয়ে প্রতিফলিত হয়। ছবি দেখবার বেলায় শিক্ষক প্রয়োজন অনুসারে শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় বিষয়গুলো লক্ষ্য করবার জন্য নির্দেশ দিয়ে থাকেন।

লণ্ঠন ও ডায়াস্কোপ যন্ত্রে ব্যবহারের ছবি, চিত্র ইত্যাদি কাঁচপাত বা অনুরূপ পাতে এঁকে নিতে হয়। এসব যন্ত্রে ব্যবহারের উপযোগী ছবি সম্বলিত কাঁচপাত ইত্যাদি কিনতেও পাওয়া যায়। এপিস্কোপ বা এপিডায়াস্কোপ যন্ত্রে ব্যবহারের উপযোগী ছবি, বাস্তব পদার্থ ইত্যাদি প্রয়োজন অনুসারে সংগ্রহ করে নিতে হয়। ছবি সম্বলিত কাঁচপাত ইত্যাদি যত্ন করে রাখলে বহুদিন ব্যবহার করা চলে।

৫. প্রজেক্টর (Projector)

প্রোজেক্টর ছবি, নকশা, তালিকা ইত্যাদি দেখবার যন্ত্রবিশেষ। তা মূলত ডায়াস্কোপ যন্ত্রেরই রকমফের মাত্র। এ যন্ত্রের সাহায্যে সাধারণত কাঁচের মতো স্বচ্ছ পাত বা কাগজে আঁকা লিখিত ছবি, নকশা ইত্যাদি সাদা পর্দা অথবা দেয়ালের গায়ে প্রতিফলিত করে দেখান হয়। এ যন্ত্রেও বৈদ্যুতিক আলোক ব্যবহার করতে হয়।

শ্রেণি প্রশিক্ষণের ব্যাপারে ওভারহেড প্রজেক্টরের সম্ভাবনাময় ভূমিকা লক্ষ্য করা গেছে। ভূগোল শিক্ষার ব্যাপারে এর উপযোগিতা বহু ভূগোল শিক্ষকের মনোযোগ আকৃষ্ট করেছে। এ যন্ত্রের মাধ্যমে ভৌগোলিক ছবি, নকশা ইত্যাদি দেখিয়ে শিক্ষার্থী সম্বলিত শ্রেণিকে ভূগোল শিক্ষার ব্যাপারে বিশেষভাবে সাহায্য করা হয়। পাঠ আলোচনার সাথে সাথে পাঠ সংশ্লিষ্ট ভৌগোলিক বিষয় যন্ত্রের নির্দিষ্ট স্বচ্ছ পাতে এঁকে লিখেও দেখান যায়। তাতে ভূগোল পাঠ শিক্ষার্থীর কাছে সহজ এবং আনন্দময় হয়ে ওঠে। এ উপযোগিতা থাকার জন্যই প্রজেক্টর এখনকার দিনে ভূগোল শিক্ষার অন্যতম সাহায্যকারী উপকরণ বলে গণ্য হয়।

সাধারণত প্রজেক্টর শিক্ষকের আসনের কাছে ডানপার্শ্বে স্থাপিত থাকে। পাঠ আলোচনা চলাকালে দরকার হলে শিক্ষক নিজের আসনে বসে থেকেই শ্রেণিতে ছবি, নকশা ইত্যাদি শিক্ষকের পিছনে কক্ষতল থেকে একটু উপরে প্রসারিত পর্দা বা দেয়ালের গায়ে প্রতিফলিত করতে পারেন। তাতে শিক্ষার্থীগণ নিজ নিজ আসনে বসে থেকে একসাথে শিক্ষকের কথা ও আলোচনা

শোনে, এবং শিক্ষকের মাথার উপর দিয়ে অতি সহজ দৃষ্টিতে নকশা ছবি ইত্যাদি দেখে।

পাঠ আলোচনার সাথে সাথে কিছু এঁকে লিখে দেখাতে হলে ওভারহেড প্রোজেক্টর নির্দিষ্ট স্বচ্ছপাতে ঘন দাগ পড়ে, এমন পেনসিল বা কালি দিয়ে আঁকতে, লিখতে হয়। বলা বাহুল্য এ যন্ত্রের মাধ্যমে নকশা , ছবি ইত্যাদি দেখাবার বেলায় দরজা, জানালা বন্ধ করে ঘর অন্ধকার করে নিলে ভাল হয়।

৬. চলচ্চিত্র যন্ত্র (Filmstrips projector)

"The Filmstrips projector is another audio visual instrument which can be used in the teaching of many school subjects but no where is it of greater service than in the Geography class room."

যে যন্ত্রের সাহায্যে গতিশীল ছবি দেখান হয়, তাকে চলচ্চি ত্র বলে। চলচ্চিত্র যন্ত্রের সাহায্যে দেখবার ছবি এক বিশেষ রীতিতে ফিল্মের ফিতায় সাজানো থাকে। সে ছবি বিভিন্ন রঙের হতে পারে। এ যন্ত্রের সাহায্যে ছবি দেখাতে হলে অন্ধকার করা যায় এমন ঘর ও বেশ জোরালো বৈদ্যুতিক আলোকের দরকার হয়।

চলচ্চিত্র যন্ত্রের সাহায্যে নানা ঘটনা ও বিভিন্ন দেশের মানুষের বিবিধ কর্ম তৎপরতার ছবি যথার্থভাবে গতিশীল করে দেখান সম্ভবপর। শিশুরা গতিশীল ছবি দেখতে যেমন আনন্দ পায় তেমনি আগ্রহ বোধ করে। তা ছাড়া তাদের কাছে গতিশীল ছবিতে দৃষ্ট বিষয়বস্তু বাস্তব বলে প্রতিভাত হয়ে থাকে। সুতরাং ভৌগোলিক ছবি দেখাবার তথা ভূগোল শিক্ষা দিবার ব্যাপারে চলচ্চি ত্র যন্ত্রের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে।

চলচ্চিত্র যন্ত্রে ছবি দেখাবার পূর্বে তার কলকব্জা, দ্রষ্টব্য ছবির ফিতা, ইত্যাদি ঠিক আছে কিনা তা বিশেষভাবে দেখে নেয়া উচিত। তা না হলে ছবি দেখাবার বেলায় নানা অসুবিধায় অযথা সময় নষ্ট হতে পারে। ছবি দেখাবার সময় দরজা, জানালা বন্ধ করে ঘর অন্ধকার করে নিলে ভাল হয়। যন্ত্রের নির্দিষ্ট স্থানে বহু ছবি সম্বলিত ফিল্মের ফিতা জুড়ে দিয়ে বৈদ্যুতিক আলোকের সাহায্যে সে ফিতার ছবিগুলো যথাস্থানে বিস্তৃত সাদা পর্দা বা দেয়ালের গায়ে প্রতিফলিত করে দেখান হয়। ছবিগুলো ফিল্মের ফিতায় এক বিশেষ রীতিতে সাজানো থাকে বলে গতিশীল প্রতিভাত হয়। শিক্ষকগণ মনে রাখবেন ছবি দেখবার পূর্বে কোন বিশেষ ছবি দেখাবার উদ্দেশ্য কি, তা শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দেয়া ভাল। ছবি দেখাবার বেলায় মৌখিকভাবে অথবা ধ্বনিযন্ত্র যোগে শিক্ষার্থীদের ছবিতে লক্ষণীয় বিষয়গুলো লক্ষ্য করবার জন্য নির্দেশ দানের ব্যবস্থা করা উচিত। ছবি দেখাবার পর ছবিতে দৃষ্ট বিভিন্ন বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রয়োজনীয় আলোচনার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৭. ভি.সি.আর (VCR)

ভিডিও ক্যাসেট রেকর্ডারকে সংক্ষেপে বলা হয় ভি.সি.আর। একে ভিডিও টেপ রেকর্ডার বলা হয়। এটি আসলে একটি টেলিভিশন সেট। ভি.সি.আর প্রেরক স্টেশন থেকে পাঠানো টেলিভিশন অনুষ্ঠান গ্রহণ করতে পারে। এতে বিভিন্ন চ্যানেল নির্বাচনের ব্যবস্থাও থাকে। ভি.সি.আর এ কোনো পিকচার টিউব বা টেলিভিশন পর্দা থাকে না, থাকে না কোনো স্পীকার। তাই এর সাহায্যে ছবি দেখা যায় না এবং শব্দও শোনা যায় না। ভি.সি.আর থেকে শব্দ ও ছবি পেতে হলে একে কোনো না কোনো টেলিভিশন সেটের সাথে সংযুক্ত করতে হবে। টেলিভিশন সেটটি সাদা কালো কিংবা রঙিন হতে পারে। যে টিভি সেটের সাথে এই ভি.সি.আরকে সংযুক্ত করা হয় তাকে বলা হয় মনিটর।

ভি.সি.আর হল পিচার টিউববিহীন এক ধরনের পরিবর্তিত টেলিভিশন সেট। এতে চুম্বক টেপ এবং ঐ টেপ চালনার ব্যবস্থার মাধ্যমে ভিডিও (ছবি) ও অডিও (শব্দ) সিগন্যাল রেকর্ড করা যায় এবং টেলিভিশন সেটের সাহায্য নিয়ে রেডর্ককৃত অনুষ্ঠান পুনরায় দেখা ও শোনা যায়। ভি.সি.আর এ যেহেতু একটি টেলিভিশন গ্রাহকযন্ত্র থাকে সুতরাং টেলিভিশনের অ্যানটেনা এর সাথে জুড়ে দিয়ে এতে প্রেরক স্টেশন থেকে পাঠানো কোনো টেলিভিশন অনুষ্ঠান একই সঙ্গে যেমন দেখা যায় তেমনি তা রেকর্ডও করা যায়। এতে পিকচার টিউব নেই বলে একে টেলিভিশনের সাথে সংযুক্ত করতে হয়। ভি.সি.আর এর সাথে টেলিভিশনকে সংযুক্ত করে, এবং বিশেষভাবে টিউন করে এক চ্যানেলে টেলিভিশন অনুষ্ঠান যেমন দেখা যায় তেমনি সাথে সাথে অপর চ্যানেলে প্রচারিত অনুষ্ঠান রেকর্ডও করা যায়। কোনো অনুষ্ঠান ভি.সি.আর এ যেমন সাথে সাথে রেকর্ড করা যায় তেমনি ভবিষ্যতে প্রচারিত হবে এমন কোনো অনুষ্ঠানকে রেকর্ড করার জন্য ভি.সি.আরকে সেট করেও রাখা যায়।

ভি.সি.আর কি করে কাজ করে

ভি.সি.আর এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল এর হেড। এতে আছে কয়েকটি হেড যেমন ইরেজ হেড—যার সাহায্যে টেপে কোনো জিনিস পূর্বে রেকর্ড করা থাকলে তা নতুন অনুষ্ঠান রেকর্ডের পূর্বে মুছে ফেলা যায়, রেকর্ড/প্লে ব্যাক হেড—এটি আবার দু'রকম, অডিও হেড ও ভিডিও হেড। অডিও ক্যাসেট রেকর্ডারের চেয়ে এখানে ভিডিও হেডটি বাড়তি থাকে। ভি.সি.আর এর বাইরের গায়ে .কয়েকটি বোতাম থাকে । এগুলো বিভিন্ন কাজের জন্য ব্যবহৃত হয়। Record বোতামটি ব্যবহৃত হয় কেবল অনুষ্ঠান রেকর্ড করার জন্য Play বোতামটি ব্যবহৃত হয় কোনো অনুষ্ঠান প্লেব্যাক করে দেখার জন্য, Stop বোতাম ব্যবহৃত হয় টেপ চালনা বা ভি.সি.আর কাজ বন্ধের জন্য। Rewind টেপ বা ক্যাসেটের ফিতাকে পুনরায় পেঁচানোর জন্য

অনুষ্ঠানের কোনো অংশ একাধিকবার দেখতে ইচ্ছে করলে টেপকে Rewind করে আবার দেখা যায়। F. F (Front Fast) বোতাম ব্যবহৃত হয় ক্যাসেটের ফিতাকে দ্রুত ঘুরানোর জন্য, Still Pause বোতাম অনুষ্ঠান চলাকালীন সময়ে ক্ষণিকের জন্য ছবিকে স্থির রাখার জন্য ব্যবহৃত হয়, Eject বোতাম টিপে ক্যাসেট ভি.সি.আর থেকে বের করে নেয়া যায়।

আমরা জেনেছি ভি.সি.আর এ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল তার হেড। মূলত হেডটি হল কোনো ধাতব বেলুন বা সিলিন্ডার। এর ভিতর রাখা থাকে পেচানো তার। এই তারের ভিতর দিয়ে তড়িৎ কারেন্ট চালালে চৌম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়। এই চৌম্বক ক্ষেত্রে অসংখ্য রেখা বা লাইনবিশিষ্ট ফ্লাস্ক থাকে। এই চৌম্বক রেখাগুলো হেড থেকে একটি সূক্ষ্ম ফাঁকের মধ্য দিয়ে নির্গত হয়। ভি.সি.আর এ কোনো অনুষ্ঠান রেকর্ড করা বা ক্যাসেট থেকে কোনো অনুষ্ঠান দেখার সমস্যা হল, রেকর্ড করার সময় হেড থেকে অনেক তথ্যকে টেপ বা ক্যাসেটে স্থানান্তর এবং কোনো অনুষ্ঠান দেখার বেলায় অনেক তথ্যকে 'হেড' এ স্থানান্তর। 'হেড' থেকে টেপে বা টেপ থেকে হেডে তথ্য স্থানান্তর প্রক্রিয়াকে বলা হয় স্ক্যানিং।

৮. ভি.সি.পি (VCP)

ভিডিও ক্যাসেট প্লেয়ারকে সংক্ষেপে বলা হয় ভি.সি.পি। এই যন্ত্রে ক্যাসেটে রেকর্ডকৃত কোনো অনুষ্ঠান টিভির পর্দায় দেখা যেতে পারে। ভি.সি.পিতে টেলিভিশন প্রেরক স্টেশন থেকে পাঠানো কোনো অনুষ্ঠান দেখা যায় না এবং রেকর্ডও করা যায় না। ভি.সি.পি ও ভি.সি.আর এর মধ্যে মূল পার্থক্য হল, ভি.সি.পিতে শুধু রেকর্ডকৃত অনুষ্ঠান প্লেব্যাক করার ব্যবস্থা থাকে, এতে রেকর্ডিং ইউনিট থাকে না, থাকে না কোনো রেকর্ডিং ও ইরেজ হেড। তাই কোনো ভি.সি.আর থেকেই এই ভি.সি.পি দ্বারা কোনো অনুষ্ঠান রেকর্ড করা যায় না। এতে শুধু প্লেব্যাক হেড থাকে ভি.সি.পিতে কোনো টেলিভিশন ইউনিট থাকে না, তাই টেলিভিশনের অ্যান্টনা ভি.সি.পির সাথে সংযুক্ত করার ব্যবস্থা করলেও কোনো টেলিভিশন অনুষ্ঠান ভি.সি.পির মাধ্যমে টেলিভিশনের পর্দায় দেখা যায় না। ভি.সি.আর এর সাথে যখন টিভির অ্যান্টনা জুড়ে দেয়া হয় তখন টিভির পর্দাটি শুধু ভি.সি.আর এর মনিটর হিসেবে কাজ করে, টিভি নিজের ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রেরণ স্টেশন থেকে পাঠানো অনুষ্ঠান প্রদর্শন করে না, ভি.সি.আর এর টেলিভিশন ইউনিট কর্তৃক গৃহীত অনুষ্ঠানটি প্রদর্শন করে মাত্র। ভি.সি.আর এত মতো ভি.সি.পির নিজস্ব টিভি ইউনিট নেই, তাই টেলিভিশন পর্দাকে মনিটর হিসাবে ব্যবহার করে এর সাহায্যে কোনো টেলিভিশন অনুষ্ঠান এতে দেখা যায় না। এ ছাড়া এতে রেকর্ডিং ইউনিট নেই বলে টিভি বা অন্য কোনো ভি.সি.আর থেকে এর সাহায্যে কোনো অনুষ্ঠানও রেকর্ড করা যায় না।

ভি.সি.পিতে টেলিভিশন ইউনিট ও রেকর্ডিং ইউনিট নেই বলে এর দামও ভি.সি.আর এর তুলনায় অনেক কম।

ভি.সি.পি–তে ভি.সি.আর–এর মতো যে সব বোতাম থাকে তাহলে Play, Rewind, FF (Front Fast, Stop, Eject এবং Still এদের কাজ ভি.সি.আর এ এদের যে কাজ ছিল তার মতোই।

৯. টেপ রেকর্ডার (Tape Recorder)

অডিও টেপ রেকর্ডার বা অডিও ক্যাসেট রেকর্ডার যন্ত্রে যে কোন শব্দ মানুষের কণ্ঠস্বর, গান, বাজনা ইত্যাদি টেপে বা ক্যাসেটে রেকর্ড করা হয় এবং রেকর্ডকৃত অনুষ্ঠান পুনরায় চালিয়ে শোনাও যায়। যে কোনো ক্যাসেট বা টেপ রেকর্ডারে রেকর্ডকৃত অনুষ্ঠান অন্য ক্যাসেট বা টেপ রেকর্ডারে বাজিয়ে শোনা যায়। মনে রাখতে হবে অডিও মানে শাব্দিক বা শ্রাব্য শব্দ থেকে এসেছে।

টমাস আলভা এডিসনের ফনোগ্রাফ আবিষ্কারের মধ্যে দিয়েই মানুষের কণ্ঠস্বরকে রেকর্ড করার যাত্রা শুরু হয়। ঘটনাটি ঘটেছিল ১৮৭৭ সালে। এরপর বিভিন্ন বিজ্ঞানী এডিসনের সেই গ্রামোফোন যন্ত্রটির উন্নয়ন প্রক্রিয়ার এক পর্যায়ে টেপ রেকর্ডার যন্ত্রে পরিণত করেন। এটি গ্রামোফোন যন্ত্রেরই উন্নয়ন সংস্করণ মাত্র। টেপ রেকর্ডারে যা থাকে তা হল স্পন্দক রেকর্ড/প্লে ব্যাক হেড, ক্যাপস্টেন, পিনচহুইল, টেপ গ্রহণকারী চাকা প্রভৃতি যন্ত্রাংশ। রেকর্ড/প্লে ব্যাক হেড কোনো অনুষ্ঠান রেকর্ড করা বা কোনো রেকর্ডকৃত অনুষ্ঠানকে পুনরায় প্লেব্যাক করা বা চালিয়ে দেখার জন্য ব্যবহৃত হয়। রেকর্ড করণের সময় এই হেড ক্যাসেটে তথ্য সরবরাহ করে এবং প্লেব্যাকের সময় একটি ক্যাসেট থেকে তথ্য সংগ্রহ করে। ইরেজ হেড টেপ থেকে কোনো তথ্য বা রেকর্ডকৃত অনুষ্ঠান মুছে ফেলার জন্য ব্যবহৃত হয়। আজকাল শিখন শেখানো কার্যাবলিতে টেপ রেকর্ডার এর ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে। যন্ত্রটি ব্যবহারের ফলে একদিকে যেমন শিক্ষকের পরিশ্রম কম হয় অন্যদিকে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের টেপকৃত বক্তৃতা নিজেদের সুবিধামতো সময়ে শুনে উপকৃত হয়। রেকর্ডকৃত টেপ পুনঃপুন বাজানোরও সুবিধা রয়েছে।

২.১১ ভূগোলের যাদুঘর (Geography Museum)

ভূমিকা : ভূ–মণ্ডলের সকল বস্তু সম্পদ, দৃশ্য অদৃশ্য বিচিত্র অস্তিত্বকে নিয়ে ভূগোল শাস্ত্র গড়ে উঠেছে। আমাদের কাছে ও দূরে রয়েছে অসংখ্য বস্তু, নদী, পাহাড়–পর্বত–টিলা, মালভূমি, জলপ্রপাত, ঝরণা, শাখা নদী, উপনদী, মরুভূমি, দোঁ–আশ ভূমি, সমতল, উর্বর জমি, পশু–পাখি, জন্তু জানোয়ার, মৎস্য ও জলজীব। সমুদ্রজীব, উদ্ভিদ, আগাছাসহ বিভিন্ন স্তরের বিভিন্নমুখী বাতাস ও বহু প্রকার তুষার বৃষ্টি আমাদের নিত্যই কৌতূহল বৃদ্ধি করে। এ সবই ভূগোলের বিষয়বস্তু। গ্রাম, বন্দর, শহর উৎপন্ন ফসল, সবজি, অন্য দ্রব্যাদি, মানুষ, মানুষের পেশা, জীবন ও আবহাওয়া, পাতাল, সমভূমি থেকে অন্তরীক্ষে অবস্থানরত অগুণতি বস্তুসমূহ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক

জ্ঞানই ভূগোল শাস্ত্রের পাঠ্যবিষয়। এসব কিছু সম্পর্কে সম্যকভাবে জানা, পর্যবেক্ষণ করা, আলোচনা করা, গবেষণা করা এবং অবিরত অনুসন্ধান চালানই ভূগোল পাঠের উদ্দেশ্য।

যাদুঘর এ ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের, গবেষকদের, শিক্ষকদের তথা সাধারণ জ্ঞানানুসন্ধানীদের নমুনা দ্বারা সাহায্য করে। আমরা যা নিরাপদভাবে প্রদর্শন করি যে স্থানের মাধ্যমে তাকেই যাদুঘর বলে। যুগ যুগান্তরের দর্শনীয় শিক্ষণীয় ইতিহাস বহনকারী বস্তুই যাদুঘরে মজুদ রাখা হয়। শিল্প সংস্কৃতি, জ্ঞান বিজ্ঞান থেকে শুরু করে মানুষ তার আদি সমাজ ও সমাজের পূর্বযুগের বস্তু যা প্রশ ঐতিহাসিক মূল্য বহন করে সবই যাদুঘরে রাখে। সেদিক থেকে বলতে গেলে সমস্ত পৃথিবীটাই যাদুঘর এবং এর বস্তুগত দিকগুলো ভূগোলের যাদুঘর।

ভূগোল শিক্ষা ও যাদুঘর

জ্ঞান আহরণের ক্ষেত্রে নিকট থেকে দূরে, সহজ থেকে কঠিন, হালকা থেকে গভীর এবং পুরাতন থেকে নতুনে যাত্রাই আমাদের শিক্ষার্থীদের যাত্রা। আমাদের শিক্ষার্থীরা ভূগোল শেখার জন্য যে কক্ষে পৃথিবীর অবাক করা প্রাচীন, নবীন সকল বস্তু ভূগোলের নিরীখে দেখবে, জানবে রেখাচিত্র, ম্যাপ, চার্ট, পরিসংখ্যানসমূহ করবে এই যাদুঘরের সাহায্যে বাহিরের বিক্ষিপ্ত অগোছালো অবিন্যস্ত জানার বস্তুগুলোকে তাদের সামনে আনাই যাদুঘরের কাজ। ভূগোলের বিষয়বস্তুর সাথে জীবনের ব্যবহারিক দিক নিয়েই ব্যবহারিক ভূগোল। তার প্রধান দিক ম্যাপ বহুবিধ প্রাচীন ও নতুন ম্যাপের সাথে শিক্ষার্থীর যোগসাধনই ভূগোল পাঠের প্রয়োজন। যাদুঘর গবেষণাগারকে শক্তি ও উপকরণ দেবে। যাদুঘর একটি স্থায়ী ও সার্বিক গবেষণাগার। প্রতি বিদ্যালয়ে ভূগোলের যাদুঘর থাকবে। ভূগোল শিক্ষার সাথে ভূগোলের যাদুঘর নিবিড়ভাবে সংযুক্ত বিদ্যালয়গৃহে ভূগোলের উপকরণ সাজানই হবে ছাত্র/ছাত্রীদের মূল লক্ষ্য। এর জন্য তারা শিক্ষাভ্রমণ করবে। বাহিরের জগতের সাথে সংযোগ সাধন করবে। বিভিন্ন স্থান ঘুরে তারা দেখবে কোন ফসলের কোন বীজ হয়। সেই সকল বীজের প্রকারভেদ এবং গুণাগুণ পর্যবেক্ষণ করা এবং নমুনা হিসেবে সংগ্রহ করে ছাত্রদের বিদ্যালয়ে সংগ্রহশালায় রাখার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে

নিজেদের এলাকার শহর, গ্রাম, বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় সব কিছুর মানচিত্র আঁকতে হবে এবং কোথায় কোনটা আছে তা সুচারু ও সঠিকভাবে চিহ্নিত করা শিখবে ছাত্ররা। মাটি, শিলা ও বিভিন্ন ফসলের নমুনা সংগ্রহ করে ভূগোলের যাদুঘরে সংগ্রহ করতে হবে। প্রতিটি শিক্ষার্থীর মন জানার জন্য কৌতূহল বৃদ্ধির জন্য নতুন পরিবেশে ভ্রমণ কার্যক্রম করা বিরতিহীনভাবে চালু রাখতে হবে নদী, পাহাড়, ঝরণা, প্রপাত ইত্যাদি দেখানোর পর এগুলোর নকশা বর্ণনা উৎপত্তি পরিবর্তন ইত্যাদির নমুনা সংগ্রহ করা দরকার।

বিভিন্ন পার্বত্য এলাকার উপজাতীর সাথে সাধারণ মানুষের তফাৎ কি তাও ছাত্রদের ভ্রমণের মাধ্যমে শিখতে হবে। সেই অঞ্চলে সারাদিন থেকে তাদের ঘরবাড়ি, তাদের পোশাক, তাদের চাষবাস, খাদ্য, খাবার উৎসব-পার্বন, সকল অনুষ্ঠান পর্যবেক্ষণ করে বিভিন্ন নমুনা সংগ্রহ করতে হবে।

বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন সময়ে যাদুঘরে আসবে এবং জানবে। প্রথমে ধরা যাক সমুদ্র এবং বায়ুপ্রবাহ। বিভিন্ন সমুদ্র দেখিয়ে নীলরং মিশিয়ে সমুদ্রের পানিকে দেখান যেতে পারে। কোন সমুদ্র কোন দিকে, কোন দেশে তাও দেখান যাবে। অতি প্রসিদ্ধ পোতাশ্রয় নগর দেখাতে হবে। খেলনা জাহাজ তৈরি করে একটি জেটির নকল চেহারা দেখানো যেতে পারে। তারপর সমুদ্রজাত দ্রব্যাদি, মাছ, প্রাণী কাছাকাছি স্থাপন করতে হবে। বিভিন্ন ধরনের চিত্র, নকশা, মডেল তৈরি করে আন্তর্জাতিক পরিবেশ তৈরি করতে হবে। সমুদ্রের পানি কিভাবে লবনমুক্ত করা হচ্ছে তার দু'একটা নমুনা দেখাতে হবে। কিভাবে পানি থেকে বিদ্যুৎ হচ্ছে, মরুপ্রধান দেশের সমুদ্র উপকূলের উন্নয়ন হচ্ছে এসবের মডেল শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করতে হবে।

এরপর সৌরমণ্ডলের মহাকাশের, আকাশ ভূগোল বিভাগে সংযোগ করতে হবে। সূর্যগ্রহণ চন্দ্রগ্রহণ সম্বন্ধে ধারণা দেয়ার জন্য এর মডেল তৈরি করতে হবে। নক্ষত্রপুঞ্জ, কৃত্রিম আকাশ জ্যোতিষ্কমণ্ডল তৈরি করে মোটরের সাহায্যে অতি ধীরে ঘুরতে পারে তার ব্যবস্থা করে যাদুঘরে সন্নিবেশিত করতে পারি। প্রতিদিনের সূর্যোদয়—সূর্যাস্ত মেরুদেশের সূর্যহীন অবস্থা সবই দেখানো যায়। এই বিভাগে রকেট, মহাশূন্য অভিযান, চন্দ্র ভ্রমণ ইত্যাদি মডেল বা চিত্রে দেখানো যেতে পারে। চন্দ্র ভূ-মণ্ডলের চারদিকে কিভাবে অবস্থান করে দেখানো যেতে পারে। বিভিন্ন সময়ে আকাশ জ্যোতিষ্কমণ্ডল যে অবস্থায় থাকে তার মডেল করে বা ছবি, নকশা করে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য উপস্থাপন করা যেতে পারে।

তারপর যাই সামরিক ভূগোলে। দেশরক্ষা, অভ্যন্তরের দুর্যোগ সামাল দেয়ার জন্য সামরিক বিভাগ, পুলিশ বিভাগ, বি.ডি.আর, আনসার বাহিনীর সদস্যের উপর নির্ভর করতে হয়। আমাদের শিশুদের যদি সামরিক ভূগোলের সচিত্র ধারণা দিতে পারি তাহলে যুদ্ধ এবং ভূ-প্রকৃতি সম্পর্কে তাদের ধারণা বাড়বে। হিটলারের অপরিসীম বিক্রম থাকা সত্ত্বেও কি কারণে তার পরাজয় হয়েছে তার মডেল আক্রমণ কেন্দ্র, প্রতিরক্ষা কেন্দ্র, তারিখ উল্লেখ করা যেতে পারে। পানিপথে যুদ্ধ এক রকম, মরুভূমির যুদ্ধ আর এক রকম। আকাশ যুদ্ধ আবহাওয়ার সাথে সম্পর্কিত তাও প্রদর্শনীর মাধ্যমে ভূগোল যাদুঘরে প্রদর্শন করতে পারি। আমাদের ছেলেমেয়েরা আগে থেকে এগুলো জানলে সৈন্য বিভাগে গিয়ে দক্ষতার পরিচয় দিতে পারবে। পাহাড়ে যুদ্ধ, তুষার যুদ্ধ, বনে যুদ্ধ ইত্যাদির নমুনা সংগ্রহ করতে পারি। দেখাতে পারি কোন বন্দর কোথায়, পার্লহারবার কেন পৃথিবীতে বিখ্যাত তাও আমরা যাদুঘরে জানবার ব্যবস্থা করতে পারি।

তারপর আমরা জনসংখ্যার কথা ভাববো। ভূগোলের সাথে আবহাওয়ার সাথে মানুষের জন্ম মৃত্যু এবং দৈহিক বৃদ্ধি হ্রাস, উন্নয়ন নির্ভরশীল। কোন্ দেশে জনগণের চাপে দম বন্ধ হয়ে আসছে, আবার কোন দেশে জনশক্তির অভাবে কর্মকাণ্ড অচল হয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন দেশের জনসংখ্যার সাথে জলবায়ুর কোথায় যোগাযোগ বিবরণসহ ইত্যাদির চার্ট, ছবি নকশা, ম্যাপ, মডেল ভূগোল থাকবে যাদুঘরের জনসংখ্যা বিভাগে।

আমাদের যুগ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির । প্রযুক্তির মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ এবং খাদ্য উৎপাদন করে দেশীয় প্রযুক্তির উন্নয়ন ঘটাতে হবে। এর জন্য খাদ্যে কিভাবে স্বয়ং সম্পন্ন হওয়া যায় তার উপর একটা পদ্ধতি উপস্থাপন করা যেতে পারে, ভূগোলের যাদুঘরে। জলবায়ুর উপর খাদ্যের উৎপাদন যেহেতু নিয়ন্ত্রিত সেহেতু সময় উপযোগী নকশা মডেল করে যাদুঘরে উপস্থাপন করতে হবে।

যাদুঘর তৈরি ও ব্যবহার : অনেক বড় শহর বা বিখ্যাত স্থানের মানুষের যাদুঘর দেখার সুযোগ হলেও সুদূর গ্রাম থেকে শুরু করে অনেক ছোট শহরে ও এলাকায় শত শত মানুষের ও শিশুদের এ সুযোগ নেই। সুতরাং স্কুলে স্কুলে যদি ভূগোল যাদুঘর স্থাপন করা যেতো তাহলে যাদুঘরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা প্রকৃতভাবে সঠিক জিনিস সম্পর্কে ধারণা নিতে পারত।

স্কুলের বাইরে শিক্ষার্থীদের শিখানোর ব্যবস্থা করার জন্য আমাদের দেশের স্কুলগুলো ভূমিকা রাখতে পারে না, কারণ তাদের সুযোগ অনেক কম। এজন্যে বিদ্যালয় ধনী ব্যক্তি বা সরকারি সাহায্যে এ অভাব পূরণের ব্যবস্থা নিতে পারে। একদিনে একটি যাদুঘর সমৃদ্ধ করা যাবে না এজন্যে পরিকল্পনা, উদ্যোগ, প্রচেষ্টা ও আন্তরিকতার সমন্বয় থাকতে হবে।

ভূগোল যাদুঘর সম্পর্কে পরামর্শ

ভূগোল পাঠের অন্যতম উদ্দেশ্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও জীবনধর্মী জ্ঞান লাভ। এ উদ্দেশ্যকে সুচারুরূপে বাস্তবায়ন, ভূগোল পাঠের ব্যাপক চাহিদা সৃষ্টি, প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা জোরদার করা, সুযোগ্য শিক্ষক তৈরি, ভূগোল পাঠের পরিবেশ তৈরির জন্যেই এ যাদুঘরের প্রয়োজন। একটি নাতিদীর্ঘ টিনের তৈরি ঘরে এর যাত্রা শুরু করা যায়। ভূগোলের জ্ঞান আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সাথে কিভাবে জড়িত সে ব্যাপারে উৎসাহ সৃষ্টি করতে হবে এবং প্রচার করতে হবে, প্রদর্শনী গড়ে তুলতে হবে।

তারপর নিজেদের প্রচেষ্টায় বাড়ি তৈরি করা যায়। যেখানে ছাত্ররা শ্রম দিতে পারে। নিজের কাজ নিজে করার প্রবণতা বাড়বে। আসবাবপত্র কিনে শিক্ষকের সহায়তায় উপকরণ এবং দর্শনীয় বস্তু সংগ্রহ করা যেতে পারে।

এ প্রসঙ্গে ইংল্যান্ডের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক সংস্থা বলেছেন, "ভূগোল কক্ষ বা যাকে যাদুঘর বলা যায় তা হলো একটি কর্মশালাবিশেষ। এখানকার পরিবেশ, এমন হওয়া প্রয়োজন যাতে শিক্ষার্থীদের কল্পনাশক্তি সহজেই উজ্জীবিত হয়। এই পরিবেশ তাদের এমনভাবে অনুপ্রাণিত করে যা অন্যত্র সম্ভব নয়।"

বিভিন্ন বিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত ভূগোল যাদুঘরের মধ্যে সার্বিক অবস্থা মূল্যায়ন করে পুরস্কারের ব্যবস্থা করা দরকার। বাৎসরিক ভিত্তিতে ভূগোল যাদুঘর প্রতিষ্ঠা উৎসব পালন করে ভূগোল চর্চায় আগ্রহ সৃষ্টি করতে হবে। ভূগোল যাদুঘরের মান উন্নয়ন, সঠিক ব্যবহার এবং শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধকরণের জন্যে এখন থেকে বাংলাদেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে ভূগোল পড়ানোর জন্য উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। এ ছাড়া গবেষণা এবং ইদানিংকালের প্রযুক্তিসহ সকল দিকের এতদসংশ্লিষ্ট ধারণা সুপ্রসারিত করতে হবে।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রাকৃতিক ভূগোল

৩.০ সৌরজগৎ সৃষ্টির মতবাদ

৩.১ সূচনা : বিশ্বজগৎ সৃষ্টিরহস্য অনুসন্ধান মানুষের আদি ও অকৃত্রিম পিপাসা। যুগে যুগে বিজ্ঞানীরা সেই অনন্ত পিপাসা নিবারণে সচেষ্ট হয়েছেন। আমাদের এই পৃথিবী বিশাল সৌরজগতের একটি অংশমাত্র। সৌরজগতের উদ্ভব সম্পর্কে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন বিজ্ঞানী ও দার্শনিকগণ নানা মতবাদ উপস্থাপন করেছেন। কালের বিবর্তনে মানব জ্ঞানের পরিধি বিস্তারের সাথে সাথে পূর্ববর্তী মতবাদগুলো সংশোধিত ও পরিমার্জিতরূপে পরিবর্তিত হয়েছে। মতবাদগুলো কোনটিই সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত অথবা গ্রহণীয় হয় নি। সৌরজগৎ সৃষ্টির প্রক্রিয়া আজও মানুষের নাগালের বাইরে। তবে এই জটিল রহস্য উদঘাটনে নিরলস প্রচেষ্টার ফল হিসাবে বিজ্ঞানীরা সৌরজগৎ সৃষ্টি সম্বন্ধে নানা মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেন।

৩.২ সৌরজগৎ কি ?

পৃথিবী বিশাল সৌরজগতের অংশবিশেষ। লক্ষ লক্ষ সৌরজগৎ নিয়ে সৃষ্টি হয় এক একটি নীহারিকা। আবার লক্ষ লক্ষ নীহারিকা একত্রে মিলে গঠিত হয়েছে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। সৌরজগতের কেন্দ্রবিন্দু সূর্য হচ্ছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোটি কোটি নক্ষত্রের অন্যতম সূর্য এবং তার নয়টি গ্রহ, বত্রিশটি উপগ্রহ হাজার হাজার গ্রহাণুপুঞ্জ ও লক্ষ লক্ষ ধূমকেতু নিয়ে আমাদের এই সৌরজগৎ গঠিত। গ্রহ, উপগ্রহ এবং সূর্য নিজেদের পারস্পরিক মহাকর্ষণ শক্তির দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে সূর্যের চারদিকে নিজস্ব আবর্তন কক্ষে নির্দিষ্ট সময়ে সর্বদা পরিভ্রমণ করছে। সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘূর্ণায়মান এই জ্যোতিষ্কমণ্ডলীকে বলা হয় সৌরজগৎ। বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন এবং প্লুটো। সৌরজগতের অংশ চাঁদ হচ্ছে পৃথিবীর একটি উপগ্রহ।

উপগ্রহগুলো গ্রহকে কেন্দ্র করে ঘূর্ণায়মান। পৃথিবীর উপগ্রহ মাত্র একটি এবং বুধ ও শুক্র ব্যতীত অন্যান্য গ্রহের মধ্যবর্তী অংশ বেশ কিছু সংখ্যক গ্রহাণুপুঞ্জ আছে। গ্রহগুলোর মধ্যে বুধ আয়তনে সবচেয়ে ছোট এবং সূর্যের নিকটবর্তী। অন্যদিকে প্লুটো হচ্ছে সবচেয়ে দূরবর্তী গ্রহ। আর সবচেয়ে বড় গ্রহ বৃহস্পতি এবং শনি বিশেষ ধরনের বলয় দ্বারা বেষ্টিত বলে তার অপর নাম বলয় গ্রহ।

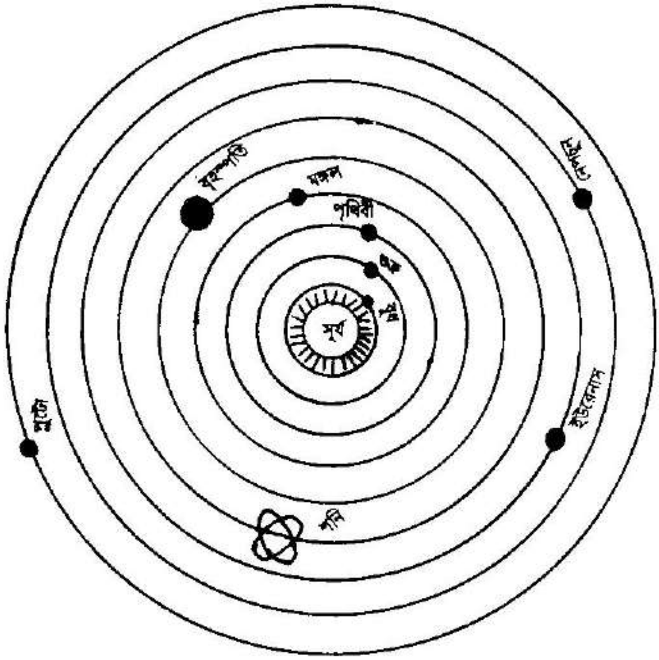

চিত্র : ৪. সৌরজগৎ

৩.৩ সৌরজগৎ সৃষ্টি মতবাদ

অতি প্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্ন বিজ্ঞানী ও দার্শনিক সৌরজগৎ সৃষ্টিরহস্য উন্মোচন করার চেষ্টা করেছেন। সৃষ্টি প্রক্রিয়ার স্বরূপ ও প্রকৃত অবস্থা জানার জন্য অবিরাম প্রচেষ্টার ফল হিসেবে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন মতবাদ সৃষ্টি হয়। সৌরজগৎ সৃষ্টি মতবাদ উপস্থাপন করে আলোড়ন সৃষ্টিকারী বিজ্ঞানী ও দার্শনিকবৃন্দের মধ্যে ইমানুয়েল কান্ট, সাইমন দ্যা লাপ্লাস, চেম্বারলিন ও মৌলটন, জেমস জিনস ও জেফরিজের নাম উল্লেখযোগ্য।

এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড বিক্ষিপ্ত নক্ষত্ররাশির একটি নিছক সমাবেশ নয়, এর গঠন প্রকৃতি এক সুশৃঙ্খল নিয়মাবলির অনুসারী, সৌরজগৎ সৃষ্টির প্রক্রিয়া অনুসন্ধানী বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক ও তাদের

উপস্থাপিত মতবাদগুলোকে প্রধানত দুই শ্রেণিতে ভাগ করা যায় :

(ক) প্রাকৃতিক বিবর্তন মতবাদ

(খ) অপ্রাকৃতিক বা অস্বাভাবিক সংঘটন মতবাদ।

প্রাকৃতিক বিবর্তন মতবাদ শ্রেণিতে কান্ট ও লা প্লাসের মতবাদ এবং অপ্রাকৃতিক বা অস্বাভাবিক সংঘঠন মতবাদ শ্রেণিতে গ্রহকণা মতবাদ জোয়ার মতবাদ সংঘর্ষ মতবাদ অন্তর্ভুক্ত (রউফ ও হালিম ১৯৭৬, পৃ. ১)। সৌরজগৎ সৃষ্টি মতবাদের প্রবক্তাগণ একটি বিষয়ে সবাই একমত যে একটি বাষ্পীয় ও ঘূর্ণায়মান নীহারিকা থেকেই সৌরজগৎ সৃষ্টি হয়েছে। তবে কেন কখন এবং কিভাবে এই প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়েছে সে বিষয়ে বিজ্ঞানীগণ সুস্পষ্ট ও সর্বসম্মত বক্তব্য উপস্থাপন করতে আজও ব্যর্থ হয়ে আছে।

সৌরজগৎ সৃষ্টি সম্বন্ধে আলোচিত মতবাদসমূহ

কান্ট ও লা প্লাসের নীহারিকা মতবাদ : জার্মান ভূগোলবিদ ও দার্শনিক ইমান্যুয়েল কান্ট অষ্টাদশ শতকে সৌরজগৎ সৃষ্টি সম্পর্কে সর্বপ্রথম যুক্তিগ্রাহ্য একটি মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেন, কান্টের মতবাদ 'নীহারিকা মতবাদ' নামে পরিচিত। তার মতে, সূর্য এবং গ্রহ উপগ্রহগুলো সমন্বয়ে গঠিত সৌরজগৎ সৃষ্টির আদিতে ছিল একটি ঘূর্ণায়মান প্রসারিত নীহারিকা। কান্টের এই নীহারিকা মতবাদের ভিত্তি ছিল নিউটনের মহাকর্ষ মতবাদ। সৌরজগৎ সৃষ্টি প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা উপস্থাপিত বক্তব্যে কান্ট বলেন যে, "আদি নীহারিকা অভ্যন্তরস্থ ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর পৃথক পৃথক আকর্ষণীয় শক্তির ফলে কঠিন বস্তুকণাগুলোর মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি হয় এবং সেই কারণে নীহারিকাটি উত্তপ্ত হতে থাকে। অভ্যন্তরস্থ বস্তুকণাসমূহের ক্রমাগত সংঘাতের ফলে নীহারিকাটির ঘূর্ণন বেগও বৃদ্ধি পায়। দ্রুত ঘূর্ণায়মান বিশালাকার নীহারিকাটি প্রসারিত হতে হতে নিরক্ষীয় অঞ্চল থেকে আংটির আকারে পর পর কতকগুলো বস্তুপিণ্ড বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ঘূর্ণায়মান বস্তুর কেন্দ্রাতিগ শক্তি এই প্রক্রিয়ায় ক্রিয়াশীল ছিল। প্রত্যেক আংটি আকার বস্তু থেকে একটি গ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। গ্রহগুলো থেকে একইভাবে উপগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে।

কান্টের মতবাদ বিজ্ঞানসম্মত নয় বলে নীহারিকা মতবাদ নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়। কারণ নীহারিকার বিভিন্ন কণিকার মধ্যে সংঘাতের ফলে ঘূর্ণনের সৃষ্টি হবে এই ধারণা পদার্থ বিদ্যার সাধারণ একটি নীতির পরিপন্থী। তাই কান্টের মতবাদ সঠিক বলে গ্রহণীয় নয়। (বাইড, ভূগোল, ১৯৮৫, পৃ.-১৬)।

পরবর্তীকালে ফরাসি গাণিতিক পীয়েরি সাইমন দ্য লাপ্লাস কান্টের মতবাদকে উন্নত, পরিমার্জিত এবং আরও বিজ্ঞানসম্মত রূপ দিয়ে ১৭৯৬ খ্রিস্টাব্দে নীহারিকা মতবাদকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করেন। তার মতে নীহারিকাটি ঠাণ্ডা ছিল না বরং প্রথম থেকেই বাষ্পাকার, উত্তপ্ত ও ধীরে

ধীরে ঘূর্ণায়মান ছিল। তাপ বিকিরণ করে ক্রমাগত শীতল হতে থাকে এবং স্বীয় মহাকর্ষ শক্তির আওতায় ক্রমশ সংকুচিত হয়। নীহারিকাটি যতই শীতল হতে থাকে ততই সংকুচিত ও ঘনত্ব প্রাপ্ত হয়। তার সাথে কৌণিক ভরবেগের সমতা রক্ষার জন্য এর ঘূর্ণন বেগও বৃদ্ধি পায়। ঘূর্ণন বেগ বৃদ্ধি পেতে পেতে এমন একটা সময় উপস্থিত হয় যখন এর নিরক্ষীয় এলাকা থেকে আংটির গ্রহে পরিণত হয়। এভাবে এক একটি গ্রহ সৃষ্টি হয় এবং মূল নীহারিকাটি এক সময় সংকুচিত হয়ে বর্তমান সূর্যের আকার নেয়। বিবর্তনের একই নিয়মে গ্রহগুলো থেকে এক বা একাধিক উপগ্রহ সৃষ্টি হয়।

এই মতবাদ অনুযায়ী গ্রহ উপগ্রহ এবং শনি গ্রহের বলয় উৎপত্তির কারণ ব্যাখ্যা করা যায় কিন্তু একই প্রক্রিয়ায় কিভাবে শনির বলয় অক্ষুণ্ন থাকল আর অন্যান্য গ্রহের বলয়গুলোর বিলুপ্ত হলো তা ব্যাখ্যা করা যায় না।

লা প্লাসের নীহারিকা মতবাদ

লা প্লাসের নিহারীকা মতবাদ

চিত্র : ৫. ঘূর্ণায়মান নীহারিকা (ক)

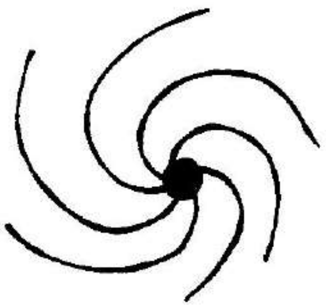

চিত্র : ৬. ঘূর্ণায়মান নীহারিকা (খ)

উনবিংশ শতাব্দীতে সৌরজগৎ সৃষ্টি সম্বন্ধে কান্ট ও লা প্লাসের নীহারিকা মতবাদ সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। পরবর্তীকালে এই মতবাদ নানাভাবে সমালোচিত হয়।

নীহারিকা মতবাদের সমালোচনা

(১) বিবর্তনকালে সৌরজগতের কৌণিক ভর বন্টন সম্পর্কে লা প্লাসের ব্যাখ্যা সঠিক নয়। "বস্তুর ওজন বেশি হলেই কৌণিক ভরবেগ বেশি হবে।" লা প্লাসের এই নীতি বিজ্ঞানসম্মত নয়। কারণ ভরবেগ নির্ভর করে বস্তুর ঘূর্ণনের গতিবেগ এবং ওজনের উপর। লা প্লাসের মতে অন্যান্য গ্রহের তুলনায় সূর্যের কৌণিক ভরবেগ বেশি। কিন্তু বাস্তবে গ্রহগুলোর কৌণিক ভরবেগ ৯৮% এবং সূর্যের মাত্র ২% ভাগ। সুতরাং এই মতবাদ সৌরজগতের মধ্যে কৌণিক ভরবেগ বন্টনের সঠিক ব্যাখ্যা সম্ভব নয় (ইসলাম, ১৯৮৫ পৃ. ৮)।

(২) কেন্দ্রাতিগ শক্তির প্রভাবে সূর্যের চারদিকে বাষ্পপিণ্ডগুলো বলয়াকৃতি ধারণ না করে অথবা গ্রহরূপে সূর্যকে পরিভ্রমণ না করে মহাশূন্যে ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়াই স্বাভাবিক ছিল। অথচ তা হয় নি। এর কোন সঠিক উত্তর এই মতবাদে পাওয়া যায় নি।

(৩) নীহারিকা মতবাদ অনুযায়ী যদি ধরে নেয়া যায় যে, কতকগুলো বলয়ই সৃষ্টি হয়েছিল বলে কিভাবে সেগুলো গোলাকার গ্রহে পরিণত হল তা ব্যাখ্যা করার মতো যথেষ্ট সুস্পষ্ট বক্তব্য এই মতবাদে তুলে ধরা হয় নি।

(৪) অন্যান্য গ্রহ ব্যতীত কেবল শনি গ্রহের বলয় কেন অবশিষ্ট তার ব্যাখ্যা নীহারিকা মতবাদ দিতে পারে না।

(৫) বৃহস্পতি ও শনির কতগুলো উপগ্রহ আছে সেগুলো মূল গ্রহ যেদিকে আবর্তন করে তার বিপরীত দিকে আবর্তিত হয়, আবার মূল গ্রহটি আবর্তিত হতে যে সময় লাগে কিছু উপগ্রহ (যেমন ফোবস) তা অপেক্ষা কম সময়েই আবর্তিত হয়। নীহারিকা মতবাদ এ বিষয়ে আলোকপাত করে নি।

(৬) নীহারিকা মতবাদ অনুযায়ী পর পর আংটিগুলো বিচ্ছিন্ন হওয়ায় সূর্যের আবর্তন গতি বৃদ্ধি পাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সূর্যের গতি দ্রুত হয় নি।

চেম্বারলিন ও মৌলটনের গ্রহকণা মতবাদ

সৌরজগৎ সৃষ্টি সম্পর্কে নীহারিকা মতবাদের পর দীর্ঘদিন কোন নতুন মতবাদ বা ধারণা বিকাশ লাভ করে নি। ১৯০৪ সালে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন অধ্যাপক সৌরজগৎ সৃষ্টি সম্বন্ধে নতুন মতবাদ উপস্থাপন করেন। এই মতবাদ অনুযায়ী মহাবিশ্বে পরিভ্রমণরত অসংখ্য নক্ষত্রের মধ্যে যে কোন একটি নক্ষত্র তার নিজস্ব গতিপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে সূর্যের কাছাকাছি এসে পড়লে তাদের পারস্পরিক আকর্ষণে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে। ফলে জ্বলন্ত বাষ্পীয় কুণ্ডলী সূর্যপৃষ্ঠে যে জোয়ার সৃষ্টি হয় তাতে সূর্যপৃষ্ঠ থেকে বাষ্পীয় পদার্থ বিচ্ছিন্ন হয়ে ঐ নক্ষত্রের দিকে

ছুটে যায়। কিন্তু বিচ্ছিন্ন বাষ্পপিণ্ডগুলো দ্রুত ধাবমান তারকার সাথে মিলিত হবার পূর্বেই ঐ নক্ষত্র মহাশূন্যে সূর্য থেকে বহুদূরে চলে যায়। তখন বাষ্পপিণ্ডগুলো দ্রুতগতিতে সূর্যের চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করতে শুরু করে। বিস্ফোরণের সময় বাষ্পীয় গ্রহকণা থেকে সৌরজগৎ সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় পদার্থগুলো ছোট বড় বিভিন্ন আকৃতিক অসংখ্য কঠিন পদার্থের টুকরায় পরিণত হয়। ঐ টুকরাগুলোই গ্রহকণা

অতঃপর ঘূর্ণায়মান গ্রহকণাগুলোর মধ্যে অপেক্ষাকৃত বড় টুকরা বা কণাগুলো নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণে কুণ্ডলী আকারে আস্তে আস্তে জমাট বাধে এবং পৃথক পৃথকভাবে একাধিক গ্রহ সৃষ্টি হয়। আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণাগুলো জমাট বেধে গ্রহগুলোর চারপাশে ঘুরতে থাকে। এদেরকে আমরা বলি উপগ্রহ। এ ছাড়া যে সব কণা জমাট বাধার সুযোগ পায় নি সেগুলো উল্কারূপে বিরাজ করছে। গ্রহকণা থেকে এভাবে সৌরজগতের উৎপত্তি বা সৃষ্টি হয়েছে বলে মত প্রকাশ করায় এই মতবাদ গ্রহকণা মতবাদ নামে অভিহিত হয়।

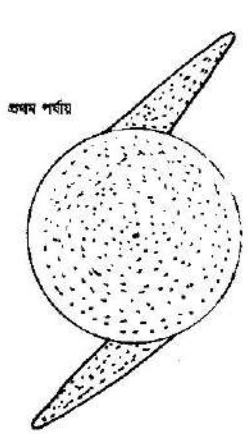

চিত্র : ৭. গ্রহকণা থেকে সৌরজগৎ সৃষ্টি প্রক্রিয়া (ক)

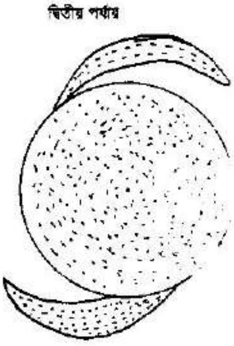

চিত্র : ৮. গ্রহকণা থেকে সৌরজগৎ সৃষ্টি প্রক্রিয়া (খ)

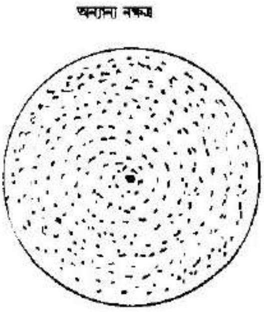

চিত্র : ৯. গ্রহকণা থেকে সৌরজগৎ সৃষ্টি প্রক্রিয়া (গ)

গ্রহকণা মতবাদের সমালোচনা

(১) কান্ট ও লা প্লাসের মতবাদের মতো এই গ্রহকণা মতবাদটিও সূর্য ও গ্রহগুলোর মধ্যে কৌণিক ভরবেগের বণ্টন ব্যাখ্যা দিতে পারে নি।

(২) সূর্য থেকে বিচ্ছিন্ন গ্রহগুলো এত বেশি উত্তপ্ত ছিল যে তা জমাট বাঁধা সম্ভব ছিল না।

(৩) আগন্তুক তারকার প্রভাবে সূর্যপৃষ্ঠে যে জোয়ার সৃষ্টি হয় তাতে উভয় পার্শ্ব হতেই গ্রহকণা বিচ্ছিন্ন হলেও গ্রহগুলো সব কেন একই দিকে আবর্তন করে তা জানা যায় না।

(৪) সূর্য থেকে ছোট গ্রহগুলো নিকটে ও দূরে এবং বড়গুলোর মধ্যস্থলে অবস্থান করার কোন কারণ এই মতবাদ হতে জানা যায় না।

জিনস ও জেফরিজের জোয়ার মতবাদ

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে (১৯১৯) জেমস জিনস এবং জেফরিজ নামক বৃটিশ বৈজ্ঞানিকদ্বয় গ্রহকণা মতবাদকে সংশোধন করে নতুন মতবাদ উপস্থাপন করেন। যা জোয়ার মতবাদ নামে

চিত্র : ১০. জোয়ার মতবাদ (ক)

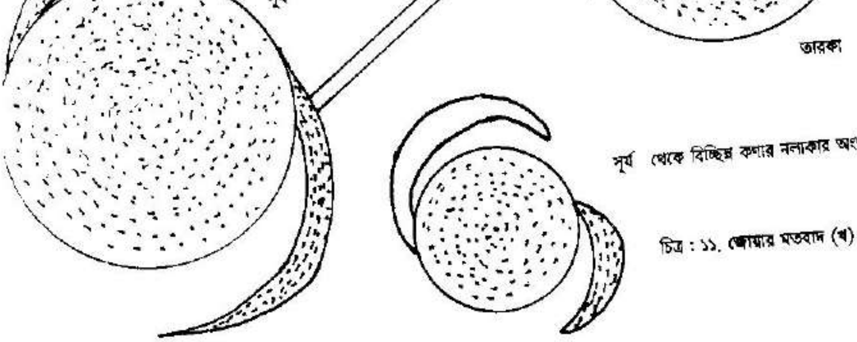

চিত্র : ১১. জোয়ার মতবাদ (খ)

পরিচিত। এই মতবাদ অনুযায়ী সূর্য পৃষ্ঠের বিস্ফোরণ নয়, সূর্য পৃষ্ঠে সৃষ্ট জোয়ারের প্রভাবই গ্রহ সৃষ্টির কারণ। তাদের মতে সূর্য থেকে কয়েক গুণ বড় একটি নক্ষত্র সূর্যের কাছাকাছি আসায় সূর্যপৃষ্ঠে যে জোয়ার সৃষ্ট হয় তাতে সূর্যের অংশবিশেষ বিচ্ছিন্ন হয়ে গ্রহ উপগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে।

সৌরজগৎ সৃষ্টির জোয়ার মতবাদ অনুযায়ী সূর্যের দিকে এগিয়ে আসা নক্ষত্রের আকর্ষণে সূর্যপৃষ্ঠে যে জোয়ার সৃষ্টি হয় তা ক্রমশ তীব্র হতে থাকে এবং সূর্যের উপরিভাগ স্ফীত হয়ে ওঠে এই স্ফীত অংশটি ক্রমশ লম্বা হতে থাকে এবং উভয়ের আকর্ষণে মাঝখানে স্ফীত এবং দুইপ্রান্ত সরু হয়ে পটলের মতো আকৃতির একটি বস্তু বিচ্ছিন্ন হয়। নক্ষত্রটি যতই নিকটবর্তী হতে থাকে বিচ্ছিন্ন অংশটির গতিবেগ ততই বাড়তে থাকে। কিন্তু এই বাষ্পাকার পটলাকৃতি নলটি ঐ নক্ষত্রের সাথে মিলিত হবার আগেই নক্ষত্রটি দ্রুতবেগে সূর্য থেকে দূরে চলে যায়। অতঃপর ঐ নলটি সূর্যের আকর্ষণের কারণে সূর্যের চারদিকে পরিভ্রমণ করতে থাকে।

বাষ্পাকার পটলাকৃতি বস্তুটির ঘনত্ব প্রান্তভাগ অপেক্ষা অনেক বেশি থাকায় তাপ বিকিরণ করতে করতে প্রান্তভাগই প্রথম তরলাবস্থা প্রাপ্ত হয়। তরলিত প্রান্তদ্বয় বাষ্পাকার বস্তুর সাথে একত্রে থাকতে না পেরে বিচ্ছিন্ন হয়ে দুটি গ্রহের সৃষ্টি হয়। এভাবে মূল বস্তুটি ভেঙে একে একে অন্যান্য গ্রহ সৃষ্টি হয়। এ জন্যই ক্ষুদ্র গ্রহগুলো সূর্যের কাছে ও দূরে অবস্থিত এবং বড় গ্রহগুলো মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থান করছে। ক্ষুদ্রাকার গ্রহগুলো সৃষ্টির সময় থেকেই দ্রুত তরল বা কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু বড় গ্রহগুলো জ্বলন্ত বাষ্পীয় অবস্থা থেকে ধীর গতিতে তরল ও কঠিন অবস্থায় আসে।

জিনসের মত অনুযায়ী গ্রহগুলোর উপর সূর্যের আকর্ষণে জোয়ার সৃষ্টি হলে তা বিচ্ছিন্ন হয়ে উপগ্রহ সৃষ্টি করে। জোয়ার মতবাদ দ্বারা গ্রহগুলোর একই দিকে আবর্তনের কারণ ব্যাখ্যা করা যায়। এ ছাড়া উপগ্রহগুলোর কক্ষ সমতল মূল গ্রহগুলোর কক্ষ সমতলের সাথে সূক্ষ্মকোণে অবস্থানের কারণ জানা যায়। জেফরীজের মতে জোয়ার সৃষ্টির আগে সূর্য ও অন্য নক্ষত্রের মধ্যে পারস্পরিক সংঘর্ষ বাধে, তাই এই মতবাদকে সংঘর্ষবাদও বলা হয়।

ডঃ লিটলটনের ত্রি নক্ষত্রবাদ

লিটলটনের মতে (১৯৩৬) সূর্য কখনও সম্পূর্ণ একা বিরাজমান ছিল না, তার একটি সঙ্গী নক্ষত্র ছিল। যা অন্যান্য নক্ষত্রের বেলায় দেখা যায়। এরপর মহাশূন্য থেকে তৃতীয় একটি নক্ষত্র তাদের কাছে আসায় উভয়ের মধ্যে জোয়ারের সৃষ্টি হয়। তৃতীয় নক্ষত্র যতই ঐ যুগ্ম নক্ষত্রের কাছে আসে ততই জোয়ার বেগ বাড়তে থাকে। আস্তে আস্তে উভয়ের বহির্দেশ স্ফীত হয়ে ফিতা আকারে উভয়কে সংযুক্ত করে দেয়। যখন তৃতীয় নক্ষত্র আবার মহাশূন্যে চলে যায় তখন সঙ্গী

নক্ষত্রটি ঐ একই গতিপথ অনুসরণ করে। কিন্তু ফিতার ন্যায় অংশটির খানিকটা সূর্যের আকর্ষণে সূর্যের চারপাশে ঘুরতে থাকে। কালক্রমে এটা ঘনিভূত হয়ে বিভিন্ন গ্রহ উপগ্রহ সৃষ্টি করে।

চিত্র : ১২ নক্ষত্রবাদ

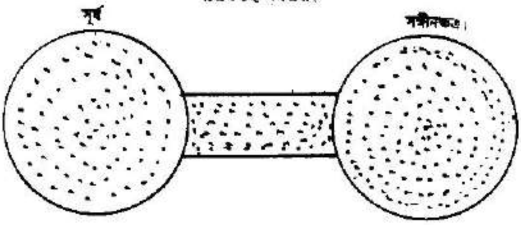

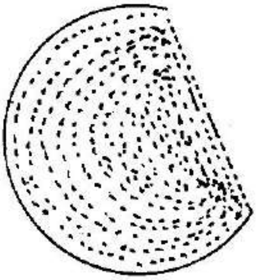

চিত্র : ১৪ বৃহৎনক্ষত্র

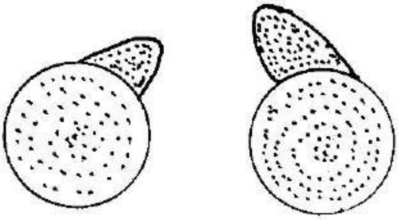

চিত্র : ১৩, ত্রি-নক্ষত্রবাদ প্রক্রিয়া সংঘটন

লিটলটন তার মতবাদে তৃতীয় নক্ষত্রের ভর এবং গতিবেগ সম্পর্কে বলেন এর গতিবেগ ছিল প্রতি সেকেন্ডে ১০০ মাইল এবং নক্ষত্রটি সূর্য থেকে কমপক্ষে বিশগুণ ভারী। (ইসলাম, ১৯৮৫)।

পৃথিবীসৃষ্টির আধুনিক মতবাদসমূহ

সৌরজগৎ সৃষ্টি সম্পর্কে কুইপারের মতবাদ : বিগত তিন দশকের মধ্যে সৌরজগৎ সৃষ্টি সম্পর্কে যে সব মতবাদ উপস্থাপিত হয়েছে তাদের মধ্যে মার্কিন বিজ্ঞানী কুইপারের (১৯৫৫) মতবাদ সর্বপেক্ষা তথ্য নির্ভর। তার মতে, বর্তমান সূর্যের চেয়ে কমপক্ষে দশগুণ ভারী চাকতির মতো নীহারিকা একটি ঘোলাটে মধ্যবস্তুকে ঘিরে বিরাজমান ছিল। যা পরে সূর্যে পরিণত হয়। নীহারিকাটি সংকুচিত হয়ে চ্যাপ্টা হয়ে পড়লে ক্রমে অশান্ত হতে থাকে এবং কতগুলো পৃথক অংশে ভাগ হয়ে পড়ে। বাষ্পীয় পদার্থ বেষ্টিত হয়ে অধিক কঠিন বস্তুগুলো অভ্যন্তরভাগে জমাট বাধে এবং এক একটি গ্রহ সৃষ্টি হয়। সৃষ্টির সময় পৃথিবী বর্তমান অপেক্ষা এক হাজার গুণ বড় ছিল সূর্য ও নীহারিকাটি প্রায় একই উপাদানে গঠিত ছিল।

গ্রহগুলো সংকুচিত হয়ে একইভাবে আবার উপগ্রহগুলো সৃষ্টি করে। তাদের মধ্যে পারস্পরিক জোয়ারে ঘূর্ণন বেগ কমে যায়। আর মধ্যবস্তুটি সংকুচিত হয়ে একটি নক্ষত্রে পরিণত হয় এবং উত্তাপ বাড়তে থাকে, নক্ষত্রটি থেকে বিচ্ছিন্ন অংশ এবং সৌরতেজ বিকীর্ণ হয়ে তাকে বেষ্টিত বাষ্পপিণ্ডগুলোকে ক্রমশ ঠাণ্ডা করে তোলে। ফলে সূর্যের ঘূর্ণন বেগ আস্তে আস্তে কমে আসে এবং গ্রহগুলোর ঘূর্ণনবেগ বৃদ্ধি পায়। এভাবে সূর্যের কৌণিক ভরবেগ ধীরে ধীরে গ্রহগুলোর মধ্যে সঞ্চারিত হয়। সেজন্যই সূর্যের কৌণিক ভরবেগ মাত্র ২% ভাগ এবং গ্রহগুলোর ৯৮% ভাগ।

সূর্যের নিকটবর্তী গ্রহগুলো অধিক পরিমাণে গ্রহকণা ত্যাগ করে বলে আকৃতিতে ছোট হয় তবে তাদের ঘনত্ব বেশি। অন্যদিকে বৃহস্পতি ও শনি গ্রহ বেশি গ্রহকণা সংরক্ষণ করতে সক্ষম হয় বলে আয়তনে বড় কিন্তু তাদের ঘনত্ব কম। তাপ বিকিরণের ফলে সংকুচিত হওয়ার সাথে সাথে গ্রহগুলোর ঘূর্ণন বেগ বাড়তে বাড়তে বর্তমান অবস্থা প্রাপ্য হয়েছে। গ্রহগুলো সংকুচিত হয়ে তাদের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি কমে গেলেও উপগ্রহগুলোকে আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। কিন্তু কয়েকটি উপগ্রহ তাদের আকর্ষণী শক্তির বাইরে চলে যায়। কুইপারের মতে প্লুটো এই ধরনের একটি উপগ্রহ যা নেপচুনের আওতার বাইরে চলে যায়। এ মতবাদ থেকে কতকগুলো উপগ্রহের অনিয়মিত পরিভ্রমণের কারণ ব্যাখ্যা করা যায়।

এ মতবাদ অনুযায়ী সৃষ্টি পরম্পরায় ধীরে ধীরে সৌরজগতের মধ্যে অপেক্ষাকৃত ভারী উপাদানগুলো সৃষ্টি হতে থাকে। নাক্ষত্রিক বিবর্তনের প্রথম পর্যায়ের নক্ষত্রগুলোর মধ্যে অপেক্ষাকৃত ভারী উপাদান গঠিত হয়। তৃতীয় পর্যায়ের নক্ষত্রগুলো আরও ভারী উপাদানে গঠিত হয়। সূর্য এই পর্যায়ের সৃষ্ট নক্ষত্র।

সৌরজগৎ সৃষ্টি সম্পর্কে অটোস্মিট এর মতবাদ

সৌরজগৎ সৃষ্টি সম্বন্ধে কুইপারের অধিকতর বিজ্ঞানসম্মত মতবাদটিতেও কিছু অসঙ্গতি ছিল। কারণ তার মতবাদ অনুযায়ী প্রথম পর্যায়ে সৃষ্ট নক্ষত্র কেবল হিলিয়াম ও হাইড্রোজেন উপাদানে গঠিত হবে। তার মধ্যে কোন ভারী উপাদান থাকবে না। অথচ বাস্তবে এমন কোনো নক্ষত্র খুঁজে প্যাওয়া যায় নি। সোভিয়েত বিজ্ঞানী অটোস্মিট সৌরজগতের সৃষ্টি প্রক্রিয়াকে আরও বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে ব্যাখ্যা করতে সচেষ্ট হন।

তিনি সূর্যকে মহাশূন্যের অন্যান্য জোতিষ্ক থেকে বিশেষভাবে আলাদা করে দেখেন নি। বরং সৌরজগৎ সৃষ্টির ব্যাপারে সমগ্র পরিবেশের প্রভাব বিবেচনা করেছেন। কারণ সূর্য ছায়াপথের মধ্যেই একটি নক্ষত্র। তার মতে এই সৌরজগৎ সৃষ্টির পূর্বে সূর্যের চারপাশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাগতিক বস্তু একত্রে বিরাট আকারে পুঞ্জিভূত ছিল। কালের বিবর্তনে তাদের মধ্যে গতির শক্তি হ্রাস পায় এবং পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। ফলে পুঞ্জিভূত বস্তুগুলো চেপ্টাকার ধারণ করে এবং তার ঘনত্ব বৃদ্ধি পায়। এই বিবর্তনের সময় তার উপর সূর্যের প্রভাব পড়ে। ক্রমে তা ভেঙে কঠিন ও বাষ্পীয় পদার্থগুলো আলাদা হয়। এভাবে সূর্যের নিকটে অপেক্ষাকৃত ছোট ও অধিক ঘনত্বসম্পন্ন গ্রহের জন্ম হয়। চাপ কম থাকায় বাষ্পীয় অংশ সূর্য থেকে অনেক দূরে নিক্ষিপ্ত হয়, যা পরে ঘনীভূত হয়ে কম ঘনত্ব সম্পন্ন কিছু বড় এবং কিছু ছোট গ্রহ সৃষ্টি করে। চেপ্টা পুঞ্জিভূত বস্তুটি কিভাবে সূর্যের আওতায় এল তার ব্যাখ্যা দিতে তিনি তিনটি বিষয় উল্লেখ করেছেন। সেগুলো হচ্ছে—

(১) ছায়াপথের পরিভ্রমণ

(২) ছায়াপথের মধ্যে ঘনকালো জমাট বাঁধা মেঘপুঞ্জের অবস্থান। এবং

(৩) সৌরজগতের মধ্যে অগণিত উল্কাপিণ্ডের অবস্থান।

এই তিনটি বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বলেন যে, ছায়াপথের একটি অংশ সূর্য পরিভ্রমণকালে একইসাথে ভ্রাম্যমান অন্যান্য ক্ষুদ্র বৃহৎ উল্কাপিণ্ডসহ উল্লেখিত ঘনকালো মেঘপুঞ্জকে মহাকর্ষের প্রভাবে সূর্যের আওতায় আনতে সক্ষম হয়। পরে মেঘপুঞ্জটি সূর্যের সাথে তার চারদিকে উপবৃত্তকার পথে ছায়াপথের মধ্যে পরিভ্রমণ শুরু করে। পরে তার মধ্যে অবস্থিত কঠিন বস্তুগুলো থেকে গ্রহের জন্ম হয় এবং কিছু কিছু অংশ নিয়ে ধূমকেতু ও নানা আকৃতির উল্কাপিণ্ড সৃষ্টি হয়।

অটোস্মিট তার মতবাদে উল্কাপিণ্ডগুলোকে গ্রহ সৃষ্টির প্রধান উপাদান বলে মত প্রকাশ করেন। কিন্তু তার মতবাদকে সমালোচনাকারীরা গ্রহ সৃষ্টির পূর্বে উল্কাপিণ্ডের অবস্থানকে স্বীকার করেন না এবং বাষ্পীয় পদার্থকেই গ্রহ সৃষ্টির উপাদান বলে মনে করেন। তাছাড়া এই মতবাদ অনুযায়ী পৃথিবী সৃষ্টির প্রথম পর্যায়ে সৃষ্ট পাললিক শিলাস্তরের মধ্যে উল্কাপিণ্ড থাকবার কথা কিন্তু বাস্তবে তার প্রমাণ পাওয়া যায় নি।

সৌরজগৎ সৃষ্টি সম্বন্ধে উইজ স্যাকারের মতবাদ

পৃথিবী সৃষ্টি সম্পর্কে উইজ স্যাকার প্রদত্ত মতবাদ বলা হয় যে, সূর্য এক সময় আন্তঃনাক্ষত্রিক মেঘের একটি অপেক্ষাকৃত ঘন অঞ্চলে উপস্থিত হয় এবং তার চারপাশে এই মেঘের একটি পুরু আবরণ আকর্ষিত হয়, যার বিস্তৃতি ছিল বর্তমানের দূরতম গ্রহ পর্যন্ত এবং এর ভর ছিল সূর্যের ভরের প্রায় এক দশমাংশ আবরণের বস্তুকণাগুলোর অভ্যন্তরীণ ঘর্ষণের ফলে এদের পরিক্রমণের প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়। তারপর কালক্রমে বস্তুকণাগুলো বিভিন্ন গোলাকার বস্তুসমষ্টিতে পরিণত হয় এবং এদের কক্ষসমতলে মোটামুটিভাবে সূর্যের নিরক্ষ সমতলের সমতায় উপনীত হয়। কিন্তু এই মতবাদও যথেষ্ট বিজ্ঞানসম্মতভাবে সৃষ্টি রহস্য ব্যাখ্যা করতে পারে নি।

উপসংহার : সৌরজগৎ সৃষ্টি মতবাদগুলোর কোনটিই সামগ্রিকভাবে গ্রহণীয় বলে স্বীকৃত হয় নি। প্রত্যেক মতবাদের কোন না কোন একটি ত্রুটি থাকায় আজ পর্যন্ত সৃষ্টি প্রক্রিয়া উদঘাটনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। সময়ের অগ্রগতির সাথে সাথে অধিকতর তথ্যনির্ভর যুক্তি ও বিজ্ঞান সম্মত মতবাদ উপস্থাপিত হচ্ছে। তবে একটি ব্যাপারে সবাই একমত যে, পৃথিবী সৃষ্টিকালে ছিল এক জ্বলন্ত বাষ্পপিণ্ড। লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরে তাপ বিকিরণের মাধ্যমে সংকুচিত ও তরল অবস্থাপ্রাপ্ত পৃথিবী পরে আরও তাপ বিকিরণ করে ক্রমশ কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

৩.৪ পৃথিবীর আকার ও আবর্তন

ভূমিকা : আমরা পৃথিবীপৃষ্ঠে বাস করি। একটি বৃহৎ বস্তুর অংশবিশেষ হতে বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে বস্তুটি সমতল বলে মনে হয়। আমরা বৃহৎ পৃথিবীর ক্ষুদ্রতর অংশকে একসঙ্গে দেখতে পাই বলে পৃথিবীপৃষ্ঠ সমতল বলে মনে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পৃথিবী অভিগত গোলক মহাকাশের গোলাকার জ্যোতিষ্ক সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত, সমুদ্রগামী জাহাজ, দিগন্তের পরিধি মহাশূন্য থেকে তোলা ছবি ইত্যাদি পরীক্ষা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, পৃথিবী অভিগত গোলক।

পৃথিবী নিজ অক্ষে পশ্চিম হতে পূর্ব দিক আবর্তন করে। একটি ঘূর্ণায়মান লাটিম সব সময় তার অক্ষকে ভিত্তি করে ঘুরতে থাকে। তেমনি পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ মেরুকে সংযোগ করে একটি আঞ্চলিক অক্ষ ধরে লওয়া হয়। এই অক্ষকে ভিত্তি করে পশ্চিম হতে পূর্বদিকে আবর্তন করে। পৃথিবীর আবর্তন গতির জন্যই দিবা-রাত্রি সংঘটিত হয়। পৃথিবী নিজ অক্ষে ২৪ ঘণ্টায় একবার আবর্তন করে।

ক. পৃথিবীর আকার : আমাদের এই পৃথিবীটা মস্ত বড়। পৃথিবী সৌর জগতের দশটি গ্রহের মধ্যে একটি। শুক্রের পরই পৃথিবীর অবস্থান। পৃথিবী একটি আদর্শ গ্রহ । গ্রহদের মধ্যে পৃথিবীর কয়েকটি গুণাগুণ রয়েছে। গ্রহদের মধ্যে পৃথিবীর আপেক্ষিক গুরুত্ব বেশি। একমাত্র পৃথিবীতে জল

আছে, বায়ুমণ্ডলে প্রচুর অক্সিজেন আছে, তাছাড়া রয়েছে উষ্ণতা ও তাপমাত্রার সংমিশ্রণ। সে কারণেই পৃথিবীতে জীবজন্তু গাছপালা প্রভৃতি রয়েছে। আর এ কারণেই পৃথিবীকে আদর্শ গ্রহ বলা হয়।

আপাত দৃষ্টিতে আমাদের নিকট মনে হয় পৃথিবীপৃষ্ঠ সমতল। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সমতল নয়, এটি অপেক্ষাকৃত গোলাকার। কোন বৃহৎ বস্তুর অংশবিশেষ থেকে এর সঠিক আকার অনুমান করা যায় না। আয়তনের তুলনায় পৃথিবীর অতি ক্ষুদ্রতম অংশকেই আমরা একসঙ্গে দেখতে পাই। তাই এটি সমতল দেখায়। সাধারণভাবে পৃথিবীর আকৃতিকে গোলাকার বলা হলেও এটি ঠিক গোল নয়। প্রকৃতপক্ষে এই গোলীয় (Spherical) পৃথিবীর উত্তর দক্ষিণ ভাগ কিছুটা চাপা এবং নিরক্ষ অঞ্চল সামান্য স্ফীত। এটি অনেকটা কমলালেবুর আকার।

বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর আকৃতি নিয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। অধুনা আমেরিকার বিজ্ঞানীদের ধারণা মোতাবেক পৃথিবীর আকৃতি অনেকটা আপেলের ন্যায়।

নিচে পৃথিবীর আকার সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের বিভিন্ন পরীক্ষা ও যুক্তিগুলো উল্লেখ করা হলো :

(১) দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে আকাশের গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি জ্যোতিষ্ককে গোলাকার দেখায়, পৃথিবীও একটি জ্যোতিষ্ক। সুতরাং পৃথিবীর আকৃতি গোলাকার বলে ধারণা করা হয়।

(২) ১৫৯৯ খ্রিষ্টাব্দে শতাব্দীর মহা আবিষ্কার যুগে ফার্ডিন্যান্ড ম্যাগিলান (Ferdinand Magellan) ১৪৮০-১৫২১ খ্রিঃ) স্পেন থেকে ভিক্টোরিয়া নামে একটি জাহাজ নিয়ে পশ্চিম দিকে যাত্রা শুরু করেন। কয়েক বৎসর পর পুনরায় স্পেনে ফিরে আসেন। পৃথিবী চ্যাপ্টা হলে তার জাহাজ পৃথিবীর শেষ প্রান্তে পৌঁছে যেত। কিন্তু সেটা হয় নি। এ থেকে প্রমাণ হয় যে, পৃথিবী গোলাকার।

(৩) তিনটি সমান লম্বা দণ্ড তিনটি কাঠের মধ্যে দাঁড় করে যদি কোন শান্ত জলরাশির মধ্যে এক কিলোমিটার অন্তর অন্তর দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে লক্ষ্য করা হয় তবে দেখা যায় তিনটি দণ্ডের মাঝেরটি অপেক্ষাকৃত উপরে। এ থেকে বলা যায় ঐ জলরাশির উপরিভাগ যদি সমতল হতো তবে তিনটি দণ্ডই একই সরল রেখায় দেখা যেত। এতে প্রমাণ পাওয়া যায় পৃথিবী সমতল নয় গোলাকার।

(৪) বিভিন্ন মহাকাশচারী চন্দ্রে অবতরণ করেছেন এবং সেখান হতে পৃথিবীর যে চিত্র গ্রহণ করেছেন তাতে স্পষ্টই দেখা গেছে, পৃথিবীর আকৃতি গোলাকার। এটিই পৃথিবীর আকৃতি সম্পর্কিত নির্ভুল প্রমাণ।

(৫) পূর্ব দিকের দেশগুলোতে তাদের পশ্চিমে অবস্থিত দেশগুলোর আগে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত

হয়। পৃথিবী সমতল হলে একই সময়ে সর্বত্র সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত হতো। কিন্তু পৃথিবী গোলাকার বলে একই সময়ে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত হয় না।

(৬) সাগর তীরে দাঁড়ালে প্রথমে তীরগামী জাহাজের মাস্তুল, পরে চোঙা এবং ক্রমশ সমগ্র জাহাজটি দৃষ্টিগোচর হয়। পৃথিবী গোলাকার বলেই এমনটি হয়।

(৭)চন্দ্র পৃথিবীর চতুর্দিকে এবং পৃথিবী সূর্যের চতুর্দিকে ঘোরে। এইভাবে ভ্রমণ করতে করতে কখনও কখনও পৃথিবী সূর্য ও চন্দ্রের মধ্যস্থানে গিয়ে উপস্থিত হয় । তখন পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রের উপর পড়ে এবং চন্দ্রের এই অবস্থানকে চন্দ্রগ্রহণ বলে। প্রত্যেক চন্দ্রগ্রহণের সময় পৃথিবীর ছায়া গোলাকার দেখা যায়। এ থেকে প্রমাণিত হয় পৃথিবী গোলাকৃতি।

পৃথিবীর আকার অভিগত গোলকরূপে প্রমাণ

পূর্বেই উল্লেখ করেছি পৃথিবীর আকৃতি সম্পূর্ণ গোল নহে। এর মেরু দুটি কিছুটা চাপা এবং নিরক্ষীয় প্রদেশ কিছুটা স্ফীত। তাছাড়া বিজ্ঞানীগণও বিভিন্ন তথ্য ও প্রমাণের সাহায্যে দেখিয়েছেন যে, পৃথিবী গোলাকার নয়, বরং অভিগত গোলক।

(১) পৃথিবী সর্বদা তার আপন কক্ষ পথে পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে আবর্তিত হচ্ছে। এই আবর্তনের ফলে পৃথিবীর কেন্দ্রাতিগ বলের সৃষ্টি হয়। এই বলের জন্য এর মধ্যভাগ কিছুটা স্ফীত হয়ে গেছে। হিসেব করে দেখা গেছে পৃথিবীর উত্তর দক্ষিণ এবং পূর্ব পশ্চিমে নিরক্ষীয় ব্যাসের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এই পার্থক্যের পরিমাণ ৪৩ কিলোমিটার। অর্থাৎ উত্তর দক্ষিণ পরিধি কিছুটা বড় এতে বোঝা যায় পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তভাগ নিরক্ষীয় প্রদেশ অপেক্ষা কিছুটা চাপা।

(২) আমরা জানি, পৃথিবীর সকল বস্তুকে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি তার কেন্দ্রের দিকে টানছে। কিন্তু এই টান কেন্দ্র হতে দূরত্ব অনুসারে পার্থক্য ঘটে। ফলে বস্তুটির ওজনেরও পার্থক্য ঘটে। কোন বস্তুকে দু'টি মেরুতে এবং নিরক্ষীয় অঞ্চলে ওজন করলে দেখা যায় নিরক্ষীয় অঞ্চলে এই ওজন কম। পৃথিবীর আকর্ষণের তারতম্যের জন্যই এইরূপ পার্থক্যের কারণ। এ থেকে বোঝা যায় পৃথিবীর কেন্দ্র হতে নিরক্ষরেখা ও মেরুদ্বয়ের দূরত্ব বেশ কিছুটা কম।

(৩) নিরক্ষ রেখা হতে দৃশ্যমান কোন নক্ষত্রকে দিগন্তের উপর দেখা গেলে নিরক্ষরেখা হতে দক্ষিণ বা উত্তরে ১১১ কিলোমিটার অগ্রসর হলে নক্ষত্রটিকে দিগন্তের ১° উপরে দেখা যায়। কিন্তু মেরু হতে ঠিক ১১১ কিলোমিটার একই দিকে অগ্রসর হয়ে দেখলে নক্ষত্রটিকে ১° কম সারিতে দেখা যায়। এতে প্রমাণিত হয় পৃথিবীর নিরক্ষদেশ মেরু অপেক্ষা অধিক গোলাকার।

খ. পৃথিবীর আবর্তন

পৃথিবী হচ্ছে প্রায় গোল যার চারদিকে শিলাবৃত্ত এবং বায়ুমণ্ডল একে ইনভেলাপের ন্যায় বেষ্টন করে রয়েছে। মাধ্যাকর্ষণ শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে পৃথিবী সূর্যের চারদিকে লাটিমের ন্যায় আবর্তিত হচ্ছে। প্রতি বৎসরে অর্থাৎ ৩৬৫$\frac{১}{৪}$ দিনে সূর্যের চারদিকে পরিভ্রমণ করছে। এই ঘূর্ণনকেই বলা হয় আবর্তন। এই আবর্তনের সময় পৃথিবীর যে অংশটিতে আলো পড়ে সেখানে দিন এবং বিপরীত অংশে রাত। সূর্য হতে পৃথিবীর গড় দূরত্ব ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল।

জ্যোতির্বিদগণ পৃথিবীর দুই প্রকার গতি প্রমাণ করেছেন। যথা—আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতি।

(১) আহ্নিক গতি

পৃথিবী নিজ মেরুরেখায় বা অক্ষে (Axis) অবিরাম পশ্চিম হতে পূর্বদিকে আবর্তন (Rotation) করছে। এভাবে একবার আবর্তন করতে পৃথিবীর প্রায় ২৪ ঘণ্টা বা একদিন সময় লাগে। সূক্ষ্ম হিসেবে সময় হলো ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট ৪ সেকেনড। পৃথিবীর এই গতিকে দৈনিক বা আহ্নিক গতি (Diurnal Motion) এবং সময়কে সৌরদিন (Solarday) বলে।

বিষুব রেখার উপর পৃথিবীর পরিধি প্রায় ৪০,২৫০ কি.মি.। এ হিসেবে নিরক্ষরেখায় আহ্নিক গতির বেগ প্রতি ঘণ্টায় ১,৬১০ কিলোমিটারের অধিক। কিন্তু নিরক্ষ রেখা হতে উত্তর দক্ষিণে ক্রমান্বয়ে এ গতিবেগ কমতে থাকে। ৬০° অক্ষাংশে আহ্নিক গতির বেগ প্রায় ১,০৯৫ কি.মি. এবং মেরুদ্বয়ে এ গতি নেই বললেই চলে। বিজ্ঞানীগণ মনে করেন যে, পৃথিবীর আহ্নিক গতি ধীরে ধীরে কমে আসছে। ফলে সৌরদিনের দৈর্ঘ্য প্রতিদিন এক সেকেন্ডের হাজার ভাগের এক ভাগ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আহ্নিক গতির ফলে দিবারাত্রি সংঘটিত হয় এবং আহ্নিক গতি বায়ুপ্রবাহ এবং সমুদ্র স্রোতের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে।

আহ্নিক গতির ফলে দিবারাত্রি সংঘটিত হয় : অন্ধকার ঘরে টেবিলের উপর একটি জ্বলন্ত বাতি রেখে তার সামনে একটি ভূ-গোলক ঘোরালে দেখা যাবে বাতির মুখোমুখি অংশ আলোকিত এবং বিপরীত অংশ অন্ধকার থাকে। এভাবে বর্তুলাকার ও আবর্তনশীল পৃথিবীর যে অর্ধাংশে সূর্য কিরণ পড়ে, সে অংশে দিন হয়। সে সময় পৃথিবীর বিপরীত অর্ধাংশ সূর্যালোকের অভাবে অন্ধকার থাকে। ঐ অংশে তখন রাত। ভূ-পৃষ্ঠের সৌরদীপ্ত এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন সংযোগ স্থলকে ছায়াবৃত্ত (Shadow Circle) বলে।

সূর্যোদয়ের এবং সূর্যাস্তের অব্যবহিত পূর্বের ও পরের সময়কে যথাক্রমে উষা ও গোধূলি (Twilight) বলা হয়। এ সময় ধূলিকণাময় বায়ুমণ্ডলের নিম্নস্তরে ঈষৎ সূর্যকিরণের

প্রতিফলনে আকাশের আলো ঝাপসা ও নিষ্প্রভ মনে হয়।

আহ্নিক গতি বায়ুপ্রবাহ এবং সমুদ্র স্রোতের ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে : আবর্তন না থাকলে বায়ু এবং সমুদ্রস্রোতসমূহ সকল অবস্থায় একই দিকে অর্থাৎ নিরক্ষরেখার সাথে সমকোণে প্রবাহিত হতো। কিন্তু কার্যত দেখা যায় সমুদ্র স্রোত ও বায়ু অন্যভাবে প্রবাহিত হয়। আহ্নিক গতি দ্বারা পৃথিবী পশ্চিম হতে পূর্ব দিকে আবর্তন করে এবং এ আবর্তনের গতিবেগ নিরক্ষরেখা হতে মেরু অভিমুখে ক্রমশ হ্রাস পায়। এ উভয় কারণে দেখা যায়, সমুদ্র স্রোত এবং বায়ু বরাবর উত্তর দক্ষিণে প্রবাহিত না হয়ে উত্তর গোলার্ধে ডানদিকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে বামদিকে বেঁকে যায়। এই সূত্রকে ফেরেলের সূত্র বলে।

(২) বার্ষিক গতি

পৃথিবী আপন অক্ষে ২৪ ঘণ্টায় একবার আবর্তনের সঙ্গে যে পৃথিবী একটি নির্দিষ্ট পথে বছরে একবার সূর্যের চতুর্দিকে পরিক্রমণ (Revolution) করে। পশ্চিম হতে পূর্ব দিকে পৃথিবীর এক পরিক্রমণ কালকে বার্ষিক গতি (Annual Motion) এবং একটি পূর্ণ পরিক্রমণ কালকে সৌর বছর বলা হয়।

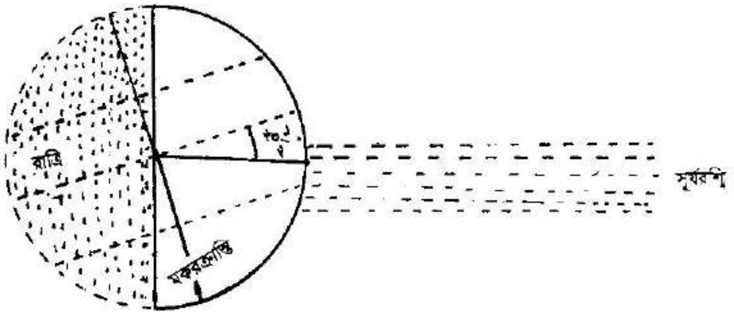

চিত্র : ১৫, নিরক্ষরেখা কক্ষতলের সংগে সমান্তরাল

বার্ষিক গতির গড় বেগ প্রতি ঘন্টায় ১০৬২৬০ কি.মি. বা প্রতি সেকেন্ডে ২৯.৭৬ কি.মি.। ৩৬৫ দিনে সৌর বছর গণনা করা হলেও প্রকৃতপক্ষে সূর্যকে একবার পরিক্রমণ করতে পৃথিবীর ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৭ সেকেন্ড সময়ের প্রয়োজন হয়। এজন্য ইংরেজি হিসাবে প্রতি ৪ বছরে একদিন বাড়িয়ে ৩৬৬ দিনে বছর গণনা করা হয়। সেই বছর ফেব্রুয়ারি মাস ২৮ দিনের পরিবর্তে ২৯ দিনে ধরা হয়। এরূপ বছরকে অধিবর্ষ (Leap Year) বলে।

পৃথিবী যে পথে সূর্যকে পরিক্রমণ করে তাকে পৃথিবীর বক্ষ (Orbit) বলে। এর দৈর্ঘ্য ৯৩৮০৫১৮২৭ কি. মি.। এ কক্ষপথে পরিক্রমণকালে সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব সর্বদা সমান থাকে না।

পহেলা জানুয়ারিতে সূর্য পৃথিবীর নিকটতম অবস্থানে (১৪৬৫৮৩৫০০ কি.মি.) থাকে। একে পৃথিবীর অনুসূর ((perihelion) অবস্থান বলে। কিন্তু পহেলা জুলাই এ সূর্য ও পৃথিবীর দূরত্ব সর্বাপেক্ষা বেশি (১৫১৪২০৫০০ কি.মি.) পৃথিবীর এ অবস্থানকে অপসূর (Aphelion) বলে।

সূর্য ও পৃথিবীর দূরত্বের হ্রাস বৃদ্ধি এবং সেই কারণে সূর্যের আপেক্ষিক আয়তনের আপাত পরিবর্তন প্রমাণিত হয় যে, কক্ষপথ বৃত্তাকার নয়। এটি উপবৃত্তাকার (Eliptical) পৃথিবীর যে তল (Plane) বরাবর এই উপবৃত্তাকার কক্ষপথে পরিক্রমণ করে তাকে কক্ষতল (Plane of the orbit) বলা হয়।

পরিক্রমণকালে পৃথিবীর মেরুরেখা বা অক্ষ কক্ষতলের সঙ্গে সমকোণে বা লম্বভাবে অর্থাৎ নিরক্ষরেখা কক্ষতলের সঙ্গে সমান্তরালভাবে থাকলে সূর্যরশ্মি প্রত্যহ নিরক্ষরেখার ওপর লম্বভাবে পড়ত। এক্ষেত্রে ভূ-পৃষ্ঠে দিবা-রাত্রি সকল সময় সমান হতো।

আবার মেরুরেখা বা অক্ষ কক্ষতলের সমান্তরাল অর্থাৎ নিরক্ষরেখা কক্ষতলের উপর লম্বভাবে অবস্থান করলে পৃথিবীর এক অর্ধাংশ চিরকাল অন্ধকার বা রাত্রি এবং অপর অর্ধাংশ চিরকাল আলো বা দিন থাকত।

এরূপ অবস্থায় দিবা-রাত্রি বা ঋতু পরিবর্তনজনিত কোন বৈচিত্র্য দেখা যেত না। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি লক্ষ করে বিজ্ঞানীগণ অনুমান করেছেন যে, পৃথিবীর অক্ষ বা মেরুরেখা সর্বদা ২৩$\frac{১}{২}$° কোণে হেলে থাকে এবং সূর্যের চারদিকে পরিক্রমণকালে ধ্রুব নক্ষত্রাভিমুখী হয়ে মেরুরেখা কক্ষতলের সঙ্গে ৬৬$\frac{১}{২}$° কোণে অবস্থান করে। এ দ্বিবিধ কারণেই বার্ষিক গতির ফলস্বরূপ দিবা-রাত্রির হ্রাসবৃদ্ধি এবং ঋতু পরিবর্তন ঘটে।

৩.৪.১ মহাবিশ্ব ও পৃথিবী সম্পর্কিত কতিপয় কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য

১. গ্যালাক্সি (Galaxy) কি?

রাতের আকাশে যে অসংখ্য তারা আমরা দেখি এরা সবাই আমাদের এই ছায়াপথ গ্যালাক্সির অন্তর্ভুক্ত। দূরবীণ দিয়ে যতদূর দেখা যায় গ্যালাক্সির কোন শেষ পাওয়া যায় না। মনে হয় যেন এরা কেবলই অন্তহীন। এ পর্যন্ত পৃথিবী থেকে দূরতম যে গ্যালাক্সির সন্ধান পাওয়া গেছে তার দূরত্ব ৫০০ কোটি আলোকবর্ষ।

দূরের গ্যালাক্সি থেকে আগত নাক্ষত্রিক আলোর বর্ণালী বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন যে, গ্যালাক্সিসমূহ ক্রমেই পৃথিবী থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এ ঘটনার ব্যাখ্যা হিসাবে বিজ্ঞানীরা বলেছেন যে, মহাবিশ্ব ক্রমশ প্রসারিত হয়ে চলেছে এবং তার অন্তর্গত গ্যালাক্সিসমূহ পরস্পর থেকে ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে। গ্যালাক্সিসমূহের দূরে সরে যাওয়ার বেগ যে কত প্রচণ্ড তা এ উদাহরণ থেকে বোঝা যাবে যে ২৩ কোটি আলোকবর্ষ দূরের একটি গ্যালাক্সি আমাদের কাছ থেকে সেকেন্ডে ২৪,৪০০ মাইল বেগে দূরে সরে যাচ্ছে।

ক্রমপ্রসারমান মহাবিশ্বের এই বিশাল ব্যাপ্তির মধ্যে একশ' কোটি গ্যালাক্সির একটি গ্যালাক্সি ছায়াপথের অন্তত দশ হাজার কোটি নক্ষত্রের একটি নক্ষত্র সূর্যের পরিমণ্ডলে অবস্থিত সৌরজগতের নয়টি গ্রহের অন্যতম গ্রহ পৃথিবীর মানুষ আমরা। বিশালতার এই অভাবনীয় পরিসরে আমাদের পৃথিবীর অবস্থান প্রায় অদৃশ্য একটি বিন্দুর মতো। এ বিষয়টি উচ্চারণ করা যতখানি সহজ, বোধের অন্তর্গত করা ঠিক ততখানি সহজ নয়।

২. ছায়াপথ (Milkyway) কি?

আমাদের সৌরজগৎ যে নক্ষত্রমণ্ডল বা গ্যালাক্সির অন্তর্গত তার ছায়াপথ বা মিলকিওয়ে। ছায়াপথ গ্যালাক্সির বিস্তার প্রায় ১ লক্ষ আলোকবর্ষ। এ গ্যালাক্সির ভেতর বিচ্ছিন্নভাবে একক নক্ষত্র যেমন আছে, তেমনি আছে দল বাধা বহু শতকোটি তারকাগুচ্ছ এবং বিশাল আয়তনের বাষ্পীয় পদার্থপূর্ণ নীহারিকা, যার একটির মাঝে সমগ্র সৌরজগৎ হারিয়ে যেতে পারে।

ছায়াপথ গ্যালাক্সির আকৃতি অনেকটা চ্যাপ্টা একটি চাকতির মতো, যার কেন্দ্রস্থল প্রায় ২০ হাজার আলোকবর্ষ পুরু। সমগ্র চাকতিটা জুড়ে তারাগুলো সমানভাবে ছড়ানো নয়। তারাগুলো এমনভাবে ছড়ানো যে, মনে হয়, চাকতির কেন্দ্র থেকে একাধিক মণ্ডলী পাকানো বাহু বেরিয়ে এসেছে, অর্থাৎ ছায়াপথের গোলাকার চাকতিটা মোটামুটি সর্পিল আকারে বিন্যস্ত। আমাদের সূর্য রয়েছে এমনি একটা বাহুতে, ছায়াপথের কেন্দ্র থেকে প্রায় ৩০ হাজার আলোকবর্ষ দূরে।

আমরা জানি, আমাদের সূর্য নিজের অক্ষের চারপাশে যেমন আবর্তিত হচ্ছে, যেমনি গ্রহ-উপগ্রহ অর্থাৎ সমগ্র সৌরজগৎকে নিয়ে মহাশূন্যে সেকেন্ডে ১২ মাইল বেগে ছুটে চলছে। কিন্তু শুধু আমাদের সূর্য নয়, ছায়াপথ গ্যালাক্সিতে যত নক্ষত্র আছে তারা সবাই এমনিভাবে ঘুরছে এবং ছুটছে। আবার ছায়াপথ গ্যালাক্সিই চাকতির কেন্দ্রের চারপাশে অবিরাম ঘুরছে গ্যালাক্সির সকল নক্ষত্র ও নীহারিকা নিয়ে। সূর্যের কাছাকাছি স্থানে এ গতির পরিমাণ সেকেন্ডে ১৫০ মাইল। পক্ষান্তরে ছায়াপথ গ্যালাক্সির কেন্দ্রের চারদিকে একবার ঘুরে আসতে সূর্যের সময় লাগে ২০ কোটি বছর।

মহাবিশ্বের গ্যালাক্সিসমূহ দল বেঁধে থাকে। আর একটি দলে শত শত, হাজার হাজার গ্যালাক্সি থাকতে পারে। আমাদের ছায়াপথ গ্যালাক্সি যে দলটির অন্তর্ভুক্ত তার নাম দেয়া হয়েছে স্থানীয় দল। এ দলের মোট কুড়িটিরও বেশি গ্যালাক্সি ২৫ লক্ষ আলোকবর্ষ ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট একটা গোলকের সমপরিমাণ স্থান দখল করে ছড়িয়ে আছে।

খালিচোখে আমরা ছায়াপথ ছাড়া অন্য যে তিনটি গ্যালাক্সিকে অস্পষ্টভাবে আলোর ছটার মতো দেখতে পাই, তারা হলো 'এন্ড্রোমিডা' (যার দূরত্ব প্রায় ২২ লক্ষ আলোকবর্ষ) এবং 'ম্যাজিলান-এর মেঘ' নামে এক জোড়া গ্যালাক্সি পৃথিবী থেকে যাদের দূরত্ব প্রায় ১ লক্ষ ২৫ হাজার আলোকবর্ষ। একটি গ্যালাক্সিই নক্ষত্রলোকে আমাদের স্থানীয় দলের অন্তর্ভুক্ত।

৩. ছায়াপথকে দুধাল পথ বলা হয় কেন?

অন্ধকার রাতে পরিষ্কার আকাশে দেখা যায় বিস্তৃত ছায়াপথ, ছায়াপথগুলো অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারার সমষ্টি। এই ছায়াপথের গ্রিক প্রতিশব্দ গ্যালাক্সিয়াস (Galaxious) এর অর্থ হলো 'দুধাল'। পৃথিবী থেকে সবচেয়ে বড় বড় যে সমস্ত নক্ষত্রপুঞ্জ চোখে পড়ে সেগুলোর নাম দেয়া হয়েছে 'দুধাল সাগর' যাকে আমরা ছায়াপথ বা আকাশগঙ্গা বলি। আর দুধাল পথ বলার আরও কারণ, ছায়াপথগুলো দূর থেকে বিস্তৃত পাতলা সাদা মেঘের মতো দেখায় এবং কে যেন দুধ ঢেলে রেখেছে বলে মনে হয়। এ কারণে ছায়াপথের অপর নাম মিল্কিওয়ে (Milkyway) বা দুধাল পথ।

৪. রংধনু (Rainbow) কি?

সূর্যের আলোকরশ্মি আকাশের মেঘের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পানি কণিকার উপর পতিত হয়ে আকাশের গায়ে যে বিচিত্র বর্ণের বৃত্তচাপ সৃষ্টি করে তাকে রংধনু (rainbow) বলে।

এ সকল ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র পানিকণা প্রিজমের মতো কাজ করে। এতে করে আলোক বিচ্ছুরণ ঘটে এবং বর্ণালীর সৃষ্টি হয়। আর তাই হলো রংধনু।

বৃষ্টি হবার ঠিক পরেই সূর্য উঠলে অথবা আকাশে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছে অথচ আকাশে সূর্য আছে এমন অবস্থায় রংধনু দেখা যায়। রংধনুতে সাতটি রং পরিলক্ষিত হয়।

যথা—বেগুনী, নীল, আসমানী, সবুজ, হলুদ, কমলা, লাল।

এই রংগুলোকে একত্রে 'বেনীআসহকলা' বলা হয়। রংধনু দুই প্রকার :

(১) প্রাথমিক রংধনু (Primary Rainbow)

(2) দ্বিতীয় রংধনু (Secondary Rainbow)।

প্রাথমিক রংধনু : সূর্যালোক মেঘের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পানিকণায় দুবার প্রতিসৃত এবং একবার প্রতিফলিত হলে মুখ্য রঙধনুর সৃষ্টি হয়। মুখ্য রংধুন বা প্রাথমিক রংধনুর উপরের দিকে লাল রং এবং নিচের দিকে বেগুনী রং থাকে।

দ্বিতীয় রংধনু : সূর্যালোক মেঘের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পানিকণায় দুবার প্রতিফলিত এবং দুবার প্রতিসৃত হলে দ্বিতীয় রংধনু সৃষ্টি হয়। ভিতরের দিকে লাল এবং বাইরের দিকে বেগুনী রং থাকে।

৫. আকাশ কেন নীল দেখায়?

সাধারণ ধারণা এই যে, খালি চোখে দূর পর্যন্ত দেখা যায় না। যেহেতু চোখের দৃষ্টি ক্ষমতায় রয়েছে নির্দিষ্ট সীমানা। এ সীমার মধ্যে মহাকাশের যে অংশটুকু দেখা যায় তা মহাকাশের খুবই ক্ষুদ্রতম অংশ। আকাশে অসংখ্য মেঘ ভেসে বেড়ায় এবং মেঘ ও মাটির মধ্যবর্তী অঞ্চল সম্পূর্ণরূপে বায়ুতে পূর্ণ। আর এতে রয়েছে ধূলিকণা, জলীয় বাষ্প ইত্যাদি। তাই সাধারণ দৃষ্টিতে আকাশ নীল দেখায়।

আসলে সূর্যের বিভিন্ন আলো তরঙ্গে (তরঙ্গ দৈর্ঘ্য) রয়েছে সাতটি রং। আলোক তরঙ্গ কোন ক্ষুদ্র কণার উপর পড়লে তা ঐ আলোক তরঙ্গতে বিভিন্ন দিকে বিক্ষিপ্ত হয়। একে বলা হয় আলোক বিক্ষেপণ (Scattering)। আবার এই বিক্ষেপণ নির্ভর করে আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের উপর। কম দৈর্ঘ্যের আলোর তরঙ্গে বিক্ষেপণ বেশি হয়। নীল বর্ণের আলোর তরঙ্গে দৈর্ঘ্য কম

সূর্যরশ্মি যখন বায়ুমণ্ডলের সূক্ষ্ম ধূলিকণা ও অণুতে আপতিত হয় তখন নীল রঙের আলোর বিক্ষেপণ বেশি হয় এবং নীল আলোর পরিমাণ বেড়ে যায়। ফলে আকাশ নীল দেখায়। বায়ুমণ্ডল না থাকলে অবশ্য আকাশ নীল দেখাতো না কারণ সে ক্ষেত্রে আলোর বিক্ষেপণ হতো না। মূলত আকাশ নীল দেখায় আলোর বিক্ষেপণ ও বিরাজমান বায়ুমণ্ডলের কারণে।

৬. নক্ষত্র মিটমিট করে জ্বলে কেন?

মেঘশূন্য আকাশে তাকালে দেখা যায় নক্ষত্রগুলো মিট মিট করে জ্বলছে। এরূপ হয় কেন? আকাশে নক্ষত্র মিট মিট করার মূল কারণ হল পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের অসাম্যতা। যখন নক্ষত্রের আলো পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ভেদ করে আমাদের দৃষ্টিশক্তির মধ্যে এসে পৌঁছায়, ঠিক তখনি আমরা তাদের দেখতে পাই। বৈজ্ঞানিকদের অনুসন্ধান সিদ্ধ ফল যে, নক্ষত্রের আলো যত বেশি পথ অতিক্রম করে আসছে, তত বেশি তাকে মিট মিট করতে দেখা যাবে। আমাদের কাছাকাছি যে সকল নক্ষত্রগুলো রয়েছে, সেগুলোর চেয়ে দূরবর্তী নক্ষত্রগুলো বেশি মিটমিট জ্বলতে দেখি। এ ছাড়া আরও প্রমাণিত হয় যে, যে রাত্রিতে উষ্ণতা কম থাকে সে রাত্রিতে নক্ষত্রের মিট মিট করা আরও বেড়ে যায়। বাতাসে জলীয় বাষ্প যদি থাকে তাহলেও নক্ষত্রদের বেশি মিট মিট করতে দেখা যায়। অতএব বলা যেতে পারে বায়ুমণ্ডলের আলোক প্রতিসরিত করবার ক্ষমতার তারতম্যের জন্যই নক্ষত্রেরা মিট মিট করে জ্বলতে থাকে।

৭. আলোর (Light) উদ্ভব হয় কি করে?

আলো এক প্রকার শক্তি যা চোখে প্রবেশ করে দেখার অনুভূতি জন্মায়। আলো তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গাকারে বিকীর্ণ হয়। আমরা কোন বস্তুকে তখনই দেখতে পাই, যখন বস্তুটির উপর থেকে আলো প্রতিফলিত হয়ে আসে এবং আমাদের চোখের রেটিনার উপর পড়ে।

আলোর উৎপত্তি : পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রন ও নিউক্লিয়াসগুলো নির্দিষ্ট দূরত্বের বিভিন্ন গোলকে অবস্থান করে। পরমাণুতে যখন তাপ বা অন্য কোন শক্তি সরবরাহ করা হয়, তখন ইলেকট্রনগুলো এক শক্তি স্তর হতে অন্য শক্তিস্তরে লাফিয়ে চলে যায়। কিন্তু শক্তির উৎস হতে যদি শক্তি সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায় তাহলে ইলেকট্রনগুলো পুনরায় আপন শক্তি স্তরে ফিরে আসে। তখন ইলেকট্রনের মধ্যে সঞ্চিত শক্তি আলোক শক্তিরূপে নির্গত হয়।

সুতরাং ইলেকট্রনের সঞ্চিত শক্তি আলোক শক্তিরূপে সকল প্রকার আলোকের উৎস। সব রকমের আলোর উদ্ভব এভাবেই হয়।

৮. সৌরজগতের গ্রহ-উপগ্রহ কি?

সৌরজগৎ-এর মোট গ্রহ (এ পর্যন্ত যা আবিষ্কৃত হয়েছে) ১০টি। ক্রম অনুসারে এগুলো নিম্নরূপ :

বুধ (Mercury), শুক্র (Venus), পৃথিবী (Earth), মঙ্গল (Mars), বৃহস্পতি (Jupiter), শনি (Saturn), ইউরেনাস (Uranus), নেপচুন (Neptune) এবং প্লুটো (Pluto)।

এক্স নামে একটি গ্রহের কথা বিজ্ঞানীরা বলেছিলেন কিন্তু পরে জানতে পেরেছেন যে, এটি গ্রহ নয়।

এই গ্রহগুলোর মোট উপগ্রহ ৩২ টি। অধুনা বলা হয়, গ্রহগুলোর মোট উপগ্রহ ৬১টি ভয়েজার নামক মহাশূন্যযান মহাশূন্যে প্রেরণের পর আরো কিছু উপগ্রহ আবিষ্কৃত হয় কিন্তু এখন পর্যন্ত সঠিক কোন তথ্য জানা নেই। এ গ্রহগুলোর মধ্যে বুধ, শুক্র, প্লুটো এবং ভলকানের কোন উপগ্রহ আবিষ্কৃত হয় নি।

যে গ্রহগুলোর উপগ্রহ রয়েছে সেগুলো হলো, পৃথিবীর উপগ্রহ ১টি। এর নাম (Moon) মঙ্গলের উপগ্রহ ২টি। এদের নাম যথাক্রমে ফোবস (Phobos), ডিমোস (Deimos)। বৃহস্পতির ১২টি উপগ্রহ। তন্মধ্যে লো, ইউরোপ প্যানিমেড এবং ক্যালিস্টো প্রধান। শনির ১৮টি উপগ্রহ তন্মধ্যে টাইটান, হয়া, ডাইওন, ক্যাপিটাস ও টেথিস প্রধান।

ইউরেনাসের ৫টি উপগ্রহ । এদের নাম মিরিন্ডা, এরিয়েল, আমিত্রয়েল, টাইটানিয় এবং ওবেরম। নেপচুনের দুটি উপগ্রহ। এদের নাম টিটন এবং নিরিয়ড।

৯. শনিগ্রহের নতুন চাঁদ কি?

বিজ্ঞানীরা শনি গ্রহকে পরিক্রমণরত আরেকটি চাঁদ আবিষ্কার করেছেন। মাত্র ১২ মাইল ব্যাসের এ নতুন চাঁদটি আবিষ্কারের ফলে শনি গ্রহের মোট চাঁদের সংখ্যা ১৮টিতে দাঁড়িয়েছে

নাসার মার্ক শোয়ালটার মতে, ১৯৮০-৮১ সালে ভয়েজার-২ এর গৃহীত আলোকচিত্রের বিশ্লেষণ করে এ চাঁদটি আবিষ্কার করা হয়েছে। এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত উপগ্রহগুলোর মধ্যে নব আবিষ্কৃত চাঁদটি সবচেয়ে ছোট। নাসার কর্মকর্তারা জানিয়েছেন গ্রিক পৌরাণিকের দেবতা প্যাটোরাসের নামানুসারে এ চাঁদটির (উপগ্রহটির) নামকরণ করা হয়েছে।

১০. মহাবিশ্বের সৃষ্টি কিভাবে হল?

মহাবিশ্বের সৃষ্টি সম্পর্কে দুটি মত তত্ত্ব হিসেবে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে। এর মধ্যে জর্জ গ্যামো ও তাঁর সহযোগী বিজ্ঞানীরা যে মত দিয়েছেন তা 'বিবর্তনবাদী' তত্ত্ব নামে পরিচিত। অপর মতটির উপস্থাপক ফ্রেড হয়েল ও তাঁর সমর্থক বিজ্ঞানীগণ । এ মতটির নাম 'স্থিতিশীল বিশ্ব' তত্ত্ব।

বিবর্তনবাদী তত্ত্বে বলা হচ্ছে যে একেবারে আদিতে মহাবিশ্বে গ্যালাক্সি বা নক্ষত্র এবং এমনকি পদার্থও খুব বেশি ছিল না। তখন ছিল কেবল জমাট বাঁধা প্রচণ্ড উত্তপ্ত শক্তি ও এক ধরনের আদিম পদার্থ। এক হাজার থেকে দু'হাজার কোটি বছর আগে এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণের

ফলে মহাবিশ্বের উৎপত্তি ঘটে। এই বিস্ফোরণ ঘটার ফলে বিশাল আয়তনের শক্তিপুঞ্জ ও আদিম পদার্থ কণা দ্রুত বেগে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তারপর এসব শক্তিপুঞ্জ ও পদার্থ কণা ক্রমশ রূপান্তরের মাধ্যমে আমাদের পরিচিত স্বাভাবিক পদার্থে পরিণত হয়। অতঃপর দ্রুতগতিতে ধাবমান এ সকল পদার্থের খণ্ডগুলোর গ্যালাক্সিতে পরিণত হয়েছে। তারপর ধীরে ধীরে গ্যালাক্সির অভ্যন্তরে সৃষ্টি হয়েছে এবং এখনো গ্যালাক্সিগুলোর নতুন নক্ষত্র সৃষ্টি হয়ে চলেছে।

'স্থিতিশীল বিশ্ব' তত্ত্বটিতে বলা হয়েছে, মহাবিশ্ব আকস্মিক কোন বিস্ফোরণের মাধ্যমে সৃষ্টি হয় নি। এই তত্ত্বের প্রবক্তারা বলেন, মহাবিশ্বের প্রসারণ সব সময়ে ও সমানভাবে হয়ে চলেছে এবং নতুন বস্তুও সমভাবে সৃষ্টি হয়ে চলেছে। তত্ত্ব অনুসারে গ্যালাক্সিগুলো যত পরস্পর থেকে দূরে সরে যায়, মহাশূন্যে ততই আশ্চর্যজনকভাবে হাইড্রোজেন উৎপন্ন হয় এবং অপসৃয়মান গ্যালাক্সির স্থলে অনবরত উদয় হয় নতুন গ্যালাক্সির।

মহাবিশ্বের সৃষ্টি সম্পর্কে এ দুটি তত্ত্ব নিয়ে জোর তর্ক–বিতর্ক দীর্ঘদিন ধরে চলছে। তবে মহাকাশ গবেষণার যুগ শুরু হওয়ার পর মহাবিশ্বকে আরো ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করতে পারার ফলে এখন ধরে নেয়া হয় যে, প্রচণ্ড বিস্ফোরণের তত্ত্বটিই গ্রাহ্য। বিশেষত মহাশূন্য অতিমাত্রায় সমতাপূর্ণ। যে কোন স্থান থেকে যে কোন দিকে তাকালেই মহাবিশ্বের এই সহজ রূপটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

১১. মহাবিশ্বে প্রাণের সাড়া সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা কি ভাবছেন

পৃথিবী ব্যতীত সৌরজগতের অপর কোন গ্রহ কিংবা উপগ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব নেই বলেই বিজ্ঞানীরা মনে করেন। কিন্তু সেই সাথে এ বিষয়টিও অনুধাবনযোগ্য যে, মহাশূন্য মূলত সদৃশ বস্তুপুঞ্জ দ্বারা গঠিত। এ ক্ষেত্রে আমাদের ছায়াপথ গ্যালাক্সি কিংবা অপর কোন গ্যালাক্সির কোন নক্ষত্রকে ঘিরে সৌরজগতের মতো গ্রহমণ্ডল সৃষ্টি অসম্ভব কিছু নয়। সে ক্ষেত্রে যে পরিবেশ ও তাপমাত্রায় পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভব ঘটেছে, তদনুরূপ প্রক্রিয়ায় মহাশূন্যের জন্য এক বা একাধিক গ্রহমণ্ডলে প্রাণের উদ্ভব ও বিকাশ অসম্ভব নয়। এ ধারণা থেকেই মহাশূন্যে বিজ্ঞানীরা পাঠিয়েছেন জোরালো বেতার সংকেত, যাতে অন্য কোথাও আমাদের পৃথিবীর মতো বুদ্ধিমান প্রাণির অস্তিত্ব থাকলে তারা তা গ্রহণ ও বিশ্লেষণের সুযোগ পেতে পারে। সে ক্ষেত্রে মহাশূন্য থেকেই আমরা অনুরূপ জোরালো বেতার সংকেতের মাধ্যমে তার প্রত্যুত্তর পেতে পারি। বাস্তবে এ ধরনের কোন প্রত্যুত্তর এখনো মেলে নি। মহাশূন্যের বিশাল দূরত্ব ও অজানা রহস্যের কথা চিন্তা করলে বলা যায় এ ধরনের বেতার সংকেত প্রেরণ ও প্রত্যুত্তর লাভের মধ্যে যে বাস্তব অসুবিধা ও সমস্যা রয়েছে, তার ফলে ছায়াপথ গ্যালাক্সি কোথাও কিংবা মহাশূন্যের অন্যান্য গ্যালাক্সি থেকে প্রত্যুত্তর পাওয়া না গেলেও অন্যত্র প্রাণের উৎপত্তি ও বিকাশের সম্ভাবনা অন্তত এই মুহূর্তে অস্বীকার করা যায় না।

১২. মহাবিশ্বের পরিণতি নিয়ে বিজ্ঞানীরা কি ভাবছেন

আমরা জেনেছি যে ক্রমেই প্রসারিত হয়ে চলেছে মহাবিশ্ব। কিন্তু এই প্রসারণের শেষ কোথায় ? কি হবে পরিণতি মহাবিশ্বের ?

এই সম্প্রসারণশীল মহাবিশ্বের আপাতত সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে দুটি—এক : মহাবিশ্বের এই সম্প্রসারণ কেবলই চলতে থাকবে ; গ্যালাক্সিগুলো পরস্পর থেকে আরো দূরে সরতে সরতে একদিন অসীমে মিলিয়ে যাবে। দুই : সম্প্রসারণ চলতে চলতে এক পর্যায়ে পৌঁছে ক্রমে স্তিমিত হয়ে আসতে থাকবে, স্তিমিত হতে হতে বন্ধ, তারপর শুরু হবে সংকোচনের পালা। সংকোচন চলতে চলতে গ্যালাক্সিগুলো চলে আসবে পরস্পরের খুব কাছে, তারপর ধাক্কা খেতে থাকবে একে অপরের সঙ্গে। এমনিভাবে ধাক্কা খেতে খেতে পরস্পরের সাথে মিশে যাবে, আর সব শেষে মিলেমিশে একাকার হয়ে আবার পরিণত হবে একটি অতিপরমাণুতে। সেই আদি পরমাণু যেখানে শুরু সেখানে এসেই আবার শেষ।

কৃষ্ণবিবর : আইনস্টাইন তার আপেক্ষিক তত্ত্বে বলেছিলেন, আলোর উপর মহাকর্ষের ক্রিয়া আছে। আসলে কোন বস্তু যদি এমন অতি ঘন হয় যে তার মহাকর্ষ টানের ফলে আলো একেবারে আটকে যাবে, তাহলে ঐ বস্তুটিকে আর দেখা যাবে না। আপেক্ষিক তত্ত্ব অনুসারে এমন বস্তুকেই প্রকৃত অদৃশ্য বস্তু বলা যেতে পারে। কৃষ্ণবিবরের ধারণাটি এসেছে এরূপ অতিঘন বস্তুর অস্তিত্বের ধারণা থেকেই। আমেরিকার পদার্থবিজ্ঞানী জন হুইলারের মতে, "মহাবিশ্ব সংকুচিত হতে হতে পরিণত হবে এক অতিঘন বস্তুতে যার নাম 'কৃষ্ণবিবর " (ব্লাক হোল)।

কৃষ্ণবিবরেই কি মহাবিশ্বের সমাপ্তি ? সম্ভবত নয়। কোন কোন জ্যোতির্বিজ্ঞানীর মতে কৃষ্ণবিবর থেকে শ্বেত বিবর। তখন আবার শুরু হবে সম্প্রসারণের পালা। কালক্রমে আবার সংকোচন। আবার কৃষ্ণবিবর। এমনিভাবেই হয়তো চলতে থাকবে মহাবিশ্বের অনন্ত জীবনলীলা

১৩. ধূমকেতু কি

ধূমকেতু আসলে ধূলা আর ঠাণ্ডায় জমাট বাঁধা গ্যাসের একটি বস্তুপিণ্ড। তাই বিজ্ঞানীদের মতে ধূমকেতুর লেজটি মূলত তার আকারগত কোন বৈশিষ্ট্য নয়। উক্ত জমাটবাঁধা গ্যাস সূর্যের কাছাকাছি এলে তা সূর্যের তাপে ফুলে-ফেঁপে ওঠে। তখন সৌরবায়ু এ ফেঁপে ওঠা গ্যাসকে পেছনের দিকে ঠেলে দেয় বলেই তা ধূমকেতুর বিশাল লেজ বলে মনে হয়। এ জন্যই যখন ধূমকেতু সূর্যের দিকে আসতে থাকে, তখন লেজটি থাকে পেছনের দিকে, আবার ধূমকেতু যখন সূর্যকে ঘুরে দূরের দিকে চলে যেতে থাকে, তখই এই লেজটি থাকে সামনের দিকে।

ধূমকেতুর আবাসস্থল বা উৎস সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা মনে করেন, কিছু কিছু হালকা গ্যাস ও ধূলিকণা সৌরজগতের একেবারে বাইরে যেতে পারে নি। তাই সেগুলো কয়েক হাজার কোটি মাইল দূরে সৌরজগৎকে ঘিরে একটা খোলের আকারে থেকে যায়। সূর্য থেকে অনেক দূরে বলেই এখানে তাপমাত্রা কম থাকে, এখানকার জমাটবাঁধা বস্তুপিণ্ড সূর্যের আকর্ষণে সূর্যের দিকে ছুটে আসে এবং নিজের গতিবেগের দরুন সূর্যের চারদিকে পাক খেয়ে আবার দূরে ফিরে যায়। তারপর হয়তো আবার ফিরে আসে, আবার ফিরে যায়। এদেরকেই আমরা বলি ধূমকেতু।

১৪. সূর্যে বসবাস করা যায় না কেন

সূর্য ছাড়া পৃথিবীতে জীবন ধারণ সম্ভব নয়। তাহলে নিশ্চয় সূর্যে বসবাসও করা যাবে। আসলে সূর্যে বসবাস করার মতো উপযোগী নয়। কেননা সূর্য প্রচণ্ড উত্তপ্ত এক নক্ষত্র যেখানে কেন্দ্রভাগের উত্তাপ প্রায় ৪,০০,০০,০০০ ডিগ্রি ফারেনহাইট এবং পৃষ্ঠভাগ আনুমানিক ১১০০০ ডিগ্রি ফারেনহাইট। এখানে যেন জ্বলন্ত বাষ্পকণা প্রচণ্ড বেগে ছুটাছুটি করে আগুনের ঘূর্ণিঝড় উঠায়। ফলে সেখানে বসবাস সম্ভব নয়। সেখানে বাস করা মানে উনুনে ঢুকে বাস করার ইচ্ছা।

১৫. সূর্য কেন সাগরে ডুবে যায়

আমরা জানি পৃথিবী সূর্যের চারপাশে ঘুরছে। এই আবর্তনে পৃথিবীতে এক সময় আসে দিন, আবার দিনের বদলে রাত। এটি সর্বকালব্যাপী চলছে। বিশাল সাগরতীরে দাঁড়িয়ে সূর্য ডোবার দৃশ্য দেখলে মনে হয় সূর্য সমুদ্রের শেষভাগে যেখানে আকাশ মিশেছে বলে মনে হয় সেখানে ধীরে ধীরে জলে নামছে এবং এক সময় তলিয়ে যাচ্ছে। আসলে সূর্য তলিয়ে যায় না, অস্তাচলে যায়। পৃথিবীর অবিরাম ঘূর্ণনের ফলে সূর্যের দিকে অন্য পাশ ঘোরাল, আর পৃথিবী ঘুরে গেল সূর্যের অন্য পাশে। এজন্য সূর্যকে আর দেখা গেল না এবং মনে হলো সূর্য সাগরে ডুবে গেল।

১৬. আকাশ ও পৃথিবীর সংযোগস্থলে পৌছান যায় না কেন?

আমরা যখন কোন মুক্তাঙ্গনে দাঁড়াই তখন মনে হয় আকাশ ও পৃথিবীর একটি সংযোগস্থল রয়েছে এবং সংযোগস্থল আমাদের কাছ থেকে বেশি দূরে নয়। কিন্তু যদি এই সংযোগস্থলে পৌছাতে চাই তবে যতই আমরা যেতে থাকি ততই সেটি দূরে সরে যেতে থাকে। এমন কেন? আসলে পৃথিবীটা গোল, আর ঐ জায়গাটার যেখানে পৃথিবী গোল হয়ে গেছে, সেখানে মনে হয় আকাশ বুঝি পৃথিবীর সাথে গেছে। পৃথিবী ও আকাশের সংযোগ স্থলে কোন দাগ নেই। যতই সেখানে যেতে চাই যাওয়া যাবে না।

১৭. চাঁদ কেন রাতে কিরণ দেয়

চাঁদ পৃথিবীর নিকটতম জ্যোতিষ্ক এবং পৃথিবীর একটি উপগ্রহ। কিন্তু তার কোন আলো নেই। তাহলে কি করে চাঁদ পৃথিবীকে আলোকিত করে? চাঁদের আলো আয়নার আলোর ন্যায় আয়না যেমন বাতির আলো প্রতিফলন ঘটিয়ে নিজের আলোর কথা ভাবে, তেমনি চাঁদ ও সূর্যের আলোকে আলোকিত হয়ে নিজের আলোর কথা ভাবে। সূর্য ছাড়া সে কিরণ দিতে পারে না তার রাতে আলো দেয়ার কারণ, পৃথিবীর আবর্তনে যখন সূর্য পৃথিবীর অন্য পিঠে অবস্থান করে, তখন চাঁদ বিপরীত পৃষ্ঠে সূর্যের আলো অপহরণ করে আলো দেয় অর্থাৎ সূর্যালোকে তার আলোর প্রতিফলন ঘটায়। এই জন্য বলা হয়, চাঁদ আলোর উৎস নয়, সে অন্যের আলোর প্রতিফলন মাত্র, পরের আলোর অপহরক।

১৮. উপগ্রহকে গ্রহ বলা যায় না কেন

গ্রহ কঠিন পদার্থে গড়া। এদের আয়তন আছে। এই আয়তনের উপর নির্ভর করেই বলা হয়, গ্রহটি কত বড়। আয়তনের দিক দিয়ে উপগ্রহগুলো গ্রহের চেয়ে ছোট। কিন্তু সব গ্রহ উপগ্রহ নয় যেমন গ্যানিমেড উপগ্রহ বুধ গ্রহের চেয়ে বৃহৎ। অথচ গ্যানিমেড একটি উপগ্রহ মাত্র, বুধ হল গ্রহ কিন্তু বুধ আবার উপগ্রহও বটে, কিন্তু তাকে উপগ্রহ না বলে বলে গ্রহ। আসলে ব্যাপারটি হল, বুধ সূর্যের উপগ্রহ, আর গ্যানিমেড একটি গ্রহের (বৃহস্পতির) উপগ্রহ । তবে স্বাভাবিকভাবেই বলা যায়, সে নিজে আর কি করে গ্রহ হতে পারে যদি কোন একটি গ্রহের উপগ্রহ হয়?

১৯. প্লুটো গ্রহকে 'X' (এক্স) বলা হয় কেন

নেপচুন গ্রহ আবিষ্কারের পর বিজ্ঞানীরা ভাবলেন নেপচুনের যে গতি তাতে সেখানে নিশ্চয় আরও একটি গ্রহ রয়েছে। জ্যোতির্বিদ পারসিভাল লোয়েল তখন খুঁজে বের করার জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন। তাকে খুঁজে বের করার আগেই তিনি এটির নাম দিলেন Plannet 'X" , এজন্য প্লুটো গ্রহকে 'X' ও বলা হয়।

২০. তারা এত ছোট দেখায় কেন

আকাশে তারার সংখ্যা অসংখ্য। এর মধ্যে খালি চোখে দেখা যায় পাঁচ হাজারের বেশি নয় তবে দূরবীণ দিয়ে দেখা যায় লক্ষ লক্ষ। কিন্তু এগুলো দেখা যায় অত্যন্ত ছোট ছোট। এর অবশ্য কারণ আছে। দূর থেকে সব জিনিসই ছোট দেখায়। দারুণ উঁচু বাড়িও দূর থেকে ছোট দেখায় এমন বিশালাকৃতি সূর্যও দেখা যায় একটি থালার মতো। এজন্য তারা ছোট দেখার মূল কারণ

তারাগুলোর দূরে অবস্থান। তারা ও সূর্য অনেক দূরে । অথচ অনেক তারা সূর্যের চেয়েও বহুগুণ বড়। সত্যিকারের আয়তন দূর থেকে দেখা যায় না বলে তারা এত ছোট দেখায়।

২১. দিনের বেলায় তারা কোথায় যায়?

আমরা জানি, চাঁদ এবং অপর তিন চারটি জ্যোতিষ্ক ভিন্ন রাত্রির আকাশে যে সব জ্যোতিষ্ক দেখা যায়, তাদের বলা হয় তারা। এই সব তারাগুলো সূর্যের মতো এক একটি জ্বলন্ত গ্যাসের পিন্ড। অধিকাংশ তারার আয়তন ও উজ্জ্বলতা প্রায় সূর্যেরই মতো। কিন্তু মজার ব্যাপার দিনের প্রারম্ভে সূর্যের আগমনের সাথে সাথে তারা যেন কোথায় চুপে চুপে সরে পড়ে। এর কারণ কি? কারণ যে কোন আলোর কণা বিশেষ করে অন্ধকারের চোখে পড়ে উজ্জ্বল আলোয় তা ফ্যাকাশে হয়ে যায়। তাই দিনের বেলায় তারা দেখা যায় না।

২২. এএম (AM) পিএম (PM) কি?

সময় নির্দেশ করতে এ এম (AM) ও পিএম (PM) ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিন্তু এই দু'টি পরিভাষার সঠিক অর্থ কি এবং কিভাবেই বা প্রচলিত হলো তা হয়তো আমরা অনেকেই জানি না। আমরা জানি কমপক্ষে পৃথিবীর আবর্তনের ফলেই দিন ও রাত্রি হয়। পৃথিবীর যে অংশটি সূর্যের দিকে থাকে সে দিকটি হয় দিন এবং অপর দিকটিতে হয় রাত্রি। সূর্য যখন পূর্ব দিকে উদিত হয়, তখন থেকে পশ্চিম প্রান্তে অস্ত যাওয়া পর্যন্ত আমরা দিনের আলো পেতে থাকি।

সূর্য যখন ঠিক মাথার উপর সোজাসুজি অবস্থান করে তখন আমরা বলি দুপুর। এই সময় আমরা আকাশের পারাপারে উত্তর থেকে দক্ষিণে কাল্পনিক রেখা টানতে পারি। এই রেখাকে আমরা বলি দুপুর বা মধ্যাহ্নকালীন রেখা (Meridiam)। যে সময় সূর্য এই মধ্য চিহ্ন রেখার পূর্ব দিকে থাকে যে সময়টাকে আমরা প্রাতঃকালীন সময় (Morning) বলি। সূর্য এই মধ্যাহ্নরেখা পার হয়ে গেলে তখন বলা হয় অপরাহ্ন।

মধ্যাহ্নকে ল্যাটিন ভাষায় মেরিডিস (Meridies) বলা হয়। ইংরেজি শব্দ মেরিডয়ান এসেছে এই মেরিডিস থেকে। সেই জন্যে এ.এম (A.M) বলতে পূর্ব মধ্যাহ্ন (Ante-Meridium) এবং অপরাহ্ন বোঝাতে উত্তর মধ্যাহ্ন (Post-Meridium) লেখা হয়। তাই বেলা ১২টার পর থেকে রাত্রি ১২টা পর্যন্ত সময় নির্দেশকালে পি.এম (P.M) এবং রাত্রি ১২টার পর থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত সময় নির্দেশ করতে এ.এম (A.M) এই সংক্ষিপ্ত অক্ষরগুলো ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

২৩। পৃথিবীতে দিনের অংশ বাড়ছে কিভাবে?

আজ থেকে প্রায় ৪ হাজার বছর আগের তুলনায় পৃথিবীর প্রতিটি দিন এখন এক সেকেন্ডের সাতশ' ভাগের এক ভাগ বেড়েছে। নিজের অক্ষের চারপাশে পৃথিবীর আবর্তন হ্রাস পাওয়াই এর কারণ। এই আবর্তন বেগ কমছে । চিনের নথিপত্র বিচার করে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, ৫০২ ৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। সেই গ্রহণের সময়কাল হিসেব করেও দেখা গেছে, পৃথিবীর আবর্তন বেগ কমেছে। তার প্রমাণ ব্যাবিলন এবং আরবের প্রাচীন নথিপত্রেও পাওয়া গেছে। পৃথিবীর আবর্তন বেগ কমার সঙ্গে সঙ্গে চাঁদ পৃথিবী থেকে ক্রমে দূরে সরে যাচ্ছে। অথচ আজ থেকে প্রায় ৪ কোটি বছর আগে চাঁদ পৃথিবীর অনেক কাছে ছিলো। দূরত্ব ছিলো এখনকার চেয়ে এক তৃতীয়াংশ মাত্র। পৃথিবীর আবর্তন বেগ ছিলো অনেক দ্রুত। তখন পৃথিবীর প্রতিটি দিন চব্বিশ ঘণ্টার পরিবর্তে ছিলো আট ঘণ্টায়।"

এ কথা বলেছেন জ্যোতির্বিজ্ঞানী প্যাসাডেনার জেট প্রোপলেসন ল্যাবরেটরির কেভিন প্যা এবং রবার্ডভলফ, লস অ্যাঞ্জেলসের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংশিয়াং চাড় এবং বৃটেনের ডারহ্যম বিশ্ববিদ্যালয়ের কেভিন ইয়াউ।

২৪। ইংরেজি মাসগুলোর নামকরণ হলো কি ভাবে

ক্যালেন্ডারের উদ্ভাবন স্থান রোম। তাই বছরের বারো মাসের নামকরণ করা হয়েছে কোন রোমান দেব–দেবী বা নামকরা কোন সম্রাটের নামানুসারে। রোমান দেবতা 'জানুস'–এর নামেই প্রথম মাস জানুয়ারির নামকরণ করা হয়েছে। জানুস–এঁর দু'টি মুখ। একটি সামনে, অপরটি পিছনে একটি মুখ চেয়ে আছে অনাগত ভবিষ্যতের দিকে। অন্যটি বিদায়ী অতীতের দিকে। সেই আমলে দেবতা জানুস–এর পূজা ও বলিদান একটি পবিত্র কাজ ছিল। 'ফেব্রুয়া' থেকে ফেব্রুয়ারি মাস এসেছে। ফেব্রুয়া নামে সেই আমলে চিত্তশুদ্ধির উৎসব নামে একটি উৎসব প্রচলিত ছিল ফেব্রুয়ারি মানে পবিত্র। এ মাসটা রোমানরা পবিত্র বলে মনে করতো। মার্চ, এপ্রিল, মে আর জুন মাসের নাম এসেছে রোমানদের দেবতা মার্শিয়াস, এপ্রিনিস, মাইয়া, আর জুনোর নাম থেকে

আর সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বর — এইসব ল্যাটিন শব্দ কোন সংখ্যাকে বুঝায়। এদের মান হচ্ছে যথাক্রমে সপ্তম, অষ্টম, নবম আর দশম। কিন্তু বর্তমানে প্রচলিত ক্যালেন্ডারের মাসের তালিকায় এদের স্থান হলো নয়, দশ এগারো আর বারো। এখনো সেই পুরনো নামের রীতিই চলছে। জুলাই আর আগস্ট এ দুটো মাসের নাম আগে ছিল কুইন্টিলিস আর সেক্সটিলিস অর্থাৎ পঞ্চম আর ষষ্ঠ। জুলিয়াস সিজার যখন রোমের কর্তা হলেন তিনি নিজের নামটিকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করার জন্য কুইন্টিলিসের নাম দিলেন নিজের নামে জুলিয়াস এটি

তার জন্ম মাসও বটে। অবশ্য তাতেই তিনি ক্ষান্ত হলেন না, আরও গৌরব বাড়াবার জন্যে তিনি ৩০ দিনের এই মাসকে ৩১ দিনে বাড়ালেন। কিন্তু বছর তো আর ৩৬৫ দিন থেকে বেড়ে ৩৬৬ দিন হতে পারে না। তাই রোমান পন্ডিতেরা ফেব্রুয়ারি মাসকে ৩০ দিন থেকে কমিয়ে ২৯ দিনে করতে বাধ্য হন।

সিজারের পর রোমের সম্রাট হন তারই ভাইয়ের ছেলে অগস্টাস সিজার। তাঁর জন্ম ছিল সেপ্লটিলিস। তিনিও পিতৃব্যের অনুসারী হয়ে সেপ্লটিলিসের নাম দিলেন নিজের নামে অগাস্টাস। আবার অপারেশন চালানো হলো ফেব্রুয়ারির উপরে। সেই থেকে ফেব্রুয়ারি ২৮ দিনের হলো। অগাস্টাস সিজার এমন নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, 'লিপইয়ার' বছরে আগষ্ট মাসটিকে ৩২ দিন গোনা হবে। এই ব্যবস্থা বহুদিন পর্যন্ত রোমে ছিল। অগাস্টাস মারা যাবার পরও পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত চালু ছিল। পরে তা বাদ দেওয়া হয়।

৩.৫ দিবা-রাত্রির হ্রাস বৃদ্ধি ও ঋতু পরিবর্তন

পৃথিবী যদি একস্থানে অবস্থান করে আপন অক্ষে লাটিমের ন্যায় ঘুরতে থাকে তবে আকাশের একই জায়গায় প্রতিদিন সূর্যোদয় হত। ফলে এক গোলার্ধে সারা বছর দিন বড় ও রাত্রি ছোট

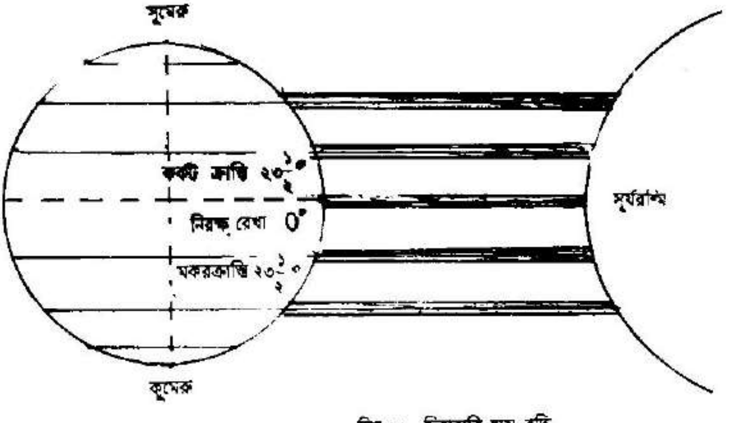

চিত্র ১৬. দিবারাত্রি হ্রাস-বৃদ্ধি

এবং অন্য গোলার্ধে সারা বছর তার বিপরীত অবস্থা বিরাজ করত। কিন্তু কার্যত দেখা যাচ্ছে যে, প্রতিদিন সূর্য আকাশের ঠিক এক জায়গায় থাকে না, কিংবা প্রত্যহ আকাশের একই জায়গায় সূর্যোদয় বা সূর্যাস্ত হয় না। প্রকৃত পক্ষে সূর্যকে পরিক্রমণকালে পৃথিবী নিজ কক্ষতলের সঙ্গে $৬৬\frac{১}{২}^\circ$ কোণে হেলে সর্বদা স্থান পরিবর্তন করছে।

এ কারণে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের স্থান ঠিক থাকে না এবং ভূ-পৃষ্ঠের সর্বত্র দিবা-রাত্রির হ্রাস বৃদ্ধি হয়।

পৃথিবী সূর্যের চতুর্দিকে পরিক্রমণকালে ২১ জুন কক্ষ পথে এমন এক অবস্থানে পৌঁছে যেখানে সুমেরু সূর্যের দিকে সর্বাপেক্ষা বেশি ($২৩\frac{১}{২}^\circ$) ঝুঁকে থাকে এবং কুমেরু সূর্য হতে সর্বাপেক্ষা দূরে সরে পড়ে। এই দিন মধ্যাহ্নে $২৩\frac{১}{২}^\circ$ উত্তর অক্ষাংশে সূর্যকে ঠিক মাথার ওপরে দেখা যায় এবং উক্ত সমাক্ষ রেখায় সূর্য কিরণ লম্বভাবে (৯০° কোণে) পড়ে। এ অক্ষাংশকে কর্কটক্রান্তি (Tropic of Cancer) বলে। ২১ জুন তারিখে উত্তর গোলার্ধে দিন সবচেয়ে বড় এবং রাত্রি সবচেয়ে ছোট হয়। দক্ষিণ গোলার্ধে দিন সবচেয়ে ছোট এবং রাত্রি সবচেয়ে বড় হয়। এই দিন $৬৬\frac{১}{২}^\circ$ উত্তর অক্ষাংশ হতে সুমেরু পর্যন্ত ২৪ ঘন্টা দিন এবং $৬৬\frac{১}{২}^\circ$ দক্ষিণ অক্ষাংশ হতে কুমেরু পর্যন্ত ২৪ ঘন্টা রাত্রি থাকে। $৬৬\frac{১}{২}^\circ$ উত্তর এবং $৬৬\frac{১}{২}^\circ$ দক্ষিণ সমাক্ষরেখাদ্বয়কে যথাক্রমে সুমেরুবৃত্ত (Arctic circle) এবং কুমেরুবৃত্ত (Antaritic circle) বলা হয়। ২১ এ জুনের পর পৃথিবী আপন কক্ষপথে অগ্রসর হতে থাকলে ক্রমান্বয়ে সুমেরু সূর্য হতে দূরে সরতে থাকে এবং কুমেরু সূর্যের নিকট আসতে থাকে। ফলে উত্তর গোলার্ধে ধীরে ধীরে দিন ছোট ও রাত্রি বড় এবং দক্ষিণ গোলার্ধে দিন বড় ও রাত্রি ছোট হতে থাকে। এভাবে চলতে চলতে ২৩ সেপ্টেম্বর পৃথিবী তার কক্ষে এমন অবস্থানে আসে যখন উভয় মেরু সূর্য হতে সমান দূরে অবস্থান করে। এই দিন সূর্য ঠিক পূর্ব দিকে উদিত হয় এবং নিরক্ষ রেখার ওপর মধ্যাহ্ন সূর্য লম্বভাবে কিরণ দেয়। এই তারিখে পৃথিবীর সর্বত্র দিবা-রাত্রি সমান হয়।

২১ মার্চ হতে ২৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ছয়মাস উত্তর মেরুতে অবিরত দিন এবং দক্ষিণ মেরুতে অবিরত রাত্রি থাকে। এইজন্যে ভূ-পৃষ্ঠের অনেক দেশেই যখন মধ্য রাত্রি তখন উত্তর গোলার্ধে মেরু অঞ্চলীয় দেশসমূহে সূর্যকিরণ দেখা যায় এসব দেশকে নিশীথ সূর্যের দেশ (Land of the Midnight sun) বলে।

২৩ সেপ্টেম্বরের পর সুমেরু সূর্য হতে ক্রমান্বয়ে অধিকতর দূরে সরতে থাকে এবং কুমেরু অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী হয়। ফলে উত্তর গোলার্ধে দিন ছোট এবং রাত্রি বড় হতে থাকে।

এভাবে চলতে চলতে ২২ এ ডিসেম্বর তারিখে পৃথিবী আপন কক্ষপথে এমন এক স্থানে উপস্থিত হয় যখন কুমেরু সূর্যের দিকে সর্বাপেক্ষা বেশি ($২৩\frac{১}{২}^{\circ}$) ঝুঁকে থাকে। এ তারিখে দক্ষিণ গোলার্ধে দিন সবচেয়ে বড় এবং রাত্রি সবচেয়ে ছোট। উত্তর গোলার্ধে এর বিপরীত অবস্থা দেখা যায়। $২৩\frac{১}{২}^{\circ}$ দক্ষিণ অক্ষাংশে এদিন মধ্যাহ্ন সূর্য লম্বভাবে (৯০° কোণে) কিরণ দেয়। এই সমাক্ষরেখাকে মকরক্রান্তি (tropic of capricorn) বলে। ২২ ডিসেম্বর তারিখে উত্তর গোলার্ধে $৬৬\frac{১}{২}$ উত্তর অক্ষাংশের উত্তরে সর্বত্র রাত্রি এবং দক্ষিণ গোলার্ধে $৬৬\frac{১}{২}^{\circ}$ দক্ষিণ অক্ষাংশের দক্ষিণে সর্বত্র দিন থাকে।

এরূপ পরিক্রমণশীল পৃথিবী আপন কক্ষপথে আরও অগ্রসর হলে উত্তর গোলার্ধে ক্রমশ সূর্যের নিকট আসে এবং দক্ষিণ গোলার্ধ দূরে সরে যায়। এভাবে উত্তর গোলার্ধে দিবাভাগের পরিমাণ আবার বাড়তে থাকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে কমতে থাকে। অবশেষে ২১ মার্চ পৃথিবী তার কক্ষপথে এমন এক স্থানে আসে যখন ২৩ সেপ্টেম্বরের মতো পৃথিবীর সর্বত্র পুনরায় দিবা-রাত্রি সমান হয়। ফলে ২৩ সেপ্টেম্বর থেকে ২১ মার্চ পর্যন্ত এই ছয়মাস উত্তর মেরুতে অবিরত রাত এবং দক্ষিণ গোলার্ধে অবিরত দিন থাকে। ২১ মার্চের পর পৃথিবী আপন কক্ষপথে অগ্রসর হতে থাকলে উত্তর গোলার্ধে দিন রাত্রি অপেক্ষা ক্রমশ আরও বড় হতে থাকে এবং পৃথিবী পুনরায় ২১ জুনের অবস্থায় ফিরে আসে। এভাবে পৃথিবীর পরিক্রমণের (revolution) সঙ্গে সঙ্গে দিবা-রাত্রির হ্রাস বৃদ্ধি ঘটছে।

ঋতু পরিবর্তন

বার্ষিক গতির ফলে বছরের বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের তাপের তারতম্য ও ঋতু পরিবর্তন হয়। সূর্য কিরণ খাড়া বা লম্বভাবে পতিত হলে তা কম বায়ুস্তর ভেদ করে ভূ-পৃষ্ঠে পৌঁছে এবং ভূ-পৃষ্ঠের অপেক্ষাকৃত স্বল্প স্থানে কেন্দ্রীভূত থাকে।

এরূপ স্থানে সূর্যকিরণ তির্যকভাবে পতিত স্থান অপেক্ষা তাপমাত্রা অধিক হয়। আবার কোন স্থানে দিবাভাগের পরিমাণ রাত্রির পরিমাণ হতে দীর্ঘ হলে সেই স্থানে বায়ুমন্ডল অধিকতর উষ্ণ থাকে।

সূর্যকে পরিক্রমণকালে পৃথিবীর কক্ষপথে তার চারটি অবস্থান নির্দিষ্ট করা হয়েছে। ২১ মার্চ ও ২৩ সেপ্টেম্বর তারিখে মধ্যাহ্নে সূর্য রশ্মি নিরক্ষরেখার উপর লম্বভাবে পতিত হয় অর্থাৎ উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধ সূর্য হতে সমান দূরত্বে থাকে এবং পৃথিবীর সর্বত্র দিবা-রাত্রি সমান হয়। উভয় গোলার্ধে এই দিনে গরম ও শীতের মধ্যম অবস্থা অনুভূত হয়। উভয় গোলার্ধে ২১ মার্চ বসন্ত

কালের মাঝামাঝি এবং ২৩ সেপ্টেম্বর শরৎকালের মাঝামাঝি অবস্থা বজায় থাকে। এজন্য ২১ মার্চকে বসন্ত বিষুব বা মহাবিষুব (Vernal Equinox) এবং ২৩ সেপ্টেম্বরকে শারদ বিষুব বা জল বিষুব (Autumnal Equinox) বলে।

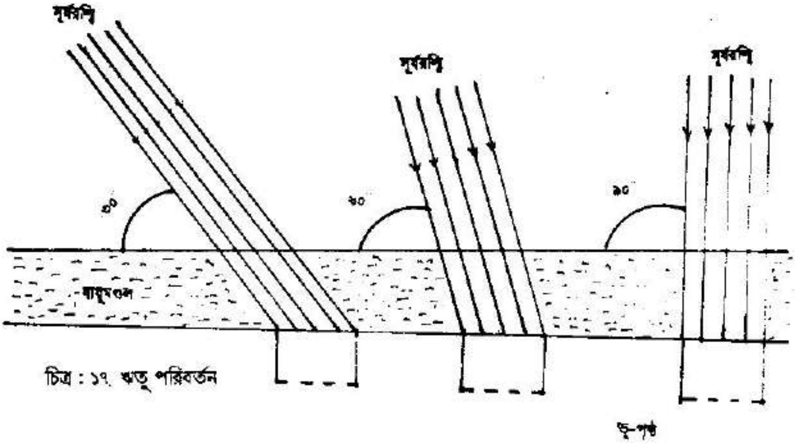

চিত্র : ১৭. ঋতু পরিবর্তন

২১ মার্চ হতে ২১ জুন পর্যন্ত প্রতিদিন উত্তর গোলার্ধে দিনের দৈর্ঘ্য বাড়তে থাকে। ফলে তাপমাত্রাও বাড়ে। এ সময় উত্তর গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল। ২১ জুন সূর্য কর্কটক্রান্তির (২৩$\frac{১}{২}$ উত্তর) উপর লম্বভাবে কিরণ দেয়। এ অক্ষাংশ সূর্যের উত্তরায়নের শেষসীমা বলে ২১ জুনকে উত্তর অয়নান্ত বা উত্তরায়নাদি (Summer Solstice : Sol-Sun : Stice = Standstill) বলা হয়।

২২ ডিসেম্বর সূর্য মকরক্রান্তির উপর লম্বভাবে কিরণ দেয়। দক্ষিণায়নে এটিই সূর্যের শেষ অবস্থান। একে দক্ষিণায়নাদি বা দক্ষিণ অয়নান্ত (Winter solstice) বলে। এ সময় উত্তর গোলার্ধে শীতকাল থাকে।

উত্তর গোলার্ধের ন্যায় দক্ষিণ গোলার্ধেও পর্যায়ক্রমে শীত, গ্রীষ্ম, শরৎ ও বসন্তকালের আবির্ভাব হয়। উত্তর গোলার্ধে যখন গ্রীষ্মকাল, দক্ষিণ গোলার্ধে তখন শীতকাল, আবার দক্ষিণ গোলার্ধে যখন গ্রীষ্মকাল, উত্তর গোলার্ধে তখন শীতকাল।

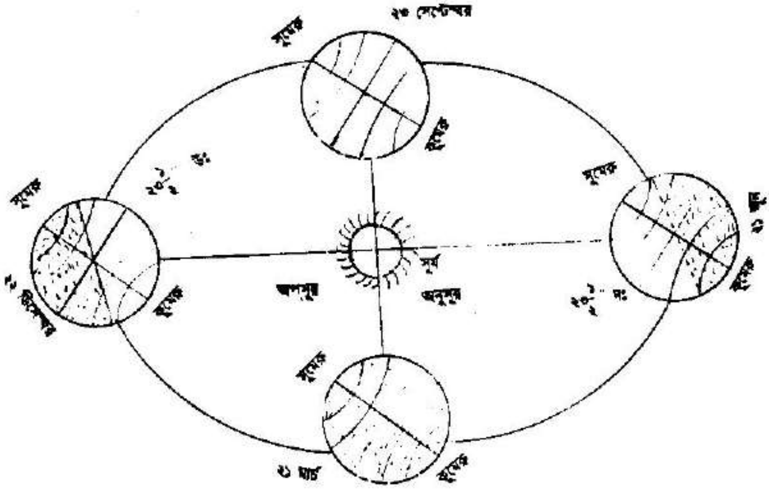

চিত্র : ১৮. সূর্যকে অতিক্রমকালে পৃথিবীর কক্ষপথের চারটি অবস্থান।

৩.৬ অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ (Latitude and longitude)

ভূমিকা : অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশের সাহায্যে আমরা পৃথিবীর কোন স্থানে সঠিক অবস্থান নির্ণয়ের জন্য ব্যবহার করে থাকি, অক্ষাংশের সাহায্যে উত্তর দক্ষিণের দূরত্ব নির্ণয় করা যায়, অন্যদিকে দ্রাঘিমাংশের সাহায্যে পূর্ব পশ্চিমের দূরত্ব নির্ণয় করা যায়। যার ফলে আমরা ভূ-পৃষ্ঠের কোন স্থানের সঠিক অবস্থান সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারি।

অক্ষাংশ (Latitude) : পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগে ভূকেন্দ্রকে ছেদ করে উত্তর দক্ষিণ বরাবর যে রেখা কল্পনা করা হয় তাকে মেরুরেখা বা অক্ষ (Axis) বলে। অক্ষের উত্তর প্রান্ত বিন্দুকে উত্তর মেরু বা সুমেরু (North pole) এবং দক্ষিণ প্রান্ত বিন্দুকে দক্ষিণ মেরু বা কুমেরু (South pole) বলে। দুমেরু হতে সমান দূরত্বে পূর্ব পশ্চিমে পূর্ণ বৃত্তের ন্যায় পৃথিবীকে বেষ্টন করে এক রেখা কল্পনা করা হয়। একে নিরক্ষরেখা বা নিরক্ষবৃত্ত বা ভূ-বিষুব রেখা (Terrestrial Equator) বলে। নিরক্ষরেখা উত্তর দক্ষিণে পৃথিবীকে দু'টি সমানভাগে ভাগ করেছে। উত্তর ভাগের নাম উত্তর গোলার্ধ (Northern Hemisphere) এবং দক্ষিণ ভাগের নাম দক্ষিণ গোলার্ধ (Southern Hemisphere)। নিরক্ষরেখা ও সুমেরু বা কুমেরুর মধ্যে কৌণিক দূরত্ব পৃথিবীর মোট পরিধির অর্থাৎ ৩৬০° ডিগ্রির এক চতুর্থাংশ (৩৬০ ÷ ৪) = ৯০° বা এক সমকোণ। এরূপ সমকোণকে ডিগ্রি বা মিনিট ভাগ করে নিরক্ষরেখার সমান্তরাল নিরক্ষরেখার উত্তর ও দক্ষিণে অনেকগুলো রেখা কল্পনা করা হয়। একে সমাক্ষ রেখা বলে। সমাক্ষরেখাগুলো পৃথিবীকে পূর্ব পশ্চিমে বেস্টনকারী একেক পূর্ণবৃত্ত। এই বৃত্তগুলো যতই মেরু বিন্দুর দিকে অগ্রসর হয় ততই ছোট হয়ে আসে। এর নিরক্ষরেখা সর্ববৃহৎ। এজন্য একে গুরুবৃত্ত বা মহাবৃত্ত বলে।

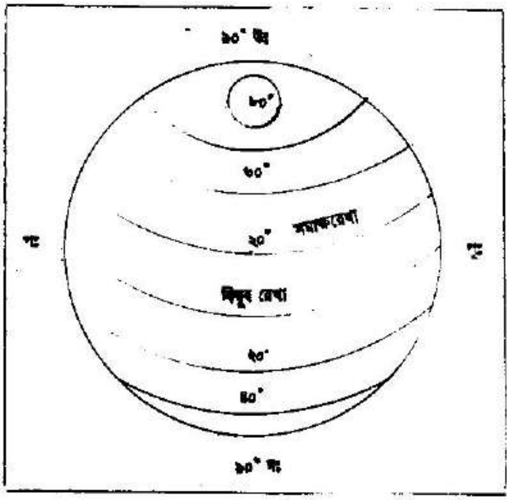

চিত্র : ১৯, সমাক্ষ রেখা।

নিরক্ষরেখা হতে উত্তর বা দক্ষিণে কোন স্থানের কৌণিক দূরত্বকে ঐ স্থানের অক্ষাংশ বলে। নিরক্ষরেখা অক্ষাংশকে ০° ধরে সুমেরু ও কুমেরু অক্ষাংশ যথাক্রমে ৯০° উত্তর এবং ৯০° দক্ষিণ ধরা হয়। সমাক্ষ রেখাগুলো নিরক্ষরেখার সমান্তরাল থাকে বলে একেই সমাক্ষ রেখায় অবস্থিত

সকল স্থানের অক্ষাংশ একই হয়। নিরক্ষীয় অক্ষাংশকে নিম্ন অক্ষাংশ এবং মেরুপ্রদেশীয় অক্ষাংশকে উচ্চ অক্ষাংশ (High Latitude) বলে।

মেরু অঞ্চলে পৃথিবী ঈষৎ চাপা বলে নিরক্ষীয় অঞ্চল হতে মেরু প্রদেশে অক্ষাংশের রৈখিক দূরত্ব বেশি হয়। নিরক্ষরেখা হতে প্রথম ১° উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষাংশের দূরত্ব ১১০°৫২ কিলোমিটার। মেরুদ্বয় হতে প্রথম ১° অক্ষাংশের দূরত্ব ১১১°৬৫ কি.মি. গড়ে ১° অক্ষাংশের ব্যবধান ১১১ কি.মি.।

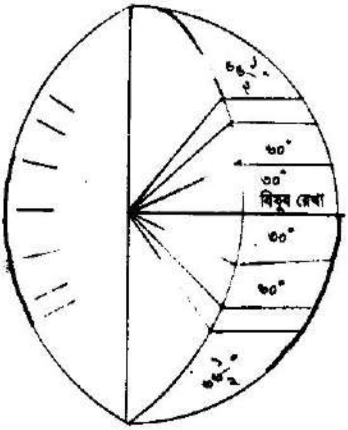

চিত্র : ২০. অক্ষাংশ।

প্রতি ডিগ্রি অক্ষাংশকে ৬০ মিনিট এবং প্রতি মিনিটকে ৬০ সেকেন্ডে ভাগ করা হয়। প্রতি মিনিট অক্ষাংশ গড়ে ১৮৫৩ মিটারের সমান এবং প্রতি সেকেন্ডে অক্ষাংশ গড়ে প্রায় ৩১ মিটারের সমান।

অক্ষাংশ নির্ণয় :

অক্ষাংশ নির্ণয়ের জন্য কয়েকটি পদ্ধতি রয়েছে। যথা—

(১) ধ্রুবতারার সাহায্যে

(২) সূর্যের উন্নতির সাহায্যে

(৩) ছায়ার সাহায্যে

(১) ধ্রুবতারার সাহায্যে : উত্তর গোলার্ধের যে কোন স্থান হতে বহুদূরে উত্তর আকাশে একটি নির্দিষ্ট স্থানে প্রত্যহ রাত্রিতে ধ্রুবতারাকে দেখা যায়। কিন্তু উত্তর গোলার্ধের সকল স্থান হতে একে

আকাশে দিগন্ত হতে সমান উচ্চতায় দেখা যায় না। স্থান ভেদে এই উচ্চতার পার্থক্য ঘটে নিরক্ষরেখা হতে ধ্রুবতারাকে ঠিক দিগন্তরেখায় দেখা যায়। অর্থাৎ নিরক্ষরেখায় ধ্রুবতারার উন্নতি ০° ডিগ্রি হয়। নিরক্ষরেখা হতে সুমেরুর দিকে প্রতি ১° অগ্রসর হলে ধ্রুবতারার উন্নতি ১° বাড়তে দেখা যায়। সুমেরুতে একে ঠিক শিরোবিন্দুতে দেখা যায়। অর্থাৎ তথায় এর উন্নতি ৯০° হয়। আমরা জানি, নিরক্ষরেখার অক্ষাংশ 0° ডিগ্রি। নিরক্ষরেখা হতে যতই উত্তরে অগ্রসর হওয়া যায় ততই অক্ষাংশ বেড়ে যায় এবং সুমেরুর অক্ষাংশ হল ৯০° ডিগ্রি। সুতরাং উত্তর গোলার্ধে কোন অক্ষাংশ ও ধ্রুবতারার উন্নতি সমান।

ধ্রুবতারার উন্নতি নির্ণয়ের জন্য সেক্সট্যান্ট যন্ত্রের সাহায্য নিতে হয়। সেক্সট্যান্ট নামক যন্ত্রের মধ্যে একটি দূরবীক্ষণ যন্ত্র বসানো থাকে। প্রথমে যন্ত্রটি উত্তরমুখী করে ভূমিতলের সহিত আনুভূমি রেখে পরে দূরবীক্ষণ যন্ত্রকে ধীরে ধীরে উপরদিকে ঘোরানো হয়। যতক্ষণ না এর মধ্য দিয়ে ধ্রুবতারাকে দেখা যায়। দূরবীক্ষণের এই দুই অবস্থানের কৌণিক পার্থক্য = ধ্রুবতারার উন্নতি = সেই স্থানের অক্ষাংশ। মনে করি AB অনুভূমিক রেখা, AC অবস্থার ধ্রুবতারা D কে দেখা যায়

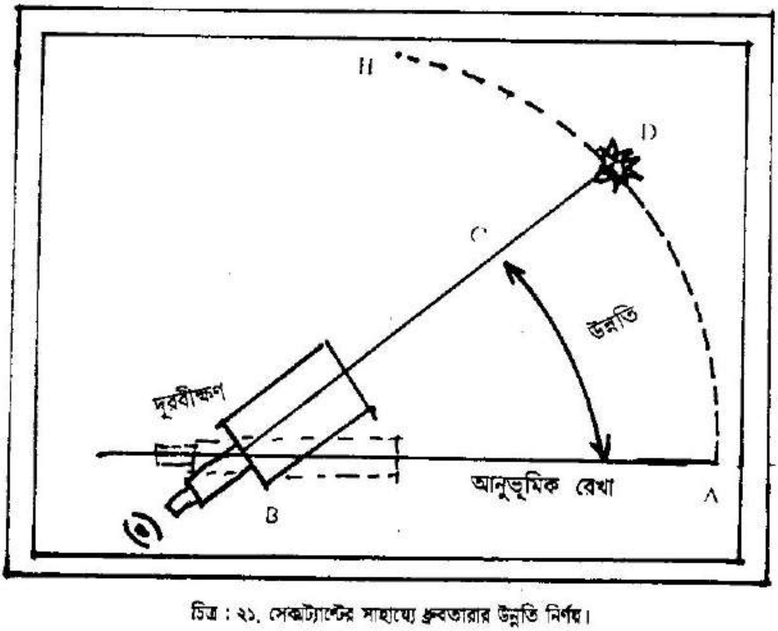

চিত্র : ২১. সেক্সট্যান্টের সাহায্যে ধ্রুবতারার উন্নতি নির্ণয়।

দূরবীক্ষণ যন্ত্রকে ABC কোণে ঘোরানো হল। এটাই ধ্রুবতারার উন্নতি এবং ঐ স্থানের অক্ষাংশ দক্ষিণ গোলার্ধে ধ্রুবতারাকে দেখা যায় না। দক্ষিণ গোলার্ধে কুমেরু হতে সোজাসুজি দক্ষিণে তাকালে আকাশে হ্যাডলির অক্ট্যান্ট নামে একটি নক্ষত্রকে দেখা যায়। এর সাহায্যে উপরোক্ত উপায়ে দক্ষিণ গোলার্ধের যে কোন স্থানের অক্ষাংশ নির্ণয় করা যায়।

(২) সূর্যের উন্নতির সাহায্যে : দুই গোলার্ধেই দিনে সূর্যের উন্নতির সাহায্যে যে কোন স্থানের অক্ষাংশ নির্ণয় করা যায়।

সূত্র : অক্ষাংশ = ৯০° − মধ্যাহ্ন সূর্যের উন্নতি ± বিষুব লম্ব।

সূর্য যেদিন যে অক্ষাংশের উপর লম্বভাবে কিরণ দেয় সেটাই সেদিনের সূর্যের বিষুব লম্ব। বস্তুত পৃথিবীর বার্ষিক পরিক্রমের জন্য সূর্যের আপাত পরিভ্রমণ পথ বিষুব রেখা হতে $২৩\frac{১^{\circ}}{২}$ উত্তর অক্ষাংশ বা কর্কটক্রান্তি রেখা ও $২৩\frac{১^{\circ}}{২}$ দঃ অক্ষাংশ বা মকরক্রান্তি রেখা এ কারণেই সূর্যের বিষুব লম্ব $২৩\frac{১^{\circ}}{২}$ উত্তর অক্ষাংশে হতে $২৩\frac{১^{\circ}}{২}$ অক্ষিণ অক্ষাংশে পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। ২১ মার্চ হতে ২৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সূর্যের বিষুব লম্ব উত্তরে এবং ২৩ সেপ্টেম্বর হতে ২১ মার্চ পর্যন্ত সূর্যের বিষুব লম্ব দক্ষিণে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ২১ জুন তারিখে কর্কটক্রান্তির উপর লম্বভাবে কিরণপাত করে। অতএব ২১ এ জুন তারিখে সূর্যের বিষুব লম্ব $২৩\frac{১^{\circ}}{২}$ উত্তরে। উক্তরূপে ২৩ সেপ্টেম্বর এবং ২১ এ ডিসেম্বর তারিখে বিষুব লম্ব যথাক্রমে ০° এবং $২৩\frac{১^{\circ}}{২}$ দক্ষিণ। আলোচ্য স্থানটি যদি উত্তর গোলার্ধে হয়। তবে উত্তর বাচক বিষুব লম্ব যোগ করতে হবে এবং দক্ষিণ

ছায়ার সাহায্যে ঃ

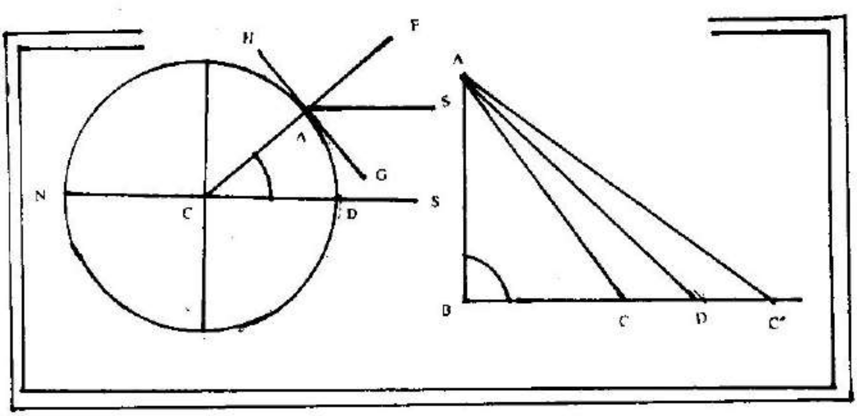

চিত্র : ২২. ২১ মার্চ ও ২৩ সেপ্টেম্বর কোন স্থানের অক্ষাংশ নির্ণয়।

বাচক বিষুব লম্ব বিয়োগ করতে হবে। ± চিহ্ন দ্বারা এটিই সুচিত করা হয়েছে। এ সূত্র অনুযায়ী উত্তর গোলার্ধে কোনদিন মধ্যাহ্ন সূর্যের উন্নতি ৪০° থাকলে এবং সেই দিনের বিষুব লম্ব ২০° উঃ হলে সে স্থানে অক্ষাংশ ৯০° – ৪০° + ২০° = ৭০° উঃ হবে।

দক্ষিণ গোলার্ধের কোন্ স্থানের অক্ষাংশও উপরের নিয়মে বের করা যায়। তবে এক্ষেত্রে সূর্যের উন্নতির সঙ্গে উত্তর বিষুব লম্ব বিয়োগ ও দক্ষিণ বিষুব লম্ব যোগ করতে হবে। যে যন্ত্রের সাহায্যে মধ্যাহ্ন সূর্যের উন্নতি পরিমাপ করা হয়., তাকে সেক্সট্যান্ট যন্ত্র বলা হয়। বিভিন্ন তারিখের বিষুব লম্ব নৌ সারণীতে লিপিবদ্ধ থাকে।

(৩) ছায়ার সাহায্যে : উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে একটি সরল দণ্ড লম্বভাবে পুঁতে ২১ জুন ও ২২ ডিসেম্বর এর মধ্যাহ্ন ছায়ার দৈর্ঘ্য নির্ণয় করি। তারপর ঐ দণ্ড ও ছায়া দুটির দৈর্ঘ্য যে কোন স্কেল অনুযায়ী ছক কাগজে আঁকি, মনে করি, AB দণ্ডের দৈর্ঘ্য BC এবং BC′ ছায়ার দৈর্ঘ্য। AC ও BC যোগ করে CAC′ কোনকে AD রেখা দ্বারা সমান দু'ভাগে ভাগ করি। তাহলে ∠ ADB = ঐ স্থানের অক্ষাংশ।

দ্রাঘিমাংশ (Longitude)

সমাক্ষ রেখা হতে পূর্ব বা পশ্চিমের অবস্থা জানার জন্য ভূ-পৃষ্ঠে দু'মেরুকে সংযুক্ত করে উত্তর–দক্ষিণে প্রসারিত অনেকগুলো রেখা কল্পনা করা হয়েছে। এগুলো নিরক্ষরেখাকে লম্বভাবে

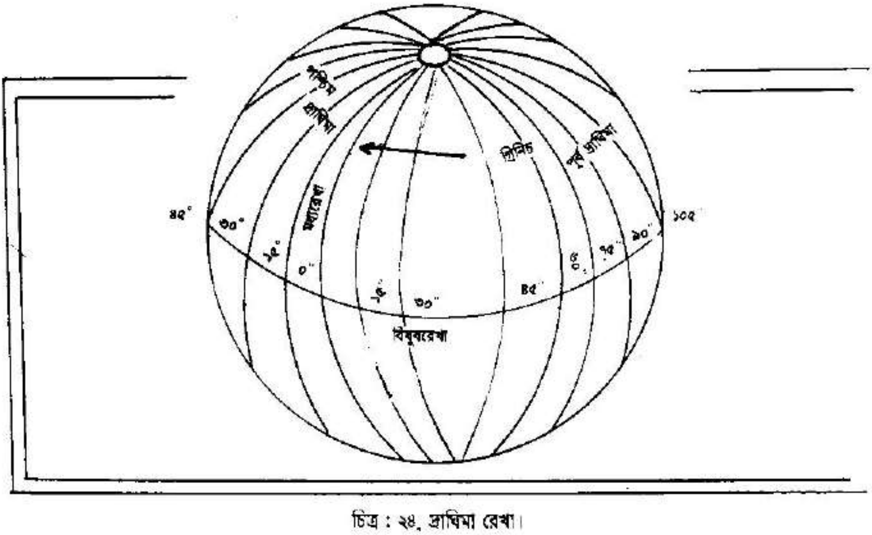

চিত্র : ২৪. দ্রাঘিমা রেখা।

ছেদ করেছে। কার্যত নিরক্ষ রেখাকে ডিগ্রি, মিনিট ও সেকেন্ডে ভাগ করে এ সকল অংকেন করা হয়। এদেরকে দ্রাঘিমা রেখা বা মধ্যরেখা বলে।

নিরক্ষরেখা উত্তর দক্ষিণে পৃথিবীকে সমদ্বিখণ্ডিত করেছে। কিন্তু প্রাকৃতিক কারণে পৃথিবীকে পূর্ব পশ্চিমে দ্বিখণ্ডিত করার মতো এরূপ কোন মধ্যরেখা নির্দিষ্ট করা যায় না। প্রাচীনকালে বিভিন্ন দেশে আঞ্চলিক সুবিধা অনুযায়ী বিভিন্ন মধ্যরেখার সাহায্যে পূর্ব পশ্চিমের দূরত্ব নিরূপণ করা হত, কিন্তু আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির মাধ্যমে স্থির করা হয় যে লন্ডনের উপকণ্ঠে গ্রিনিচ শহরে রাজকীয় জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত মান মন্দিরের উপর দিয়ে যে মধ্যরেখা অতিক্রম করেছে তাকে মূল মধ্যরেখা বিবেচনা করে অন্যান্য স্থানের দ্রাঘিমা রেখার অবস্থান নির্ণয় করা হয়।

মূল মধ্য রেখা হতে পূর্ব বা পশ্চিমে কোন স্থানের কৌণিক দূরত্বকে সেই স্থানের দ্রাঘিমা বলা হয়। গ্রিনিচের ০° ডিগ্রি ধরে পরিধিকে (৩৬০°) মূল মধ্য রেখা হতে ১° অন্তর অন্তর পূর্বে ১৮০টি এবং পশ্চিমে ১৮০টি ভাগ করা হয়। এ কারণে দেখা যায় ১৮০° পূঃ দ্রাঘিমা এবং ১৮০° পঃ দ্রাঘিমা মূলত একই মধ্যরেখায় পড়ে। অক্ষাংশের ন্যায় প্রতি ডিগ্রি দ্রাঘিমাকে মিনিট এবং সেকেন্ডে ভাগ করা হয়। প্রতি ডিগ্রি দ্রাঘিমা এক ডিগ্রির $\frac{১}{৬০}$ অংশের সমান এবং প্রতি সেকেন্ড ১ মিনিটের $\frac{১}{৬০}$ অংশের সমান। গিনি উপসাগরে কোন একস্থানে মূল মধ্যরেখা ও নিরক্ষরেখা পরস্পরকে লম্বভাবে ছেদ করেছে। এ স্থানের অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমা উভয়ই '০' ডিগ্রি।

মূল রেখাগুলো একে অন্যের সমান হলেও সমান্তরাল নয়। এর কারণ নিরক্ষ রেখা হতে উত্তর এবং দক্ষিণে ক্রমশ কমতে থাকে এবং ৯০° উত্তর বা দক্ষিণ অক্ষাংশে পৌছলে এদের প্রান্তদ্বয় মেরু বিন্দুতে মিশে যায়। নিরক্ষ রেখার উপর ১° দ্রাঘিমার রৈখিক দূরত্ব প্রায় ১১১.২৬ কিলোমিটার, ৬০° উঃ ও দঃ অক্ষাংশে ৫৬ কি.মি. এবং ৮০° উঃ ও দঃ অক্ষাংশে ১৯.৩৮ কি.মি.।

দ্রাঘিমা নির্ণয়

(১) সময়ের পার্থক্য দ্বারা : পৃথিবী আকারে একটি বৃত্ত, সুতরাং পৃথিবীর পরিধির কৌণিক মাপ ৩৬০°। পৃথিবী প্রতি ২৪ ঘন্টায় সূর্যের সম্মুখে নিজ মেরুদণ্ডের উপর নির্দিষ্ট সমবেগে একবার আবর্তন করে, অর্থাৎ ৩৬০° ঘুরে আসে, সুতরাং সূক্ষ্মভাবে প্রকাশ করলে পৃথিবী এক ঘন্টায় ১৫০ এবং ৪ মিনিটে ১° ঘুরে আসে। আবার পৃথিবী পশ্চিম হতে পূর্বদিকে ঘুরছে। ফলে আমরা সূর্যকে পূর্বদিক হতে পশ্চিম দিকে ঘুরতে দেখি। সুতরাং পশ্চিম দিকের স্থান অপেক্ষা পূর্বদিকের স্থানে আগে সূর্যোদয়, মধ্যাহ্ন বা সন্ধ্যাও হয়। এক এক ডিগ্রি দ্রাঘিমার পার্থক্যের জন্য দুটি স্থানের সময়ের পার্থক্য হয় ৪ মিনিট। কোন স্থানের স্থানীয় সময় যখন বেলা ১২টা, তখন এর ১° পূর্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত স্থানের স্থানীয় সময় ১২টা ৪ মিনিট এবং ১ পশ্চিম দ্রাঘিমায় অবস্থিত স্থানের স্থানীয় সময় ১১টা ৫৬ মিনিট হয়।

(২) গ্রিনিচের সময় দ্বারা : গ্রিনিচের দ্রাঘিমা '০' ডিগ্রি, সুতরাং গ্রিনিচের সময় ও কোন স্থানের স্থানীয় সময়ের পার্থক্য জানতে পারলে সে স্থানের দ্রাঘিমা নির্ণয় করা যায়। সেক্সট্যান্ট নামক যন্ত্রের

সাহায্যে আকাশে সূর্যের সর্বোচ্চ অবস্থান দেখে কিংবা কাঠির সাহায্যে সূর্যের ক্ষুদ্রতম ছায়া দেখে কোন স্থানের মধ্যক বা বেলা ১২টা স্থির করা যায়। ক্রনোমিটার নামক উৎকৃষ্ট ঘড়ি নির্ভুলভাবে গ্রিনিচ অর্থাৎ মূল মধ্যরেখার সময় রেখে চলে, এই ঘড়ির সাহায্যে কিংবা বেতারে গ্রিনিচের সময় জানতে পারা যায়। প্রত্যেক জাহাজে সেক্সট্যান্ট যন্ত্র ও ক্রনোমিটার ঘড়ি থাকে। নাবিকগণ এদের সাহায্যে জাহাজ কোন দ্রাঘিমায় আছে তা সহজেই জানতে পারে।

দ্রাঘিমা নির্ণয় বিষয়ক সমস্যা

(ক) ঢাকা হতে জাপানের কোন একটি শহরের স্থানীয় সময়ের ব্যবধান ৩ ঘণ্টা ১৫ মিনিট ঢাকার দ্রাঘিমা ৯০.২৬ হলে ঐ শহরটির দ্রাঘিমা কত?

ঢাকা ও জাপানের শহরটির মধ্যে সময়ের ব্যবধান = ৩ ঘ. ১৫ মি. = ১৯৫ মি.

আমরা জানি,

৪ মিনিট সময় ব্যবধানের জন্য দ্রাঘিমা পার্থক্য = ১°

∴ ১ মিনিট সময় ব্যবধানের জন্য দ্রাঘিমা পার্থক্য = $\frac{১}{৪}$

∴ ১৯৫ মিনিট সময় ব্যবধানের জন্য দ্রাঘিমা পার্থক্য = $\frac{১ \times ১৯৫}{৪}$ = ৪৮°৪৫´

জাপান, ঢাকা হতে পূর্বে অবস্থিত বিধায় ঐ শহরের দ্রাঘিমা ঢাকার চেয়ে বেশি হবে।

∴ ঢাকার দ্রাঘিমা = ৯০°২৬´

∴ জাপানের শহরটির দ্রাঘিমা হবে = ৯০°২৬´ + ৪৮°৪৫´ = ১৩৯°১১´ পূর্ব।

(খ) গ্রিনিচে যখন রাত্রি ১০টা, তখন কোন স্থানের সময় রাত্রি ৬টা, ঐ স্থানের দ্রাঘিমা কত?

গ্রিনিচের দ্রাঘিমা = ০°

গ্রিনিচে যখন রাত্রি ১০টা তখন কোন স্থানের সময় রাত্রি ৬টা অর্থাৎ ঐ স্থানের অবস্থান নিশ্চয়ই গ্রিনিচ হতে পশ্চিমে। কারণ স্থানটি পশ্চিমে অবস্থিত না হলে ঐ স্থানের সময় গ্রিনিচ অপেক্ষা পশ্চাদগামী (Slow) হতো না।

গ্রিনিচ ও ঐ স্থানটির মধ্যে সময়ের পার্থক্য = ১০−৬টা = ৪টা = ৪ × ৬০মিঃ = ২৪০মিঃ

আমরা জানি, ৪ মিনিট সময় ব্যবধানের জন্য দ্রাঘিমা পার্থক্য = ১° এবং ৪ সেকেন্ডের জন্য পার্থক্য = ১´

ঐ স্থানের দ্রাঘিমা = ২৪০ মিঃ ÷ ৪ মিঃ

= ৬০° (পশ্চিম)।

অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশের প্রয়োজনীয়তা

ভূগোল বিষয়ে অক্ষাংশ এবং দ্রাঘিমাংশের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। সময় নির্ণয়, আন্তর্জাতিক যাতায়াত, যোগাযোগ ও ভূ-পৃষ্ঠের কোন স্থানের সঠিক সময় নির্ণয়ে এর বিকল্প নেই। নিম্নে এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোকপাত করা হল।

(১) অবস্থান নির্ণয় : অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশের সাহায্যে ভূ-পৃষ্ঠের কোন স্থানের সঠিক অবস্থান নির্ণয় করা হয়। যেমন কোন স্থানের অক্ষাংশ যদি ৪০° উত্তর হয় এবং দ্রাঘিমা যদি ৯০° পূর্ব হয় তবে ৯০° পূর্ব মধ্যরেখা এবং ৪০° উত্তর অক্ষরেখার সংযোগস্থলে উক্ত স্থানটি অবস্থিত হবে।

(২) সময় নির্ণয় : দ্রাঘিমাংশের সাহায্যে বিভিন্ন স্থানের সময় নির্ণয় করা হয়। মূল মধ্যরেখা হতে পূর্ব দিকে ১° দ্রাঘিমান্তরে ৪ মিনিট সময় বাড়ে এবং পশ্চিমে ১° দ্রাঘিমান্তরে ৪ মিনিট সময় কমে।

(৩) তাপমাত্রা নির্ণয় : অক্ষাংশের সাহায্যে কোন স্থানের তাপমাত্রা এবং জলবায়ু সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। যেমন নিম্ন অক্ষাংশের তাপ মাত্রা কম এবং উচ্চ অক্ষাংশে তাপমাত্রা বেশি।

(৪) যাতায়াত ব্যবস্থা : সমুদ্রগামী জাহাজের নাবিক ও বৈমানিকগণ অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশের সাহায্যে তাদের অবস্থান দিক ও পথ নির্ণয় করে থাকে।

৫) দুর্ঘটনা থেকে উদ্ধার : কোন জাহাজ বিমান বা পর্বত যাত্রীরা দুর্ঘটনা কবলিত হলে অক্ষাংশ এবং দ্রাঘিমাংশের সাহায্যে তাদের অবস্থান সম্পর্কে জেনে 'SOS' সংকেত পাঠাতে পারে।

৩.৭ স্থানীয় সময়, প্রমাণ কাল ও প্রতিপাদ স্থান

ভূমিকা : স্বাভাবিক কারণেই সময় যেমন স্থানীয় সময়, প্রমাণ সময়, গ্রিনিচ সময়, আন্তর্জাতিক সময় এলাকা, আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা প্রভৃতি বিষয়ে সকলের মনে কিছু না কিছু কৌতূহল কাজ করে। আমরা যখন রমজান মাসের ইফতার ও সেহরির সময় তালিকার দিকে তাকাই তখন দেখতে পাই, ঢাকায় যদি ইফতারের সময় ৬টা ৪০ মিনিট হয় তবে একই দিনে খুলনার ইফতার সময় প্রায় ৬টা ৪৫ মিনিট এবং চট্টগ্রামে ইফতার সময় প্রায় ৬টা ৩৫ মিনিট। তাছাড়া আমরা যখন রেডিওতে বি.বি.সি অথবা ভোয়া'র (VOA) সংবাদ শুনি তখন দেশভেদে সময়ের পার্থক্য যে কত প্রকট হতে পারে তা সহজেই অনুমান করতে পারি। কোন দেশ কিভাবে তাদের দেশের সময় হিসেব করে। একই দেশের মধ্যে ইফতার বা সেহরির পার্থক্য কেন হয়, এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা যে শিরোনামগুলোর সাথে জড়িত তা হচ্ছে স্থানীয় সময়, প্রমাণ সময় (Standard time), আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা (International Date Line) প্রভৃতি।

মূল শিরোনামগুলোর আলোচনার সাথে অন্য একটি ভৌগোলিক বিষয়ের আলোচনা আন্ত সম্পর্কিত। এ বিষয়টি হচ্ছে দ্রাঘিমা রেখা (Lines of Longitude) বা মধ্যরেখা (meridians) যা ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে।

স্থানীয় সময় (LocalTtime) : সূর্যের লম্বভাবে কিরণ, কোনস্থানের মধ্যরেখায় সূর্যের অবস্থান ও মধ্যাহ্ন ১২টা'র ভিত্তিতে স্থানীয়ভাবে যে সময় নির্ধারণ করা হয় তাকে বলে স্থানীয় সময় বা Local Time.

পৃথিবী আবর্তনের ফলে যে সময়ে কোন স্থানের মধ্যরেখা সূর্যের সামনে আসে অর্থাৎ যে সময় সূর্যরশ্মি লম্বভাবে কিরণ দেয় সে সময়কে ঐ স্থানের মধ্যাহ্ন সময় (Noon) বলে। মধ্যাহ্ন সময় হতে দিনের অন্যান্য সময় নির্ধারণ করা যায়। মধ্যাহ্ন-এর সময় কোন স্থানের ঘড়িতে বাজে বেলা ১২টা। এক দিনের মধ্যাহ্ন থেকে পরবর্তী দিনের মধ্যাহ্ন সময়কে ২৪ ঘণ্টা ধরা হয়। যে কোন

মধ্যাহ্ন থেকে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত সময়কে Post Meridian (P.M) বা অপরাহ্ন এবং মধ্যরাত্রি থেকে পরবর্তী দিনের মধ্যাহ্ন পর্যন্ত সময়কে বলে ('Ante' Meridian (A.M) বা পূর্বাহ্ন।

কোন স্থানের আকাশ সীমায় যে সময়ে সূর্য সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছায় সেই সময়কে স্থানীয় সময় অনুসারে দুপুর (Noon) বলে। কখন সূর্য কোন স্থানের মধ্যরেখা অতিক্রম করছে তা নির্ভুলভাবে খুঁজে বের করার জন্য সেক্সট্যান্ট নামক যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। ধরা যাক পৃথিবী পৃষ্ঠে অত্যন্ত নিকটবর্তী দুটি বিন্দু "ক" ও "খ" (চিত্র)। যেহেতু সূর্য তার অক্ষের উপর ছবিতে তীর চিহ্নিত দিকে ঘোরে সেহেতু "ক" বিন্দু অবশ্যই "খ" বিন্দুর চেয়ে পূর্বেই সরাসরি সূর্যের নিচে অবস্থান করবে. সুতরাং 'ক' বিন্দুতে 'খ' বিন্দুর চেয়ে আগে মধ্যাহ্ন উপস্থিত হবে। কিন্তু দুটি স্থান যদি সরাসরি পরস্পরের উত্তর দক্ষিণে অবস্থিত হয় তবে তারা একই দ্রাঘিমা রেখায় অবস্থান করে বিধায় তাদের স্থানীয় সময়ও একই। এই কারণে বার্লিন ও কেপটাউন শহর দুটি প্রায় একই দ্রাঘিমায় অবস্থানের জন্য উভয় স্থানের স্থানীয় সময় প্রায় এক। অথচ লন্ডন, নিউইয়র্ক, ঢাকা প্রভৃতি মহানগরী ভিন্ন ভিন্ন দ্রাঘিমা রেখায় অবস্থান করায় প্রত্যেকের স্থানীয় সময়ও ভিন্ন ভিন্ন।

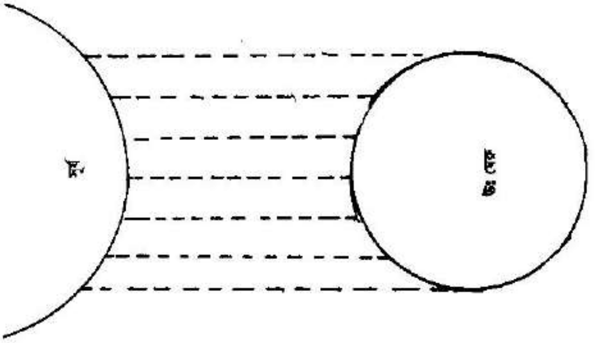

চিত্র : ২৫, সূর্য।

দ্রাঘিমার পার্থক্যের জন্যই স্থানীয় সময় এক হয় না। প্রতি ১° দ্রাঘিমা পার্থক্যের জন্য ৪ মিনিট সময়ের ব্যবধান হয়।

প্রমাণ সময় (Standard Time) : কোন দেশের বা বৃহৎ অঞ্চলের মধ্যবর্তী দ্রাঘিমা রেখার ভিত্তিতে মধ্যবর্তী কোন উল্লেখযোগ্য স্থানের স্থানীয় কাল বা সময়কে সারা দেশের জন্য বা বৃহৎ অঞ্চলের জন্য নির্দিষ্ট সময় বলে গণ্য করা হয়। এই নির্দিষ্ট সময়কে ঐ দেশের প্রমাণ সময় বলে।

প্রমাণ সময়ের প্রয়োজনীয়তা : যদি কোন দেশের প্রতিটি শহর ও গ্রামের স্থানীয় সময় থাকে এবং যখন আমরা এক শহর থেকে অন্য শহরে বা এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে যাই তখন যদি আমাদের হাত ঘড়ির সময় পরিবর্তন করার প্রয়োজন পড়ে তবে ঘড়ির সময় পরিবর্তন করতে করতেই আমাদের সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকতে হবে। এটা একেবারে অসম্ভব। তাই প্রত্যেকটা দেশের

জন্য একটা নির্দিষ্ট ব্যবহারিক প্রমাণ সময় নির্বাচন করা একান্ত প্রয়োজন। যে নির্দিষ্ট সময় দেশের সকল অংশে প্রয়োগযোগ্য হবে। নিয়মানুসারে কোন দেশের মধ্যভাগের উল্লেখযোগ্য স্থানের স্থানীয় সময়কেই ঐ দেশের জন্য প্রমাণ সময় হিসাবে নির্ধারণ করা হয়।

কোন কোন দেশের জন্য একাধিক প্রমাণ সময় নির্দিষ্ট রয়েছে, যেমন— ইউ.এস.এ. এবং কানাডা। ইউরোপে তিনটা প্রমাণ সময় রয়েছে। যেমন — গ্রিনিচ সময়, মধ্য ইউরোপীয় সময় এবং পূর্ব ইউরোপীয় সময়। ইউরোপের পশ্চিমাঞ্চলীয় দেশগুলো গ্রিনিচ প্রমাণ সময় অনুসরণ করে।

প্রমাণ সময় হিসাবে গ্রিনিচ মিন সময়ের গুরুত্ব : গ্রিনিচ রাজকীয় মানমন্দিরের দ্রাঘিমা ০°। এই ভিত্তিতে গ্রিনিচ প্রমাণ সময় নির্ধারণ করা হয়। গ্রিনিচ প্রমাণ সময়ের বা গাণিতিক নিয়ম অনুসরণ করে বিভিন্ন দেশের প্রমাণ সময় নির্ধারণ করা যায়।

৩.৮ প্রতিপাদ স্থান (Antipode) :

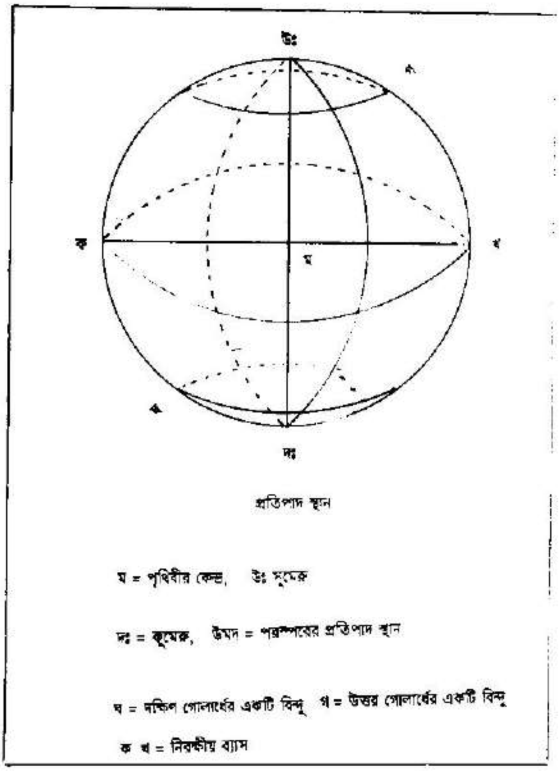

চিত্র : ২৬. প্রতিপাদ স্থান।

পৃথিবীর কেন্দ্র ভেদ করে কল্পিত ব্যাসের বিপরীত প্রান্তদ্বয়ে অবস্থিত বিন্দু দুটিকে পরস্পরের প্রতিপাদ স্থান বলে। প্রতিপাদ স্থান দুটি সম্পূর্ণ রূপে একে অন্যের বিপরীত দিকে থাকলে অন্যটি নিরক্ষ রেখার সমদূরত্বে অবস্থান করে এবং তাদের মধ্যে দ্রাঘিমান্তর হয় ১৮০° সুতরাং একটি স্থানের অক্ষাংশ ৫০° উত্তর হলে তার প্রতিপাদ স্থানের অক্ষাংশ ৫০ দক্ষিণ এবং দ্রাঘিমা ৫০° পূর্ব হলে প্রতিপাদ স্থানের দ্রাঘিমা ১৮০° – ৫০° = ১৩০° পঃ হবে, ফলে স্থান দুটির মধ্যে সময়ের পার্থক্য ১২ ঘণ্টা হয়। লন্ডনের প্রতিপাদ স্থান নিউজিল্যান্ডের নিকট প্রশান্ত মহাসাগরে (৫১°৩০ দঃ অক্ষাংশ এবং ১৭৯°৫৫ পূর্ব দ্রাঘিমায়) অবস্থিত। ঢাকার প্রতিপাদ স্থান দক্ষিণ আমেরিকার অন্তর্গত চিলির নিকট প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত।

বাংলাদেশের প্রমাণ সময় নির্ণয় : গ্রিনিচের দ্রাঘিমা ০° হওয়ায় সাধারণত গ্রিনিচের স্থানীয় সময়কে বিশ্বের প্রায় সর্বত্রই প্রমাণ সময় হিসাবে ধরা হয়। ৯০° পূর্ব দ্রাঘিমা রেখা বাংলাদেশের স্থানীয় সময় নির্ণয় করা হয়। এ সময়কে বাংলাদেশের সর্বত্র প্রমাণ সময় হিসাবে গণ্য করা হয় বাংলাদেশের প্রমাণ সময় গ্রিনিচ সময় অপেক্ষা ৬ ঘন্টা অগ্রবর্তী।

৩.৮.১ : আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা (International Date Line) :

আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতির মাধ্যমে প্রশান্ত মহাসাগরের মানচিত্রে ১৮০° দ্রাঘিমায় একটি রেখা

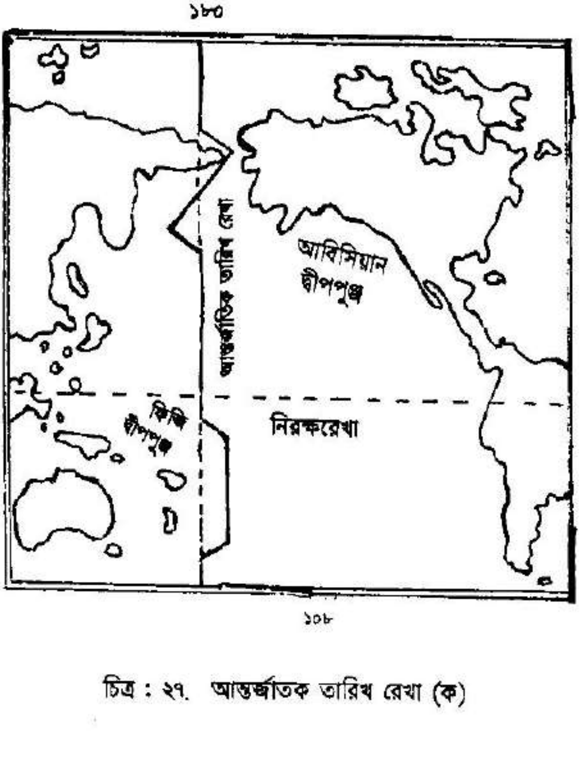

চিত্র : ২৭. আন্তর্জাতক তারিখ রেখা (ক)

কল্পনা করা হয়েছে। এই রেখাটি আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা নামে পরিচিত। এই রেখাটি গ্রিনিচের 0° মধ্যরেখার বিপরীত দিকে অবস্থিত।

আন্তর্জাতিক তারিখ রেখার প্রয়োজনীয়তা : আমরা যখন আমাদের দেশ থেকে দূরবর্তী কোন দেশে ভ্রমণে যাই তখন আমাদের দেশের স্থানীয় সময় অনুযায়ী ঘড়ির সময়ের সাথে সেই দেশের স্থানীয় সময় মিলে না। ফলে স্থানীয় সময়ের পার্থক্যের জন্য নানা প্রকার অসুবিধার সৃষ্টি হয়। এমনকি বারের নাম নিয়েও গোলযোগ ঘটে। অসুবিধা দূরীকরণার্থে আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা কল্পনা করা হয়েছে। এই রেখাটি কাল্পনিক। অপর একটি রেখা লন্ডনের নিকটবর্তী গ্রিনিচের মানমন্দিরের উপর দিয়ে সুমেরু ও কুমেরু পর্যন্ত বিস্তৃত। এই রেখাটি নিরক্ষরেখাকে লম্বভাবে ছেদন করেছে। এই রেখাটি হল ০° দ্রাঘিমা রেখা। এই রেখা থেকে প্রতি ডিগ্রি পূর্ব বা পশ্চিম দিকে গেলে সময় যথাক্রমে ৪ মিনিট বেশি বা কম হয়। এর ফলে বিভিন্ন স্থানের সময় হিসাব করতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু একটি মাত্র স্থানে এই অসুবিধা চরমভাবে অনুভূত হয়। সেই স্থানটি হল ১৮০° পশ্চিম দ্রাঘিমা ও ১৮০° পূর্ব দ্রাঘিমা রেখা। আসলে এই দু'টি রেখা পৃথক নয় — কারণ পৃথিবী হল গোল, কাজেই গ্রিনিচ থেকে দু'টি বিমান যদি একই সময় পূর্ব ও পশ্চিম এই দুই দিকে যাত্রা করে তবে ১৮০° পশ্চিম দ্রাঘিমা ও ১৮০° পূর্ব দ্রাঘিমা রেখাতে উভয়ের মধ্যে সময়ের ব্যবধান হবে ১ দিন বা ২৪ ঘণ্টা (১৮০ × ৪ মিঃ + ১৮০ × ৪ মিঃ = ৭২০ মিঃ + ৭২০ মিঃ = ১৪৪০ মিনিট = ২৪ ঘণ্টা = ১ দিন)। কিন্তু ঐ স্থানটি একই স্থান, এবং তাই সময়ও বিভিন্ন না হয়ে এক হওয়া উচিত। এই অসুবিধা ও সমস্যা দূর করবার জন্য আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা (International Date Line) বলে আরও একটি রেখা উপযোগী। এই রেখাটি গ্রিনিচের মূল মধ্যরেখা থেকে ১৮০° পূর্ব বা পশ্চিমে অবস্থিত। আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরুকে যুক্ত করেছে। তবে এই রেখাটি সরল রেখা নয়। গ্রিনিচ থেকে ১৮০° পূর্ব বা পশ্চিম সাধারণত স্থলভাগকে এড়িয়ে আঁকা–বাঁকা এই পথে রেখা জলভাগের উপর দিয়ে কল্পিত।

কোন পশ্চিমগামী বিমান বা জাহাজ ঐ কল্পিত রেখা অতিক্রমের সময় হিসাব অনুযায়ী সময়ের সঙ্গে ১২ ঘণ্টা যোগ করলে গ্রিনিচের প্রমাণ সময় পাবে এবং ২৪ ঘণ্টা বা ১ দিন যোগ করলে ঐ অঞ্চলের স্থানীয় সময় পাবে। আবার পূর্বগামী কোন বিমান বা জাহাজ ঐ কল্পিত রেখা অতিক্রমের সময় হিসাব অনুযায়ী সময় থেকে ১২ ঘণ্টা বিয়োগ করলে ঐ গ্রিনিচের প্রমাণ সময় এবং ২৪ ঘণ্টা বা ১ দিন বিয়োগ করলে ঐ অঞ্চলের স্থানীয় সময় পাবে। ঐ কল্পিত রেখা অতিক্রমের সময় আন্তর্জাতিক এই নিয়মটি মেনে চলতে হয়। এই রেখাটি আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা বলে পরিচিত। নিচের চিত্রে আন্তর্জাতিক তারিখ রেখার মানদণ্ডে স্থানীয় সময় নিরূপণ কৌশল দেখানো হল।

লক্ষণীয় যে, যখন সূর্য ৪৫° পূর্ব মধ্যরেখায় সরাসরি লম্বভাবে কিরণ দেয় (অর্থাৎ ৪৫° পূর্ব দ্রাঘিমায় মধ্যাহ্ন ১২.০০ ঘটিকা) ধরা যাক সে সময় সোমবার। এটি গ্রিনিচে ৯.০ সকাল এবং গ্রিনিচের পশ্চিমে ১৭৯° পশ্চিম দ্রাঘিমায় হবে ৯.০৪ এবং বার হবে রবিবার। আমরা যদি পশ্চিম দিকের পরিবর্তে ৪৫° পূর্ব দ্রাঘিমার দিকে যাই তাহলে ৯০° পূর্ব দ্রাঘিমায় সময় হবে বিকাল ৩.০ টা, সোমবার। এবং ১৭৯° পূর্ব দ্রাঘিমায় সময় হবে ৮.৫৬ রাত্রি, সোমবার।

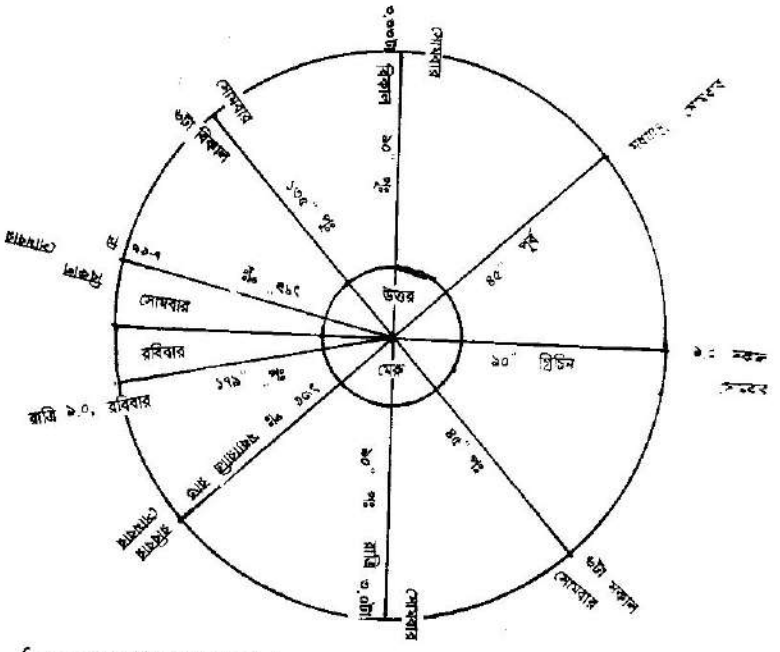

চিত্র : ২৮. আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা (ক)

এভাবে যদি আমরা গ্রিনিচ থেকে পশ্চিম দিকে সময় হিসাব করি তবে ১৮০° দ্রাঘিমায় সময় দাঁড়াবে রাত্রি ৯–০ টা, রবিবার। আর যদি পূর্ব দিক থেকে সময় গণনা করা হয় তবে সময় দাঁড়াবে রাত্রি ৯–০ টা সোমবার। কিন্তু ১৮০° পূর্ব দ্রাঘিমা এবং ১৮০° পশ্চিম দ্রাঘিমা একই রেখা। কিন্তু একই স্থানে কারো হিসাব মতে সোমবার আবার কারো হিসাব মতে রবিবার। এই অসুবিধা দূর করার জন্য বিজ্ঞানীগণ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের সময় নিরূপণের জন্য একটি স্থির রেখার সাহায্য লওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তাই আন্তর্জাতিকভাবে প্রশান্ত মহাসাগরের মানচিত্রে ১৮০° দ্রাঘিমায় আন্তর্জাতিক তারিক রেখাটি কল্পনা করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক তারিখ রেখাটি আঁকাবাঁকা কেন

আন্তর্জাতিক তারিখ রেখাটি গ্রিনিচের মূল মধ্য রেখা থেকে ১৮০ পূর্ব বা পশ্চিমে অবস্থিত। আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরুকে যুক্ত করেছে। তবে রেখাটি সরল রেখা নয়। গ্রিনিচ থেকে ১৮০° পূর্ব বা পশ্চিমে সাধারণত মূল স্থলভাগকে এড়িয়ে আঁকাবাঁকা পথে রেখাটিকে প্রশান্ত মহাসাগরের মানচিত্রে জল ভাগের উপর দিয়ে কল্পনা করা হয়েছে।

আগেই আলোচিত হয়েছে যে ১৮০° দ্রাঘিমার এক দিকে সময় কম এবং অন্য দিকে সময় বেশি। তাছাড়া বারের ক্ষেত্রেও বিরাট অসামঞ্জস্য রয়েছে। ফলে রেখাটি যদি স্থলভাগে অবস্থিত কোন দেশের উপর দিয়ে যায় তবে একই দেশে দু'রকমের সময় ও বার এর হিসাবের প্রয়োজনীয়তা ও জটিলতা দেখা দেবে। জটিলতা এড়াবার জন্য আন্তর্জাতিক তারিখ রেখাটিকে স্থলভাগ এড়িয়ে কেবল জলভাগের উপর দিয়ে কল্পনা করা হয়েছে। ফলে রেখাটি অ্যালুশিয়ান দ্বীপ পুঞ্জের নিকট পূর্বদিকে এবং ফিজি দ্বীপপুঞ্জের নিকট পশ্চিম দিকে বেঁকে গিয়েছে। স্থলভাগ এড়িয়ে জলভাগের উপর দিয়ে কল্পনা করার জন্য রেখাটি আঁকাবাঁকা হয়েছে।

কোন পশ্চিমগামী বিমান বা জাহাজ ঐ কল্পিত রেখা অতিক্রমের সময় হিসেব অনুযায়ী সময়ের সঙ্গে ১২ ঘন্টা যোগ করলে গ্রিনিচের প্রমাণ সময় পাবে এবং ২৪ ঘন্টা বা ১ দিন যোগ করলে ঐ অঞ্চলের স্থানীয় সময় পাওয়া যাবে। আবার পূর্বগামী কোন বিমান বা জাহাজ ঐ কল্পিত রেখা অতিক্রমের সময় হিসেব অনুযায়ী সময় থেকে ১২ ঘন্টা বিয়োগ করলে ঐ স্থানের গ্রিনিচের সময় পাবে এবং ২৪ ঘন্টা বা ১ দিন বিয়োগ করলে ঐ স্থানের স্থানীয় সময় পাবে।

৩.৯.১ ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগ (Earth's Crust)

ভূমিকা : ভূ-পৃষ্ঠ প্রধানত দু'টি ভাগে বিভক্ত। জলভাগ ও স্থলভাগ। ভূ-পৃষ্ঠের মোট ক্ষেত্রফল প্রায় ৫১ কোটি ৫৪ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার। এর ১০ ভাগের ৭ ভাগ জল এবং ৩ ভাগ স্থল। অধিকাংশ স্থলভাগ উত্তর গোলার্ধে ও অধিকাংশ জলভাগ দক্ষিণ গোলার্ধে অবস্থিত। এই বিশাল স্থলভাগ বিভিন্ন মহাদেশে এবং জলভাগ বিভিন্ন সাগর ও মহাসাগরে বিভক্ত। এই মহাদেশ ও মহাসাগরগুলো বিশাল ত্রিভুজাকারে ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগে অবস্থিত। নিচের চিত্রে ভূ-পৃষ্ঠে মহাদেশ ও মহাসাগরের অবস্থান দেখানো হল।

পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন প্রকৃতির ভূমিরূপ দেখা যায়। এক স্থানের ভূ-সংস্থান ও ভূমিরূপের কোন সাদৃশ্য খুব একটা দেখা যায় না। ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগের বিভিন্ন স্থানে নদী, হ্রদ, হিমবাহ প্রভৃতি প্রবাহিত হয় এবং এর ফলে বিভিন্ন স্থানের ভূমিরূপও নানা রকম হয়। তাছাড়া চুনাপাথর অঞ্চল ও মরুভূমি অঞ্চলেও ভূ-প্রকৃতির পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

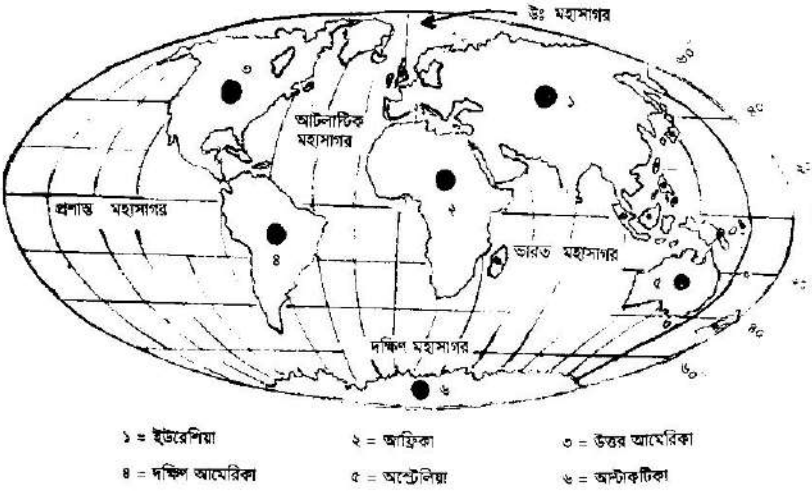

চিত্র : ২৯. পৃথিবীর মহাদেশ ও মহাসাগর

১ = ইউরেশিয়া	২ = আফ্রিকা	৩ = উত্তর আমেরিকা
৪ = দক্ষিণ আমেরিকা	৫ = অস্ট্রেলিয়া	৬ = অ্যান্টার্কটিকা

মহাসাগর (Ocean)

ভূ-পৃষ্ঠে অবস্থিত বিশাল জলভাগগুলোকে মহাসাগর বলা হয়। পৃথিবীতে মহাসাগরের সংখ্যা ৫টি যথা—

১. প্রশান্ত মহাসগর (The Pacific Ocean)

২. আটলান্টিক মহাসগার (The Atlantic Ocean)

৩. ভারত মহাসাগর (The Indian Ocean)

৪. সুমেরু মহাসাগর (The Arctic Ocean)

৫. কুমেরু মহাসাগর (The Antarctic Ocean)

১. প্রশান্ত মহাসাগর : মহাসাগরসমূহের মধ্যে বৃহত্তম হলো প্রশান্ত মহাসাগর। এটি ভূ-পৃষ্ঠের প্রায় এক তৃতীয়াংশ স্থান অধিকার করে আছে। এর আয়তন প্রায় ১৬ কোটি বর্গ কিলোমিটার। এর আকৃতি একটি বৃহদাকার ত্রিভুজের ন্যায়। এই মহাসাগরের পূর্ব দিকে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশ এবং পশ্চিমে এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া ও অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশ অবস্থিত।

২. আটলান্টিক মহাসাগর : এই মহাসাগরের আয়তন প্রায় ৭ কোটি ৮৭ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার। এর পূর্বদিকে ইউরোপ ও আফ্রিকা এবং পশ্চিমে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশ অবস্থিত। এ সকল মহাদেশের আকৃতির ভিন্নতার জন্য আটলান্টিক মহাসাগরের আকৃতি অনেকটা ইংরেজি U এর মত।

৩. ভারত মহাসাগর : ভারত মহাসাগরের আয়তন প্রায় ৭ কোটি ১০ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার। এর উত্তরে এশিয়া, দক্ষিণে অ্যান্টার্কটিকা, পূর্বে অস্ট্রেলিয়া ও পশ্চিমে আফ্রিকা মহাদেশ অবস্থিত। ভারত মহাসাগরের উত্তর দিক সম্পূর্ণরূপে স্থলভাগ দ্বারা বেষ্টিত।

৪. সুমেরু মহাসাগর : এই মহাসাগর উত্তর মেরু চতুর্দিকে বৃত্তাকারে বিস্তৃত। এর আয়তন প্রায় ১ কোটি ৪৫ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার। এর চতুষ্পার্শে উত্তর গোলার্ধের স্থলভাগ দ্বারা বেষ্টিত। সুমেরু মহাসাগরের অধিকাংশ অঞ্চলই বরফাবৃত। বসন্তকালে এই বরফ কিছু গলে।

৫. কুমেরু মহাসাগর বা দক্ষিণ মহাসাগর : দক্ষিণ মেরুর নিকট অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশকে বেষ্টন করে বরফাচ্ছন্ন দক্ষিণ মহাসাগর অবস্থিত। এর আয়তন প্রায় ১ কোটি ৪২$\frac{১}{৪}$ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার। প্রশান্ত মহাসাগর আটলান্টিক মহাসাগর ও ভারত মহাসাগরের দক্ষিণ অংশ এই মহাসাগরের সাথে মিলেছে।

ভূ-পৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থানে ৭টি মহাদেশ রয়েছে। যথা—

১. এশিয়া

২. ইউরোপ

৩. আফ্রিকা

৪. উত্তর আমেরিকা

৫. দক্ষিণ আমেরিকা

৬. অস্ট্রেলিয়া

৭. অ্যান্টার্কটিকা।

১. এশিয়া : এশিয়া পৃথিবীর বৃহত্তম মহাদেশ। এর আয়তন প্রায় ৪ কোটি ৪৪ বর্গ কিলোমিটার। পৃথিবীর স্থলভাগের প্রায় এক তৃতীয়াংশ এ মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত।

২. ইউরোপ : ইউরাল পর্বত, ইউরাল নদী, কাস্পিয়ান সাগর, ককেশাস পর্বত, কৃষ্ণ সাগর, দার্দানেলিস প্রণালী ও ইজিয়ান সাগর এশিয়া থেকে ইউরোপকে পৃথক করেছে। ইউরোপের আয়তন ৯৯,৭১,৪৬২ বর্গ কিলোমিটার। এশিয়া ও ইউরোপকে একত্রে ইউরেশিয়া বলা হয়।

৩. আফ্রিকা : আফ্রিকা পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাদেশ। এর আয়তন প্রায় ৩,০০,৪৩,৮৮৪ বর্গ কিলোমিটার। ভূমধ্যসাগর এবং লোহিত সাগর আফ্রিকাকে যথাক্রমে ইউরোপ ও এশিয়া থেকে পৃথক করেছে।

৪. উত্তর আমেরিকা : উত্তর আমেরিকা পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম মহাদেশ। এর আয়তন প্রায় ২৪,৩৪,৫৯,০৬ বর্গ কিলোমিটার। ত্রিভুজাকৃতি এই মহাদেশটি উত্তর হতে দক্ষিণে ক্রমান্বয়ে সংকীর্ণ হয়ে গেছে। বেরিং প্রণালী উত্তর আমেরিকাকে এশিয়া থেকে পৃথক করেছে।

৫. দক্ষিণ আমেরিকা : উত্তর আমেরিকার দক্ষিণপূর্বে দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশ অবস্থিত পূর্ব পশ্চিমে এর বিস্তৃততম অংশ প্রায় ৪৮২৭ কি.মি. প্রশস্থ। উত্তর হতে এ মহাদেশ ক্রমান্বয়ে দক্ষিণ দিকে সংকীর্ণ হয়ে গেছে। এর আয়তন প্রায় ১,৭৭,৫৯,৫৬৫ বর্গ কিলোমিটার।

৬. অস্ট্রেলিয়া : এশিয়ার দক্ষিণ পূর্বে ভারত মহাসাগর এবং প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে অবস্থিত। এর আয়তন প্রায় ৭৭,৬৯,১৭০ বর্গ কিলোমিটার। এটা সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র মহাদেশ।

৭. অ্যান্টার্কটিকা : দক্ষিণ মেরুর চতুর্দিকে সুবিশাল বরফাবৃত অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশ। এটি পৃথিবীর শীতলতম মহাদেশ। এর আয়তন প্রায় ১,৩৭,২৬,৯৪৭ বর্গ কিলোমিটার। এই মহাদেশটি সারা বছর গভীর বরফস্তর দ্বারা আবৃত থাকে।

৩.৯.২ ভূ-পৃষ্ঠের অভ্যন্তরীণ গঠন (Interior of the Earth Structure)

ভূমিকা : পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ গঠন সম্বন্ধে ধারণা লাভের পূর্বে এর জন্ম হয়েছে কিভাবে তা জানা প্রয়োজন। কোন সুদূর অতীতে পৃথিবীর জন্ম কিভাবে হয়েছে তার প্রকৃত ইতিহাস আজও রহস্যাবৃত। আমরা এ পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে জেনেছি যে, জেমস জিনস প্রমুখ বিজ্ঞানীদের অনুমান অনুযায়ী কয়েকশত কোটি বছর পূর্বে একটি বিরাট নক্ষত্র সূর্যের নিকট দিয়ে প্রবল বেগে চলে যাওয়ার সময় তার প্রচণ্ড আকর্ষণে সূর্যের জ্বলন্ত বাষ্পময় দেহ থেকে পটলাকৃতি কিয়দংশ

বিচ্ছিন্ন হয়ে সূর্যের চতুর্দিকে ঘুরতে ঘুরতে নক্ষত্র ও সূর্যের টানে পরে টুকরা টুকরা হয়ে যায় এমনি একটি টুকরা থেকে পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে।

আমরা আরো জেনেছি, সর্বাধুনিক মতবাদ অনুসারে সূর্যের নিকটবর্তী কোন নক্ষত্রের প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ফলে নক্ষত্রের কিছু অংশ টুকরা টুকরা হয়ে চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হয় এদের যে অংশগুলো সূর্যের আশে পাশে থেকে যায় তারা সূর্যের মহাকর্ষ বলের প্রভাবে অন্তরীক্ষে এর চতুর্দিকে ঘুরতে থাকে। ঘূর্ণায়মান এই অংশগুলোকে বলা হয় গ্রহ। পৃথিবী এমনই একটি গ্রহ।

পৃথিবী ও সৌরজগতের সৃষ্টি রহস্য আজও সন্দেহাতীতভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়নি। তবে গ্রহ গ্রহান্তরের অভিযাত্রী আগামী দিনের মানুষ হয়তো তা সাধন করতে পারবে।

পৃথিবীর ভূ-অভ্যন্তরস্থ স্তর বিন্যাস : যেভাবেই পৃথিবীর জন্ম হোক না কেন জন্মের সময় সূর্যের ন্যায় পৃথিবীও একটি জ্বলন্ত গ্যাসীয় পিণ্ড ছিল। তারপর কোটি কোটি বৎসর ধরে বিরাট আবর্তন বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সেই বাষ্পময় দেহ থেকে পৃথিবী বর্তমান কঠিন অবস্থায় উপনীত হয়েছে। ধীরে ধীরে সাধারণ নিয়মে তাপ বিকিরণের ফলে প্রথমে বাষ্পময় দেহের কিছু অংশ শীতল ও ঘনীভূত হয়ে তরল হলো। পৃথিবীর বিভিন্ন উপাদানের তাপ বিকিরণের মতো হিমাঙ্ক ঘনাঙ্ক বিভিন্ন সেজন্যে এই তরল অবস্থায় পৃথিবীর উপাদানগুলোর মধ্যে স্থান বিনিময় হয়। আমরা জানি হালকা পদার্থ ভারী পদার্থের উপর ভাসে। এই নিয়মে অপেক্ষাকৃত ভারী উপাদান যথা — নিকেল, লৌহ তরল পিণ্ডের কেন্দ্রের দিকে নিচে তলিয়ে যায় আর হালকা উপাদানগুলো উপরের দিকে ভেসে উঠে। এই সময় পৃথিবীর উপাদনগুলো ঘনাঙ্কের তারতম্য অনুসারে স্তরে স্তরে সজ্জিত হয়। যেসব উপাদান বেশি ভারী যেমন — লোহা নিকেল তরল পিণ্ডের নিচে ডুবে পৃথিবীর বিরাট "কেন্দ্র মণ্ডল" গঠন করে কেন্দ্র মণ্ডলের চারদিকে লোহা মিশ্রিত অপেক্ষাকৃত হালকা উপাদান ঘনীভূত হয়ে "গুরুমণ্ডল বা ম্যান্টেল" গঠন করে। তরল পিন্ডের সবার উপরে যে অংশ সবশেষে কঠিন হলো তাকে বলা হয় "অশ্মমণ্ডল"। ভূ-ত্বক এই অশ্মমণ্ডলেরই অন্তর্ভুক্ত।

বিভিন্ন স্তরের গঠন ও উপাদান : পৃথিবীর বহিরাবরণ যেমন, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত উপত্যকা প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানা সম্ভব হয়েছে কিন্তু পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগ কি অবস্থায় আছে সে সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান খুবই সীমিত। পৃথিবীর ব্যাসার্ধ প্রায় ৩;৯৬২ মাইল অর্থাৎ ৬ হাজার কিলোমিটার। এই দূরত্বের মধ্যে আমাদের নিকটের সামান্য কয়েক মাইলে অনুসন্ধান করা সম্ভব হয়েছে কিন্তু ভূ-অভ্যন্তরভাগ জানার জন্য বিজ্ঞানীগণ ভিন্ন পথ অবলম্বন করেছেন। তাঁরা পৃথিবীর ঘনত্ব নির্ণয় করে দেখিয়েছেন এই ঘনত্ব সর্বত্র সমান নয়। বিভিন্ন ঘনত্বের বিভিন্ন উপাদানে গঠিত ভূ-অভ্যন্তরকে বর্ণনার সুবিধার জন্য ভূ-তত্ত্ববিদগণ ৩টি প্রমাণ স্তরে বিভক্ত করেন, যেমন, (ক) কেন্দ্রমণ্ডল (খ) গুরুমণ্ডল (গ) অশ্মমণ্ডল।

অশ্মমণ্ডলের উপরিভাগকে বলা হয় ভূ-ত্বক। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভূ-ত্বক পাললিক শিলা দ্বারা গঠিত। এই শিলার গড় গভীরতা প্রায় ৮০০ মিটার। পানির ঘনত্বকে এক ধরলে, এই পাললিক শিলায় গঠিত পাতলা স্তরটির ঘনত্ব হয় ২.৬। সমগ্র পৃথিবীর ঘনত্ব ৫.৫ এবং অশ্মমণ্ডলের গড়

ঘনত্ব ৩। অতএব এখন নিশ্চিতভাবে বলা যায় পৃথিবীর কেন্দ্রমণ্ডলের ঘনত্ব পৃথিবীর গড় ঘনত্ব অর্থাৎ ৫.৫ হতে অনেক বেশি।

কেন্দ্র মণ্ডল (Centrosphere) : পৃথিবীর কেন্দ্রের চারদিকে প্রায় ৩২০০ কি.মি. ব্যাসার্ধের এক গোলক অবস্থিত। এর নাম দেয়া হয়েছে কেন্দ্রমণ্ডল। অত্যন্ত উত্তাপের জন্য এই গোলকের উপাদান সম্ভবত তরল অবস্থায় রয়েছে। বিজ্ঞানীদের মতে এর গড় ঘনত্ব ১০ থেকে ১২ উপাদানগুলোর মধ্যে নিকেল (Ni) ও লোহা (Fe) প্রধান। এই জন্যে এই অংশকে Nife বলা হয়। এর ধাতব প্রকৃতির উপর পৃথিবীর চুম্বকত্ব অনেকাংশে নির্ভরশীল। তরল অবস্থায় থাকলেও এর কাঠিন্য বা দৃঢ়ত্ব ইস্পাতের মতো, পৃথিবীর কেন্দ্রর চতুর্দিকে ২০০০ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত। ভূ-কম্পন তরঙ্গ হতে বুঝা যায় যে, কেন্দ্র মণ্ডলের বহির্ভাগ তরল অবস্থায় রয়েছে। কিন্তু কেন্দ্র হতে ৮০০ মাইল ব্যাসার্ধের মধ্যে কেন্দ্রমণ্ডল কঠিন অবস্থায় রয়েছে বলে অনুমান করা হয়।

গুরুমণ্ডল (Barysphere) : কেন্দ্রমণ্ডলের চতুর্দিকে জুড়ে গুরুমণ্ডল অবস্থিত। প্রায় ১৯০০ মাইল বিস্তৃত এই মণ্ডলের নিম্নাংশের ১০০০ মাইল প্রধানত লোহা ও অন্যান্য গুরু ধাতব উপাদানে গঠিত। প্রধানত সিলিকন (Si) ও এ্যালুমিনিয়াম (Al) প্রভৃতি ভারী ধাতুগুলোর মিশ্রণে গঠিত বলে এটাকে Sial ও বলা হয়। নিম্নাংশের এই স্তরটিকে অতিগুরুমন্ডল (Mesosphere) বলা হয়। এই অংশের উপাদানগুলো কেন্দ্র মণ্ডলের উপাদানগুলো অপেক্ষা কিছু হালকা এবং উপরের ব্যাসলট অঞ্চলের উপাদানগুলো অপেক্ষা কিছুটা গুরু। গুরুমণ্ডল অত্যধিক উত্তপ্ত। তবে চারদিকের প্রচণ্ড চাপের প্রভাবে এখানকার উপাদানগুলো তরল ও কঠিনের মধ্যবর্তী অবস্থা অর্থাৎ কর্দমাক্ত রূপ ধারণ করেছে। গুরুমণ্ডলের উপরাংশের ৯০০ মাইল ১৫০০ কি.মি. প্রধানত ব্যাসল্ট জাতীয় উপাদানে গঠিত এর সাথে সিলিকান ও ম্যাগনেশিয়ামও রয়েছে। ঘনত্ব ৮। ঘনত্ব অনুসারে ধাতুগুলোর বিন্যাস নিচে থেকে উপরের দিকে ক্রমেই ভারী থেকে হালকা।

অশ্মমণ্ডল (Lithosphere) : গুরুমণ্ডলের উপরের অংশ অশ্মমণ্ডল। এটিই পৃথিবীর কঠিন বহিরাবরণ বা নানা প্রকার শিলা ও খনিজ পদার্থ দিয়ে গঠিত। গভীরতা ১৩০০ থেকে ১৬০০ কি.মি. অক্সিজেন, লোহা ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, এ্যালুমিনিয়াম ও সিলিকনের মধ্যে (Si) সিলিকন ও এ্যালুমিনিয়ামের (Al) ভাগ বেশি বলে এর অপর নাম Sial। বিস্তৃতি মহাদেশীয় অঞ্চলের নিচে সবচেয়ে বেশি ও মহাসাগরগুলোর নিচে সবচেয়ে কম। গড় বিস্তৃতি ৪০ মাইল মাত্র

অশ্মমণ্ডলকেও দু'টি অংশে ভাগ করা যায়, ভূ-ত্বক ও ভূ-ত্বকের নিম্নাংশের উপরি ভাগ উপরি ভাগ যত কঠিন নিম্নাংশ তত কঠিন নয়। মানুষ মাটি খুঁড়ে ১.৭ মাইল পর্যন্ত অবতরণ করেছে। আবার পৃথিবীর অভ্যন্তর থেকে তেল উত্তোলন করার জন্য ৩.৯ মাইল বিস্তৃত নল প্রেরণ করা হয়েছে।

যে উপাদানগুলো দ্বারা অশ্মমণ্ডল গঠিত তার কোনটির পরিমাণ কত তার একটি তালিকা দেয়া হলো —

উপাদান	শতাংশ	উপাদান	শতাংশ
অক্সিজেন	৪৫.৪৬	হাইড্রোজেন	০.১৪
সিলিকন	২৭.৬১	ফসফরাস	০.১২
এ্যালুমিনিয়াম	৮.০৭	ম্যাঙ্গানিজ	০.০৯
লৌহ	৫.০৬	কার্বন	০.০৯
ক্যালসিয়াম	৩.৬৪	সালফার	০.০৮
সোডিয়াম	২.৭৫	ক্লোরিন	০.০৫
পট্যাশিয়াম	২.৮৫	বেহিয়াম	৪.০৪
ম্যাগনেশিয়াম	২.০৭	ফ্লোহরিন	০.০৩
টাইটানিয়াম	০.৩২	স্ট্রোনটিয়াম	০.০২

অশ্মমণ্ডল গঠিত উপাদানের শতকরা ভাগ।

পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ সম্ভাব্য অবস্থা : পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগ যে অত্যধিক উত্তপ্ত তা উষ্ণ প্রস্রবণ, ফোয়ারা অগ্ন্যুৎপাতের ফলে উৎক্ষিপ্ত উত্তপ্ত গলিত লাভা স্রোত ইত্যাদি অভ্যন্তর ভাগের প্রচণ্ড উত্তাপই প্রমাণ করে। আবার কোন গভীর খনির মধ্যে অবতরণের সময় দেখা যায় যে প্রতি ৬০ ফুট অবতরণে ১ ফাঃ উত্তাপ বৃদ্ধি পায়। তাপবৃদ্ধি পাওয়ার এই হার যদি একই রকম থাকে তাহলেও দেখা যাবে যে কেন্দ্র অঞ্চল ভীষণ উত্তপ্ত। এই উত্তাপে কোন বস্তুই কঠিন অবস্থায় থাকতে পারে না। এমনকি তরল অবস্থাতেও না। পূর্বে বিশ্বাস ছিল যে পৃথিবীর পাতলা বহিরাবরণের নিচে সব উপাদান গলিত অবস্থায় আছে। কিন্তু বর্তমানে বিজ্ঞানীগণ এ ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁদের মতে, প্রচণ্ড উত্তাপ সত্ত্বেও পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগ কঠিন। কেননা যদি তরল হতো তাহলে নিঃসন্দেহেই অভ্যন্তর ভাগে জোয়ার ও ভাটা সংঘটিত হতো। এছাড়াও পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগ দিনে প্রবাহিত ভূ-কম্পনের ঢেউগুলোর গতি প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে অভ্যন্তরভাগ তরল নয়। প্রচণ্ড চাপের ফলেই যে পৃথিবীর অভ্যন্তরের সমুদয় উপাদান আপাত কঠিন অবস্থায় আছে সে সম্পর্কেও বর্তমানে আর সন্দেহের অবকাশ নেই। এটা একটা প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, কোন বস্তুর উপর চাপ প্রয়োগ করলে সেটাকে গলাতে বেশি উত্তাপের প্রয়োজন হয়। সুতরাং অভ্যন্তরের উপাদানগুলো প্রচণ্ড চাপ বা ভরের কারণে তরল হতে পারে না। পৃষ্ঠ থেকে মাত্র ৮/১০ মাইল নিচেই এর চাপ এত প্রচণ্ড যে তাতে কঠিনতম শিলাও চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে। সুতরাং পৃথিবীর অভ্যন্তর এমন একটি এলাকা যেখানে শূন্যতা সৃষ্টি হওয়ার কোন অবকাশ নেই।

ভূ-কম্পন বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ প্রমাণ : পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগের বিভিন্ন উপাদান ও এদের ঘনত্ব সম্পর্কে সম্ভবত একমত প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়। ভূমিকম্পের বিভিন্ন তথ্য থেকে ভূ-

কম্পন বিজ্ঞানের গাণিতিক সূক্ষ্মতার মধ্যে না গিয়েও বুঝা যায় যে, পৃথিবীর ভিতর দিয়ে প্রবাহিত বিভিন্ন 'ভূ-কম্পন ঢেউ" ক্রমান্বয়ে দিক পরিবর্তন করে। ভূ-কম্পন লেখ যন্ত্রের সাহায্যে এসব ঢেউয়ের গতিপথ বের করা যায়। সমমাত্রিক বা এক জাতীয় কঠিন পদার্থের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত ভূ-কম্পন রেখা গাণিতিক নিয়ম অনুযায়ী সরল রেখাই হবে। কিন্তু — ভূ-কম্পন লেখ যন্ত্রের সংগৃহীত-তথ্য থেকে দেখা যায় যে রেখাগুলো কোন ক্ষেত্রেই সরল নয় পৃথক ঘনত্ব সম্বলিত ভিন্ন ভিন্ন উপাদানেই তা গঠিত। ভূ-কম্পন রেখার আঁকাবাঁকা গতিপথ হওয়ার কারণ হলো পৃথিবীর অভ্যন্তরের বিভিন্ন স্তরের ঘনত্বও উপাদানের বিভিন্নতা। আলোকরশ্মি যেমন এক মাধ্যম থেকে অন্য প্রকার ঘনত্ব সম্পন্ন মাধ্যমের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময় প্রতিসরিত হয়ে দিক পরিবর্তন করে। তেমনি ভূ-কম্পনে ঢেউ ও পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন ঘনত্ব সম্পন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময় প্রতিসরিত হয় ফলে গতিপথও বক্র হয়ে যায়।

প্রাপ্ত তথ্য থেকে আরও জানা যায় যে, গতিপথের বিভিন্নতা অনুযায়ী ভূ-কম্পন ঢেউ তিন প্রকারের হয়ে থাকে। বিজ্ঞানীগণ প্রমাণ করেছেন যে, অভ্যন্তরের ৩টি স্তরের জন্যেই এই ৩ ধরনের ঢেউ এর উদ্ভব হয়। স্তরগুলোর ঘনত্বের পার্থক্য খুব বেশি। উপরের স্তর সবচাইতে হাল্কা (অশ্মমণ্ডল)। মধ্যবর্তী স্তর (গুরুমণ্ডল) কিছুটা গুরু এবং কেন্দ্রস্থিত স্তর (কেন্দ্রমণ্ডল) সর্বাপেক্ষা গুরু। গবেষণাগারে বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষণের মধ্য দিয়ে তাঁরা বিভিন্নস্তরের সকল প্রকার উপাদানগুলোকে নির্ণয় করতে সক্ষম হয়েছেন।

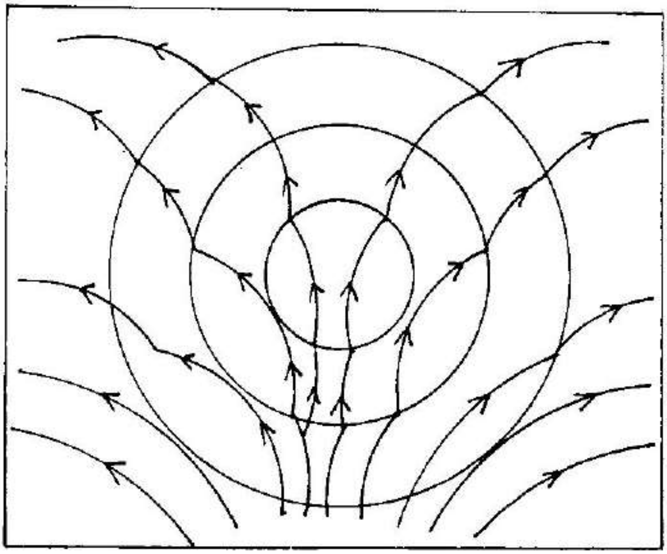

চিত্র : ৩০. ভূ-কম্পন ঢেউ।

ভূ-অভ্যন্তরীণ তাপীয় অবস্থা : পৃথিবীর অভ্যন্তর সম্পর্কে যখন মানুষ প্রথম চিন্তা-ভাবনা শুরু করে তখন থেকেই ধারণা জন্মে যে সেখানে প্রচণ্ড উত্তাপ রয়েছে। পরবর্তীতে অভিজ্ঞতা ও গবেষণায় এই ধারণার সত্যতা প্রমাণিত হয় উপরিস্থিত বস্তুর প্রচন্ড চাপের ফলে প্রচুর তাপ সৃষ্টি হতে পারে। অভ্যন্তরে বিভিন্ন রাসায়নিক ক্রিয়াতেও তাপ উৎপন্ন হয়। এসমকালীন উত্তাপও কম ছিলনা প্রায় ৫০০ কোটি বছর ধরে ঠান্ডা হলেও এই তাপের বেশ কিছু এখনও অবশিষ্ট রয়েছে। ভূ-ত্বকের শিলা আবরণ উত্তাপের উপযুক্ত পরিবাহক নয় ফলে অভ্যন্তরভাগ শীতল হতে পারে না। তেজস্ক্রিয়তা উত্তাপের তৃতীয় প্রধান উৎস হতে পারে। যদিও ভূ-ত্বকে তেজস্ক্রিয় পদার্থসমূহের উপস্থিতি অন্যান্য পদার্থের তুলনায় খুবই নগণ্য তবুও গবেষণায় প্রকাশিত হয়েছে যে, এই নগণ্য পরিমাণ তেজস্ক্রিয় পদার্থের তেজস্ক্রিয়তার ফলে পৃথিবীর সৃষ্টি হতে এ পর্যন্ত প্রচুর পরিমাণে তাপ উদ্ভূত হয়েছে।

কেন্দ্র মণ্ডলের উত্তাপ ৪০০০° – ৬০০০° সেলসিয়াস। সূর্যের বহিরাবরণের উত্তাপও অনুরূপ। এটা পরোক্ষ প্রমাণ নির্ভর। সাধারণ খনির গভীরতায় প্রাপ্ত হিসাব অনুযায়ী প্রতি ৬০ ফুটে ১° ফাঃ তাপ বৃদ্ধি পায় ফলে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ৩/৪ মাইল গভীরে যে তাপ হবে তাও মানুষের সহ্য সীমার বাইরে। অভ্যন্তরস্থ উত্তাপ সম্পর্কে সাম্প্রতিক কালে ভূ-কম্পন বিজ্ঞান থেকে প্রচুর তথ্য পাওয়া যায়। পরীক্ষায় দেখা গেছে পৃথিবীর গভীর অভ্যন্তরে একটা স্তর শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরবর্তী স্তরটি শুরু হয় নাই। মধ্যস্থলে অত্যন্ত পাতলা বা সংকীর্ণ হলেও একটি আপাতত শূন্য এলাকা রয়েছে। ভূ-কম্পন বিদ্যার সাহায্যে গভীর ভূ-অভ্যন্তরে অনুরূপ একটি মধ্যবর্তী স্তর পেলে সেই স্থান থেকে উর্ধ্ব দিকে মোটামুটি সঠিকভাবে তাপ নির্ণয় করা সম্ভব হয়।

উপসংহার

পৃথিবীর মূল উত্তাপ, চাপ জনিত উত্তাপ, রাসায়নিক প্রক্রিয়াজাত উত্তাপ, চন্দ্র সূর্যের আকর্ষণে অভ্যন্তরীণ জোয়ার জনিত উত্তাপ কেন্দ্র অঞ্চল হতে বহির্মুখী ক্রম সঞ্চালিত উত্তাপ ও তেজস্ক্রিয়জাত উত্তাপের প্রকৃত কার্যকারিতা ও পরিমাণ জ্ঞাত না থাকায় ভূ-পৃষ্ঠের তাপ বৃদ্ধির হার সন্তোষজনকরূপে গাণিতিক উপায়ে নির্ণয় করা এযাবত সম্ভব হয় নি। তবুও বিজ্ঞানী জেফরি জোসন ও এডামস গাণিতিক উপায়ে বিভিন্ন গভীরতায় উত্তাপ নির্ণয়ের চেষ্টা করে বিশ্বে প্রশংসা অর্জন করেছেন। তাদের হিসাবগুলো যথেষ্ট যুক্তি নির্ভর হলেও তা সীমিত তথ্য নির্ভর হয়ার ফলে অনিশ্চয়তার অবকাশ থেকে যায়। ভবিষ্যতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দিগন্ত আরও প্রসারিত হবে। তখন বর্তমানের মতবাদ পরিবর্তিত হলে বিচিত্র কিছু হবার নয়।

৩.৯.৩ ভূ-পৃষ্ঠের ভূমিরূপ

ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগ সর্বত্র সমান নয়। কোথাও সুউচ্চ পর্বত। কোথাও মালভূমি, কোথাও পাহাড় আবার কোথাও বা বিস্তৃত সমভূমি বিদ্যমান। কতকগুলো সুউচ্চ পার্বত্য ভূমি ক্ষয়প্রাপ

হয়ে মালভূমি ও সমভূমির সৃষ্টি করছে। আবার নিম্নভূমি ভরাট হয়েও সমভূমি বা মালভূমি গঠিত হয়ে থাকে। এভাবে ভৌগোলিক দিক দিয়ে বিচার করলে পৃথিবীর ভূমিরূপকে তিনভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা—

১. পর্বত (Mountain)

২. মালভূমি (Plateaer)

৩. সমভূমি (Plain)

১. পর্বত : ভূ-পৃষ্ঠের অতি উচ্চ, সুবিস্তৃত এবং খাড়া ঢাল বিশিষ্ট শিলাস্তূপকে পর্বত বলে। পর্বত নানা প্রকারে গঠিত হয়। উৎপত্তির তারতম্য অনুযায়ী পর্বতসমূহকে পাঁচটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়। যথা —

ক. ভাঁজ পর্বত (Fold Mountain)

খ. স্তূপ পর্বত (Block Mountain)

গ. ল্যাকোলিথ পর্বত (Laccolith Mountain)

ঘ. ক্ষয়জাত পর্বত (Residual Mountain)

ঙ. সঞ্চয়জাত পর্বত (Mountain of Accumulation)

ক. ভাঁজ পর্বত : পৃথিবীর ভিতরকার আলোড়নের ফলে কোন স্থান বসে যায়, আবার কোন স্থান উঁচু হয়ে উঠে। এই রূপে নানা রকম ভাঁজ পড়ে যে সব শিলাস্তূপের সৃষ্টি হয়েছে তাদের নাম ভাঁজ পর্বত। পৃথিবীর উচ্চতম ও দীর্ঘতম পর্বতমালাসমূহ এই পর্বত শ্রেণির অন্তর্গত। এশিয়ার হিমালয় পর্বতমালা, ইউরোপের আল্পস, দক্ষিণ আমেরিকার আন্দিজ প্রভৃতি ভাঁজ পর্বতের উদাহরণ।

খ. স্তূপ পর্বত : আন্দোলন বা কম্পনের ফলে ভূ-ত্বক কখনো কখনো খাড়াভাবে ফেটে যায় এবং কতকগুলো গভীর রেখার সৃষ্টি করে। এই রেখাগুলোকে চ্যুতি বলে। অনেক সময় দুটি চ্যুতির মধ্যবর্তী শিলাস্তর নিম্নচাপে অথবা পার্শ্বচাপে বাইরে এসে পর্বতের মতো উঁচু হয়ে উঠে। একে স্তূপ পর্বত বলে। জার্মানির ব্ল্যাক ফরেস্ট, ফ্রান্সের ভোজ পর্বত, ভারতের নীলগিরি, ভারতের আনামালই বিন্ধ্য ও সাতপুরা পর্বত স্তূপ পর্বতের উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

গ. ল্যাকোলিথ পর্বত : অনেক সময় পৃথিবীর অভ্যন্তরের ম্যাগমা বা গলিত শিলার উপাদানগুলোর সাথে বিভিন্ন গ্যাস মিশ্রিত হয়ে উর্ধ্বপ্রবাহী হয়ে ভূ-পৃষ্ঠের দিকে আসার পথে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে ভূ-ত্বকের নীচে সঞ্চিত হতে থাকে। আস্তে আস্তে চাপ পরার ফলে ভূ-ত্বকের শিলা না ভেঙ্গে উঁচু হয়ে উঠে। এটি দেখতে গম্বুজের মতো এভাবে সৃষ্ট পর্বতকে ল্যাকোলিথ পর্বত বলে। যুক্তরাষ্ট্রের ড্যাকোটা প্রদেশের র‍্যাকহিলস এবং উটা প্রদেশের হেনরি পর্বত এ জাতীয় পর্বতের উদাহরণ।

ঘ. ক্ষয়জাত পর্বত : ভূ-পৃষ্ঠে কোন সুউচ্চ মালভূমির শিলারাজি প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ার সময় অপেক্ষাকৃত কঠিন শিলাস্তূপ অপসারিত না হয়ে পাহাড় ও পর্বতাকারে অবস্থান করে। এগুলোকে ক্ষয়জাত পর্বত বলে। যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম ভাগের মালভূমির মেসাস এবং বাটেস ও ক্যাটাস্কিল, আফ্রিকার কং, ভারতের পশ্চিম ঘাট, আরাবলী প্রভৃতি ক্ষয়জাত পর্বত।

ঙ. সঞ্চয়জাত পর্বত : আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের ফলে জ্বালামুখ দিয়ে উত্তপ্ত লাভা কালক্রমে কঠিন ও শীতল হয়ে ভূ-পৃষ্ঠে ক্রমশ সঞ্চিত হতে হতে উচ্চ পর্বতের সৃষ্টি হয় এবং একে সঞ্চিত পর্বত বলে। ইতালির বিসুভিয়াস, আফ্রিকার কিলিমানজারো, হাওয়াই দ্বীপের মনালোয়া প্রভৃতি সঞ্চয়জাত পর্বতের দৃষ্টান্ত।

বিভিন্ন মহাদেশে পার্বত্য অঞ্চলগুলোর বিন্যাস

পৃথিবীর প্রত্যেক মহাদেশেই পর্বত ও পার্বত্য অঞ্চল রয়েছে। নিচে এই অঞ্চলগুলোর বিন্যাস দেখান হল।

এশিয়া

এশিয়া মহাদেশের মধ্যভাগে সুউচ্চ পর্বতমালা ও সুবিস্তৃত পার্বত্যঅঞ্চল অবস্থিত। এই পাবত্য অঞ্চল পামির গ্রন্থি হতে উৎপন্ন হয়ে এক শাখা হিমালয় পর্বতশ্রেণিরূপে পূর্বদিকে চলে গেছে। অন্য একটি শাখা কুয়েনলান পার্বতশ্রেণির উত্তর পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়েছে। পামির গ্রন্থি থেকে অপর একটি শাখা হিন্দুকুশ পর্বত নামে দক্ষিণ পশ্চিমে অগ্রসর হয়ে আমেনিয়া গ্রন্থির সাথে মিলিত হয়েছে। দক্ষিণে এলবুর্জ পর্বতমালা। পামির গ্রন্থি থেকে পর্বত শ্রেণি উত্তর পূর্ব দিকে বেরিং সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। এশিয়ার উত্তরাংশে খিনঘান পর্বতশ্রেণি অবস্থিত। মাঞ্চুরিয়ার সীমারেখায় টিয়েনসান, বৃহৎ আলতাই ও সায়ান পর্বতসমূহ বিশেষ প্রসিদ্ধ। হিমালয় পর্বতের পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত হতে কতগুলো পর্বত উত্থিত হয়েছে। যেমন— আসামের নাগা, পাতকোই, লুসাই, ব্রহ্মদেশের (বর্তমানে মায়ানমারের) আরাকান, হয়োমা, পোগাইয়োমা এবং পশ্চিমাংশের সুলেমান ও ক্ষিরথর পর্বত। এশিয়ার সর্বোচ্চ পর্বত শৃঙ্গ এভারেস্টের উচ্চতা ৮৮৪৮ মিটার যা পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গরূপে পরিচিত।

ইউরোপ

আলপস ইউরোপের উচ্চতম পর্বতশ্রেণি। দক্ষিণ ফ্রান্সে অবস্থিত মাউন্টব্লাংক (৪,৮১০ মিটার) আল্পসের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ। আল্পস পর্বত পূর্ব প্রান্তে দুভাগে বিভক্ত হয়ে দক্ষিণে বলকান ও উত্তরে কাপেথিয়ান পর্বতশ্রেণি গঠন করেছে। দিনারিক আল্পস নামে দক্ষিণে অপর একটি শাখা রয়েছে। ইতালির দক্ষিণ ভাগ থেকে আপেনাইন পর্বত উত্তর পশ্চিমে প্রসারিত হয়ে আল্পসের সাথে

মিলিত হয়েছে। ফ্রান্স ও স্পেনের সীমান্তে পিরেনিজ পর্বত এবং স্পেনের সর্ব দক্ষিণে সিয়েরা নেভাদা পর্বত অবস্থিত।

আফ্রিকা

আফ্রিকা মহাদেশের পর্বতশ্রেণি বিশেষ প্রসিদ্ধ নয়। পূর্বদিকে মালভূমির পার্শ্বে মাঝে মাঝে পর্বত বিদ্যমান। পূর্বদিকে মাউন্ট কেনিয়া ও মান্ট কিলিমানজারো ও দক্ষিণাংশে লেকোমরো পর্বত ও দ্রকেলবার্গ পর্বত অবস্থিত। নাইজেরিয়া ও নিরক্ষীয় আফ্রিকার সন্ধিস্থলে ক্যামেরুন পর্বত এবং সাহারা মরুভূমির উত্তর পশ্চিম দিকে আটলাস পর্বত অবস্থিত।

উত্তর আমেরিকা

এই মহাদেশের প্রধান পর্বতশ্রেণি পশ্চিম উপকূলের সমান্তরাল আলাস্কা হতে মধ্য আমেরিকা পর্যন্ত বিস্তৃত। যুক্তভাবে এগুলোর নাম কর্ডিলেরা। কর্ডিলেরার সবচেয়ে পূর্বের পর্বতশ্রেণি আলাস্কার এ্যান্ডিকট এবং কানাডায় ও যুক্তরাষ্ট্রে রকি পর্বত নামে পরিচিত। মধ্যভাগের পর্বতশ্রেণির মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের আলস্কা রেঞ্জ, ক্যাসকেড ও সিয়েরা নেভাদা পর্বতমালা এবং মেক্সিকোর সিয়েরা মাদ্রে পর্বতমালা উল্লেখযোগ্য। আলাস্কার ম্যাককিনলি (৬১৯৪ মিটার) উত্তর আমেরিকার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ। পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলে অবস্থিত পর্বতমালার নাম কোস্ট রেঞ্জ।

দক্ষিণ আমেরিকা

প্রশান্ত মহাসাগরের প্রায় সমান্তরাল দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত আন্দিজ পর্বতমালা পৃথিবীর দীর্ঘতম পর্বতশ্রেণি। এই পর্বতশ্রেণির দৈর্ঘ্য প্রায় ৭,২৪৩ কিলোমিটার বলিভিয়াতে অবস্থিত আন্দিজ পর্বতমালার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ আন্কোহোমা (Ancohoma)-র উচ্চতা ৭,০১০ মিটার।

অস্ট্রেলিয়া

অস্ট্রেলিয়ার পূর্বাঞ্চলে উচ্চ পার্বত্যভূমি অবস্থিত। এই পার্বত্যভূমি ইয়র্ক অন্তরীপ থেকে দক্ষিণে তাসমানিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত। উত্তরভাগে এই উচ্চভূমি গ্রেট ডিবাইডিং রেঞ্জ নামে পরিচিত।

২. মালভূমি

মালভূমি বলতে উচ্চ সমভূমি বোঝায়। সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে এর উচ্চতা কয়েক শত ফুট হতে কয়েক হাজার ফুট পর্যন্ত হয়। সধারণত মালভূমির চতুর্দিকে নিম্নভূমি থাকে। বিভিন্ন প্রাকৃতিক

শক্তির ক্ষয়কার্যের ফলে সুউচ্চ পর্বত শীর্ষ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে মালভূমি সৃষ্টি হতে পারে। আবার ভূ-আন্দোলনের ফলে সমতল ভূমি উত্থিত হয়েও মালভূমির সৃষ্টি হতে পারে।

মালভূমির অবস্থান অনুযায়ী এগুলোকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা—

ক. পর্বতবেষ্টিত মালভূমি

খ. পাদদেশীয় মালভূমি

গ. মহাদেশীয় মালভূমি।

ক. পর্বত বেষ্টিত মালভূমি : পর্বত শ্রেণি দ্বারা বেষ্টিত মালভূমিকে পর্বতবেষ্টিত মালভূমি বলা হয়। হিমালয় অঞ্চলের তিব্বত মালভূমি, ইরানের মালভূমি, আনাতোলিয়ার মালভূমি বলিভিয়ার মালভূমি, উত্তর আমেরিকার পশ্চিম কর্ডিলেরার মালভূমি প্রভৃতি এই শ্রেণির অন্তর্গত। পৃথিবীর উচ্চ এবং বিস্তৃততম তিব্বত মালভূমি দক্ষিণ হিমালয় এবং উত্তরে কিউনলুন পর্বতের মধ্যবর্তী অংশে অবস্থিত। এর গড় উচ্চতা প্রায় ৪,০০০ মিটার এবং এটা প্রায় ১০ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার স্থান অধিকার করে আছে।

খ. পাদদেশীয় মালভূমি : বৃষ্টি, নদী, হিমবাহ প্রভৃতির দ্বারা পর্বত গাত্র হতে ক্ষয়প্রাপ্ত পদার্থ পর্বতের পাদদেশে সঞ্চিত হয়ে মালভূমির সৃষ্টি করলে তাকে পাদদেশীয় মালভূমি বলে। এ জাতীয় মালভূমির এক প্রান্তে সমতলভূমি বা সাগর অবস্থান করে। উত্তর আমেরিকার কলোরেডো ও দক্ষিণ আমেরিকার পাতাগোমিয়া মালভূমি পাদদেশীয় মালভূমির উদাহরণ।

গ. মহাদেশীয় মালভূমি : এ জাতীয় মালভূমি সাধারণত সাগর অথবা নিম্নভূমি দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে। পর্বতের সাথে এর কোন সংযোগ থাকে না। স্পেন, অস্ট্রেলিয়া, আরব, ভারতীয় উপদ্বীপ, গ্রিনল্যান্ড এবং এ্যান্টার্কটিকা প্রভৃতিকে মহাদেশীয় মালভূমি বলা যায়। প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে কোন কোন মালভূমি পর্বত ও উপত্যকার সমষ্টিতে পরিণত হয়।

৩. সমভূমি

বিস্তৃত সমতল বা প্রায় সমতল নিম্নভূমিকে সমভূমি বলে। সমভূমি সমুদ্র পৃষ্ঠের প্রায় সমতলে কিংবা স্বল্প উর্ধ্বে অবস্থান করে। উৎপত্তির কারণ ও গঠনের বিভিন্নতা অনুসারে সমভূমি নানা প্রকার হতে পারে। নিচে বিভিন্ন প্রকার সমভূমির বর্ণনা দেয়া হলো।

ক. ভূ-গঠনকারী স্বাভাবিক সমভূমি : ভূ-ত্বকে শিলাস্তর যেখানে প্রায় সমান্তরালে বিন্যস্ত আছে সেখানে আপনা থেকেই সমভূমি গঠিত হয়। রাশিয়ার উচ্চভূমি এভাবে গঠিত হয়েছে।

খ. উপকূলীয় সমভূমি : নদীর কাঁকর, পলি প্রভৃতি সমুদ্রের উপকূলবর্তী অগভীর অংশে সঞ্চিত হয়ে ভরাট হলে অথবা ভূ-আন্দোলনের ফলে উত্থিত হয়ে সমভূমি সৃষ্টি হলে তাকে উপকূলীয় সমভূমি বলা হয়। এশিয়া, ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার উত্তর দিকে উপকূলীয় সমভূমি বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত।

গ. হ্রদ সমভূমি : নদীবাহিত পলি, কাঁকর প্রভৃতি সঞ্চিত হয়ে হ্রদের বুকে যে সমভূমি সৃষ্টি করে, তাকে হ্রদ সমভূমি বলা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গ্রেট বেসিন এবং কানাডার ম্যানিটোবা অঞ্চল এইরূপে গঠিত।

ঘ. প্লাবন সমভূমি : যে অঞ্চলে প্রায়ই বন্যা হয়, বন্যা শেষে এসব অঞ্চলে পরিত্যক্ত পলির সাহায্যে প্লাবন সমভূমি গঠিত হয়। সিন্ধু গাঙ্গের সমভূমি ও হোয়াংহোর সমভূমি এর দৃষ্টান্ত

ঙ. ব-দ্বীপ সমভূমি : নদী বাহিত পলিমাটি নদীর মোহনায় সঞ্চিত হয়ে ক্রমে ব-দ্বীপের সৃষ্টি করে। হুগলী নদী থেকে পূর্বে পদ্মা নদীর সীমানা পর্যন্ত পশ্চিম বঙ্গ ও বাংলাদেশের সমগ্র দক্ষিণাংশ, ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গা নদীর বিখ্যাত ব-দ্বীপ অঞ্চল। নীল,মিসিসিপি, ইরাবতী, হোয়াংহো প্রভৃতি নদীর মোহনায় এ ধরনের সমভূমি দেখা যায়।

চ. সমপ্রায় ভূমি বা তরঙ্গায়িত সমভূমি : নদীর ক্ষয়কার্যের ফলে উচ্চ প্রাচীন ভূ-ভাগ সমপ্রায় ভূমিতে পরিণত হয়। রাঁচি, গজারিবাগ প্রভৃতি অঞ্চলে এরূপ সমপ্রায় ভূমি দেখা যায়। এরূপ ভূমিভাগে মাঝে মাঝে ছোট টিলার মতো পাহাড় থাকে। তখন সমগ্র ভূ-ভাগটি অল্প অল্প ঢেউ খেলানো মনে হয় বলে এটাকে তরঙ্গায়িত সমভূমি বলা হয়।

ছ. তরঙ্গ কর্তিত সমভূমি : অসম উপকূলভাগ সাগর তরঙ্গের আঘাতে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে সমভূমিতে পরিণত হয়। নরওয়ের উপকূল ভাগে এ রকম তরঙ্গ কর্তিত সমভূমি দেখা যায়।

জ. হিমবাহ সমভূমি : হিমবাহ আনীত মোরেল ও কিছু পরিমাণ বোল্ডার ক্লে সঞ্চয়ের ফলে হিমবাহ সমভূমি গর্বিত হয়। তাছাড়া হিমবাহের ঘর্ষণে উচ্চ অসমতল ভূ-ভাগ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং আজ্ঞাকৃত নিম্ন ও সমতল ভূ-ভাগে পরিণত হয়। কানাডার শিল্ড অঞ্চলে এরূপ ক্ষয়জাত সমভূমি দেখা যায়।

ঝ. মরু অঞ্চলের সমপ্রায় ভূমি : মরুপ্রায় অঞ্চলে এক প্রকার অসমতল প্রস্তরময় ভূ-খণ্ডের উপরের অংশ অত্যন্ত খাড়াই এবং নিচের অংশ ওয়াদি (Wadis) নামক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলধারা বাহিত প্রস্তরখণ্ড দ্বারা প্রায় সমতল হয়ে থাকে। এরূপ সমপ্রায় ভূমি 'পেডিমেন্ট' নামে পরিচিত। মরুভূমি অঞ্চলে বালুকা অপসৃত হয়ে এক রকম সমপ্রায় ভূমির সৃষ্টি করে। আলজিরিয়ার রেগ, লিবিয়ার 'সেরীর', সাহারার হামাদা এই শ্রেণির সমভূমি।

ঞ. উন্নতি সমভূমি : ভূ-আন্দোলনের ফলে কখনো কখনো সমুদ্রের অগভীর অংশ অথবা কোন নিম্নস্থান উন্নত হয়ার ফলে এ ধরনের সমভূমি সৃষ্টি হয়। ইউরেশিয়ার স্টেপ অঞ্চল এরূপ উন্নত সমভূমির উদাহরণ।

ট. অবনত সমভূমি : ভূ-আন্দোলনের ফলে কোন উচু অঞ্চল বসে গেলে অবনত সমভূমির সৃষ্টি হয়। কাস্পিয়ান সাগরের নিকটে তুরান নিম্নভূমি এর দৃষ্টান্ত।

ঠ. লাভা সমভূমি : ভূ-অভ্যন্তরের গলিত পদার্থগুলো ভূ-পৃষ্ঠের ফাটল ও আগ্নেয়গিরির মধ্য দিয়ে লাভারূপে বের হয়ে অনুভূমিকভাবে সঞ্চিত হলে লাভা সমভূমির সৃষ্টি হয়। দক্ষিণ ভারতের উত্তর পশ্চিমাংশের কৃষ্ণমৃত্তিকাময় সমভূমিটি এ জাতীয় সমভূমির একটি উদাহরণ।

ঙ. লোয়েস সমভূমি : বায়ুর সঞ্চয় ক্রিয়ার ফলে যে সমভূমি গঠিত হয় তাকে লোয়েস সমভূমি বলে। উত্তর চিনের এক বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে এই সমভূমি দেখা যায়। তাছাড়া মিসিসিপি অববাহিকা, মধ্য ইউরোপ, যুক্তরাষ্ট্র ও দক্ষিণ আমেরিকায় লোয়েস সমভূমি রয়েছে।

উচ্চ অক্ষাংশের অতি শীতল তুষারাবৃত অনুর্বর সমভূমিকে তুন্দ্রা বলা হয়। বালুকাময় বৃক্ষলতাশূন্য সমভূমির নাম মরুভূমি। তৃণময় সমভূমি স্থানভেদে ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন — ইউরোশিয়া স্টেপ, উত্তর আমেরিকায় প্রেইরি, দক্ষিণ আমেরিকায় পম্পাস, অস্ট্রেলিয়ায় ডাউনস এবং আফ্রিকায় সাভানা নামে পরিচিত।

৪. হ্রদ

স্থলভাগের বিভিন্ন অংশে পানিপূর্ণ স্বাভাবিক বিস্তীর্ণ অবনত অংশকে হ্রদ বলে। ভূ-পৃষ্ঠে ছোট বড় বহু হ্রদ আছে। এসব হ্রদের পানির আস্বাদন হিসাবে পৃথিবীর হ্রদগুলোকে দু'টি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। যথা –

(১) স্বাদু পানির হ্রদ (সংক্ষেপে স্বাদু হ্রদ)

(২) লবণ পানির হ্রদ (সংক্ষেপে লবণ হ্রদ)

(১) **স্বাদু হ্রদ :** যেসব হ্রদের পানি সুপেয় সে গুলোকে স্বাদু হ্রদ বলে। পৃথিবীর বৃহত্তম হ্রদ উত্তর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডাতে অবস্থিত সুপিরিয়র হ্রদ। এর আয়তন ৮২,৯০০ বর্গ কিলোমিটার।

সুপিরিয়র হ্রদ ব্যতীত উত্তর আমেরিকায় আরো স্বাদু হ্রদ রয়েছে। যেমন — যুক্তরাষ্ট্রে ও কানাডাতে রয়েছে হিউরন, ইরি, ওন্টারিও হ্রদ। কানাডার গ্রেট বিয়ার, উইনিপেগ গ্রেট স্লেভ, এবং যুক্তরাষ্ট্রের মিসিগান হ্রদ উল্লেখযোগ্য।

এশিয়া মহাদেশের সর্ববৃহৎ স্বাদু হ্রদ সাইবেরিয়ায় অবস্থিত 'বৈকাল হ্রদ'। এর আয়তন ৩০,৫০০ বর্গ কিলোমিটার। অন্যান্য স্বাদু হ্রদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো তিব্বতের মানস সরোবর কাশ্মীরের উলার ও গল এবং আর্মেনিয়ার গকচা হ্রদ।

আফ্রিকা মহাদেশের বৃহত্তম স্বাদু হ্রদ ভিক্টোরিয়া। এর আয়তন ৬৮,৮০০ বর্গ কিলোমিটার। অন্যান্য হ্রদের মধ্যে রুডলফ, অঞ্জানিয়া, মালাওয়ি, আলবার্টা, এডওয়ার্ড এবং কিয়োগা অন্যতম।

তাছাড়া ইউরোপে অবস্থিত সুইজারল্যান্ডের জেনেভা এবং সুইডেনের ভেনার হ্রদ প্রসিদ্ধ। দক্ষিণ আমেরিকার পেরু বলিভিয়াতে অবস্থিত টিটিকাকা এবং অস্ট্রেলিয়ার এয়ার উল্লেখযোগ্য স্বাদু হ্রদ।

(২) **লবণ হ্রদ :** যে সব হ্রদের পানি লবণাক্ত এবং পান করার অযোগ্য তাদের লবণ হ্রদ বলে। এশিয়ার কাস্পিয়ান সাগর পৃথিবীর বৃহত্তম লবণ হ্রদ হিসাবে পরিচিত। এর আয়তন হলো ৩,৭১,০০০ বর্গ কিলোমিটার।

এশিয়ার অন্যান্য লবণ হ্রদের মধ্যে বলখাস ও আরন, মধ্য এশিয়ার উরুমিয়া ও হামুন, ইরানে মরুসাগর, প্যালেস্টাইনে কোকনর ও টেংরিনর, তিব্বতে এবং ভান আর্মেনিয়ায় অবস্থিত

তাছাড়া আফ্রিকার সাহারা মরুভূমির চাদ এবং কালাহারি মরুভূমির নাগমী উল্লেখযোগ্য লবণ হ্রদ। এবং অস্ট্রেলিয়ার টরেন্স প্রসিদ্ধ লবণ হ্রদ।

৫. নদী

সাধারণত ভূ-পৃষ্ঠের পার্বত্য অথবা উচ্চ মালভূমি অঞ্চল হতে জলধারা নিচের দিকে প্রবাহিত হয়ে সমতল ভূমির উপর দিয়ে সাগরে মিলিত হয়। এই জলধারাকেই নদী বলে। কিন্তু সব নদীই সাগরে মিলিত হয় না। কোন কোন নদী দেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত হ্রদ বা নিচু জলাভূমিতেও পতিত হয়। যথা ইউরোপের দানিয়ুব নদী কৃষ্ণসাগরে এবং তামির নদী লোনা জলাভূমি 'লপনর' এ মিলিত হয়েছে।

নদীর দ্বারা ভূ-পৃষ্ঠের পরিবর্তন হয় সবচেয়ে বেশি। ক্ষয়কার্য এবং সঞ্চয় কার্যের মাধ্যমে নদী ভূ-পৃষ্ঠের পরিবর্তন করে থাকে। এবং এর ফলে দুরকমের ভূ-প্রকৃতি দেখা যায়। যথা — (১) নদীর ক্ষয়জাত ভূ-প্রকৃতি, (২) নদীর সঞ্চয়জাত ভূ-প্রকৃতি।

১. নদীর ক্ষয়জাত ভূ-প্রকৃতি

পার্বত্য অবস্থায় নদীর ক্ষয়কার্য অত্যন্ত বেশি। এর ফলে এ অবস্থায় নদীর উপত্যকা গঠিত হতে থাকে। পার্বত্য অবস্থায় স্রোতের বেগ ঘন্টায় প্রায় ৩২ কিলোমিটার। পর্বত হতে প্রবল

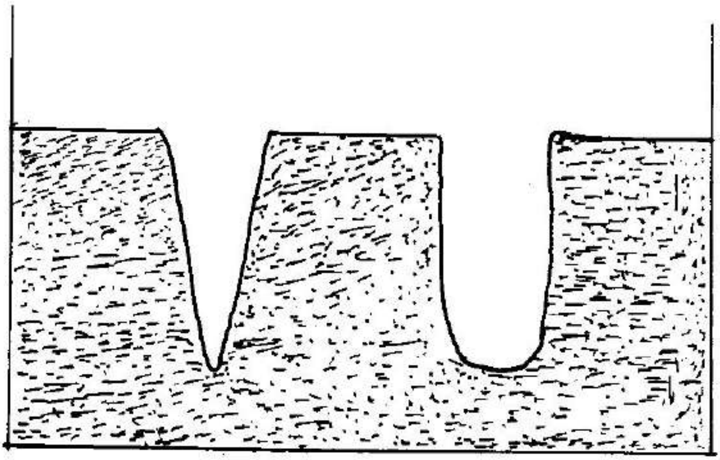

চিত্র : ৩১. নদীর উপত্যকা

বেগে নামার সময় নদীর প্রবল স্রোত বড় বড় শিলাখণ্ড বহন করে নিম্নের দিকে অগ্রসর হয়। নদী খাতের পার্শ্ব অপেক্ষা নিচের দিকের শিলা বেশি কোমল হলে পার্শ্বিক ক্ষয় অপেক্ষা উল্লম্ব ক্ষয় বেশি হয়। এভাবে ক্রমশ ক্ষয় সাধন হতে হতে নদী উপত্যকা অনেকটা ইংরেজি 'ভি' (V)

অক্ষরের মতো হয়। এরূপ উপত্যকাকে 'ভি' আকৃতি উপত্যকা বলে। কিন্তু নদীর সমভূমি অবস্থায় স্রোত ও শিলারাশি দ্বারা উল্লম্ব ক্ষয় অপেক্ষা পার্শ্ব ক্ষয় বেশি হয়। ফলে নদী উপত্যকা ক্রমশ প্রশস্ত হয়ে ইংরেজি 'ইউ' (U) অক্ষরের মতো আকৃতি ধারণ করে। তাই এরূপ উপত্যকাকে 'ইউ' আকৃতি উপত্যকা বলে। নিচের চিত্রে নদীর উপত্যকা দেখানো হল।

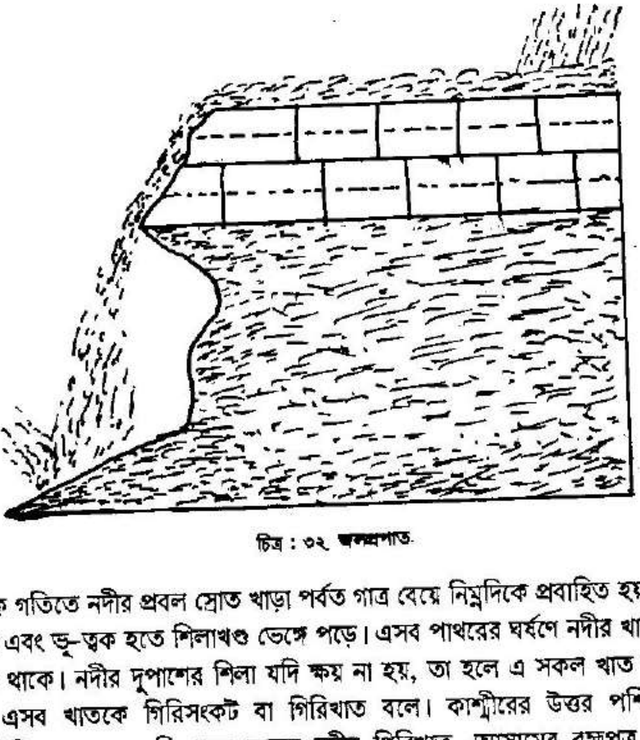

চিত্র : ৩২ জলপ্রপাত

প্রাথমিক গতিতে নদীর প্রবল স্রোত খাড়া পর্বত গাত্র বেয়ে নিম্নদিকে প্রবাহিত হয়। এতে ভূ-পৃষ্ঠ ক্ষয় হয় এবং ভূ-ত্বক হতে শিলাখণ্ড ভেঙ্গে পড়ে। এসব পাথরের ঘর্ষণে নদীর খাত গভীর ও সংকীর্ণ হতে থাকে। নদীর দুপাশের শিলা যদি ক্ষয় না হয়, তা হলে এ সকল খাত অতি গভীর হয়। তখন এসব খাতকে গিরিসংকট বা গিরিখাত বলে। কাশ্মীরের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে সিন্ধুনদের গিরিখাত, আফগানিস্তানের কাবুল নদীর গিরিখাত, আসামের ব্রহ্মপুত্র নদীর খাত প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

গিরিখাতগুলো শুষ্ক অঞ্চলে কোমল শিলাস্তরে হলে অতীব সংকীর্ণ ও গভীর হয়। এরূপ গভীর ও সংকীর্ণ গিরিখাতকে ক্যানিয়ন বলে। উত্তর আমেরিকার কলরাডো নদীর গিরিখাত গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন পৃথিবী বিখ্যাত। এই গিরিখাত প্রায় ৪৮৩ কিলোমিটার।

পার্বত্য অবস্থায় নদীস্রোত কোন কঠিন শিলাস্তর হতে কোমল শিলাস্তরের উপর দিয়ে প্রবাহিত হলে কোমল স্তরটি বেশি পরিমাণে ক্ষয় হয়। ফলে কঠিন শিলাস্তর কোমল শিলাস্তর অপেক্ষা অনেক উচ্চে অবস্থান করে এবং জলধারা খাড়াভাবে নিচে পড়তে থাকে। জলের এরূপ পতনকে জলপ্রপাত বলে। নিচের চিত্রে জলপ্রপাত দেখানো হল। দক্ষিণ আমেরিকার ভেনেজুয়েলায় রাইও কারোনি নদীর উপর অ্যাঞ্জেল জলপ্রপাত পৃথিবীর সর্বোচ্চ জলপ্রপাত। এই জলপ্রপাতের উপর হতে ৯৭৯ মিটার নিচে অবিচ্ছিন্নভাবে জল পড়তে থাকে। যুক্তরাষ্ট্রের নায়াগ্রা জলপ্রপাতটি পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা সুদৃশ্য জলপ্রপাত।

সমভূমি অঞ্চলে নদীর উপত্যকা অসমানভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হলে নদীর উভয়পার্শ্বে সিঁড়ির ন্যায় ভূ-প্রকৃতির সৃষ্টি হয়। এটাকে নদীমঞ্চ বলে। নিচের চিত্রে নদীমঞ্চ দেখানো হল।

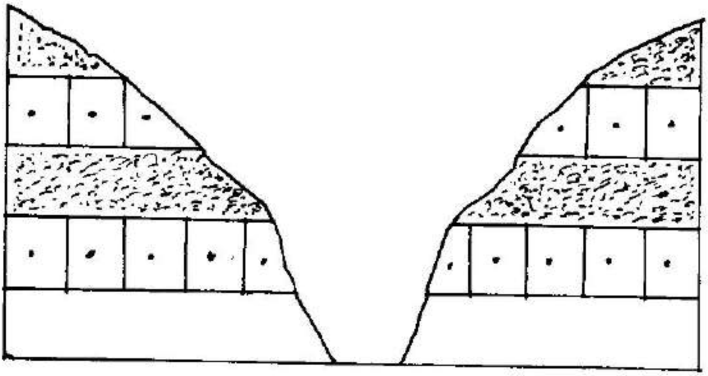

চিত্র : ৩৩. নদীমঞ্চ।

২. নদীর সঞ্চয়জাত ভূ-প্রকৃতি

পাহাড়ের পাদদেশে মৃত্তিকা কঠিন হলে সেখানে পলিমাটি সঞ্চিত হয়ে নদীর সঞ্চয় বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে হাতপাখার মতো ভূ-খণ্ডের সৃষ্টি করে। এরূপ পলল ভূমিপলল পাখা নামে পরিচিত।

অনেক সময় আঁকাবাঁকা পথে চলতে চলতে নদীর বাঁকের দু বাহুর মধ্যবর্তী সংকীর্ণ স্থান ক্ষয়প্রাপ্ত হলে নদী পুরাতন বাঁকা পথ ত্যাগ করে নতুন সোজা পথে প্রবাহিত হয়। ফলে পুরাতন খাদটি হ্রদে পরিণত হয়। এরূপ হ্রদের আকৃতি অশ্বের ক্ষুরের ন্যায় দেখা যায় বলে এটাকে অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ বলে। নিচের চিত্রে এ ধরনের হ্রদ দেখানো হল। প্রতি বছর বর্ষাকালে এ সব হ্রদে পলিমাটি সঞ্চিত হয়ে ভরাট হয়ে সমভূমিতে পরিণত হয়। এরূপ সমভূমিকে কর্দম ছিপি বলে।

বর্ষকালে নদীর উভয় তীর প্লাবিত হয়ে যায় তখন নদীর স্রোতধারা নদীর তীরে প্রবলভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়। ফলে সেখানে প্রচুর পরিমাণে বালি, পলি প্রভৃতি সঞ্চিত হয়ে বাঁধ সৃষ্টি করে। এরূপ বাঁধকে প্রাকৃতিক বাঁধ বলে। চিনের হোয়াংহো ও উত্তর আমেরিকার মিসিসিপি নদীর প্রাকৃতিক বাঁধ উল্লেখযোগ্য। এই বাঁধের পশ্চাৎ দিকে নদীর পলি সঞ্চয়ের স্বল্পতার দরুন সেটা নিম্নভূমিরূপে বিদ্যমান থাকে। বন্যার পানি সরে গেলে নিম্নভূমিতে জল আবদ্ধ অবস্থায় থাকে এবং এমন জলাবদ্ধভূমিকে পশ্চাদ জলাভূমি বলে।

নদী গতিপথ পরিবর্তন করলে প্লাবন ভূমির মধ্যস্থ পরিত্যক্ত গতিপথটি ক্রমশ ভরাট হয়ে ওঠে এবং স্থানে স্থানে পানিবদ্ধ আগাছা জন্মে। এটাকেই জলাভূমি বলে।

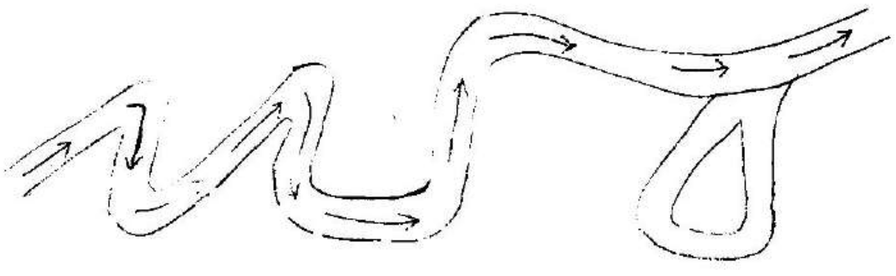

চিত্র : ৩৪. অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ।

তাছাড়া নদীর সঞ্চয় কার্যের ফলে পলল সমভূমি, প্লাবন সমভূমি এবং বিভিন্ন ধরনের ব-দ্বীপ গঠিত হয়ে থাকে।

পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য ছোট বড় নদী রয়েছে। নিচে বিভিন্ন মহাদেশের প্রধান প্রধান নদীর বর্ণনা দেয়া হল।

এশিয়া : এশিয়া নদীবহুল মহাদেশ। মধ্যভাগের উচ্চভূমি এশিয়া মহাদেশের প্রধান জল বিভাজিকা। এখান থেকে ভূমির ঢাল অনুসারে বিভিন্ন নদী উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়ে যথাক্রমে উত্তর মহাসাগর, প্রশান্ত মহাসাগর ও ভারত মহাসাগরে পড়েছে। আরো কিছু নদী অন্তবাহিনী নদীরূপে বিভিন্ন হ্রদে পড়েছে। তালতাই পর্বত থেকে ওব ইরতিশ (৫৪১০ কি.মি) ও ইনিসি (৪০৯০ কি.মি.) এবং বৈকাল হ্রদ থেকে লেনা উৎপন্ন হয়ে উত্তর মহাসাগরে পড়েছে। আমুর নদী (৪৪১৬ কি.মি.) পর্বত থেকে উৎপন্ন হয়ে ওখটস্ক সাগরে পড়েছে। এ নদী বছরের ছয় মাস বরফাচ্ছন্ন থাকে। ইয়াংসিকিয়াং (৬,৩৮০ কি.মি.) মেকং ও মেনাস তিব্বতের মালভূমি থেকে উৎপন্ন হয়ে যথাক্রমে পূর্বচিন সাগর, দক্ষিণ চিন সাগর ও শ্যাম উপসাগরে পতিত হয়েছে। গঙ্গা হিমালয় পর্বত থেকে উৎপন্ন হয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে।

ইউরোপ : ইউরোপের দীর্ঘতম নদী **ভলগা** (৩,৬৮৮ কি.মি.) পশ্চিম রাশিয়ার ভলদাই পাহাড় থেকে উৎপন্ন হয়ে কাস্পিয়ান সাগরে পড়েছে। দানিয়ুব নদী ব্ল্যাক ফরেস্ট থেকে নির্গত হয়ে মধ্য ও পূর্ব ইউরোপের ছয়টি দেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে কৃষ্ণসাগরে পড়েছে। আল্পসের পার্বত্য অঞ্চলে উৎপন্ন হয়ে রাইন উত্তর সাগরে পো অড্রিয়াটিক সাগরে এবং রোন ভূমধ্যসাগরে পতিত হয়েছে। তাছাড়া ডন, নিপার, লিস্টার কৃষ্ণসাগরে এবং পেচোরা এবং ডুইনা নদী উত্তর মহাসাগরে পতিত হয়েছে।

আফ্রিকা : আফ্রিকার নীল নদ (৬,৬৯৬ কি.মি.) পৃথিবীর দীর্ঘতম নদী। এটি ভিক্টোরিয় এবং মিশরের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ভূমধ্যসাগরে পতিত হয়েছে। তাছাড়া কঙ্গো (৪,৬৩০ কি.মি.) নাইজার, জাম্বেসী, অরেঞ্জ ভোল্টা, গাম্বিয়া আফ্রিকার উল্লেখযোগ্য নদী।

উত্তর আমেরিকা : উত্তর আমেরিকা একটি নদীবহুল মহাদেশ। ম্যাকেঞ্জি নদী (৪২৪১ কি.মি.) গ্রেট স্লেভ থেকে নির্গত হয়ে উত্তর মহাসাগরে পড়েছে। নেলসন সেন্টলরেন্স, মিসিসিপি, বিমৌরী এ মহাদেশের প্রসিদ্ধ নদী।

দক্ষিণ আমেরিকা : আমাজন পৃথিবীর প্রশস্ততম এবং দ্বিতীয় দীর্ঘতম নদী। এর দৈর্ঘ্য ৬,৫৭০ কি.মি.। দক্ষিণ আমেরিকার আন্দিজ পর্বতমালা থেকে এটি উৎপন্ন হয়ে বিষুব রেখার কাছে আটলান্টিক মহাসাগরে পড়েছে। তাছাড়া ওরিনকো, প্যারাগুয়ে, পারানা দক্ষিণ আমেরিকার উল্লেখযোগ্য নদী।

অস্ট্রেলিয়া : অস্ট্রেলিয়া মহাদেশে দীর্ঘ ও নাব্য নদীর সংখ্যা খুবই কম। মারে অস্ট্রেলিয়ার দীর্ঘতম নদী। এর দৈর্ঘ্য ২৫৭৪ কি.মি.। এটি অস্ট্রেলিয়ার আল্পসের কোসিয়াস্কো শৃঙ্গ হতে উৎপন্ন হয়ে নিউ সাউথ ওয়েলস ভিক্টোরিয়া এবং সাউথ অস্ট্রেলিয়ার মধ্য দিয়ে এনকাউন্টার উপসাগরে পতিত হয়েছে। এ মহাদেশের অন্যান্য নদীর মধ্যে বার্ডেকিন হান্টার, ভিক্টোরিয়া, রোপার অন্যতম।

৬. হিমবাহ প্রভাবিত ভূ-প্রকৃতি

তুষারক্ষেত্রে বরফের পরিমাণ যখন বেড়ে যায়, তখন বরফ একটি প্রকাণ্ড স্তূপে পরিণত হয় এবং আপন ভারে, উপরের চাপে স্থানচ্যুত হয়ে ধীর গতিতে পর্বত গাত্র বেয়ে নামতে থাকে। এরূপ চলনশীল বরফের স্তূপকে হিমবাহ বলে। হিমবাহের ক্ষয়, পরিবহণ ও সঞ্চয় ক্রিয়ার ফলে ভূ-পৃষ্ঠে যে পরিবর্তন সাধিত হয় তার রূপকে হিমবাহ প্রভাবিত ভূ-প্রকৃতি বলে।

হিমবাহের ক্ষয়জাত ভূ-প্রকৃতি : উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে পার্বত্য উপত্যকার মধ্য দিয়ে হিমবাহ নিচের দিকে প্রবাহিত হলে সে উপত্যকার উপরের অংশটি খুব খাড়া এবং মধ্য অংশে গর্তের সৃষ্টি হয়। এই গর্তকে ফরাসি ভাষায় সার্ক বলে। দুটি সার্ক পাশাপাশি থাকলে, তাদের মধ্যবর্তী উচ্চ খাড়া শৈল শিলাকে এরিটি বলে। যখন পাশাপাশি তিন চারটি সার্ক থাকে তখন তাদের মধ্যবর্তী উচ্চভূমি পিরামিডীয় বঙ্গের ন্যায় দেখায়। এই উচ্চভূমিকে পিরামিডীয় শৃঙ্গ বলে আল্পস পর্বতের ম্যাটারহন এর একটি উদাহরণ।

পার্বত্য অঞ্চলে আগের কোন উপত্যকার মধ্য দিয়ে যখন হিমবাহ অগ্রসর হয় তখন ক্ষয়কার্যের ফলে ঐ উপত্যকার আকৃতি ইংরেজি 'U' অক্ষরের মতো হয়। এরূপ উপত্যকাকে 'ইউ' আকৃতির উপত্যকা বলা হয়।

অনেক উপনদীর উপত্যকা মূল নদীর উপত্যকার সাথে মিশে যায়। এর মধ্য দিয়ে হিমবাহ প্রবাহিত হলে বৃহৎ হিমবাহের সাথে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিমবাহ মিলিত হয়ে বৃহৎ হিমবাহের উপত্যকাটি

গভীরতম হয়। তখন মনে হয় যেন অগভীর ক্ষুদ্র উপত্যকাগুলো ঝুলছে। এরূপ উপত্যকা ঝুলন্ত উপত্যকা নামে পরিচিত।

হিমবাহ প্রবাহিত হয়ে গেলে যে সব কঠিন শিলারাশি পাহাড়ের আকারে রয়ে যায় ওগুলোকে 'রোচি পর্বত' (Roches mountains) বলে।

সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলে হিমবাহের ক্ষয়কার্যের ফলে কঠিন শিলার উভয় পার্শ্বের নরম শিলা অপসারিত হলে গভীর নিমজ্জিত উপত্যকার সৃষ্টি হয়। এটাকে ফিয়র্ড বলে। নরওয়ের উর উপকূলের ফিয়র্ড বিখ্যাত।

হিমবাহের বহন কার্য : হিমবাহের সাথে প্রবাহিত শিলাখণ্ডসমূহ ঘর্ষণের ফলে ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে কাঁকর, বালুকা ও কাদায় পরিণত হয় এবং এগুলো পর্বতের নিম্নাংশে ও সমতল ভূমিতে সঞ্চিত হয়। এই কাঁকরমুক্ত কাদাকে বোল্ডার নামে অভিহিত করা হয়।

হিমবাহের সঞ্চয়জাত ভূ-প্রকৃতি : উচ্চ পার্বত্য অঞ্চল হতে বিচ্ছিন্ন ও ক্ষয়প্রাপ্ত শিলাখণ্ড হিমবাহের পার্শ্বে ও সম্মুখে স্তূপাকারে সঞ্চিত হয়ে নিচের দিকে প্রবাহিত হতে থাকে। এই শিলাস্তূপকে গ্রাবরেখা বলে। উত্তর পশ্চিম ইউরোপে এবং কানাডায় যথেষ্ট পরিমাণে গ্রাবরেখা দেখা যায়।

হিমবাহের সাথে প্রবাহিত প্রস্তরখণ্ড, কাঁকর প্রভৃতি বিভিন্ন স্তূপের আকারে যখন সারিবদ্ধভাবে সঞ্চিত হয়, তখন স্তূপগুলোকে সারিবদ্ধ টিলার মতো দেখায়। এই স্তূপগুলোর আকার ঠিক উল্টানো নৌকার মত। এরূপ ভূ-ভাগকে ড্রামলিন বলে। নিচের চিত্রে ড্রামলিন দেখানো হলো। উত্তর আয়ারল্যান্ড, স্কটল্যান্ড এবং ইউরোপের উত্তরাংশে যথেষ্ট ড্রামলিন দেখা যায়।

হিমবাহের তলদেশে সঞ্চিত কর্দমহীন প্রস্তরখণ্ডসমূহ ও মোটা বালুকা রাশিকে এসকারস (Eskers) বলে। ফিনল্যান্ড, সুইডেন প্রভৃতি দেশে এসকারস দেখা যায়।

অনেক সময় হিমবাহের শেষ প্রান্তে কাঁকর, বালুকা প্রভৃতি উপাদান নদীর ব-দ্বীপের মতো কৌনিক আকৃতিতে সঞ্চিত হয়। এগুলোকে কেম্‌স বলা হয়।

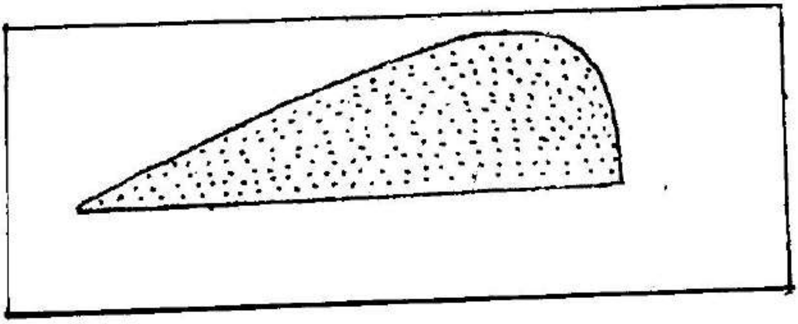

চিত্র : ৩৫. ড্রামলিন।

অনেক সময় হিমবাহ বাহিত কাঁকর, বালুকা প্রভৃতি হ্রদের মধ্যে সঞ্চিত হয়ে সমভূমিতে পরিণত হয়। এরূপ সমভূমিকে হৈমবাহিক সমভূমি বলে।

হৈমবাহিক অঞ্চলে পর্যায়ক্রমে সূক্ষ্ম ও মোটা পলির স্তরকে ভ্যারবিস বলে।

৭. চুনাপাথর অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি

চুনাপাথর অঞ্চলে ভূমির নিচের দিক দিয়ে পানি স্রোত প্রবাহিত হয়। যুগোশ্লাভিয়ার উত্তর অড্রিয়াটিক সাগরের তীরে এক বিস্তৃত চুনাপাথর অঞ্চল অবস্থিত। এই এলাকাকে কার্স্ট অঞ্চল বলা হয়। এই জন্য পৃথিবীর অন্যান্য চুনাপাথর অঞ্চলকেও কার্স্ট অঞ্চল বলা হয়ে থাকে। পৃথিবীর অনেক অঞ্চলেই চুনাপাথরজাত ভূ-প্রকৃতি দেখা যায়। যেমন — যুগোশ্লাভিয়া, ইতালি, ফ্রান্সের মধ্যমালভূমি, স্পেন, গ্রিস, পোলান্ড, জামাইকা প্রভৃতি চুনাপাথর অঞ্চল। চুনাপাথর অঞ্চলে নানা প্রকার ভূ-প্রকৃতি দেখা যায়।

চুনাপাথর অঞ্চলের ফাটল ক্ষয় হয়ে টিলার মতো যে ভূমির সৃষ্টি হয় তাকে কারেন বলে কারেনগুলো খুব ঘন হয়ে পর পর সৃষ্টি হয়ে থাকে। ফরাসি ভাষায় একে ল্যাপিজ বলে। নিচের চিত্রে ল্যাপিজ দেখানো হল।

চুনাপাথর অঞ্চলে অসংখ্য গর্তের সৃষ্টি হয়। এ সব গর্তের ভিতর দিয়ে ভূ-পৃষ্ঠের জল নিচের দিকে প্রবাহিত হয়। এগুলোই ডোলিন নামে পরিচিত।

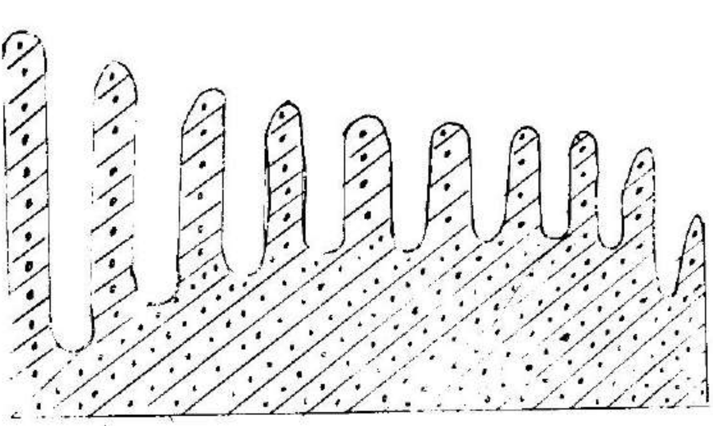

চিত্র : ৩৬, ল্যাপিজ।

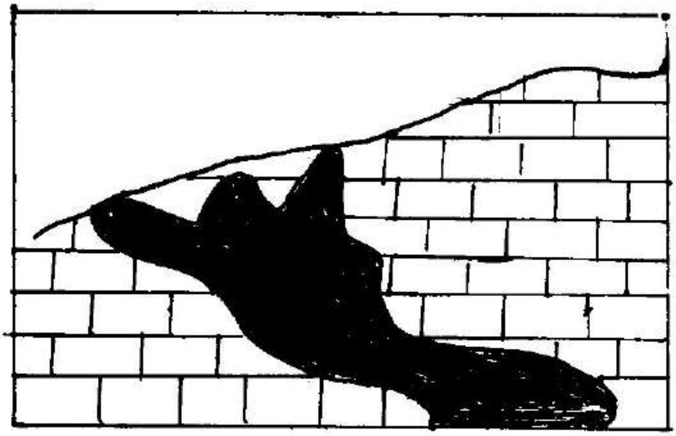

চিত্র ৩৭. ডোলিন, পনোর ও গুহা।

ডোলিন হতে যে নলপথে পানি গুহার মধ্যে জমা হয় তাকে পনোর বা এভেন বলে। উপরের চিত্রের সাহায্যে পনোর, ডোলিনগুলো দেখানো হল।

অনেক সময় গুহার ছাদে ঝুলন্ত স্ট্যালাকটাইট এবং মেঝে অবস্থিত স্ট্যালাগমাইট বর্ধিত হয়ে পরস্পর মিলিত হয়ে একটি স্তম্ভের মতো অবস্থান করে। এ ধরনের স্তম্ভকে চুনাস্তম্ভ বলে।

অনেক সময় ডোলিন, পনোর প্রভৃতির অভ্যন্তর এমনভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় যে, তা পানি সমতলের উর্ধ্বেও পানি সঞ্চয় করে রাখতে পারে। এরূপ জলধারাকে মগ্নহ্রদ বলে।

অনেক সময় ডোলিনের মধ্যবর্তী ভূ-খণ্ডগুলো পাহাড়ের আকারে বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থান করে। চুনাপাথর অঞ্চলে এরূপ ক্ষয়জাত পাহাড়কে হাম (Hum) বলে।

৮. মরুভূমি অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি

মরু অঞ্চল নানা প্রকারের হয়ে থাকে। আফ্রিকার সাহারা এবং তুর্কিস্তানের মরুভূমি বালুকাময় এবং এগুলো যথাক্রমে আর্গ ও কুম নামে পরিচিত। আবার আলজিরিয়া, লিবিয়া প্রভৃতি মরু অঞ্চল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ডের দ্বারা আবৃত। এগুলোকে প্রস্তরময় মরুভূমি বলে। আলজিরিয়ায় এবং লিবিয়ায় সেরির নামে এগুলো পরিচিত। অনেক মরুভূমি শিলাময় হয়ে থাকে। এগুলোকে হামাদা বলা হয়। ভারতের রাজস্থানের মরু অঞ্চল মরুস্থলী বা থর মরুভূমি নামে পরিচিত।

সাহারা মরুভূমিতে লিস্তিস্ত অসমানভাবে ক্ষয় হয়ে নিচের অংশ অনেক সরু, অথচ উপরের অংশ অনেক বিস্তৃত অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। এগুলোকে গৌর বলে। অনেক সময় ব্যাঙের ছাতার মতো উপরের অংশ চওড়া ও চ্যাপ্টা এবং নিচের দিকে সরু হয়ে বিভিন্ন প্রস্তরখণ্ড দ্বারা মূর্তি গঠিত হয়। এগুলোকে জিউগেন (Zeugen) বলে।

মরুভূমি ও সমুদ্রতীরে প্রচুর বালুকা সঞ্চিত হয়ে স্তূপের মতো উচু হয়ে উঠলে তাকে বালিয়াড়ি (Sand dune) বলে। অন্যান্য স্থান অপেক্ষা মরুভূমি অঞ্চলে বালিয়াড়ি বেশি দেখা যায়।

মরুপ্রায় অঞ্চলে অনেক সময় উচ্চ পর্বত বেষ্টিত অববাহিকার নিম্নাংশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লবণ হ্রদের সৃষ্টি হয়। এগুলোকে প্লায়া হ্রদ বলে। পাদদেশে উপরের অংশে বাতাসের ক্ষয়কার্যের ফলে গঠিত প্রায় সমতল ভূমিকে পেডিমেন্ট এবং নিম্নাংশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলধারাবাহিত প্রস্তরখণ্ড সঞ্চিত হয়ে গঠিত সমপ্রায় ভূমিকে বাজাদা (Bajada) বলে। তাছাড়া, মরুভূমিকে ভেন্টিফ্যাক্ট, ড্রেইকান্টার, ইয়ার্দাঙ, ইনসেলবার্জ প্রভৃতি দেখা যায়।

উপসংহার

ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগের বর্ণনার সার সংক্ষেপে এটুকুই বলা যায় যে, ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগ প্রধানত সমুদ্র ও ভূখণ্ড দ্বারা গঠিত। পৃথিবীর বিভিন্নস্থানের ভূ-প্রকৃতি বিভিন্ন রকম কোথাও সুউচ্চ পাহাড়ী অঞ্চল কোথাও মালভূমি কোথাও বা সমভূমি। কোন কোন অঞ্চল হিমবাহ প্রভাবিত, আবার কোন অঞ্চল বিস্তৃত শুষ্ক মরুভূমি। ভূ-পৃষ্ঠের নানা স্থানে অসংখ্য হ্রদ ও নদী দেখা যায়। তাছাড়া আগ্নেয়গিরি অঞ্চল, চুনাপাথর অঞ্চল, সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চল প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চলে ভূ-প্রকৃতির প্রচুর পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। এভাবে বিভিন্ন স্থানের ভূ-প্রকৃতির পার্থক্যের জন্য বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের আচার ব্যবহার, চাল চলন, পোশাক পরিচ্ছদও ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির হয়ে থাকে।

৩.১০ ভূ-ত্বকের উপাদান বিভিন্ন প্রকার খনিজ (Elements of Earth crust and Different Kinds of Minerals)

ভূমিকা

ভূ-ত্বক প্রধানত খনিজ পদার্থ জৈব উপাদান, পানি ও বায়ুর সমন্বয়ে গঠিত। মৃত্তিকার অধিকাংশই খনিজ পদার্থের সমষ্টি। মাটির প্রধান উপাদনই হল খনিজ। খনিজ হল মাটির অজৈব অংশ। নীতিগতভাবে খনিজকে নির্দিষ্ট রাসায়নিক গুণ সম্পন্ন একটি সমমাত্রিক অজৈব পদার্থ বলা হয়। প্রত্যেকটি খনিজের একটি বিশিষ্ট অভ্যন্তরীণ গঠন বর্তমান। এই খনিজ বিভিন্ন রাসায়নিক উপাদানে গঠিত হলেও প্রতিটি খনিজের একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া যায়। খনিজের গঠন সম্পর্কে জানতে হলে রাসায়নিক সংকেতের সাহায্যে জানতে হয় বা রাসায়নিক সংকেতের (Chemical Formula) সাহায্য নিতে হয়। কোন কোন খনিজ একটি মাত্র রাসায়নিক উপাদান দিয়ে গঠিত। এরূপ খনিজের মধ্যে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র হীরক প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কিন্তু অধিকাংশ খনিজই দুই বা ততোধিক রাসায়নিক উপাদানের সংমিশ্রণে গঠিত। এই সংমিশ্রণের ফলে উৎপন্ন পদার্থে মৌলিক উপাদানগুলোর কোনই বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া যায় না। খনিজের বর্ণনা করতে

গেলে শিলার কথা আসে। কারণ ভূ-পৃষ্ঠ যে সকল শিলা দিয়ে গঠিত, বিভিন্ন খনিজ্জ তাদের মূল উপাদান। ভূ-তত্ত্ববিদগণের মতে দুই বা ততোধিক খনিজ পদার্থের সংমিশ্রণেই সৃষ্টি হয় শিলা।

এই শিলা থেকেই ক্ষয়ের মাধ্যমে মাটি উৎপন্ন হয়েছে। খনিজে দ্রব্যের আকার ও বিভিন্ন হতে পারে। কোন কোন বড় খনিজের আকার প্রায় সূক্ষ্ম শিলাংশের সমান আকারের হতে পারে। কোন কোন খনিজ এত ছোট (যেমন কর্দমকণা) যা অনুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া দেখা যায় না। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, শিলা গঠনের মূল উপাদান হল খনিজ। এই শিলাসমূহের মধ্যে প্রায় দুহাজার খনিজ বিদ্যমান।

সংক্ষেপে মাটির খনিজ দ্রব্যকে ৪টি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা —

(১) খুব স্থূল প্রস্তর (Stone) ও কাঁকড় (Gravel)

(২) স্থূল বালি

(৩) সূক্ষ্ম পলি

(৪) খুবই সূক্ষ্ম কর্দম।

উপরোল্লিখিতের মধ্যে প্রথম দুটি খালি চোখে ও পরের ২টি অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা পর্যবেক্ষণ করা যায়। খনিজ মাটির উপাদান হলেও মানুষের সুস্বাস্থ্যের জন্য সামান্য পরিমাণে হলেও খনিজ পদার্থের প্রয়োজন। তেমনি উদ্ভিদেরও খনিজ পদার্থের প্রয়োজন রয়েছে। নাইট্রোজেন এবং ফসফরাস সম্বলিত খনিজই উদ্ভিদের জন্য বেশি প্রয়োজন।

খনিজ কি : প্রাকৃতিক অজৈব প্রক্রিয়ায় তৈরি নির্দিষ্ট আণবিক গঠন ও রাসায়নিক সংস্থিতি সম্পন্ন কঠিন বস্তুকে খনিজ বলা হয়। (A mineral may be defined as a solid substance having a definite chemical composition and atomic structure and formed by the inorganic process of nature)

যথা — কোয়ার্টজ (SiO_2)

নিম্নলিখিতভাবেও খনিজকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।

নির্দিষ্ট রাসায়নিক উপাদানে নির্দিষ্ট আকৃতির কাঠামো গঠিত নির্দিষ্ট গুণসম্পন্ন প্রাকৃতিক পদার্থকে খনিজ বলে। যেমন — কোয়ার্টজ, ফেলডসপার, মাইকা প্রভৃতি।

আরও সহজভাবে বলতে গেলে বলা যায়, কতকগুলো মৌলিক উপাদান প্রাকৃতিক উপায়ে মিলিত হয়ে যে যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি করে তাকে খনিজ বলে।

খনিজের রাসায়নিক ও ভৌত বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। খনিজের আকৃতি, বর্ণ, খনিজের চূর্ণের বর্ণ, দ্যুতি, কাঠিন্য আপেক্ষিক গুরুত্ব প্রভৃতি দ্বারা খনিজ চেনা যায়।

খনিজের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Minerals)

নিচে খনিজের সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহ দেয়া হল —

(১) খনিজ দ্রব্য প্রাকৃতিক অজৈব কঠিন বস্তু। এর অভ্যন্তরীণ গঠন সুনির্দিষ্ট তবে কৃত্রিমভাবে উৎপন্ন হীরক প্রকৃত অর্থে খনিজদ্রব্য নয়। এই বিবেচনায় কয়লা ও পেট্রোল খনিজ নয়।

(২) খনিজের রাসায়নিক সংস্থিতিও সুনির্দিষ্ট। তবে এতে অল্প মাত্রায় বিভিন্নতা থাকতে পারে। কয়লার রাসায়নিক সংস্থিতি সুনির্দিষ্ট নয় বলে একে খনিজ বলা যায় না।

(৩) স্ফটিক আকারে পরমাণু যুক্ত হতে হতে খনিজ উৎপন্ন হয়। পুনরায় পরমাণু বিযুক্ত হলে খনিজ ভেঙ্গে যায়।

(৪) সকল খনিজেরই কিছু সংখ্যক ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম রয়েছে।

(৫) খনিজ একটি একক মৌল উপাদান সম্পন্ন হতে পারে। যেমন — স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, সালফার ইত্যাদি।

(৬) জৈব উৎসেরও খনিজ হতে পারে। যেমন — কেলসাইট, ডলোমাইট, ঝিনুক থেকে প্রাকৃতিকভাবে উৎপন্ন।

(৭) অনেক খনিজ পদার্থ রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে।

রাসায়নিক সংযুক্তি (Chemical Composition) : অধিকাংশ খনিজের একটি নির্দিষ্ট রাসায়নিক গঠন বর্তমান, যা নির্দিষ্ট রাসায়নিক সংকেতের সাহায্যে প্রকাশ করা হয়। উদহরণস্বরূপ আমরা কোয়ার্টজ এর কথা উল্লেখ করতে পারি। কোয়ার্টজ একটি অতি সাধারণ খনিজ। এবং এর রাসায়নিক সংকেত হচ্ছে (সিলিকন ডাই অক্সাইড)। অর্থাৎ একটি সিলিকন অণু দু'টি অক্সিজেন অণুর সাথে মিলিত হয়ে কোয়ার্টজ সৃষ্টি করে। এরূপ অন্যান্য খনিজেরও নির্দিষ্ট রাসায়নিক সংযুক্তি রয়েছে।

খনিজের ভৌত বৈশিষ্ট্য (Physical Characteristics of Minerals) :

খনিজের অভ্যন্তরীণ গঠন (Internal Structure) সুনির্দিষ্ট হওয়ায় এর বিশেষ ভৌত ধর্ম রয়েছে। কয়েকটি প্রধান তাৎপর্যপূর্ণ ও সহজ দর্শনীয় ধর্মাবলী নিচে উল্লেখ করা হল।

(১) স্ফটিকাকার (Crystal for us) : অধিকাংশ খনিজ কেলাসিত (Crystalline) বা স্ফটিকাকার। অর্থাৎ খনিজের পরমাণুগুলো একটি বিশেষ জ্যামিতিক আকারে সজ্জিত। স্ফটিক (Crystal) কঠিন পদার্থ এবং এর উপরিভাগ কতিপয় মসৃণ সমতল ক্ষেত্র (Faces) দ্বারা সীমাবদ্ধ। খনিজের পার্থক্য হিসাবে স্ফটিকের গঠনের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এই পার্থক্যই খনিজকে চিনতে সাহায্য করে। কোয়ার্টজ স্ফটিকের আকৃতি পিরামিডের মতো এবং এই স্ফটিক ষড়ভুজাকৃতি (Hexagonal)।

খনিজের আকৃতি ও গঠন বিভিন্ন প্রকারের। কোন খনিজ স্ফটিকাকার (Crystalline) কোনটি কণা বিশিষ্ট (Granular), কোনটি স্তম্ভাকৃতি কোনটি তন্তুর ন্যায় (Fibrous)।

(২) খনিজের ফাটল প্রকৃতি : ফাটল দেখেও খনিজ চেনা যায়। বিভিন্ন খনিজের ফাটল বিভিন্ন প্রকারের। যে কোন খনিজ এক বা একাধিক দিকে ফেটে যেতে পারে। ফাটল স্থানে খনিজ

বিচ্ছিন্ন হয়। খনিজের ফাটলধর্মিতা এর স্ফটিকাকারের সাথে সম্পর্ক যুক্ত। অস্ফটিকাকার দ্রব্যের কোন ফাটল থাকে না। গ্যলিনার ফাটল সমমাত্রিক (Cublcal) অভ্রের ফাটল মাত্র একদিকে। এজন্য অভ্রের স্তরগুলো পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায়।

(৩) খনিজের কঠিনতা (Hardness of Minerals) : বিভিন্ন খনিজের কঠিনতাও বিভিন্ন। কোন নমুনায় সূক্ষ্ম দানাসম্পন্ন রেত দিয়ে ঘষলে উৎপন্ন গুড়া দ্রব্য ও আওয়াজ থেকে এর কঠিনতা সম্পর্কে অনুমান করা যায়। কঠিন খনিজে গুড়া কম হয় এবং আওয়াজ বেশি হয় নরম খনিজ এর বিপরীত। কোন কোন খনিজ অত্যন্ত কঠিন, কোনটি মধ্যম প্রকৃতির আবার কোনটির কাঠিন্য অতি অল্প। কাঠিন্য নিরূপণের একটি সহজ উপায় হচ্ছে যে, যে খনিজের উপর নখের সাহায্যে দাগ কাটা যায় তার কাঠিন্য ১ ও ২ এর মধ্যে। যে খনিজের উপর তাম্রমুদ্রা দ্বারা দাগ কাটা যায় তার কাঠিন্য তিন। যে খনিজের উপর দাগ কাটতে ইস্পাতের ছুরির প্রয়োজন হয় তার কাঠিন্য চার (৪) বা পাঁচ (৫)। হীরকের কাঠিন্য (১০) দশ। এটাই সর্বাপেক্ষা কঠিন খনিজ।

(৪) খনিজের ভঙ্গুরতা : কোন খনিজের ফাটল না থাকলেও আঘাতে তা ভেঙ্গে যায়। নিম্নলিখিতভাবে খনিজের ভঙ্গুরতা বর্ণনা করা যায়।

(ক) শংখাকৃতি (Conchoidal) যেমন : কোয়ার্টজ

(খ) সমভঘুর (Even) যেমন : চার্ট (Chert)

(গ) খাজ ভঘুর (Hackly) যেমন : কাস্ট আয়রন

(ঘ) মেটে (Earthy) যেমন : চক (Chalk)

(৫) খনিজের বর্ণ (Colour of Minerals)

বর্ণ দেখে খনিজ চিনতে পারা যায়। লৌহ, আকরিক, ম্যাগনেটাইটের (Magnetite) বর্ণ কৃষ্ণ। চালকোপাইরাইটের (Chalcopyrite যা থেকে তাম্র পাওয়া যায়) বর্ণ স্বর্ণাভ পীত (Golden Yellow), গ্যালিনার (Galena যা থেকে সীসা পাওয়া যায়) বর্ণ ধূসর (Lead Grey)। অনেক সময় বিভিন্ন প্রাকৃতিক কারণে বা খনিজের গঠনের পার্থক্যের ফলে তার আদি বর্ণ পরিবর্তিত হয়। যেমন কোয়ার্টজ বর্ণহীন সাদা থেকে গাঢ় বর্ণের হতে পারে।

(৬) খনিজ চূর্ণের বর্ণ (Colour of Powder or Streak) : অনেক সময় খনিজ চুর্ণের বর্ণ দেখেও খনিজ চিনতে পারা যায়। এক টুকরা পর্সিলেনের উপর কোন খনিজ দ্বারা দাগ দিলে (Streak) সেই খনিজের সূক্ষ্ম চূর্ণ পর্সিলেনের গায়ে লেগে যায়। এই সূক্ষ্ম চূর্ণ দেখে খনিজটি চিনতে পারা যায়। কষ্টি পাথরে স্বর্ণের বর্ণ যাচাই করা হয়।

(৭) খনিজের দ্যুতি (Lusture) : দ্যুতি বা উজ্জ্বলতা থেকে খনিজের পরিচয় পাওয়া যায়। খনিজের উজ্জ্বলতা নানা প্রকারের হয়। যেমন : পাইরাইটে দ্যুতি ধাতুর ন্যায় (Metallic), কোয়ার্টজের দ্যুতি কাঁচের ন্যায় (Glassy), স্ফেলিরাইটের (Sphalerite) উজ্জ্বলতা রঞ্জনের ন্যায়। ...শযুক্ত জিপসামের (Fibrous Gypsum) উজ্জ্বলতা রেশমের ন্যায় (Silky), আবার কোন কোন ...র দ্যুতি বা উজ্জ্বলতা হীরকের ন্যায় (Adamastine)।

(৮) আপেক্ষিক গুরুত্ব (Specific Gravity) : শিলা গঠনকারী অধিকাংশ খনিজের আপেক্ষিক গুরুত্ব ২.৬৫ (কোয়ার্টজ) থেকে ৩.৩৭ (অলি ভাইন)। আপেক্ষিক গুরুত্ব অনুসারে খনিজ সনাক্তকরণে সহায়তা লাভ করা যায়। তাই অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের মতো আপেক্ষিক গুরুত্বও একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

(৯) সংসক্তি (Tenacity) : খনিজ দ্রব্যের অনেকগুলো ভৌত ধর্ম আছে যেগুলো এর সংসক্তির উপর নির্ভর করে।

(ক) ছেদ্যতা (Sectility) না ভেঙ্গে ছুরি দিয়ে কাটা যায় এবং কাটা ফালি হাতুড়ি দিয়ে ভাঙ্গা যায়। যেমন — গ্রাফাইট ও জিপসাম।

(খ) পাতধর্মিতা (Malleability) পিটিয়ে পাত করা যায় যা অন্য আকার দেয়া যায় যেমন : স্বর্ণ, রৌপ্য, তামা।

(গ) নমনীয়তা (Flexibility) বাঁকানো যায়। যেমন : ট্যালক, সেলিনাইট ইত্যাদি।

(১০) অন্যান্য ধর্মাবলি :

খনিজ দ্রব্যের অন্যান্য ধর্মাবলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে —

(১) গলনতা (Fusibility)

(২) চুম্বকত্ব (Magnetism)

(৩) বিদ্যুৎ পরিবাহিতা (Electrical Conductivity)

(৪) স্বাদ (Taste)

(৫) গন্ধ (Odour) ও

(৬) অনুভব (Feel), ইত্যাদি।

খনিজের রাসায়নিক সংস্থিতি

প্রত্যেক খনিজ দ্রব্যের একটি নির্দিষ্ট রাসায়নিক সংস্থিতি রয়েছে। অর্থাৎ খনিজে বিদ্যমান রাসায়নিক উপাদানগুলোর প্রকার, পরিমাণ ও পারস্পরিক অনুপাত প্রায় নির্দিষ্ট। তবে কোন কোন খনিজের সংস্থিতি নানা কারণে কিছুটা বিভিন্ন হতে পারে। প্রধান কারণ হিসাবে সম আয়তনিক প্রতিস্থাপনের (Isomorphic Substitution) এর নাম করা যায়। এই প্রতিস্থাপন প্রক্রিয়ার উল্লেখ সহ এবং ব্যতিরেকে প্রত্যেক খনিজকেই রাসায়নিক সূত্র দ্বারা প্রকাশ করা যায়।

শিলা গঠনকারী খনিজের মধ্যে সম আয়তনিক প্রতিস্থাপন ক্রিয়া বেশ ব্যাপকভাবে সংঘটিত হয়ে থাকে। এই প্রতিস্থাপন ক্রিয়ার প্রকৃতি অনুসারে খনিজকে বিভিন্ন খনিজ দলে (Olivine Group) ভাগ করা হয়েছে। যেমন : অলিভাইন দলের (Olivine Group) সাধারণ সূত্র হচ্ছে $(Mg. Fe)_2\ Sig_4$) এই দলে কোন খনিজ ম্যাগনেসিয়াম ও লৌহ বিভিন্ন প্রতিস্থাপন মাত্রায় অবস্থান করতে পারে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে ম্যাগনেসিয়াম ও লৌহের মোট পরিমাণের সাথে

সিলিকন ও অক্সিজেন সম্পর্কযুক্ত ও এদের পরিমাণ সুনির্দিষ্ট। কিন্তু ম্যাগনেসিয়াম ও লৌহের পারস্পরিক অনুপাত সুনির্দিষ্ট নয়। ঠিক তেমনি ফেলস্পার পাইরক্সিন, এম্ফিবোল, মাইকো, এক একটি খনিজ দল(Mineral Group)। প্রত্যেক দলের অভ্যন্তরে প্রতিস্থাপন দ্বারা কোন কোন খনিজের রাসায়নিক সংস্থিতিতে পার্থক্য হতে পারে।

বিভিন্ন প্রকার খনিজ

পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে, ভূ-ত্বক নানাবিধ শিলা দ্বারা গঠিত এবং শিলাগুলো নানাবিধ খনিজের সমষ্টি। নিম্নে কতগুলো খনিজ সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

কোয়ার্টজ : এটি সিলিকন ও অক্সিজেন নামক রাসায়নিক উপাদানের মিশ্রণে উৎপন্ন একটি খনিজ। এর রাসায়নিক সংকেত SiO_2 (Silicon-di-Oxide) সাধারণত এটি সাদা ও বর্ণহীন। কোয়ার্টজ অতি সাধারণত খনিজ পদার্থ। এটি অনেক শিলার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে বর্তমান। আগ্নেয় ও পাললিক শিলায় বহু পরিমাণে বিদ্যমান। কোয়ার্টজের উজ্জ্বলতা কাঁচের ন্যায়। এটি স্বচ্ছ এবং অস্বচ্ছ উভয় প্রকারেরই হয়ে থাকে। এর কাঠিন্য ৭ এবং আপেক্ষিক গুরুত্ব ২.৬৫।

ব্যবহার : বালুকা হিসাবে সিমেন্ট তৈরির জন্য সিমেন্ট শিল্পে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া সাবান, কাঁচ, পর্সিলেন, রং প্রভৃতি প্রস্তুত করতেও এর প্রয়োজন হয়।

ফেলসপার : এটি অত্যন্ত সাধারণ সিলিকেট (Silicate) বিভিন্ন প্রকার শিলার মধ্যে এটি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এজন্য শিলা উৎপাদনে কোর্য়াটজের পরই ফেলসপারের অবস্থান গ্রানাইট শিলার অধিকাংশ ফেলসপার দ্বারা গঠিত। এছাড়া বেসষ্ট বেলে পাথর, শেল এবং কোন কোন চুনা পাথরেও ফেলস্পার থাকে। ফেলসপার সাধারণত কেলাসিত নয়। কিন্তু ফেলসপার দ্রবীভূত হয় না। উন্মুক্ত স্থানে থাকলে বায়ু, রৌদ্র, বৃষ্টিপত, প্রভৃতির সংস্পর্শে এটি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে থাকে। বহুদিন ধরে উন্মুক্ত অবস্থায় থাকলে এই কঠিন খনিজ নানা প্রকার কাদামাটিতে বিশেষ করে শ্বেত-কর্দম বা কেয়োলিন এবং অনেক সময় সূক্ষ্ম শ্বেত অভ্রে পরিণত হয়। প্রকৃতপক্ষে কর্দমরাজি প্রধানত পরিবর্তিত ফেলসুপার থেকে উদ্ভূত। বিবিধ মৃত্তিকায় পরিবর্তিত ফেলসপার বর্তমান।

ব্যবহার : মৃৎশিল্প, এলুমিনিয়ম ও পোর্সেলিন প্রস্তুত করতে ফেলসপার ব্যবহৃত হয়।

লৌহ (Iron) : খনিজ লৌহ হ্যামেটাইট, ম্যাগনেটাইট, লিমোনাইট, সাইডেরাইট প্রভৃতি বিবিধ প্রকার অক্সাইড রূপে পাওয়া যায়। এটি কৃষ্ণবর্ণ বিশিষ্ট শক্ত, ভারী, স্ফটিকবৎ এবং ধাতব দীপ্তিসম্পন্ন। চুম্বক এর কণা আকর্ষণ করে। লৌহের ল্যাটিন নাম ফোরাম। লৌহ ও অক্সিজেনের সমন্বয়ে এটি গঠিত। আকরিক লৌহের মধ্যে ম্যাগনেটাইট সর্বোৎকৃষ্ট। হ্যামেটাইট লৌহের প্রধান আকরিক।

ব্যবহার : কল-কব্জা, যন্ত্রপাতি, ইত্যাদি প্রস্তুত করতে লৌহের প্রয়োজন অত্যধিক। লৌহের উপরে দেশের শিল্প নির্ভরশীল। এছাড়া অন্যান্য অনেক কাজে এর ব্যবহার ব্যাপক।

অভ্র (Mica) : এটি এলুমিনিয়াম, পটাশিয়াম, লৌহ অথবা ম্যাগনেসিয়াম প্রভৃতি বিবিধ খনিজের যৌগিক মিশ্রণে গঠিত একটি সিলিকেট। অভ্রের উপর সহজে দাগ কাটা যায়। কোন কোন অভ্র খুব সহজেই বিনষ্ট হয়। আবার কোন কোন অভ্র শিলা ও মৃত্তিকায় বহুদিন ধরে অপরিবর্তিত থেকে চাকচিক্য সৃষ্টি করে। গ্রানাইট, বেলে পাথর ও শেলে যথেষ্ট অভ্র বিদ্যমান অভ্রের বর্ণ সাধারণত সাদা বা কালো। এর কাঠিন্য ২ থেকে ২.৫ এবং আপেক্ষিক গুরুত্ব ২.৭৮ থেকে ৩।

ব্যবহার : বৈদ্যুতিক শিল্পে ব্যাপক হারে ব্যবহৃত হয়। এটি টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, বেতার, টেলিভিশন যন্ত্রে অত্যাবশ্যক। এটি মটরযান ও হালকা উড়োজাহাজে ব্যবহৃত হয়।

জিপসাম (Gypsum) : এটি পাললিক শিলার আকারে খনিতে পাওয়া যায়। জিপসামের বর্ণ শ্বেত, ধূসর শ্বেত। এর দীপ্তি কাঁচের ন্যায়। হাতের নখ দিয়ে সহজেই জিপসামের উপর দাগ দেয় হয়। অধিকাংশ জিপসাম হীরক আকৃতির স্ফটিক বা দানা বিশিষ্ট। ক্যালসিয়াম, সালফার, অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের সমন্বয়ে গঠিত। মূর্তি নির্মাণ ও সৌন্দর্য বর্ধক কাজে এর ব্যবহার অধিক। এছাড়া প্লাস্টার অব প্যারিস প্রস্তুত করতে ব্যবহৃত হয়। সার, সিমেন্ট, কাগজ, রাবার প্রভৃতি শিল্পে এর প্রয়োজন হয়।

কেওলিন (Kaolin) : অর্থাৎ চীনামাটি। এটি অ্যালুমিনিয়াম, সিলিকন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের মিশ্রণে গঠিত। এটি নরম ও হালকা বর্ণ বিশিষ্ট খনিজ যা অত্যন্ত সূক্ষ্ম দানা বিশিষ্ট। এটি কাদা ও সেলের সমষ্টিমাত্র। এটি অনেক মৃত্তিকার উল্লেখযোগ্য উপাদান এবং কাগজ, টালি মাটির পাত্র প্রভৃতি নির্মাণ করতে ব্যবহৃত হয়।

গন্ধক (Sulphur) : খনি থেকে বিশুদ্ধ অবস্থায় যে গন্ধক পাওয়া যায় তাকে স্বাভাবিক গন্ধক বলে। এছাড়া অন্য কোন ধাতুর সাথে যৌগিক অবস্থায়ও গন্ধক পাওয়া যায়। এরূপ যৌগিক অবস্থায় প্রাপ্ত গন্ধককে পাইরাইট বলা হয়। ভূ-অভ্যন্তরে বিশুদ্ধ অবস্থায় যে গন্ধক পাওয়া যায় তা পাইরাইট অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। অনুমান করা হয় যে, সালফেট থেকে গন্ধকের উৎপত্তি। আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখের পার্শ্বে বা উষ্ণ প্রসবনের মুখের পার্শ্বে যথেষ্ট পরিমাণে গন্ধক পাওয়া যায়। পাইরাইট শক্ত, ভারী স্বর্ণস্ত হরিৎ বর্ণের খনিজ। অনেক সময় স্বর্ণ বলে ভ্রম হয়ায় একে নির্বোধের স্বর্ণ বলে। এতে লৌহ ও সালফাইড বর্তমান।

হ্যালাইট : এটি পাললিক শিলা আকারে খনিতে পাওয়া যায়। এটি সোডিয়াম ও ক্লোরাইড দ্বারা গঠিত পাথুরে লবণ। এটি ধূসর বা বর্ণহীন। বহুস্থানে এই লবণের পার্শ্বে জিপসামও দেখতে পাওয়া যায়।

ক্যালসাইট : এটি ক্যালসিয়াম, কার্বন ও অক্সিজেনের সংমিশ্রণে গঠিত। একে (Carbonate to lime) বলা হয়। পাললিক শিলা, চুনা পাথরে এটি প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান থাকে। এতে ত্রিমুখী বিদারণ ক্ষমতা বিদ্যমান। এটি নরম। ছুরি বা ধারাল অস্ত্র দিয়ে এর উপর সহজেই দাগ দেয়া যায়। সাধারণত খনিজের মধ্যে এটিই সর্বাপেক্ষা দ্রবণীয়।

অগাইট : বেসল্ট শিলা ও লাভার মধ্যে অগাইট প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এটির বর্ণ গাঢ় সবুজ। সহজে নিষ্প্রভ হয়ে যায়।

৩.১১ ভূ-পৃষ্ঠের পরিবর্তন ধীর পবির্তন ক্ষয় সাধন

১. বিচূর্ণীভবন ও নগ্নীভনন (Weathering and Denudation)

ভূমিকা

ভূ-ত্বক বিভিন্ন শ্রেণির শিলার সমন্বয়ে গঠিত। শিলার শ্রেণিভেদ এবং রূপান্তর হতে প্রমাণিত হয় যে, বিবিধ নৈসর্গিক প্রক্রিয়ায় ভূ-পৃষ্ঠের পরিবর্তন হচ্ছে। বস্তুত পৃথিবীর বহিরাবরণ দৃঢ় স্থায়ী বা অপরিবর্তনীয় নয়। ভূ-ত্বত্ত্ববিদগণের মতে, কোটি কোটি বছর পূর্বে পৃথিবীর অবস্থার সঙ্গে বর্তমান যুগের মানচিত্রের অনেক পার্থক্য অনুমান করা যায়। এ যুগের বহু সুউচ্চ পর্বতশ্রেণি প্রাচীনকালে সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত ছিল। পৃথিবী সৃষ্টির পর হতে ভূ-পৃষ্ঠের বহু রদবদল হয়েছে। পর্বত এবং মালভূমি সমভূমিতে পরিণত হয়েছে। আবার সমতল ভূমি কিংবা জলমগ্ন সমুদ্রতল উচ্চভূমিতে উত্তালিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় বর্তমানের হিমালয় পর্বত অতীতের টেনিস সাগরের উপর সৃষ্টি হয়েছে।

এ দ্বিবিধ শক্তি অভ্যন্তরীণ (Endogenetic) এবং বাহ্যিক (Exogenetic) প্রতিনিয়ত ভূ-পৃষ্ঠের এরূপ বহুমুখী পবির্তন সাধন করে চলছে। ভূ-ত্বকের পরিবর্তন সাধনে কার্যত বাহ্যিক শক্তিসমূহের মধ্যে সূর্যতাপ, বৃষ্টি, তুষার, নদী, বায়ু প্রবাহ ও হিমবাহ অন্যতম। এসব শক্তির সক্রিয়তার প্রভাবে কোথাও উচ্চ ভূ-খণ্ড ক্ষয়িত হয়ে নিম্ন সমতল ভূমিতে পরিণত হচ্ছে। আবার কোথাও সঞ্চিত পলনের সমন্বয়ে নিম্ন বা সমভূমি উচ্চভূমিতে রূপান্তরিত হচ্ছে।

সাধারণত দ্বিবিধ প্রক্রিয়ায় বাহ্যিক শক্তিসমূহের ভূ-ত্বকের পরিবর্তন সাধন করে, যথা – বিচূর্ণভবন (Weathering) এবং নগ্নীভবন (Denudation)। বিচ্যুতিভবন ভূ-পৃষ্ঠের শিলা রাশিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে। নগ্নীভবন বিচূর্ণিত শিলা বা তলানির পরিবহণ বা অপসারণ (Transportation) এবং অবক্ষেপন (Deposition) কাজে নিয়োজিত থাকে। নগ্নীভবনের সময় পরিবাহিত তলানি পরস্পর সংযোগ ও সংঘর্ষণের ফলে আরও খণ্ড বিখণ্ডিত হয়। তাছাড়া অপসরণকালে শিলা রাশি ভূ-ত্বকের ক্ষয় সাধনও (Erosion) করে।

বিচূর্ণীভবন : বিচূর্ণীভবন বা আবহিক বিকার (Weathering) শব্দটি আবহাওয়া (Weather) থেকেই এসেছে। আবহাওয়া বলতে কোন স্থানের বায়ুর উষ্ণতা, চাপ, আর্দ্রতা, সূর্যালোক, বৃষ্টিপাত প্রভৃতি দৈনন্দিন অবস্থাকে বুঝায়। আবহাওয়ার এই বিভিন্ন উপাদান বিশেষত সূর্যের উত্তাপ, বায়ুর আর্দ্রতা প্রভৃতির তারতম্যে ভূ-পৃষ্ঠের শিলাসমূহের যে পরিবর্তন ঘটে, তাকে

বিচূর্ণীভবন বলে। সুতরাং আবহাওয়ার বিভিন্ন উপাদানের দ্বারা যান্ত্রিক উপায়ে শিলাস্তর ফেটে (Mechanical Fracturing) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিলাখণ্ড বা শিলাচূর্ণে পরিণত হয়ে অথবা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় শিলাস্তর বিয়োজিত হয়ে (Chemical Decomposition) মূল শিলার উপরই যদি থেকে যায়, তখন তাকে আমরা বিচূর্ণীভবন বলে থাকি। বিচূর্ণীভবনের ফলে ভূ-ত্বকের উপরিস্তরের শিলা ভেঙ্গে চুড়ে শিথিল হয়ে পড়ে, কিন্তু অপসৃত হয় না। এই সকল শিথিল শিলাখণ্ডের অপসরণকে ক্ষয়ীভবন (Erosion) বলে।

সুতরাং বিচূর্ণীভবন ও ক্ষয়ীভবনের মধ্যে পার্থক্য হল এই যে, ক্ষয়ীভবনের ফলে শিথিল শিলাখণ্ডসমূহ দূরদেশে অপসারিত (Transported) হয়, কিন্তু বিচূর্ণীভবনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তির দ্বারা শিলাখণ্ড সামান্য স্থানচ্যুত হয় বটে, কিন্তু শিলাখণ্ডের দূরদেশে অপসারণ হয় না। বিচূর্ণীভবন দু প্রকারে সংঘটিত হয়ে থাকে। যথা — (১) যান্ত্রিক বিচূর্ণীভবন (Physical or Mechanical weathering) যাতে ভূ-পৃষ্ঠের শিলাসমূহ উত্তাপের তারতম্যে তুষারের কার্যে এবং আংশিকভাবে গাছপালা ও জীবজন্তুর ক্রিয়াকলাপে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। (২) রাসায়নিক বিচূর্ণীভবন (Chemical weathering) এর ফলে বায়ুমণ্ডলে অবস্থিত জল, অক্সিজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং জৈব পদার্থ ও তার অবশিষ্টাংশের দ্বারা শিলার খনিজ দ্রব্যসমূহ বিয়োজিত এবং দ্রবীভূত হয়ে আলগা হয়ে পড়ে।

জীবজন্তু এবং বিভিন্ন জৈব পদার্থের দ্বারা সংঘটিত বিচূর্ণীভবনকে অনেক সময় জৈবিক বিচূর্ণীভবন (Biological weathering) নামে অভিহিত করা হয়। জৈবিক আবহিক বিকার বা বিচূর্ণীভবন যান্ত্রিক এবং রাসায়নিক উভয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই কাজ করে থাকে।

বিচূর্ণীভবনকে যদিও আমরা প্রধান দুটি ভাগে ভাগ করে থাকি কিন্তু একটিকে অপরটি থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক করা একেবারেই অসম্ভব। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে সামান্যতম জলীয় বাষ্পের অবস্থান রাসায়নিক বিচূর্ণীভবনে সর্বত্র কাজ করতে সহায়তা করে থাকে।

যান্ত্রিক বিচূর্ণীভবন : যান্ত্রিক বিচূর্ণীভবন উত্তাপের দ্রুত পরিবর্তনে এবং কেলাসন প্রক্রিয়ার দ্বারা ঘটে থাকে। মরু অঞ্চল মেঘমুক্ত হওয়ায় দিবাভাগ খুবই উত্তপ্ত এবং রাত্রি ঐ একই কারণে খুবই শীতল হয়ে থাকে। ফলে মরু অঞ্চলে উত্তাপের দ্রুত পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। আবার উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে অথবা উচ্চ অক্ষাংশে অধিক শৈত্যের জন্য কেলাসিত হয়ে বরফে পরিণত হয়। সুতরাং মরু অঞ্চল এবং উচ্চ পার্বত্য অঞ্চল ও উচ্চ অক্ষাংশে যান্ত্রিক ও বিচূর্ণীভবন ক্রিয়া অধিক লক্ষ্য করা যায়।

(ক) সূর্য উত্তাপের তারতম্যে : শিলা সাধারণত উত্তাপ কম পরিবহণ করে থাকে। ফলে দিনের সূর্যতাপ শিলার উপরের স্তরেই সঞ্চিত হয়। এই কারণে উপরের স্তর নিচের স্তর অপেক্ষা অধিকতর উত্তপ্ত হয়ে পড়ে এবং শিলার মধ্যে পীড়নের (Stress) সৃষ্টি হয়। এই পীড়ন একটি নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করলে শিলার মধ্যে সমান্তরাল এবং উল্লম্ব ফাটলের সৃষ্টি হয় এবং শিলাটি

ফাটল দ্বারা বিচ্ছিন্ন হয়। এই প্রক্রিয়াকে প্রস্তর চাই এ বিচ্ছিন্নকরণ (Joint Block Separation) বলা হয়। অনেক সময় শিলা উত্তপ্ত হয়ে নিচে বা পার্শ্বে প্রসারিত হতে না পেরে উপরের দিকে প্রসারিত হয়। এর ফলে শিলার উপরের স্তরটি অভ্যন্তরের শীতল শিলাস্তর হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পিয়াজের খোসার ন্যায় খুলে যায় (peal off) একে Exfoliation বলে। এভাবে এক্সফোলিয়েশান এর ফলে শিলাসমূহের উপরের অংশ স্তরে খুলে গিয়ে গোলাকার রূপ ধারণ করে। এরূপ বিচূর্ণীভবনকে গোলাকৃতি বিচূর্ণীভবন বলা হয়। এটি গ্রানাইট জাতীয় শিলায় অধিক দৃষ্ট হয়।

যেহেতু শিলাসমূহ বিভিন্ন খনিজের সমন্বয়ে গঠিত সেহেতু শিলায় অবস্থিত খনিজসমূহ বিভিন্নভাবে প্রসারিত ও সংকুচিত হয়। এর ফলে শিলায় বিভিন্ন টান সৃষ্টি হয়ে শিলাটি হঠাৎ ফেটে যায়। মরু অঞ্চলে সূর্যাস্তের কিছু পরে অনেক সময় এরূপ শিলা ফাটার আওয়াজ শুনতে পাওয়া যায়। এটি অনেকটা পিস্তল হতে গুলি ছুড়বার আওয়াজের মতো শুনা যায়। এভাবে শিলা বিভিন্ন খনিজের মধ্যস্থিত সংযোগ সাধক পদার্থের মধ্যে দিয়ে ফেটে তা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণায় পরিণত হয় বলে একে ক্ষুদ্র বিস্ফোরণ বলে। অনেক সময় মরু অঞ্চলে হঠাৎ প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে উত্তপ্ত শিলাস্তর শীতল ও সংকুচিত হয়ে ফেটে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণায় পরিণত হয়।

খ. **তুষারের কার্য :** শীতপ্রধান দেশে ও নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে তুষারের দ্বারাও শিলা বিখণ্ডিত হয়। বৃষ্টির পানিতে এসব অঞ্চলে শিলা দিনে সিক্ত হয় রাত্রিতে অধিক শৈত্যে এই পানি জমে বরফ হয়। ফলে আয়তন বৃদ্ধি পায়। তখন বরফের চাপে ভূ-পৃষ্ঠে ফাটল (Fissure) এবং সংযুক্তির (Joint) সৃষ্টি হয়। পুনরায় দিনের বেলায় বরফ গলতে শুরু করলে পানির স্রোত এই সকল ফাটল ও সংযুক্তির মধ্য দিয়ে নিম্নগামী হয়। শীতপ্রধান দেশে উচ্চ ভূমিতে অনেক পর্বত এভাবে বিচূর্ণীভূত হয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিলাস্তূপে পরিণত হয়েছে এগুলোকে সিক্রি Scree ভূমি বলা হয়।

উদ্ভিদ ও প্রাণিমণ্ডলের যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ভূ-ত্বকের পরিবর্তন সাধন করে। উদ্ভিদের শিকড় শিলার ছোট ছোট ফাটলের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয়ে বিস্তার লাভ করলে ফাটলগুলো আরো অধিক প্রসারিত হয়। এর ফলে চূর্ণ চূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিলাখণ্ডে পরিণত হয় এবং বাতাস ও বৃষ্টির দ্বারা অন্যত্র পরিবাহিত হয়। এভাবে উদ্ভিদ মণ্ডল যান্ত্রিক বিচূর্ণীভবন সাধন করে থাকে।

প্রেইরি কুকুর, খরগোস, ছুঁচো, কেঁচো প্রভৃতি মৃত্তেদী প্রাণী ভূ-পৃষ্ঠে গর্ত সৃষ্টি করে ক্ষয়কার্যে সাহায্য করে থাকে।

(২) রাসায়নিক বিচূর্ণীভবন : আমরা জানি যে, শিলা বিভিন্ন খনিজের সমন্বয়ে গঠিত। এর সকল খনিজ সংযোগ সাধক পদার্থের দ্বারা পরস্পরের সহিত সংযুক্ত থাকে। বিভিন্ন শিলায় বিভিন্ন প্রকারের খনিজ দেখতে পাওয়া যায়। এই খনিজগুলোর উপর বায়ুমণ্ডলের প্রধান উপাদানগুলো বিশেষত অক্সিজেন, কার্বনডাই অক্সাইড ও জলীয় বাষ্প বিক্রিয়া করে থাকে। এর

ফলে কঠিন শিলা বিয়োজিত হয় এবং মূল খনিজগুলো নতুন গৌণ খনিজে পরিণত হয়ে সহজেই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এরূপ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় শিলার চূর্ণ-বিচূর্ণ হওয়াকে রাসায়নিক বিচূর্ণীভবন বলে।

বৃষ্টির পানির সাহায্যে : বৃষ্টির পানি বিচূর্ণীভবনের প্রধান শক্তি। এটি রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় শিলার দ্রবণে সহায়তা করে। আবার বৃষ্টিপাতের ফলে সঞ্চিত পানি স্রোত যখন নালা, খাল ও নদীপথে নিম্নেগামী হয়ে সাগরের দিকে প্রবাহিত হয়, তখন ভূ-ত্বকের প্রচুর ক্ষয় সাধিত হয়।

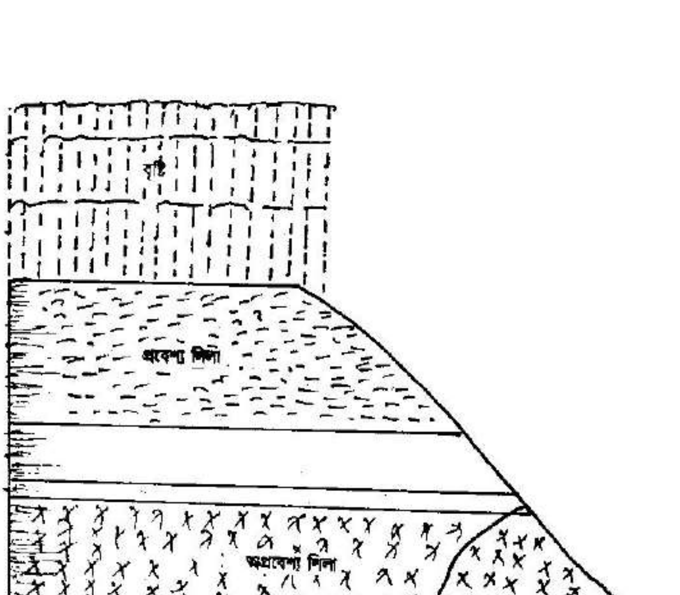

চিত্র : ৩৮, (ক) প্রবেশ্য ও অপ্রবেশ্য শিলা

ভূ-পৃষ্ঠে পতিত বৃষ্টিপাতের কিয়দাংশ শিলার ছিদ্র পথে ভূ-ত্বকের অভ্যন্তরে প্রবেশ করার সময় মৃত্তিকা ও শিলাকে কোমল ও শিথিল করে।

যে শিলার স্তরের মধ্য দিয়ে বৃষ্টির পানি ভূ-ত্বকের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে সক্ষম হয় তাকে প্রবেশ্য (Permeable) শিলা বলে, যথা — বালি, বেলেপাথর, চুনাপাথর খড়িমাটি ইত্যাদি। কঠিন,

সুদৃঢ় ও ছিদ্রবিহীন শিলাস্তরের মধ্য দিয়ে পানি ভূ-ত্বকে প্রবেশ করতে পারে না, এরূপ শিলা অপ্রবেশ্য (Impermeable) শিলারূপে পরিচিত। কাদা ও বেসল্ট এর দৃষ্টান্ত।

প্রবেশ্য স্তর ভেদ করে বৃষ্টির পানি অপ্রবেশ্য স্তরের উপরে সঞ্চিত হয়। এরূপ সংগৃহীত ভূ-গর্ভস্থ পানির উপরিভাগকে জলশীর্ষ বা অন্তঃভূজল পৃষ্ঠ (Water table) বলে। জলশীর্ষে না পৌঁছালে নলকূপে পানি পৌঁছে না। জলশীর্ষ ভূ-ত্বককে কোন স্থানে ছেদ করলে ভূ-গর্ভস্থ পানি প্রস্রবণের আকারে ভূ-পৃষ্ঠে বের হয়ে আসে। সাধারণত পাহাড় পর্বতের গায়ে প্রস্রবণের সংখ্যা বেশি দেখা যায়। জলশীর্ষক ভূ-ত্বকের সঙ্গে সমতলভাবে অবস্থিত হলে স্থায়ী বা অবিরাম প্রস্রবণ এবং তীর্যকভাবে অবস্থিত হলে সবিরাম প্রস্রবণের সৃষ্টি হয়। সবিরাম প্রস্রবণের ক্ষেত্রে জলশীর্ষ প্রস্রবণ মুখের নিচে নেমে গেলে পুনরায় উপরে না ওঠা পর্যন্ত জলধারার নির্গমন বন্ধ থাকে।

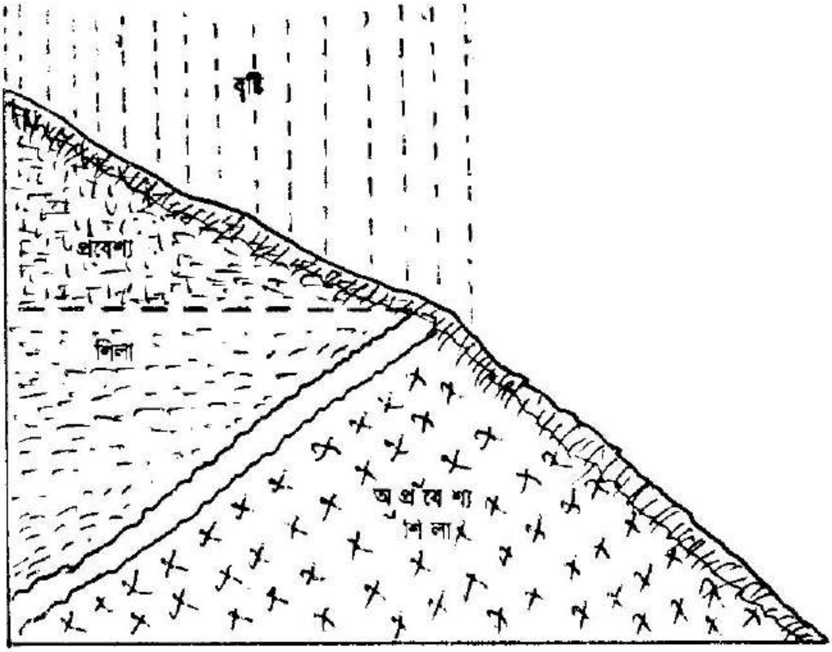

৩৮. (খ) প্রবেশ্য অপ্রবেশ্য শিলা

জল শীর্ষ ভূ-গর্ভের গভীর স্থানে অবস্থান করলে অভ্যন্তরীণ তাপে সঞ্চিত জলরাশি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এভাবে যে প্রস্রবণের সৃষ্টি হয় তাকে উষ্ণ প্রস্রবণ (Hot spring) বলে। চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের পাহাড়িয়া অঞ্চলে এরূপ একটি উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। উষ্ণ প্রস্রবণের পানি ও বাষ্প ভূ-ত্বক হতে অনেক উর্ধে উৎক্ষিপ্ত হলে তাকে গেইসার (Geyser) বলা হয়। গেইসার কয়েক ঘণ্টা বা কয়েক মিনিটের নিয়মিত বিরতির পর সবেগে উদগীরণ করে। উত্তর আমেরিকার ইয়োলোস্টোন ন্যাশনাল পার্কের 'ওল্ড বোইথফুল' নামক গেইসার প্রায় ৬৫ মিনিট পর পর ৫

মিনিট পর্যন্ত ৫৫ মিটার উর্ধ্বে জলোৎক্ষেপ করে। দু অপ্রবেশ্য স্তরের মধ্যে একটি প্রবেশ্য স্তর অর্ধ চন্দ্রাকার ভূ-ত্বক পৃষ্ঠের সঙ্গে সংযুক্ত থাকলে প্রবেশ্য স্তরটির দু প্রান্ত দিয়ে বৃষ্টির পানি স্তরটির কেন্দ্রে সঞ্চিত হয় এবং চাপের সৃষ্টি করে। এ অবস্থায় ভূ-পৃষ্ঠ হতে অপ্রবেশ্য স্তর ভেদ করে প্রবেশ্য স্তরের কেন্দ্র স্থলে কূপ খনন করা হলে স্বাভাবিকভাবে ভূ-গর্ভস্থ জলধারা সবেগে ভূ-পৃষ্ঠে উঠে আসে। অস্ট্রেলিয়ার আঁতোয়া নামক স্থানে প্রথম এ পদ্ধতিতে কূপ খনন করা হয়েছিল বলে একে অর্টেজীয় কূপ (Artesian well) বলে। জলশীর্ষ নিচে নেমে গেলে আর্টেজীয় কূপ হতে পাম্প ছাড়া পানি তোলা সম্ভব হয় না। পণ্য স্তরের শিলা আর্দ্র ও শীতল শীলাকণাগুলো প্রস্রবণের জলধারার সঙ্গে ভূ-পৃষ্ঠে বের হয়ে আসে।

ভূ-ত্বকের নিচে চুনাপাথর থাকলে তা বৃষ্টির পানিতে দ্রব ও ক্ষয় হয়ে ভূ-গর্ভে বিভিন্ন আকারের গহ্বরের সৃষ্টি করে। আবার অনেক সময় কোমল শিলার উপরে কঠিন শিলা থাকলে কোমল শিলা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে উপরের কঠিন শিলাস্তর ধসে পড়ে। একে ভূ-ধ্বংস বা ভূ-পাত বলে

নগ্নীভবন : নদী হিমবাহ এবং বায়ুপ্রবাহ নগ্নীভবন শক্তির উৎস। এ শক্তি সমূহ অবিরাম ভূ-পৃষ্ঠের বহু পরিবর্তন সাধন করছে।

নদী

প্রস্রবণ (Spring) জলাভূমি (Marsh) এবং হিমবাহের প্রান্তসীমা হতে নির্গত জলধারা কিংবা ভূ-পৃষ্ঠে পতিত বৃষ্টি বা তুষার গলা পানি ভূমির ঢাল অনুসারে নিম্নগামী হয়। এভাবে সঞ্চিত জলসরণ (Run off) নিম্নদিকে প্রবাহিত হবার সময় পর্যায়ক্রমে ক্ষুদ্রনালা (Rills) পয়োনালা (Gully), গিরি নদী (Ravine) এবং পরিশেষে ছোট বড় অসংখ্য নদী সৃষ্টি করে।

নদীর উৎপত্তি স্থলকে উৎস (Source) বলে। যে স্থানে নদী সাগর, মহাসাগর বা হ্রদে পতিত হয়, তার নাম মোহনা (Mouth)। প্রশান্ত মোহনাকে খাড়ি (Estuary) বলে। একাধিক নদীর মিলনস্থলকে নদী সঙ্গম বলে।

কোন ক্ষুদ্র জলধারা অপেক্ষাকৃত বৃহৎ নদীর সঙ্গে মিলিত হলে তাকে বৃহৎ নদীর উপনদী (Tributary) বলে। আবার কোন নদী হতে কোন জলধারা বের হয়ে অপর কোন নদী কিংবা সাগর বা হ্রদে পতিত হলে তাকে শাখা নদী (Disributary) বলে। মহানন্দা পদ্মার একটি উপনদী আড়িয়লখা পদ্মার একটি শাখা নদী। দুটি পাশাপাশি নদীর মধ্যবর্তী এলাকাকে দো-আব বলে

উৎস হতে মোহনায় পতিত হওয়া পর্যন্ত নদীর গতিপথকে তিনভাগে ভাগ করা হয়। যথা (১) আদ্যগতি বা পার্বত্য প্রবাহ (২) মধ্যগতি বা সমভূমি প্রবাহ (৩) অগ্রগতি বা নিম্নপ্রবাহ।

(১) আদ্যগতি বা পার্বত্য প্রবাহ : নদীর প্রাথমিক অবস্থা। এ সময় স্রোতের গতি তীব্র হয় এবং নদী অত্যধিক ক্ষয়সাধন করে। নদীগর্ভের শিলাখণ্ড প্রবল স্রোতের মুখে নিচের দিকে প্রবাহিত হয়। বৃহৎ শিলা খণ্ড ক্ষুদ্র শিলাখণ্ডকে অপসারিত করে এবং ঘর্ষণ ক্ষয় (Attrition

দ্বারা সিলা, পলি ও বালি মসৃন ও ক্ষুদ্রতর হয়। আদ্যগতিতে নদীর, প্রশস্ততার চেয়ে গভীরতা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। নদীর পার্বতী প্রবাহে পর্বতগাত্রে সঙ্কীর্ণ খাড়া ঢাল বিশিষ্ট এবং গভীর নদীখাতের সৃষ্টি হলে তাকে গিরিখাত (Gorge) বলে। গভীর এবং দীর্ঘ গিরিখাতকে ক্যানিয়ন (Canyon) বলে। যুক্তরাষ্ট্রের কালোরেজে নদীর গ্রান্ড ক্যানিয়ন পৃথিবীর বৃহত্তম গিরিখাত এটি ৩৪৯ কি.মি. দীর্ঘ ৬ হতে ২৯ কি.মি. প্রশস্ত এবং এর নিম্নতম খাত ১৯৪৫ মিটার গভীর।

পর্বতের গায়ে অনেকগুলো পরোনালা মিলিত হয়ে একটি পূর্ণ নদীতে পরিণত হয়। এ মিলিত জলধারা প্রবলবেগে নিচের দিকে প্রবাহিত হয়। এ সময় নদী উপত্যকায় কঠিন শিলা কোমল শিলার উপর অবস্থান করলে কোমল শিলা দ্রুত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এবং কঠিন শিলার খাড়া ঢাল বেয়ে

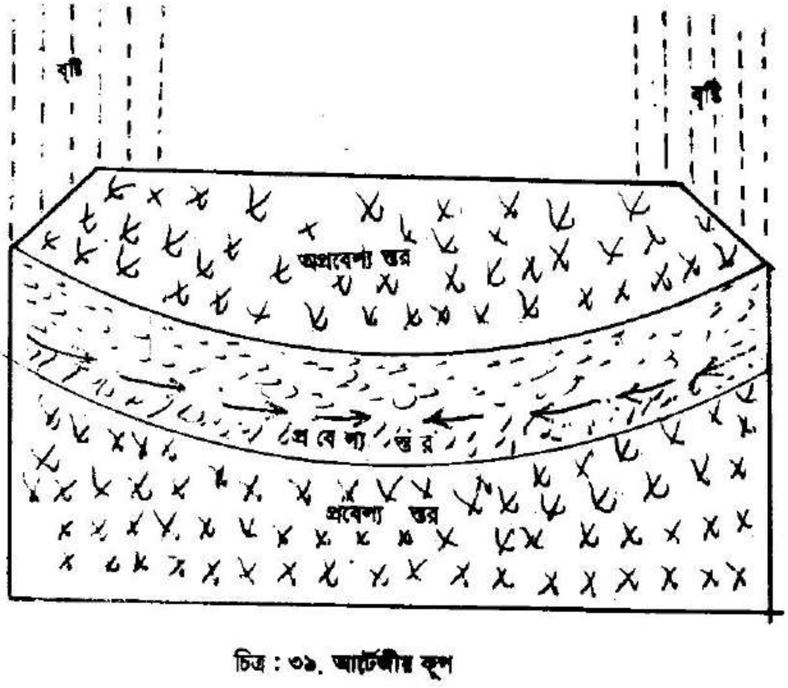

চিত্র : ৩৯. আর্টেজীয় কূপ

জলধারা তীব্র বেগে নিচে নেমে আসে। নদীর এরূপ খরস্রোত অবোগতিকে নদীপ্রপাত (Rapid) বলে। যদি প্রবাহ পথে নদীর জলস্রোত কোন খারা বা ঢালু পাহাড়ের উপর হতে হঠাৎ নিচে পতিত হয় তাহলে সেই পতন স্থলে জলপ্রপাত (Waterfall) সৃষ্টি হয়। উত্তর আমেরিকায় নায়াগ্রা এবং আফ্রিকার ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত এর দুটি দৃষ্টান্ত। অধিকাংশ জল প্রপাতের সঙ্গে নদী প্রপাতের অবস্থান লক্ষ করা যায় এবং এ দুয়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য কমই।

(২) মধ্যগতি বা সমভূমি প্রবাহ : এ অংশে নদীর স্রোত ধীরে ধীরে মন্থর হয়ে আসে এবং ক্ষয়কার্য কমতে থাকে। এ সময় নদীখাতের গভীরতা কমে প্রশস্ত বৃদ্ধি পায় এবং নদী নিচুভূমিতে এসে পরিবাহিত তলানির সাহায্যে পলল গঠিত সমতল ভূমি (Alluvial Plain) গঠন করে। স্রোতের বেগ কমে যায় বলে সমভূমি প্রবাহে নদী গতিপথে সামান্য বাধাপ্রাপ্ত হলেই এঁকেবেঁকে সর্পিল গতিতে অগ্রসর হয়। বাঁক ঘুরবার সময় নদীর ভিতরের কূলে বাইরের কূল অপেক্ষা স্রোতবেগ কম থাকে। ফলে ভিতরের কূলে তলানি জমে বালুচড়া (Sandbar) বা বালুতটের (Sand bank) সৃষ্টি হয় এবং বাইরের কূলে ক্ষয়কার্য চলতে থাকে। এভাবে সর্পিল নদীর (Meandering River) দুবাঁক ক্রমান্বয়ে কাছাকাছি এসে পুরাতন পথ পরিত্যাগ করে এবং নতুন গতি পথে সোজা প্রবাহিত হয়। পরিত্যক্ত নদী পথের দুধারে তখন তলানি জমে বন্ধ হয়ে যায়। এবং বিভিন্ন অংশে সংক্ষেপক হ্রদের (Cut off lake) বা অশ্বখুরাকৃতি হ্রদের (Ox Bour lake) সৃষ্টি করে।

বাংলাদেশের ছোট বড় অনেক নদীই সর্পিল গতি বিশিষ্ট। এগুলো বহু নদী সংক্ষেপক এবং অশ্ব খুরাকৃতি হ্রদের সৃষ্টি করেছে। মধ্যগতিতে নদী খাতের গভীরতা কমে যায় বলে বৃষ্টির পানি কিংবা তুষার গলা পানি দ্বারা নদীতে বন্যা দেখা দেয় এবং বন্যার পানি নদীর উভয় তীর উপচে নিকটবর্তী এলাকা প্লাবিত করে। বন্যা শেষে এ সকল এলাকায় পরিত্যক্ত পললের সাহায্যে সমভূমি গঠিত হয়। এরূপ সমভূমিকে প্লাবন সমভূমি (Flood Plain) বলে। বাংলাদেশের অধিকাংশ স্থানই এক বিস্তির্ণ প্লাবন সমভূমি। নীলনদ এবং মিসিসিপি নদীর তীরেও এভাবে সমতলভূমি গঠিত হয়েছে।

(৩) অগ্রগতি বা নিম্ন প্রবাহ : নদী গতি পথের শেষ সীমায় মোহনায় নিকটবর্তী হলে অন্তঃ গতি বা নিম্ন প্রবাহে উপনীত হয়। এ সময় নদীর স্রোত অত্যন্ত মন্থর হয়ে পরে এবং ক্ষয়কার্য খুব কম ও অবক্ষেপন (Deposition) কার্য খুব বেশি দেখা যায়। নিম্নপ্রবাহে নদী উর্ধ্ব গতি হতে পরিবাহিত পলি, বালি, কাদা প্রভৃতি মোহনার মুখে নিক্ষেপ করে। নদী বাহিত এ তলানি ক্রমান্বয়ে স্তরে স্তরে সঞ্চিত হয়ে নতুন ভূ-খণ্ড গঠন করে। নদী স্রোত তখন এ ভূ-খণ্ডের দুপাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়। এরূপ পানি বেষ্টিত ভূমি দেখতে গ্রিক অক্ষর ডেল্টা (Delta) বা বাংলায় মাত্রাহীন "ব" এর মতো বলে একে 'ডেল্টা' বা 'বদ্বীপ' বলা হয়। ব-দ্বীপের যে স্থলে নদী দুটি শাখায় বিভক্ত হয়, তাকে ব-দ্বীপ শীর্ষ বলে। মিসিসিপি, পো, দানিয়ুব, নীল তাইগ্রিস, ইউফ্রেটিস, হোয়াংহো, অরিনকো, গঙ্গা প্রভৃতি নদনদী এগুলোর মোহনায় ব-দ্বীপের সৃষ্টি করেছে। গঙ্গা, পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র নদীর দ্বারা গঠিত বঙ্গীয় ব-দ্বীপ প্রায় ১৫৫৩৯৯ বর্গ কি.মি. বিস্তৃত। এটি পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ।

হিমবাহ : শীত প্রধান দেশে বিশেষ করে মেরু অঞ্চলে এবং উচ্চ পর্বত শিখরে সারা বছর তুষারপাত হয়। অত্যধিক শৈত্যের জন্যে এ সকল স্থানে পতিত তুষার সম্পূর্ণ গলে যায় না।

পর্বতের যে সীমারেখার উর্ধ্বে তুষার কখনো গলে না, তাকে হিমরেখা (Snow line) বলে। হিমরেখা পৃথিবীর তাপমণ্ডল, উচ্চতা ও জলবায়ুজনিত কারণের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। হিমরেখার উপরে তুষার স্তরে স্তরে সঞ্চিত হতে থাকে। ফলে উপরের তুষার স্তূপের চাপে নিম্নস্তরের তুষার জমে বরফ হয়ে যায়।

ক্রমান্বয়ে উপরের প্রবল চাপে এবং পৃথিবীর আকর্ষণে এ বরফ স্তূপ পর্বতগাত্র বেয়ে নিচের দিকে অগ্রসর হয়। এরূপ চলন্ত বরফ স্তূপকে হিমবাহ (Glacier) বলা হয়। হিমবাহের গতি নদীর গতির মতো দ্রুত নয়। বস্তুত এটি এত ধীরে চলে যে, চোখে ধরা পড়ে না। আল্পস পর্বতের হিমবাহ বছরে একফুটের বেশি অগ্রসর হয় না।

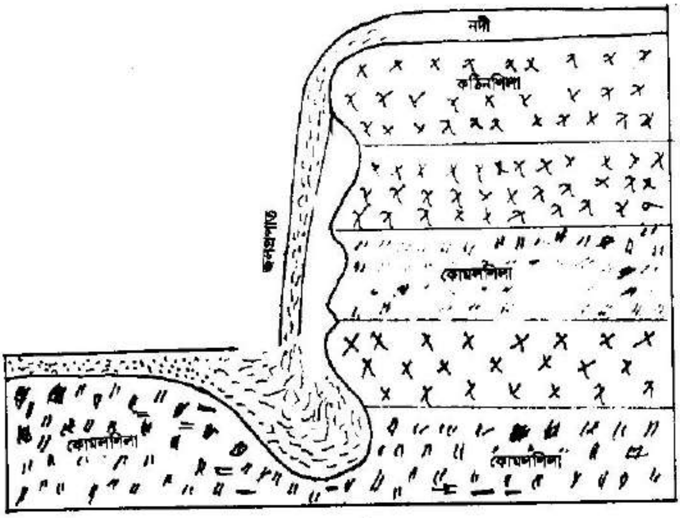

চিত্র : ৪০. নদীর পার্বত্য প্রবাহ

হিমবাহের প্রবল চাপে এবং ঘর্ষণে গতি পথের পার্শ্ব এবং তলদেশের শিলা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে হিমবাহ উপত্যকার সৃষ্টি হয়। ক্রমাগত ক্ষয়ের ফলে হিমবাহ উপত্যকা খাড়া ঢাল বিশিষ্ট হয়ে ইংরেজি 'ইউ' (U) অক্ষরের আকার ধারণ করে। সেজন্য হিমবাহ উপত্যকাকে ইউ (U) উপত্যকা বলা হয়। ইউ উপত্যকার সঙ্গে অনেক উপ-উপত্যকা (Tributary Valley) যুক্ত হয়। মূল উপত্যকার সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখা যায় বলে এগুলোকে ঝুলন্ত উপত্যকা (Hanging velley)

বলে। হিমবাহ দ্বারা বাহিত পাথর, কাঁকর, বালি, কাদা প্রভৃতিকে গ্রাবরেখা (Moraine) বলে গ্রাবরেখারূপী তলানি হিমবাহের দুপাশে রেখার ন্যায় সঞ্চিত হলে পার্শ্ব গ্রাবরেখার সৃষ্টি হয়।

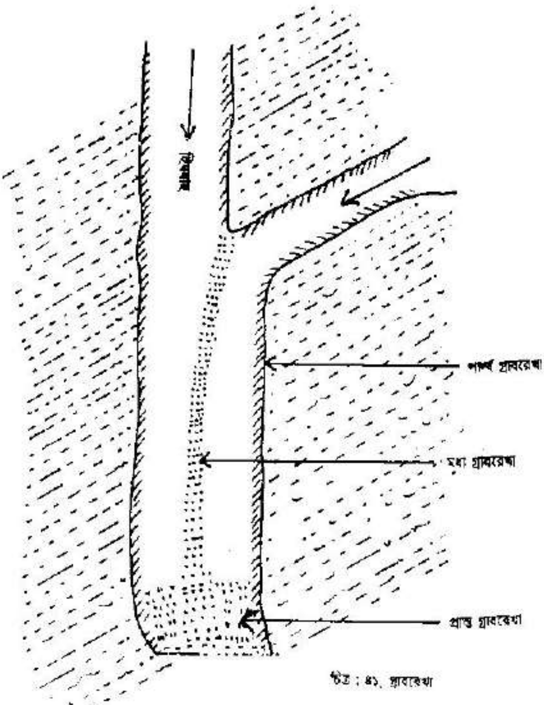

চিত্র : ৪১. গ্রাবরেখা

দুটি হিমবাহ পরস্পর মিলিত হলে তাদের মধ্যস্থিত পার্শ্ব গ্রাবরেখাদ্বয় সংযুক্ত হয়ে মধ্য গ্রাবরেখায় (Medial Moraine) পরিণত হয়। হিমবাহের শেষপ্রান্তে সঞ্চিত তলানিতে প্রান্ত গ্রাবরেখা (Terminal Moraine) বলে। হিমবাহের অপসারণের পর সময় সঞ্চিত তলানি গোলাকার ছোট ছোট পাহাড়রূপে সারিবদ্ধভাবে অবস্থান করে। এগুলোকে ড্রামলিন (Drumlin) বলে। কোন কোন সময় বিভিন্ন ড্রামলিনের মধ্যস্থিত হিমবাহের পরিত্যক্ত উপত্যকা ভূমিতে বিস্তৃর্ণ হ্রদ এবং জলাশয়ের সৃষ্টি হয়।

বায়ু প্রবাহ : বায়ু প্রবাহ ভূ-ত্বকের বিবিধ পরিবর্তন সাধন করে। মরুভূমি অঞ্চলে ও সাগর উপকূলে বায়ু সজোরে এবং অবাধে প্রবাহিত হওয়ার সময় বালুকণা এবং শিলাকণাসমূহ শিলাখণ্ডের সংঘর্ষে আসে। এভাবে ঘর্ষণের ফলে শিলাখণ্ড ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং ভূ-ত্বক বিচিত্র

আকার ধারণ করে। বায়ু প্রবাহের মুখে পাহাড় ও শিলাস্তূপের নিচের ভাগ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে ভেঙ্গে পড়ে। মরুভূমির বুকে বালির ঢেউ জাগে। সময় সময় বায়ু রাশি বালি দ্বারা বাহিত হয়ে একস্থানে সঞ্চিত হলে বালির পাহাড় বা বালিয়াড়ি সৃষ্টি হয়।

মরুভূমি সমুদ্র উপকূল এবং হ্রদের নিকবর্তী অধিক সংখ্যক বালিয়াড়ি দেখা যায়। কোন কোন বালিয়াড়ি অর্ধচন্দ্রের ন্যায় দেখায়। এগুলোকে বারখান বলে। অনেক সময় সমুদ্র উপকূল হতে বালুকণা বায়ু প্রবাহের ফলে উর্ধ্ব সমভূমিতে স্থানান্তরিত হয়ে সেস্থানে মরুভূমির সৃষ্টি হয়। এভাবে ভারতের কচ্ছ উপসাগরের বালুদ্বারা থর মরুভূমির সৃষ্টি হয়েছে। আবার স্থান বিশেষে এর বিপরীত অবস্থাও দেখা যায়। যেমন — লোয়েন সমভূমি।

৩.১২ মৃত্তিকা (SOIL)

ভূমিকা : মৃত্তিকা (Soil) এই শব্দটি ল্যাটিন শব্দ 'Solum' থেকে এসেছে। অর্থ মেঝে বা গৃহতল (Floor) যা সাধারণত মাটিকেই বুঝায়। সেখান থেকে অর্থাৎ মৃত্তিকা শব্দের উৎপত্তি হয়েছে।

মৃত্তিকা একটি প্রাকৃতিক বস্তু। শিলদ্রব্য ও খনিজের সমন্বয়ে আবহাওয়ার প্রভাবে জৈব পদার্থ মিশ্রিত হয়ে মৃত্তিকা উৎপন্ন হয়। ভূ-ত্বকের বহিরাবরণের সূক্ষ্ম পদার্থের শিথিল কোমল স্তরকে মৃত্তিকা বলে। প্রকৃতপক্ষে মৃত্তিকা হল খনিজ পদার্থ, শিলাকণা, জৈবপদার্থ, পানি বায়ু জীবাণু প্রভৃতির একটি যৌগিক মিশ্রণ। ভূ-ত্বক বিভিন্ন শিলাস্তরে গঠিত যা নিম্নস্থ কঠিন শিলার আবরণ মাত্র। শিলা থেকে মৃত্তিকার উৎপত্তি হয়েছে। ভূ-ত্বকের উপরিভাগে ১৫ বা ২০ ফুট গভীর অংশে মৃত্তিকার অবস্থান।

মৃত্তিকা থেকে উদ্ভিজ্জের উদ্ভব। মৃত্তিকা মধ্যস্থিত বিভিন্ন পদার্থের উপর উদ্ভিজ্জের বৃদ্ধি সাধন বহুলাংশে নির্ভর করে ওটাই উদ্ভিজ্জের খাদ্য ভাণ্ডার সংরক্ষণ ও পানির উৎসস্থল। ভূ-পৃষ্ঠের তাপমাত্রার প্রতিক্রিয়া এবং বর্ষণের সম্ভাবনা নির্ভর করে মৃত্তিকার প্রকৃতি ও গঠন প্রণালীর উপর। জীবজগতের বিভিন্ন প্রাণীর ক্রিয়াকর্ম মৃত্তিকার মধ্যে ও উপরে সাধিত হচ্ছে। মৃত্তিকা মধ্যস্থিত জীবগুলোর অনেক উদ্ভিদের উপযোগী খাদ্য ও সার তৈরি করে, অনেক বায়ু মণ্ডলস্থ নাইট্রোজেন মৃত্তিকার মধ্যে সংরক্ষণে সহায়তা করে, আবার মৃত্তিকাস্থ উদ্ভিজ্জের খাদ্য নষ্ট করে।

মৃত্তিকার গুণাগুণ নির্ভর করে এর কণিকার আকার, বিন্যাস প্রণালী, পানি ধারণের ক্ষমতা, তাপমাত্রা ও বর্ণ এই পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের উপর।

মৃত্তিকার সংজ্ঞা : বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বিভিন্ন সময়ে মৃত্তিকার যে সব সংজ্ঞা দিয়েছেন সেগুলোর মধ্য থেকে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সংজ্ঞা নিচে উল্লেখ করা হল। বিজ্ঞানী রমেনের মতে, 'মৃত্তিকা হলো পৃথিবীর উপরিস্থিত সতত ক্ষয়শীল একটি স্তর।' রাশিয়ান বৈজ্ঞানিক ডকুচেভের মতে, 'মাটি হলো এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক বস্তু নিচয়ের সমষ্টি যা আবহাওয়া ভূ-সংস্থান ও সময়ের প্রভাবে শিলা ও জৈব পদার্থ হতে গঠিত।' অধ্যাপক জাফরের মতে, 'মাটি এমন একটি প্রাকৃতিক বস্তু, যা শিলাকণা থেকে উৎপত্তি হয়ে খনিজ ও জৈব পদার্থের সংমিশ্রণে বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের স্তরে স্তরে সুবিন্যস্ত হয়েছে এবং আদি বস্তু শিলাকণা থেকে দৈহিক গঠনে, বাহ্যিক অবয়বে, রাসায়নিক গুণাবলিতে এবং মৌলিক বৈশিষ্ট্যে পার্থক্য ও স্বাতন্ত্র লাভ করেছে।'

মৃত্তিকার উৎপত্তি : ভূ-ত্বকের উপরিভাগের শিলা ক্ষয়ীভূত হয়ে শিলাচূর্ণের সৃষ্টি করে। এর সাথে জৈব ও উদ্ভিজ্জ পদার্থ মিশ্রিত হয়ে যে রূপে মৃত্তিকা উৎপন্ন হয় তা তিন ভাগে বিভক্ত —

(১) নৈসর্গিক প্রভাব : সূর্যতাপের তারতম্য, বৃষ্টিপাত, পানিপ্রবাহ, বায়ুপ্রবাহ হিমবাহ প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তিসমূহ ক্রিয়ায় এবং শিলায় শিলায় ঘর্ষণের ফলে কঠিন শিলা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে ক্রমশ মৃত্তিকায় পরিণত হয়।

(২) রাসায়নিক ক্রিয়া : মৃত্তিকার প্রাথমিক স্তরে নানা প্রকার শৈবাল জন্ম লাভ করে। অনুকূল জলবায়ুতে উদ্ভিজ্জের পচনক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়ে পচা সারে পরিণত হয়। অপেক্ষাকৃত কম অনুকূল অবস্থায় উদ্ভিজ্জ এসিড জাতীয় পচা সারে পরিণত হয়। উদ্ভিজ্জ ও কীটপতঙ্গের দেহ নির্যাসের সঙ্গে রাসায়নিক সংমিশ্রণের ফলে মৃত্তিকা অধিক পরিমাণে রূপান্তরিত হয়। বায়ু মণ্ডলের অক্সিজেন কার্বন ডাই অক্সাইড প্রভৃতি গ্যাস, ভূ-পৃষ্ঠের ধাতব লবণ প্রভৃতি রাসায়নিক ক্রিয়ায় সহায়তা করে।

(৩) জৈব ক্রিয়া : বড় বড় গাছের শিকড়গুলো শিলার মধ্যে বিস্তৃত হওয়ার সময় শিলাচূর্ণ করে মৃত্তিকার সৃষ্টি করে। আবার কেঁচো, উই পোকা প্রভৃতি কতকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণির ক্রিয়াকলাপের ফলে ভূ-ত্বক শিথিল হয়ে মৃত্তিকায় পরিণত হয়।

মৃত্তিকার উপাদান : মৃত্তিকার প্রধান উপাদান ৪টি। যথা — খনিজ দ্রব্য, জৈব দ্রব্য, মৃত্তিকা বায়ু ও মৃত্তিকা পানি। মৃত্তিকার কঠিন দ্রব্যের প্রধান অংশই খনিজ দ্রব্য (ওজন ভিত্তিতে প্রায় ৯০% ভাগ)। প্রাকৃতিকভাবে প্রাপ্ত সকল রাসায়নিক উপাদানই মৃত্তিকাতে পাওয়া যায় তবে পরিমাণে কম। আয়তনের ভিত্তিতে বায়ু শুকনো মৃত্তিকাতে ৪৫–৫০% ভাগ খনিজ দ্রব্য থাকে, বায়ু থাকে প্রায় ৪০%, পানি থাকে প্রায় ৫–১০% এবং জৈব পদার্থ থাকে প্রায় ৪–৫% ভাগ।

মাটিতে ভৌতভাবে বিদ্যমান বস্তুর মধ্যে প্রধান হচ্ছে বড় ও ছোট পাথর শিলা, উদ্ভাংশ, বালি, পলিকণা, কর্দমকণা, হিউমাস ইত্যাদি। মাটির জৈব পদার্থের মধ্যে প্রায় অর্ধেক থাকে পচনশীল জৈব পদার্থ, বাকী অংশে থাকে জীবন্ত প্রাণী ও উদ্ভিজ্জ শিকড়। জীবের মধ্যে আছে ব্যাকটেরিয়া, শ্যাওলা ছত্রাক, একটিনোমাইসিটিস, ক্রিমি ও কেঁচো। মাটিতে পানি ও বায়ুর পরিমাণ পারস্পরিকভাবে নির্ভরশীল, কারণ উভয়ই মাটির রন্ধ্র পরিসরে অবস্থান করে। মাটিতে আর্দ্রতা বাড়ার সাথে সাথে বায়ুর পরিমাণ কমে যায়। মাটিতে উপরোক্ত ৪টি উপকরণ খুবই ঘনিষ্ঠভাবে মিশ্রিত থাকে। নিম্নস্তরের মাটিতে জৈব পদার্থ ও বায়ুর পরিমাণ কিছু কম থাকে।

মৃত্তিকার শ্রেণিবিভাগ : একজাতীয় কতকগুলো জিনিসকে তাদের ভিতর তুলনা করে, তাদের আকৃতি, গুণাগুণ ও গঠন প্রকৃতি পার্থক্য অথবা সামঞ্জস্য বিচার বিশ্লেষণের পর যদি ভিন্ন ভিন্ন সমষ্টিতে বিন্যস্ত করা হয় তখন তাকে শ্রেণিবিভাগ বলে। এইভাবে বিন্যস্ত করার পেছনে সাধারণত উদ্দেশ্য থাকে, তা দেখে কোন ব্যক্তি যেন ঐ জিনিসগুলো সম্পর্কে মোটামুটি একটি ধারণা বা জ্ঞান পায়। মৃত্তিকার শ্রেণিবিভাগও এজন্যে করা হয়েছে। তবে তা নানা দৃষ্টিকোণ থেকে নানা উদ্দেশ্যে বিভিন্নভাবে করা হয়েছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে অসংখ্য প্রকারের মৃত্তিকা পরিলক্ষিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বিভাগের মৃত্তিকা দফতর পনের শতকেরও অধিক মৃত্তিকা শ্রেণির স্বীকৃতি দিয়েছে। উৎপত্তি সমষ্টি বাহ্যিক গঠন, দানার আকৃতি, বর্ণ, রাসায়নিক ধর্ম, উদ্ভিজ্জ খাদ্যের উপাদান, জলবায়ুর প্রভাব

প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের উপর নির্ভর করে এই শ্রেণিবিভাগ গড়ে উঠেছে। এ সবের মধ্যে ভূ-তাত্ত্বিক গঠন ও জলবায়ুর প্রভাব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এটি ব্যতীত বাহ্যিক গঠন ও রাসায়নিক ধর্ম ভিত্তিক বিভাগ দুটিও উল্লেখযোগ্য।

(১) ভূ-তাত্ত্বিক শ্রেণিবিভাগ : মৃত্তিকার যত প্রকার শ্রেণিবিভাগ রয়েছে এটি তাদের মধ্যে সহজ ও সরল। মৃত্তিকার উৎপত্তি ও সমষ্টি ধারার উপর নির্ভর করে এই শ্রেণিবিভাগ করা হয়েছে। এই বিভাগের মৃত্তিকাকে প্রধানত দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়।

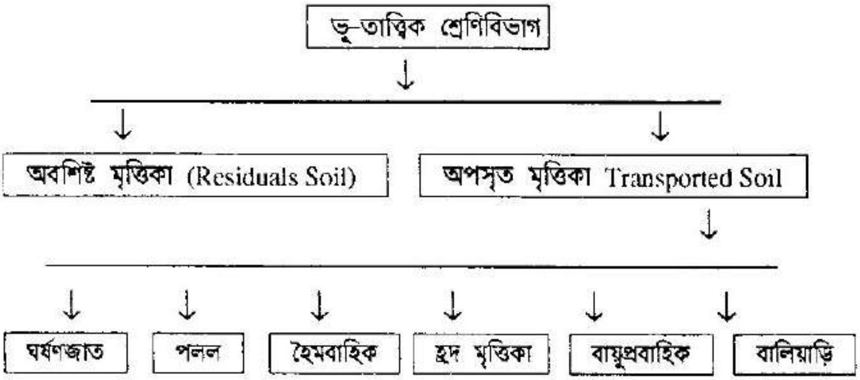

অবশিষ্ট মৃত্তিকা — যে মাটি তার উৎপত্তি স্থানেই বিদ্যমান থাকে তাকে অবশিষ্ট মৃত্তিকা বলে। প্রাচীন অবশিষ্ট মৃত্তিকার উপাদানগুলোর রাসায়নিক ক্ষয় সাধনের ফলে এতই পরিবর্তিত হয় যে, এতে আদি শিলার বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করা কঠিন। অপসৃত মৃত্তিকা — যে সকল মৃত্তিকা আদি শিলার স্থান থেকে নদী, বৃষ্টির পানি, বায়ু হিমবাহ প্রভৃতি দ্বারা বাহিত হয়ে অন্য স্থানে নীত ও সঞ্চিত হয় তাকে অপসৃত মৃত্তিকা বলে। স্থানান্তরে পরিবাহিত হওয়ার সময় বিভিন্ন মৃত্তিকা তার সহিত মিশ্রিত হয়। সুতরাং এই মৃত্তিকার শ্রেণিবিভাগ আদি শিলা হিসাবে নিরূপণ করা যায় না। মাধ্যাকর্ষণ বা উচ্চ ভূ-ভাগের ঢাল ধৌতের ফলে এই মৃত্তিকা স্বল্প দূরে নীত। আবার বায়ুস্রোত বা হিমবাহের দ্বারা শতশত মাইল দূরে নীত হয়। এই সকল মৃত্তিকার শ্রেণিবিভাগের উপর বহনকারী শক্তিসমূহ ও মৃত্তিকার বর্তমান অবস্থান উভয়েরই প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন স্থানে ঘর্ষণজাত মৃত্তিকা, পলল মৃত্তিকা, হৈমবাহিক মৃত্তিকা, হ্রদ মৃত্তিকা, বায়ুপ্রবাহিত মৃত্তিকা, বালিয়াড়ি মৃত্তিকা প্রভৃতি অপসৃত মৃত্তিকাগুলো সাধারণত দেখা যায়।

(ক) ঘর্ষণজাত মৃত্তিকা : উৎপত্তিস্থান থেকে মাধ্যাকর্ষণ এর ফলে যে সকল মৃত্তিকা অল্প দূরে নীত হয় তারা এই শ্রেণির অন্তর্গত। হিমানি সম্প্রপাত, ভূপাত, কর্দম প্রবাহ (Mud flows) সহসাপাতন (Stump) বা কেবল মাধ্যকার্ষণ এরূপ স্থানান্তরের প্রধান কারণ। সাধারণত অল্প কর্কশ ও মোটা পদার্থসমূহ এই মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত হয়।

(খ) পলল মৃত্তিকা : নদীর প্রবল স্রোত পার্বত্য অঞ্চল থেকে শিলাখণ্ড বহন করে আনে। ওগুলো ঘাত-প্রতিঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে সূক্ষ্ম মৃত্তিকায় পরিণত হয় এবং পরিশেষে সাগরবক্ষ বা নদীর পার্শ্বদেশ ভরাট করে সমভূমির সৃষ্টি করে। একেই পলল মৃত্তিকা বলে।

(গ) হৈমবাহিক মৃত্তিকা : কোয়াটারনারী সময়ের প্লেইস্টোসিন যুগে উত্তর আমেরিকার অর্ধেক ও ইউরোপের বিস্তৃত অঞ্চলের উপর হিমবাহ বর্তমান ছিল। পার্বত্য এলাকায়ও ঐ একই সময় পাবর্ত্য হিমবাহের সৃষ্টি হয়। এই হিমবাহ উচ্চ ভূ-ভাগ থেকে পার্বত্য উপত্যকা বেয়ে অগ্রসর হয়ে পার্শ্ববর্তী সমভূমিতে পৌছায়। এই হিমবাহ গলতে শুরু করলে এর দ্বারা বয়ে আসা প্রস্তর খণ্ড, নুড়ি ও মৃত্তিকাসমূহ অনিয়মিতভাবে গ্রাবরেখা আকারে সজ্জিত হতে থাকে। এটিই হৈমবাহিক মৃত্তিকা।

(ঘ) হ্রদ মৃত্তিকা : কোন কোন হ্রদের তলদেশে স্রোত দ্বারা বাহিত পলি বা উদ্ভিজ দ্বারা পূর্ণ হয়। পশ্চিম মিনাসোতা, উত্তর ডাকোটা, দক্ষিণ সানকাছুয়ান ও মিনিটোবার বিশাল গমক্ষেত 'Red River' ও তার উপনদীর পলল দ্বারা আবৃত ভূ-ভাগের উপর অবস্থিত। বর্তমানে তা সমতল ভূমিতে পরিণত হয়েছে।

(ঙ) বায়ুবাহিত মৃত্তিকা : প্রবল বায়ু প্রবাহিত হওয়ার সময় বালুকণা স্বল্প দূরে বহন করে। কিন্তু সূক্ষ্ম কণা বিশিষ্ট ধূলি শত শত মাইল দূরে বহন করে নেয়। শুষ্ক ও আর্দ্র অঞ্চল থেকে শুষ্কতার সময় আগ্নেয়গিরি, মরুভূমি, শুষ্ক প্লাবন ভূমি এবং কর্ষিত জমির ধূলিকণা বায়ু দ্বারা বাহিত হয়। বায়ু দ্বারা বাহিত হলুদ বর্ণের মৃত্তিকাকে লোয়েস বলে।

(চ) বালিয়াড়ি মৃত্তিকা : বায়ু দ্বারা বাহিত মৃত্তিকার অন্তর্গত অনেক বালিয়াড়ি নির্মল প্রায় কোয়ার্টজ বালুকা দ্বারা গঠিত। এটি দ্রবণীয় না হওয়ায়, তার মধ্যে উদ্ভিদের খাদ্য না থাকায় এবং বালিয়াড়ি দ্রুত গড়ে ওঠে বা একস্থান থেকে অন্য স্থানের দিকে অগ্রসর হয় বলে তাতে উদ্ভিদ জন্মাবার ও শুক্ত হওয়ার সুযোগ পায় না।

(২) রাসায়নিক গঠন ভিত্তিক বিভাগ : বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় মৃত্তিকা সৃষ্টি হয়। বৃষ্টিপাতের সময় বায়ুস্থিত কার্বন-ডাই অক্সাইড গ্যাস বৃষ্টির পানির সাথে চুন ও অন্যান্য পদার্থ দ্রুত দ্রবীভূত হয়। আর্দ্র অঞ্চলে বৃক্ষপত্র পচনক্রিয়ার মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়। এরূপে নানাদিক দিয়ে মৃত্তিকার পরিবর্তন সাধিত হয়ে থাকে এবং এই পরিবর্তনের সাধনে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার প্রভাব অত্যধিক। রাসায়নিক গঠন অনুযায়ী মৃত্তিকাকে প্রধানত অম্লধর্মী ও ক্ষারধর্মী শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়।

রাসায়নিকভিত্তিক মৃত্তিকা

↓

অম্লধর্মী ←——————→ ক্ষার ধর্মী

অম্লধর্মী : অধিক বৃষ্টিপাত বিশিষ্ট অঞ্চলে মাটির দ্রাব্য খনিজ লবণসমূহ পানির সাথে মিশে দূরবর্তী অঞ্চলে কিংবা উর্ধ্ব মৃত্তিকার তলদেশে চলে যায়। এ পানি যে স্থানে গিয়ে সঞ্চিত হয় সেখানকার মাটিতে সাধারণত এলুমিনিয়াম ও লৌহ ঘটিত লবণ এবং অন্যান্য বহু প্রকার রাসায়নিক লবণ দেখতে পাওয়া যায়।

ক্ষারধর্মী : স্বল্প বৃষ্টিপাত বা শুষ্ক অঞ্চলে তৃণের পাতা, কাণ্ড ও মূল পচে জৈব সারে সমৃদ্ধ উর্বর মৃত্তিকার সৃষ্টি হয়। এ সকল অঞ্চলে বৃষ্টিপাত স্বল্প বলে মৃত্তিকা থেকে উদ্ভিদ খাদ্য ধুয়ে অপসারিত হতে পারে না। প্রচুর পরিমাণে চুন অথবা চুনঘটিত লবণ যুক্ত বলে পানি সরবরাহের উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে পারলে তা কৃষিকার্যের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হয়। উর্বরা ও কর্ষণযোগ্য বলে এই মৃত্তিকায় প্রচুর খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়।

(৩) জলবায়ুভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ : মৃত্তিকা গঠনের ক্ষেত্রে জলবায়ুর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জলবায়ু বৃহদায়তন প্রস্তরকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিলায় বিভক্ত করে রেগোলিথে পরিণত করে এবং সেই রেগোলিথ মৃত্তিকা কণায় পরিণত হয়। জলবায়ুর প্রভাবের ফলে মৃত্তিকা ও উপাদান সৃষ্টিকারী আণুবীক্ষণিক জীবের জন্ম ও বৃদ্ধিলাভ নিয়ন্ত্রিত হয়। এজন্যে বিভিন্ন প্রকার জলবায়ু ও উদ্ভিদ বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মৃত্তিকার সৃষ্টি করে। জলবায়ুর বিভিন্নতা অনুসারে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মৃত্তিকাকে প্রধানত চারটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়।

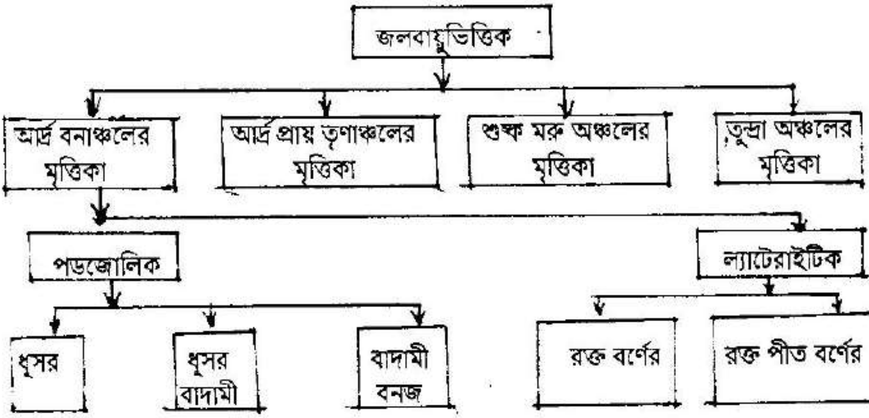

আর্দ্র বনাঞ্চলের মৃত্তিকা : আর্দ্র অঞ্চলের মৃত্তিকায় প্রচুর পরিমাণে উদ্ভিজ্জজাত পদার্থ থাকে কিন্তু তুন্দ্রাঞ্চলের ন্যায় এই সকল উদ্ভিজ্জজাত পদার্থ মৃত্তিকার সাথে সম্পূর্ণরূপে মিশ্রিত হয় না। এই মৃত্তিকায় উদ্ভিজ্জ খাদ্য জৈব ধাতব পদার্থের পরিমাণ কম।

ল্যাটোরাইটিক মৃত্তিকা : আর্দ্র ক্রান্তিয় অঞ্চলে শিলা ও খনিজ চূর্ণ এবং জৈব পদার্থের পচনক্রিয়া দ্রুত সাধিত হলেও প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে আবশ্যকীয় মৌলিক পদার্থগুলো অপসারিত হওয়ায় উর্ধ্ব মৃত্তিকায় কেবল এলুমিনিয়াম, হাইড্রোক্সাইড এবং লৌহ অবশিষ্ট থাকে। অবশিষ্টাংশকে লাটোজোল এবং এ প্রক্রিয়ায় উদ্ভূত মৃত্তিকাকে ল্যাটেরাইটিক মৃত্তিকা বলে। এই মৃত্তিকা দুপ্রকারের —

(ক) পাটকিলে মৃত্তিকা (Laterite Soil) : যে সকল অঞ্চলে অধিক তাপমাত্রা এবং পর্যায়ক্রমে আর্দ্র ও বৃষ্টিহীন ঋতুর আগমন হয় সে সকল অঞ্চলে এ ধরনের মৃত্তিকা সৃষ্টি হয়। ইটের ন্যায় লাল রঙের মৃত্তিকাকে ল্যাটেরাইট মৃত্তিকা বলে।

(খ) রক্ত ও পীত ল্যাটেরাইট মৃত্তিকা : যে সকল অঞ্চলে চুয়ান প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়েছিল কিন্তু জৈব ও খনিজ উপাদানগুলো সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হয় নাই, সে সকল অঞ্চলে এ মৃত্তিকা দেখতে পাওয়া যায়।

পডজোলিক মৃত্তিকা : উচ্চ অক্ষাংশে তাপমাত্রা অল্প হওয়ায় জৈব পদার্থসমূহের পচনক্রিয়া সম্পন্ন হয় না। অর্ধ পরিবর্তিত জৈব পদার্থসমূহ মৃত্তিকার উপরিভাগে থেকে যায়। লৌহ ও এলুমিনিয়াম পরিশ্রুত হয়ে অন্তমৃত্তিকায় সঞ্চিত হয় এবং প্রচুর সিলিকা ঊর্ধ্ব মৃত্তিকায় থেকে যায়। এ সকল প্রক্রিয়ার শেষ পর্যায়কে পডজোল বলা হয়।

আর্দ্র, শুষ্ক প্রায় এবং মরু অঞ্চলের মৃত্তিকা ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির। ক্রান্তিয় আর্দ্র অঞ্চলের মৃত্তিকা নাতিশীতোষ্ণ আর্দ্র অঞ্চলের মৃত্তিকা থেকে স্বতন্ত্র। সুতরাং জলবায়ু ও উদ্ভিজ্জকে ভিত্তি করে মৃত্তিকার শ্রেণিবিভাগে বিভিন্ন অঞ্চলের মৃত্তিকা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা জন্মে।

উপসংহার : পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে অসংখ্য প্রকারের মৃত্তিকা পরিলক্ষিত হয়। মৃত্তিকা সম্বন্ধে জানার জন্যও এর শ্রেণিবিভাগ করার পেছনে সাধারণত উদ্দেশ্য থাকে, তা দেখে কোন ব্যক্তি যেন ঐ জিনিসগুলো সম্পর্কে মোটামুটি একটি ধারণা পায়। এতে কোন মাটির কি গুণ, তার উৎপাদন ক্ষমতা কিরূপ, কোন ফসল ভাল হবে এবং তার জন্য কি কি পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন ইত্যাদির একটি সাধারণ চিত্র খুব সহজে পাওয়া যায় এবং এটি করার সময় এমনভাবে করা হয় যেন শ্রেণিবিভাগ দ্বারা জিনিসগুলো সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি এবং নির্ভুল তথ্য নির্দেশ করে মৃত্তিকার সব শ্রেণিবিভাগই আমাদেরকে সমস্ত মাটি সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা দিয়ে থাকে এবং আমাদের বিভিন্ন প্রয়োজনে নানা রকম তথ্য সরবরাহ করে থাকে। যেমন কোন মৃত্তিকায় ফসল ভাল জন্মে। মৃত্তিকার আধুনিক শ্রেণিবিভাগ শুধু আমাদেরকে ফলস উৎপাদনে কোন মাটি উপযোগী ও অনুপোযোগী সেটাই নির্দেশ করে না এর মাধ্যমে আমরা আরও অনেক ধরনের প্রয়োজনীয় তথ্য পাই যেমন — কোথায় বনাঞ্চল করা লাভজনক, কোথায় রাস্তাঘাট, পুল, ঘরবাড়ি পাইপ লাইন ইত্যাদি করা যায় তা সঠিকভাবে নির্দেশ করে আমাদের আর্থিক দিক থেকে অনেক উপকার করে থাকে। বর্তমানে উন্নয়নশীল দেশে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে মৃত্তিকার গুণাগুণ বিচার করে উপযোগিতা অনুসারে বিভিন্ন মৃত্তিকার বিভিন্ন ফলে চাষ করা হয়। এর ফলে কম খরচে অধিক শস্য উৎপাদন এবং শস্যের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং প্রাকৃতিক সম্পদের অপচয় রোধ হচ্ছে।

৩.১৩ হিমবাহ (Glacier)

হিমবাহ কি : এটিকে এককথায় এভাবে বলা যেতে পারে পার্বত্য অঞ্চলের অত্যন্ত ধীরগতি সম্পন্ন বিরাট বরফ স্তূপকে হিমবাহ বলে।

হিমবাহের গঠন প্রণালী (The Formation of the Glaciers) : পৃথিবীর অনেক স্থানে শীতকালে বা রাত্রে অত্যধিক শৈত্যের কারণে বায়ুমণ্ডলের জলীয় বাষ্প বৃষ্টিরূপে পতিত না হয়ে

তেঁজা তুলার মতো ভূ-পৃষ্ঠে পতিত হয়। আবার গ্রীষ্মকালে বা দিনের বেলায় সূর্যের তাপে তা গলে পানিতে পরিণত হয় বা বাষ্পাকারে আবার বায়ুমণ্ডলে অদৃশ্য হয়। মেরুপ্রদেশে অত্যধিক শীতের জন্য প্রায় সারা বছর তুষারপাত হয়। মেরুপ্রদেশ ছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলে শীতকালে সাধারণত উচ্চ ভূমিতে তুষাররাশি সঞ্চিত হয়। এছাড়া উঁচু পর্বতের শিখরে সারাবছর তুষার জমে থাকে। তার নিচের দিকের কতকাংশ গ্রীষ্মকালে গলে যায়, কিন্তু উঁচু অংশের তুষার কখনও গলে না। উঁচু পর্বতের শিখরদেশে বা মেরু অঞ্চলে যে সীমারেখার উপর সারাবছর তুষার জমে থাকে, কখনও গলে না এবং যার নিচে এলে বরফ গলতে থাকে তাকে অর্থাৎ সে সীমারেখারেকে হিমরেখা (Snow line) বলে।

নিরক্ষীয় অঞ্চল ছাড়া পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই শীত ও গ্রীষ্মকালের তাপের পার্থক্য বেশি। এর ফলে গ্রীষ্মকালের তুলনায় শীতকালে পার্বত্য অঞ্চলের বেশি নিম্নাংশে হিমরেখা নেমে আসে। কিন্তু স্থায়ী হিমরেখার (Permanent Snow line) উপরিভাগের তুষার গ্রীষ্মের প্রখর উত্তাপেও গলে না। নিরক্ষরেখা থেকে যতই উত্তরে বা দক্ষিণে যাওয়া যায়, সূর্যের তাপ ততই ক্রমশ কম অনুভূত হয়। এ কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে হিমরেখার উচ্চতার তারতম্য ঘটে। ভূ-পৃষ্ঠের উচ্চতা, অক্ষাংশ, বায়ু প্রবাহের দিক, বায়ু মণ্ডলে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ প্রভৃতি বিষয়ের উপর স্থায়ী হিমরেখার অবস্থান নির্ভর করে। নিরক্ষ প্রদেশে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে হিমরেখার উচ্চতা প্রায় ১৮,০০০ ফুট, পূর্ব আফ্রিকা ও হিমালয়ের দক্ষিণ অংশে ১৬,০০০ ফুট (হিমালয়ে ১৬$\frac{১}{২}$ ফুট) অন্যান্য ক্রান্তীয় অঞ্চলে ১২,০০০ ফুট, আল্পস পর্বতে ৯,০০০ ফুট, নরওয়েতে ৪,০০০ ফুট, থেকে ৫,০০০ ফুট, ল্যাপল্যাণ্ডে ৩,০০০ ফুট, গ্রীনল্যাণ্ডে ২,০০০ ফুট, এবং মেরুপ্রদেশে অধিক শৈত্যের জন্যে স্থায়ী হিমরেখা প্রায় সমুদ্রপৃষ্ঠে এসে মিশেছে। সেজন্যে মেরুপ্রদেশে সারা বছরই ঘন তুষার জমে থাকে এবং স্থানে স্থানে বিস্তৃত ও বিসদৃশ বরফের পাহাড় পরিদৃষ্ট হয়।

উঁচু পার্বত্য অঞ্চলে অথবা অত্যন্ত শীত প্রধান দেশে শীতকালে অত্যধিক তুষারপাতের কারণে বিভিন্ন সুবিধাজনক নিম্নভূমি, অববাহিকা (Basin) এবং সমতল অংশ পরিপূর্ণ হয়, এসব স্থানে তুষারপাত এত বেশি হয় যে, গ্রীষ্মকালেও তা গলে যায় না। বিশেষত হিমরেখার উর্ধ্বে বছরের পর বছর তুষার সঞ্চিত হওয়ায় উপরের তুষারের ভীষণ চাপে নিচের তুষাররাশি অনবরত জমাট বেঁধে শক্ত ও কঠিন বরফস্তূপে পরিণত হয়। এ ধরনের বরফস্তূপকে ফরাসি ভাষায় NEVE (নিভি) ও জার্মান ভাষায় FIRN (ফার্ন) বলে। ক্রমে ক্রমে এই বরফ স্তূপ বৃহৎআকৃতি ধারণ করে। গ্রীষ্মকালে এ ধরনের বরফ স্তূপের উপরের দিকের কিছু তুষার গলে যায়। ঐ তুষার গলা পানি বরফ স্তূপের নিচে উপনীত হলে তার নিম্নভাগ পিচ্ছিল হয়। এ অবস্থায় উপরের তুষার রাশির ভীষণ চাপে আপনার ভারে এবং পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে নিচের বরফ রাশি পিচ্ছিল ভূ-ভাগ থেকে স্থানচ্যুত হয়ে অতি ধীর গতিতে সেখানকার ভূমির ঢাল অনুসারে পাহাড়ের গা বেয়ে ও উপত্যকার মধ্য দিয়ে বরফের জিভের (Tongue of Glacir) আকারে নিচের দিকে নামতে থাকে। এ ধরনের গতিশীল বিরাট বরফ রাশিকেই হিমবাহ বলে।

হিমবাহ নামতে নামতে যখন হিমরেখার সীমা অতিক্রম করে তখন বরফ গলতে আরম্ভ করে এবং তা থেকে ঝরণা ও পার্বত্য নদীর উৎপত্তি হয়। ভারত উপমহাদেশের গঙ্গা, সিন্ধু, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি নদী হিমবাহ গলা পানি দ্বারা পুষ্ট। হিমালয় পর্বতের এভারেস্ট শৃঙ্গের কাছে রংবুক কাংশুং প্রভৃতি হিমবাহ আছে। কারাকোরাম পর্বতমালার গ্রেট বালটরো (Great Baltoros) নামক হিমবাহ পৃথিবীর মধ্যে দীর্ঘতম, এর দৈর্ঘ্য প্রায় ৩৬ মাইল।

হিমবাহের প্রকারভেদ : বিভিন্ন অবস্থানে বরফ স্তূপের সৃষ্টি অনুযায়ী হিমবাহকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা হয়। নিচে সেগুলোর বর্ণনা দেয়া হলো —

১. মহাদেশীয় হিমবাহ (Continental Glaciers) : ভূ-তত্ত্ববিদগণ মনে করেন যে, অতি প্রাচীন যুগে পাহাড় পর্বত সৃষ্টির পরে মহাদেশগুলোর মেরু অঞ্চলের নিকটবর্তী বিস্তীর্ণ স্থানে তুষার স্তূপ সর্বাধিক পরিমাণে সঞ্চিত হয়। সেই সময় ইউরোপের সমগ্র উত্তর পশ্চিমাংশে এবং উত্তর আমেরিকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে বর্তমান সময়ের তুলনায় অনেক বেশি পরিমাণ গভীর বরফের স্তর (গভীরতা ৮০০ থেকে ৭,০০০ ফুট) সঞ্চিত ছিল। দক্ষিণ মেরুর কাছাকাছি এন্টার্কটিক অঞ্চলের তুষার স্তূপ বর্তমানের তুলনায় আগে অনেক বেশি বিস্তৃত ছিল। ভূ-ত্বক সময়পঞ্জি অনুসারে সেই সময়কে কোয়ার্টারনারী বরফ যুগ (Quarternary Ice Age) বলা হয়।

বর্তমান সময়েও উত্তর গোলার্ধে তুন্দ্রা অঞ্চলে, গ্রীনল্যাণ্ড ও আইসল্যাণ্ডে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে এন্টার্কটিকা অঞ্চলে ঐ রকম বরফে আচ্ছন্ন বিস্তীর্ণ অঞ্চল দেখতে পাওয়া যায়। এ ধরনের সুদূরপ্রসারী তুষার স্তূপকে মহাদেশীয় হিমবাহ বলে। বর্তমানে এন্টার্কটিকা হিমবাহের আয়তন প্রায় ৩৫ লক্ষ বর্গমাইল অর্থাৎ প্রায় সমগ্র ইউরোপের সমান। প্রকৃতপক্ষে সেখানকার উপকূলবর্তী পার্বত্যাঞ্চলে কিছু শৃঙ্গ ছাড়া সমগ্র অঞ্চল সব সময় বরফাচ্ছাদিত থাকে। এই বিশাল তুষার রাশির উপকূল অংশের তুষারের গভীরতা স্থানে স্থানে ৮০০ ফুট এবং মধ্যভাগে এর গভীরতা ৭৫০০ ফুট। গ্রিনল্যাণ্ডের হিমবাহের আয়তন প্রায় ৫ লক্ষ বর্গমাইল। এখানকার উপকূলের স্থানে স্থানে তুষার রাশির গভীরতা খুবই কম, এমনকি স্থানবিশেষের ভূ-ভাগ পুরোপুরি তুষারমুক্ত আছে। কিন্তু মধ্যভাগের তুষার রাশির গভীরতা এন্টার্কটিকা হিমবাহের চেয়ে বেশি।

২. পার্বত্য বা উপত্যকা হিমবাহ (Mountain or Valley Glaciers) : বহু প্রাচীনকালে বরফ যুগে (Ice Age) পার্বত্যাঞ্চলের উচু ভূমিগুলোর তুষার রাশি সঞ্চিত হওয়ায় বিশাল বিস্তীর্ণ বরফ অঞ্চলের (Snow Field) সৃষ্টি হয়েছিল। কালক্রমে ঊর্ধ্বদেশের তুষাররাশির চাপে, নিজভারে এবং পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের ফলে সেই তুষার অঞ্চল হতে বিভিন্ন উপত্যকার মধ্য দিয়ে হিমবাহ নিচের দিকে প্রবাহিত হতে আরম্ভ করে। এমন পার্বত্য উপত্যকার মাঝ দিয়ে যে হিমবাহ অগ্রসর হয় এবং যার প্রভাবে পার্বত্য উপত্যকা বিস্তৃত হয় তাকে উপত্যকা হিমবাহ এবং কখনও পার্বত্য হিমবাহ বলা হয়।

পার্বত্য অঞ্চলে তুষার স্তূপ কম পরিমাণে সঞ্চিত হলে অথবা কোন কারণে সেখানে উত্তাপ বেড়ে গেলে হিমবাহের প্রবাহ কিছু পরিমাণে হ্রাস পায়, অর্থাৎ তখন পার্বত্যাঞ্চল থেকে খুব কম পরিমাণেই হিমবাহ পর্বতের ঢাল বেয়ে নিচের দিকে অগ্রসর হয়। এমন অবস্থাকে বলে হিমবাহের

পশ্চাদপসরণ বা প্রত্যাবর্তন (Retreal of Glaciers)। গত ১০০ বছরের মধ্যে আল্পস পর্বত অঞ্চলের হিমবাহগুলোর উল্লেখযোগ্য পরিমাণ পশ্চাৎ অপসারণ লক্ষ্য করা হয়েছে।

কখনও কখনও একটি প্রকাণ্ড ফাটল (Gaping Crack) মধ্যভাগের বরফ স্তূপকে তার চারপাশের তুষারাবৃত উঁচু চূড়াগুলো থেকে আলাদা করে রাখে। এই ফাটলকে বার্গস ক্রান্ত (Bergs Chrund) বলে। এ ধরনের ফাটলের জন্যই আল্পস, হিমালয় প্রভৃতি পর্বতে আরোহণ অত্যন্ত বিপজ্জনক ও কষ্টকর। অধিক ঢাল বিশিষ্ট পার্বত্যাঞ্চলে যে বড় বড় ফাটল দেখা যায় সেগুলোকে ক্রিভাস (Crevasse) বলে। এ ধরনের ফাটল হিমবাহের গতিপথে আড়াআড়ি (Transverse) বা প্রায় সমান্তরাল (Longitudinal) ভাবে থাকে। কোন কারণে পার্বত্য তুষারাবৃত কোন অংশে ভূমির ঢাল বৃদ্ধি পেলে পর্বত থেকে তুষার প্রপাতের সৃষ্টি হয়, তাকে সিরাক (Seracs) বলে।

৩. পাদদেশের হিমবাহ (Piedmont Glaciers) : পার্বত্য অঞ্চল থেকে পর্বতের গা বেয়ে বা উপত্যকার মধ্য দিয়ে নিচে নেমে এসে যখন কোন হিমবাহ পর্বতের পাদদেশে বিস্তৃত হয়, তখন তাকে পর্বতের পাদদেশের (Pied তল, Mont - পর্বত) হিমবাহ বলে। একে কখনও কখনও প্রসারিত হিমবাহ নামেও অভিহিত করা হয়। আলাস্কা, আইসল্যান্ড, এন্টার্কটিকা প্রভৃতি শীতল পার্বত্য অঞ্চলে এমন হিমবাহ দেখতে পাওয়া যায়। আলাস্কার পাদদেশের হিমবাহের বিস্তার প্রায় দেড় হাজার বর্গমাইল। পাদদেশের হিমবাহের অগ্রভাগকে লোব (Lobe of ice) বলে, আলাস্কায় এ ধরনের একটি লোব সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত। এর উপরিভাগ প্রায় সমতল। ভূ-তত্ত্ববিদগণ মনে করেন কোয়াটারনারী বরফ যুগে ইউরোপের ইটালি জার্মানি প্রভৃতি দেশেও পাদদেশের হিমবাহ বিদ্যমান ছিল।

হিমবাহের গতি (The Motion of a Glacier)

প্রধানত ৪টি কারণে হিমবাহের অগ্রগতি আরম্ভ হয়।

প্রথমত : উপরের বরফের চাপ,

দ্বিতীয়ত : পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাব,

তৃতীয়ত : উপরের চাপে নিম্নস্তরের কিছু পরিমাণ বরফ গলতে আরম্ভ করলে হিমবাহের তলদেশে বরফ গলা পানি সঞ্চিত হয়ে তার গতিকে পিচ্ছিল ও সহজ করে,

চতুর্থত : বরফের নমনীয়ভাব হিমবাহের গতির সহায়ক। এই ৪টি প্রক্রিয়া একত্রিত হলে বরফ স্তূপ ধীরে নিচে নামতে থাকে এবং ভূমির ঢাল অনুসারে যেদিকে বাধা সবচেয়ে কম, সেইদিকে অগ্রসর হয়।

প্রকৃতপক্ষে হিমবাহকে দীর্ঘ তুষার নদী বলা হয়। কিন্তু নদীর তুলনায় এর গতি এত মন্থর যে, এটি প্রতিদিন কয়েক ইঞ্চি এবং বৎসরে মাত্র কয়েক গজ অগ্রসর হয়। শীতকালের চেয়ে গ্রীষ্মকালে হিমবাহের গতিবেগ বাড়ে। আল্পস পর্বতের হিমবাহ প্রতিদিন এক ফুট পরিমাণ স্থানও অতিক্রম করতে পারে না। অথচ গ্রিনল্যান্ডে এর গতিবেগ প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৬ ফুট, এমনকি গ্রীষ্মকালে কোন কোন দিন ১০০ ফুটও হয়ে থাকে। হিমবাহের পার্শ্বদেশের চেয়ে মধ্যভাগের

গতিবেগ বেশি। আবার এর নিচের দিকের তুলনায় উপরদিকের গতিবেগ কিছু বেশি। পাহাড় বা পর্বতের খাড়া অংশে উপনীত স্থলে হিমবাহ প্রচণ্ড বেগে নিচে পতিত হয়।

তুষার স্তূপ সঞ্চিত হবার সময় অথবা হিমবাহ অগ্রসর হবার সময় কখনও তার কিছু অংশ ভেঙ্গে পৃথক হয়ে প্রচণ্ড বেগে নিচের দিকে অগ্রসর হবার সময় সম্মুখস্থ পাহাড় বা পর্বতের কতকাংশ বা বৃক্ষলতাদি ও জীবজন্তুর প্রচুর ক্ষতি সাধন করতে করতে অগ্রসর হলে তাকে হিমানী সম্প্রপাত (Avalanche) বলে। উঁচু পর্বতে আরোহনের সময় অনেক পর্বতারোহী হিমানী সম্প্রপাতের ফলে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

হিমবাহের কাজ (Works of Glacier) : নদীর মতো হিমবাহ ক্ষয় সাধন, বহন ও অবক্ষেপণ — এই ৩ ধরনের কাজ করে। উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে ক্ষয় সাধনই হিমবাহের প্রধান কাজ। নিম্নাংশে এটি দ্বারা বহন ও অপেক্ষপণ কাজ সাধিত হয়। হিমবাহের ক্ষয়কাজ দুপ্রকার —

প্রথমত : হিমবাহের তলদেশের পানি যখন বরফে পরিণত হয় তখন হিমবাহের নিচে অবস্থিত পর্বত গাত্র থেকে প্রস্তরকণ্ড গলে বিচ্ছিন্ন হয়ে তার সাথে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ হয়।

দ্বিতীয়ত : প্রবহমান হিমবাহের তলদেশে যে প্রস্তরখণ্ড থাকে তার ঘর্ষণে পর্বতের গায়ে দাগ পড়ে এবং শিলাগুলো মসৃন এবং কখনও কখনও চূর্ণীকৃত হয়। এ ধরনের মসৃণ চূর্ণীকৃত শিলাকে শিলাচূর্ণ বলে। হিমবাহ যে উপত্যকার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় তার উপর অংশের পার্শ্বদেশ খুব খাড়া এবং মধ্য অংশে গর্তের সৃষ্টি হয়। এই হিলাময় পর্বতকে ফরাসি ভাষায় সার্ক (Cirque) এবং ইংরেজি ভাষায় কোরি (Corrie) বলে। এ ধরনের কোরির মধ্যে অনেক সময় ছোট ছোট

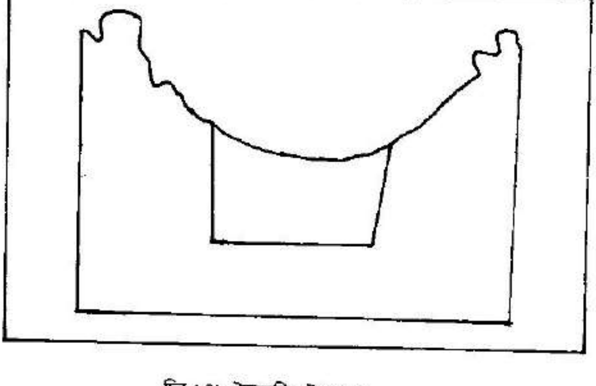

চিত্র : ৪২. হৈমবাহিক উপত্যক্যা

হিমবাহ থেকে যায়। তা গলে কোরিকে হ্রদে পরিণত করলে তাকে কোরি হ্রদ (Corrie Lake) বলে। দুটো সার্ক বা কোরি পাশাপাশি গঠিত হলে তার মধ্যবর্তী যে উচু খাড়া ভূ-ভাগের সৃষ্টি হয়, তাকে এরিট (Arete) এবং তিন চারটি সাক পাশাপাশি গঠিত হলে মধ্যের খাড়া ভূভাক

পিরামিডিয় চূড়া (Pyramidial peak) বলে। পূর্বে সৃষ্ট V আকৃতির নদী উপত্যকায় মধ্য দিয়ে হিমবাহ অগ্রসর হলে তার ঘর্ষণে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে উপত্যকাটির আকৃতি ইংরেজি U অক্ষরের (U-Shaped) মতো হয়। এ ধরনের উপত্যকাকে হৈমবাহিক উপত্যকা (Glacial Valley) বলে। এ ধরনের উপত্যকার মধ্যভাগ প্রশস্ত ও গভীর এবং পার্শ্বদেশ খাড়াই হয়।

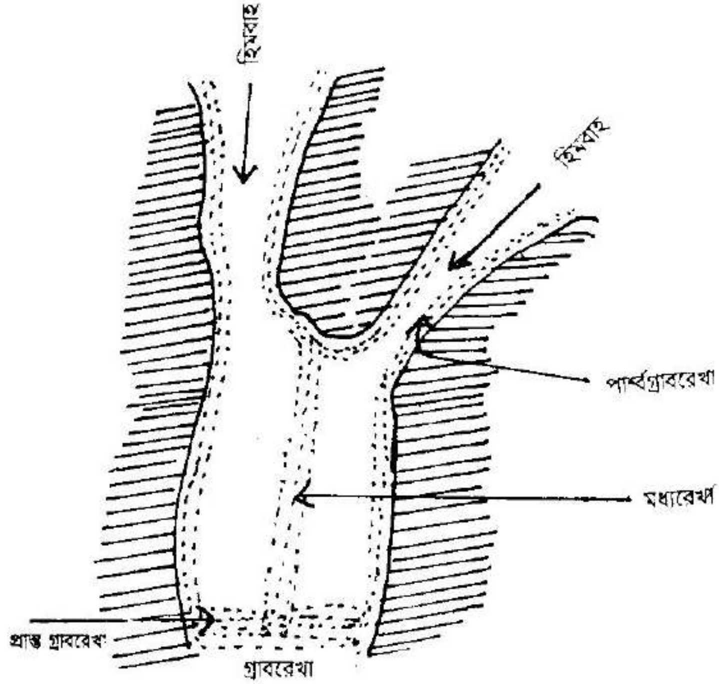

চিত্র : ৪৩. প্রান্ত গ্রাবরেখা

অনেক সময় উপনদীগুলোর মধ্য দিয়ে হিমবাহ প্রবাহিত হয়ে প্রধান নদীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত বৃহৎ হিমবাহের সাথে মিলিত হয়। প্রধান হিমবাহ বৃহৎ হওয়ায় তার উপত্যকাটি ক্ষুদ্রাকার হিমবাহের উপত্যকার চেয়ে বেশি গভীর হয়। এমন অবস্থায় মনে হয়, উপনদীর উপত্যকা বৃহৎ ও গভীর উপত্যকাটির উপর ঝুলছে। এই জাতীয় উপত্যকাকে ঝুলন্ত উপত্যকা (Hanging vallery) বলে। হিমবাহের গতিপথে কোন কঠিন শিলার পেছনে কোমল শিলা থাকলে হিমবাহ কোমল শিলাটিকে ক্ষয় করতে পারে না। ফলে পার্শ্ববর্তী স্থানগুলো ক্ষয়প্রাপ্ত হলেও তারা আগের মতো থাকে। এ ধরনের উচু কঠিন শিলাময় টিবিকে ক্র্যাগ (Crag) এবং লেজের মতো বিস্তৃত সরু নরম শিলাকে টেল (Tail) বলে।

ধী গতিপথে হিমবাহ তার প্রবল চাপে পর্বতের গায়ের বড় বড় শিলাখণ্ডকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে মসৃণ নুড়ি, কাকর, বালি প্রভৃতিতে পরিণত করে স্থানান্তর নিয়ে যায়। হিমরেখায় নিচে নেমে হিমবাহ গলতে আরম্ভ করলে বাহিত নুড়ি, কাকর, বালি প্রভৃতিতে পরিণত করে তার গতি পথের

দুদিকে সঞ্চিত হয়। হিমবাহ পুরোপুরি গলে গেলে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ শিলাখণ্ডগুলো তার গতিপথের সামনে সঞ্চিত হয়। এভাবে সঞ্চিত শিলাস্তূপকে গ্রাবরেখা (Moraine) বলে। গ্রাবরেখা চার প্রকারের। হিবাহের দুপাশে যে শিলাস্তূপ হয় তাকে পার্শ্ব গ্রাবরেখা (Lateral Moraine), সামনের শিলাস্তূপকে প্রান্ত গ্রাবরেখা (Terminal Moraine) দুটো হিমবাহ এসে পাশাপাশি মিলিত হলে দুটোর পার্শ্ব গ্রাব রেখা একত্রে সঞ্চিত হলে তাকে মধ্য গ্রাব রেখা (Medial Moraine), এবং হিমবাহের তলদেশে সঞ্চিত শিলাস্তূপকে নিম্ন গ্রাবরেখা (Ground Moraine) বলে। পর্বতের নিম্নাংশে ও সমতল ভূমিতে সঞ্চিত কাঁকরযুক্ত কর্দমকে বোল্ডার ক্লে (Boulder Clay) বলে। এ ধরনের সঞ্চিত শিলারাশি সারিবদ্ধভাবে ছোট ছোট টিলার মতো অবস্থান করে।

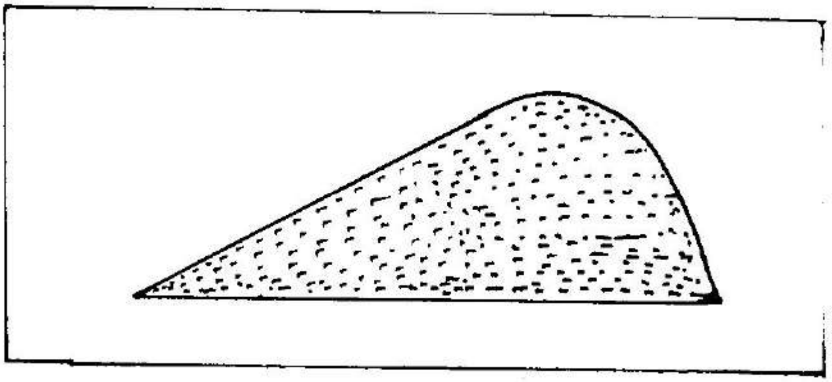

চিত্র : ৪৪. ড্রাম লিন

এগুলোকে ড্রামলিন (Drumlin) বলে। হিমবাহের তলদেশে সঞ্চিত প্রস্তরখণ্ড, কাদা ও মোটা বালি দ্বারা আঁকা বাঁকা শৈলশিরা গঠিত হলে তাকে এসকারস (Eskers) বলে। হিমবাহের শেষ প্রান্তে বালি, কাদা প্রভৃতি নদীর ব-দ্বীপের মতো কৌনিক আকৃতিতে সঞ্চিত হলে তাকে কেমস (Cames) বলে।

কোন কোন সময় বিভিন্ন ড্রামলিনের মধ্যস্থিত হিমবাহের পরিত্যক্ত উপত্যকা ভূমিতে বিস্তীর্ণ হ্রদ এবং জলাশয়ের সৃষ্টি হয়।

৩.১৪ অবক্ষেপণ এবং ভূ-পৃষ্ঠের পরিবর্তনের প্রাকৃতিক কারণসমূহ

অবক্ষেপণ (Deposition) : অবক্ষেপণ বা Deposition বলতে কোথাও কোন কিছু জমা হওয়াকে বুঝায়। অবক্ষেপণের ফলে ভূমিরূপের নানারূপ পরিবর্তন হয়। এই অবক্ষেপণ বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় ও কারণে হয়ে থাকে। নিম্নলিখিত কারণগুলোর জন্য অবক্ষেপণ হয়।

(ক) নদীর বহন ও অবক্ষেপণ

(খ) হিমবাহ অধ্যুষিত অঞ্চলের অবক্ষেপণ

(গ) বায়ুর অবক্ষেপণ

(ঘ) সামুদ্রিক অবক্ষেপণ

(ক) নদীর বহন ও অবক্ষেপণ : নদী বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় ক্ষয়প্রাপ্ত শিলাখণ্ড, বালুকা, কর্দম, প্রভৃতি বহন করে থাকে। নদীর বহন করবার ক্ষমতা তার জলের পরিমাণ ও গতিবেগের উপর নির্ভর করে। নদীর গতিবেগ আবার প্রত্যক্ষভাবে ঢালের পরিমাপের উপর নির্ভর করে থাকে। নদীর ঢাল বৃদ্ধি পেলে নদীর গতিবেগও বৃদ্ধি পায়। বন্যার সময় নদীতে জলের পরিমাণ বাড়লে নদীর জলের গতিবেগও বেড়ে যায় এবং তার বহন করবার ক্ষমতাও বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়।

আবার নদীর জল কমে গেলে অথবা অধিক পরিমাণে প্রস্তর খণ্ড নদীতে আসলে তার বহন করবার শক্তিও সেই অনুপাতে কমতে থাকে। যে কোন বৃহৎ নদী প্রস্তরখণ্ড, বালুকা, কর্দম প্রভৃতি তার বোঝারূপে বহন করে থাকে। নদী তার বোঝা চারটি প্রক্রিয়ায় বহন করে। যথা —

(১) দ্রবণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বহন ;

(২) ভাসমান অবস্থায় বহন ;

(৩) লম্ফ দান প্রক্রিয়ায় বহন ; এবং

(৪) আকর্ষণ বা টানের মাধ্যমে বহন ;

নদীর এই বহন করবার ক্ষমতা নিম্নলিখিত কারণে পরিবর্তিত হতে পারে।

(১) নদীতে জল কমে গেলে ;

(২) নদী ঢালের পরিবর্তন হলে ;

(৩) নদীর শক্তির তুলনায় অধিক পরিমাণ প্রস্তরখণ্ড নদীতে আসলে ; অথবা

(৪) নদী কোন হ্রদের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হলে ;

এইরূপ অবস্থায় নদীর তলদেশে কিছু কিছু প্রস্তরখণ্ড জমা হতে থাকে। বৃহদাকার প্রস্তরখণ্ডগুলো নদীর উচ্চ প্রবাহে এবং ক্ষুদ্রাকার প্রস্তরখণ্ড, বালুকা, কর্দম প্রভৃতি নদীর নিম্নপ্রবাহে অর্থাৎ মোহনার নিকট জমা হয়। একেই নদীর অবক্ষেপণ বলে। এর ফলে নতুন ভূমিভাগের সৃষ্টি হয়।

(২) হিমবাহ অধ্যুষিত অঞ্চলের অবক্ষেপণ ;

এই প্রক্রিয়ায় অবক্ষেপণ দুই এলাকায় হয়।

(ক) উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলের অবক্ষেপণ : উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে হিমবাহের ক্ষয় কার্যের চিহ্নই অধিক দেখতে পাওয়া যায় বটে তবে এই অংশে কিছু কিছু অবক্ষেপণও হয়ে থাকে। বিভিন্ন ধরনের গ্রাবরেখা এই অঞ্চলে অবক্ষেপণের ফলে হয়ে থাকে। পার্বত্য অঞ্চল হতে বিচ্ছিন্ন ও ক্ষয়প্রাপ্ত শিলাখণ্ড হিমবাহের পার্শ্বে ও সম্মুখে স্তূপকারে সঞ্চিত হয়ে নিম্নদিকে প্রবাহিত হতে থাকে। এই শিলাস্তূপকে গ্রাব রেখা বলে। এটি হিমবাহের পার্শ্বে হলে পার্শ্ব গ্রাবরেখা এবং সম্মুখে সঞ্চিত হলে প্রান্ত গ্রাবরেখা বলে। এইরূপ গ্রাবরেখাকে আরো কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন —

(১) মধ্য গ্রাবরেখা

(২) ভূমি গ্রাবরেখা

(৩) আবদ্ধ গ্রাবরেখা

(৪) তলদেশ গ্রাবরেখা।

এই ভাগগুলো হিমবাহের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে করা হয়।

(খ) নিম্নভূমিতে অবক্ষেপণ : নিম্নভূমিতে হিমবাহ প্রধানত অবক্ষেপণ করে থাকে। তবে নদী যেরূপ বাহিত দ্রব্যগুলো আকৃতি অনুসারে তার বিভিন্ন অংশে সঞ্চিত করে, হিমবাহ সেরূপ করে না। হিমবাহ ক্ষুদ্র বৃহৎ বিভিন্ন আকৃতির দ্রব্য একত্রে সঞ্চিত করে। হিমবাহ অধ্যুষিত নিম্নভূমিভাগের ভূমিরূপ প্রধানত হিমবাহ অবক্ষেপণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। উচ্চ পর্বত অঞ্চলে হিমবাহ অধ্যুষিত হবার পূর্বেকার ভূমিরূপগুলো হিমবাহের ঘর্ষণে কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে থাকে। কিন্তু নিম্নভূমিভাগে পূর্বেকার ভূমিরূপগুলো হিমবাহ বাহিত অবক্ষেপের দ্বারা এমনভাবে ঢেকে যায় যে, তার সহিত পূর্বের ভূমিরূপের কোনই মিল খুঁজে পাওয়া যায় না।

হিমবাহ অধ্যুষিত নিম্নভূমিভাগে হিমবাহ অবক্ষেপের দ্বারা গঠিত ভূমিরূপগুলোকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা —

(ক) আস্তরিক অনুপ্রবাহের দ্বারা গঠিত ভূমিরূপ এর উৎপত্তি হয় কেবল হিমবাহের কার্যের ফলে এবং

(খ) স্তরিত অনুপ্রবাহের দ্বারা গঠিত ভূমিরূপ এটি প্রধানত হিমবাহ গলিত জলধারার কার্যের ফলে গঠিত হয়ে থাকে।

৩. বায়ুর অবক্ষেপণ : বালিয়াড়ি গঠন বায়ুর অবক্ষেপণের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য উদাহরণ বায়ু প্রবাহ দ্বারা বালুকারাশি এক স্থান হতে বাহিত হয়ে অন্য স্থানে সঞ্চিত হয়ে উচ্চ ও দীর্ঘ বালির স্তূপ গঠন করে একে বালিয়াড়ি বলে। এইরূপ বালিয়াড়ি মরু অঞ্চলে ব্যতীত সমুদ্রোপকূলেও দেখা যায়। তবে সমুদ্রোপকূলের বালিয়াড়ি সাধারণত ছোট এবং গাছপালার সাহায্যে ভূমি সহিত আবদ্ধ হয়ে স্থায়ী রূপে অবস্থান করে।

৪. সামুদ্রিক অবক্ষেপণ : তটভাগের ক্ষয়প্রাপ্ত দ্রব্যসমূহ সমুদ্র তরঙ্গের দ্বারা বাহিত হয়ে অবশেষে সমুদ্র সৈকতে ও সমুদ্রগর্ভে সঞ্চিত হয়। বৃহদাকার প্রস্তরখণ্ড, বালুকা প্রভৃতি উপকূলের নিকটতম অংশে, তটদেশে এবং সূক্ষ্ম বালুকা, কর্দম প্রভৃতি উপকূল হতে দূর সমুদ্রে সঞ্চিত হয়ে থাকে। তটবাহিত ক্ষয়প্রাপ্ত দ্রব্য ব্যতীত নদীবাহিত পলি, কর্দম ও প্রবাল এবং আগ্নেয়গিরি হতে উৎক্ষিপ্ত দ্রব্যসমূহও সমুদ্রে সঞ্চিত হয়। নানা প্রকার দ্রব্য সমুদ্রোপকূলে সঞ্চিত হবার ফলে নানারূপ ভূমির সৃষ্টি হয় যেমন — সৈকত ভূমি, বাঁধ, দ্বীপ, চর প্রভৃতি।

ভূ-পৃষ্ঠের পরিবর্তনের প্রাকৃতিক কারণ

ভূ-ত্বক বিভিন্ন শ্রেণির শিলার সমন্বয়ে গঠিত। শিলার শ্রেণিভেদ এবং রূপান্তর হতে প্রমাণিত হয় যে, বিবিধ প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় ভূ-পৃষ্ঠের পরিবর্তন হচ্ছে। বস্তুত পৃথিবীর বহিরাবরণ দৃঢ় স্থিতিশীল বা অপরিবর্তনীয় নয়। ভূ-তত্ত্ববিদগণের মতে, কোটি কোটি বৎসর পূর্বে পৃথিবীর অবস্থার সঙ্গে বর্তমান যুগের মানচিত্রের অনেক পার্থক্য অনুম্যান করা যায়। এ যুগের বহু সুউচ্চ পর্বতশ্রেণি প্রাচীনকালে সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত ছিল। পৃথিবীর সৃষ্টির পর হতে ভূ-পৃষ্ঠের বহু রদবদল হয়েছে। পর্বত ও মালভূমি সমভূমিতে পরিণত হয়েছে। আবার সমতলভূমি কিংবা জলমগ্ন সমুদ্রতল উচ্চভূমিতে উন্নীত হয়েছে।

ভূ-ত্বক সর্বত্র সুস্থিত অবস্থায় কখনই থাকে না। পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ শক্তির দ্বারা ভূ-ত্বক এর কোথাও না কোথাও অনবরতই আলোড়িত ও পরিবর্তিত হচ্ছে। পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ এই প্রবল শক্তির উৎপত্তি সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের মতে — ভূ-ত্বকের নিম্নের অংশে বা অন্তস্তরে তেজস্ক্রিয় পদার্থ হতে তাপ বিচ্ছুরিত হয়ে প্রচণ্ড তাপের সৃষ্টি করে। এই তাপ সঞ্চিত হয়ে পৃথিবীর অভ্যন্তরে যে পরিচলন স্রোতের সৃষ্টি হয় তা হতে ভূ-আভ্যন্তরীণ এই প্রবল শক্তির উৎপত্তি। এই প্রবল শক্তির উৎপত্তি যেরূপেই হোক না কেন, এর ফলে ভূ-ত্বক আলোড়ন ঘটে এবং ভূ-ত্বকে দ্রুত বা আকস্মিক ও ধীর এই উভয় প্রক্রিয়াতেই ভূমিরূপ গঠিত হয়। এই প্রবল শক্তি অনেক সময় ভূ-ত্বক ফাটলের সৃষ্টি করে এবং এক অংশ অপর অংশ হতে স্থানচ্যুত হয়ে কখনও নিচে বসে যায়, কখনও উপরে উঠে পড়ে, আবার কখনও বা হেলে অবস্থান করে। এই শক্তির ফলেই আবার ভূমিকম্প এবং ভূমিরূপ গঠন আকস্মিক বা দ্রুত হয়। আবার ভূ-অভ্যন্তরে এই প্রবল শক্তি সমুদ্রগর্ভে বিশাল অঞ্চল ব্যাপিয়া সঞ্চিত পলিসমূহকে পেষণ করে ধীরে ধীরে উপরে ঠেলে তোলে এবং বিশাল পর্বতমালার সৃষ্টি করে। এই প্রক্রিয়ায় ভূমিরূপ গঠন ধীর গতিতে হয়।

এই সকল বিভিন্ন শক্তি, যার দ্বারা আলোড়ন সৃষ্টি হয়ে ভূ-ত্বকে বিভিন্ন ভূমিরূপ গঠিত হয়, তাদের একত্রে ভূমিরূপ গঠনকারী শক্তি বলে। তবে ভূ-গাঠনিক বা টেকনিক শব্দটি একত্রে আরও অধিক প্রচলিত। ভূ-আলোড়নকে প্রধানত দুটি ভাগে বিভক্ত করা যায় যথা —

(১) মহীভাবক আলোড়ন

(২) গিরিজনি আলোড়ন।

(১) মহীভাবক আলোড়ন : এই আলোড়ন ভূ-পৃষ্ঠে লম্বভাবে কার্য করে থাকে। এর ফলে ভূ-পৃষ্ঠের স্থানসমূহ খাড়াভাবে উপরে অথবা নিচের দিকে উঠানামা করে। ব্যাপক আকারে মহাদেশ জুড়ে সাধারণত এই আলোড়ন বা আন্দোলন হয় বলে একে মহীভাবক আলোড়ন বলে। তবে মহীভাবক আলোড়নের প্রভাব স্থানীয়ভাবেই অধিক দেখতে পাওয়া যায়।

মহীভাবক আলোড়নে জর্ডান ও পূর্ব আফ্রিকার প্রসস্ত উপত্যকাসমূহ রাইন নদীর প্রসস্ত উপত্যকা প্রভৃতি গঠিত হয়েছে।

(২) গিরিজনি আলোড়ন : গিরিজনি আলোড়ন ভূ-পৃষ্ঠে আনুভূমিক আকারে কার্য করে থাকে। এতে ভূ-ত্বকে কোথাও সংগমনের ফলে সংকোচন অথবা কোথাও টানের দরুন প্রসারণের সৃষ্টি হয়। কোন একটি স্থানে সংগমনের সৃষ্টি হলে অপর একটি স্থানে টানের সৃষ্টি হয়ে থাকে। এই আলোড়ন সমুদ্রগর্ভে বিশাল অঞ্চলব্যাপী সঞ্চিত পলিসমূহ পেষণ দ্বারা ভাজের সৃষ্টি করে এবং তা ধীরে ধীরে উপরে ঠেলে তোলায় বিশালায়তন ভংগিল পর্বতমালায় সৃষ্টি হয়। এই আলোড়নে বিশালায়তন ভঙ্গিল বা ভাঁজ পর্বতগঠিত হয় বলে একে গিরিজনি আলোড়ন বলা হয়।

চ্যুতির ফলে সৃষ্ট বিভিন্ন ভূমিরূপ : অনেক সময় ভংগুর শিলায় অসমান পীড়নের ফলে ফাটল ও দারনের সৃষ্টি হয়ে শিলার এক অংশ অপর অংশ হতে স্খলিত বা স্থানচ্যুত হলে তাকে চ্যুতি বলে। ভূমিরূপের উপর চ্যুতির প্রভাব যথেষ্ট লক্ষ্য করা যায়। কারণ চ্যুতির ফলে ভূমিভাগ কখনও উপরে উঠে পড়ে। কখনও নিচে বসে যায়, কখনও হেলে থাকে। আবার কখনও বা ভূ-পৃষ্ঠের সমান্তরালে অবস্থান করে। চ্যুতির ফলে শিলাস্তর ভেঙে গিয়ে সেই ভগ্ন অঞ্চল বরাবর শিলা দ্রুত ক্ষয় প্রাপ্ত হয়ে ভূমিরূপের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

অগ্ন্যুৎদগম ও আগ্নেয়গিরি

ভূ-পৃষ্ঠের দুর্বলস্থান ভেদ করে ফাটল দিয়ে কিংবা ছিদ্রপথে ভূ-গর্ভস্থ উষ্ণ বায়ু, গলিত শিলা, উত্তপ্ত প্রস্তরখণ্ড, জলীয় বাষ্প, কর্দম, ভস্ম প্রভৃতি পদার্থ প্রবল বেগে উর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়াকে অগ্নুৎদগম বা আগ্নেয়গিরি বলে। আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে —

(১) ভূ-ত্বক দুর্বল স্থানের বা ফাটলের বা ছিদ্র পথের অস্তিত্ব ;

(২) ভূ-গর্ভে তরল শিলার অস্তিত্ব ;

(৩) ভূ-গর্ভে চাপের বৃদ্ধি ;

ভূ-ত্বকের বিভিন্ন অবস্থিত আগ্নেয়গিরিসমূহকে তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায় —

(১) সক্রিয় আগ্নেয়গিরি

(২) সুপ্ত আগ্নেয়গিরি

(৩) মৃত আগ্নেয়গিরি

অগ্ন্যুৎপাতের ফল

(১) অধিকাংশ অগ্নুৎপাতের সময় ভূমিকম্প হয়।

(২) অগ্নুৎপাতের ফলে ভূ-পৃষ্ঠের লাভা সঞ্চিত হয়ে মালভূমির সৃষ্টি হয় যেমন দাক্ষিণাত্যের মালভূমির উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত লাভা অঞ্চলটি এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে রয়েছে।

(৩) আন্দিজ ও রকি পর্বতের অনেক পার্বত্য শৃঙ্গ মৃত আগ্নেয়গিরির শংক।

(৪) সমুদ্র গর্ভে অবস্থিত আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের ফলে সমুদ্রগর্ভে লাভা জমে নতুন নতুন দ্বীপ সৃষ্টি হয়। যথা — হাওয়াই দ্বীপ।

(৫) আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের ফলে অনেক সময় সমৃদ্ধ নগর ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ইতালির ভিসুভিয়াসের অগ্ন্যুৎপাতে হার কিউলিনিয়াম ও পাম্পই নামক দুটি সমৃদ্ধ নগর উত্তপ্ত লাভা নিচে চাপা পড়ে ধ্বংস হয়ে যায়।

(৬) ভূ-ত্বকের অংশ বিশেষ বিধ্বস্ত হয়ে বসে গিয়ে গভীর খাদের সৃষ্টি করে। এইভাবে ১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দে সুমাত্রা ও জাভা দ্বীপের মধ্যবর্তী ক্রাকতোয়া দ্বীপটির অর্ধাংশ বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং অপর অর্ধাংশ প্রায় ৩০৫ মি. গভীর গহ্বরের সৃষ্টি হয়।

(৭) মৃত আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখে হ্রদের সৃষ্টি হয়।

অগ্নুৎপাতের ফলে কিছু উপকার হয় যথা —

(১) ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়।

(২) ভূ-ত্বক আগ্নেয়শিলা এবং খনিজ দ্রব্য সমৃদ্ধ হয়। লাভা দ্বারা গঠিত ভারতের দক্ষিণাঞ্চলের কালো মৃত্তিকা কার্পাস চাষের জন্য বিশেষ উপযোগী।

(৩) অগ্নুৎপাতের ফলে অনেক সময় নদী গর্ভে লাভা জমে নদীর গতি পরিবর্তিত হয়।

ভূমিকম্প

প্রাকৃতিক কারণবশত ভূ-আলোড়নের ফলে ভূ-পৃষ্ঠের কোন কোন অংশে আকস্মিক ও ক্ষণস্থায়ী স্পন্দন বা কম্পনের সৃষ্টি হয় তাকে ভূমিকম্প বলে। ভূমিকম্প মৃদু হলে সহজে বুঝা যায় না। পৃথিবীর অভ্যন্তরে যে স্থানে কম্পনের উৎপত্তি হয় তাকে ভূমি কম্পের কেন্দ্র বলে। ভূ-কম্প কেন্দ্র সাধারণত ভূ-ত্বকের ৩২ কি.মি. এর মধ্যে অবস্থান করে। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে কেন্দ্রের গভীরতা আরও অধিক হতে পারে। কেন্দ্র হতে লম্বালম্বি ভূ-ত্বকের উপরিস্থ বিন্দুকে উপকেন্দ্র বলে। ভূমিকম্পের স্পন্দন কেন্দ্র হতে তরঙ্গের ন্যায় চারদিকে প্রসারিত হয়। সিসমোগ্রাফ বা ভূ-কম্পলিখন যন্ত্রের সাহায্যে এরূপ তরঙ্গ সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়।

ভূমিকম্পের ফল

ভূমিকম্পের ফলে ভূ-পৃষ্ঠের বহু পরিবর্তন ঘটে —

(১) বৃহৎ অট্টালিকাসমূহ নিমেষে ভূমিসাৎ হয়। প্রকাণ্ড বৃক্ষাদি উৎপাটিত হয় এবং বহু লোকের প্রাণহানি ঘটে।

(২) ভূমিকম্পে ভূ-ত্বকে অনেক চ্যুতি, ফালি ও ভাঁজের সৃষ্টি হয়। চ্যুতির এক পার্শ্বের ভূমি উচ্চ হয়ে উঠে। এবং অপর পার্শ্বের ভূমি নেমে গিয়ে গ্রস্ত উপত্যকার সৃষ্টি হয়। কখনও ফাটলের মধ্য দিয়ে কর্দম, উষ্ণ জল, বালি প্রভৃতি বহির্গত হয়।

(৩) কোন কোন নদীর গতি পরিবর্তিত হয়, আবার কোন কোন নদী শুকিয়ে যায়। ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দে আসামের ভূমিকম্পে দিবং নদীর গতি পরিবর্তিত হয়।

(৪) কখনও কখনও সাগরতল উচ্চ হয়ে জলের উপরে জেগে উঠে এবং শুষ্ক স্থলভাগ গঠন করে। অবার কখনও উপকূলভাগ সমুদ্রে নিমর্জ্জিত হয়। এইরূপ এক সময় [illegible] উপসাগরের তলদেশে ৬০ মিটার উচ্চ হয়।

(৫) সমুদ্রের জলরাশি তীর হতে দূরে নেমে যায় এবং পরক্ষণেই ভীষণ গর্জন করে ১৫-২০ মিটার উচ্চ হয়ে উপকূলভূমি প্লাবিত করে বন্যার সৃষ্টি করে। সমুদ্রের তলদেশে ভূমিকম্পের ফলে সৃষ্ট এই বিশাল সামুদ্রিক ঢেউগুলোকে জাপানে সুনেসিস বলে।

ভূ-পৃষ্ঠের প্রধান ভূমিরূপগুলো প্রধানত দুটি শক্তির পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলে গঠিত হয়ে থাকে। এই দুটি শক্তি হল —

(১) ভূ-অভ্যন্তরে সৃষ্ট শক্তি এবং

(২) ভূ-পৃষ্ঠের বাইরে সৃষ্ঠ শক্তি।

(১) ভূ-অভ্যন্তরে সৃষ্ঠ শক্তি : এই শক্তিকে ভূ-গঠনকারী শক্তি বা টেকনিক বলা হয়। এই শক্তির ফলে একদিকে যেরূপ চ্যুতি অগ্ন্যুৎদগম, অগ্নুৎপাত ভূমিকম্প প্রভৃতি দ্বারা আকস্মিক পরিবর্তনের মাধ্যমে ভূমিরূপ গঠিত হয়। সেরূপ অপরদিকে সমুদ্রগর্ভে বিশাল পর্বতমালারও সৃষ্টি হয়ে থাকে। এভাবে ভূ-অভ্যন্তরে সৃষ্ট শক্তির দ্বারা গঠিত ভূমিরূপকে আদিম বা প্রারম্ভিক ভূমিরূপ বলা হয়। এই আদিম ভূমিরূপ পরে ভূ-পৃষ্ঠের বাইরে সৃষ্ট শক্তির দ্বারা পর্যায়ক্রমে পরিবর্তিত হয়ে থাকে।

(২) ভূ-পৃষ্ঠের বাইরে (প্রধানত সূর্য হতে সৃষ্ট শক্তি) : এই শক্তি সর্বদা ভূ-পৃষ্ঠের আদিম ভূমিরূপের উপর ক্রিয়া করে ভূমিরূপের পরিবর্তন ঘটায় এবং এই পরির্বতনের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন উচ্চতা বিশিষ্ট ভূমিরূপের মধ্যে ক্রমশ একটি সমতা বা সামঞ্জস্য আনবার চেষ্টা করে। এই কারণে একে ক্রমায়ন শক্তিও বলা হয়। এই ক্রমায়ন শক্তি মাধ্যাকর্ষণ শক্তির সহযোগিতায় প্রধানত জলধারা (নদী), বায়ু প্রবাহ তুষার বা বরফ (হিমবাহ) উদ্ভিজ ও পানি মণ্ডলী প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তির মাধ্যমে কার্য করে থাকে। ভূ-পৃষ্ঠের বাইরে সৃষ্ট সকল শক্তির মূলে রয়েছে সৌরশক্তি সৌরশক্তি সমুদ্রের জলকে বাষ্পে পরিণত করছে এবং এই জলীয় বাষ্প পরে শীতল হয়ে বৃষ্টিরূপে ভূ-পৃষ্ঠে পতিত হয়ে নদী অথবা বরফের স্তূপ প্রবাহিত হয়ে পুনরায় সমুদ্রে মিলিত হচ্ছে। এই সৌরশক্তি মাধ্যাকর্ষণ শক্তির সাহায্যে আবার বায়ুপ্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করে, যা ভূ-পৃষ্ঠের মৃত্তিকা ও বালুকণাকে যে কেবল এক স্থান হতে অপর স্থানে পরিবাহিত করছে তাই নহে, এটি বৃষ্টিপাত ঘটাচ্ছে এবং সমুদ্রোপকূলে সাগর তরঙ্গের সৃষ্টি করে উপকূলভাগের গঠন ও নিয়ন্ত্রণ করছে। এটি ব্যতীত বৃক্ষাদি, কীট পতঙ্গ ও জীবজন্তু প্রভৃতি জৈব শক্তিও এই ক্রমায়ন শক্তিকে সাহায্য করছে এই জৈবিক শক্তিগুলোও আবার সৌরশক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কারণ উদ্ভিজ ও প্রাণিমণ্ডল যা প্রধানত জলবায়ুর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত তাও এই সৌরশক্তিরই নিয়ন্ত্রনাধীন।

বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তি : বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে ভূ-পৃষ্ঠের পরিবর্তন হয়। যেমন জলধারা তুষার। বাতাস প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তি মাধ্যাকর্ষণ শক্তির সহযোগিতায় ভূমিরূপের পরিবর্তন ঘটিয়ে থাকে। এই প্রাকৃতিক শক্তিগুলো ভূ-পৃষ্ঠের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ভাবে কাজ করে থাকে। উত্তাপের দ্রুত তারতম্য, কেলাসন প্রক্রিয়া রাসায়নিক আবীম বিকার (ক) হাইড্রোশোন (খ) হাইড্রলিসিল (গ) অক্সিডেশান (ঘ) কার্যনেশান এবং (ঙ) দ্রবণ প্রভৃতি প্রাকৃতিক কারণে ভূ-পৃষ্ঠের প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হয়।

নদীর কার্য : যে সমস্ত প্রাকৃতিক শক্তি ভূ-পৃষ্ঠের নিয়তই পরিবর্তন সাধন করছে নদী তাদের মধ্যে অন্যতম। নদীর কার্য ভূ-পৃষ্ঠের প্রায় সর্বত্রই লক্ষ্য করা যায়। কেবল শুষ্ক মরু অঞ্চলে অথবা তুষারমণ্ডিত হিমশীতল অঞ্চলে এর কার্য তত স্পষ্ট নহে।

হিমবাহের কার্য : বর্তমানে হিমবাহ কেবল মেঘ প্রদেশে এবং হিমালয় আলপস প্রভৃতি সুউচ্চ পর্বতপত্রে স্বল্প পরিসর স্থানব্যাপী দেখা গেলেও ভূ-পৃষ্ঠের প্রাকৃতিক পরিবর্তনে হিমবাহের কার্য নগণ্য নয়। উত্তর আমেরিকা ইউরোপ ও সাইবেরিয়ার এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল অতীত হিমবাহের স্বাক্ষর আজও বহন করছে।

বায়ুর প্রভাব : বায়ু ভূ-পৃষ্ঠে পরিবর্তনে প্রধানত মরু অঞ্চলেই বিশেষ ভূমিকা পালন করে। পৃথিবীর প্রায় .... ভাগ বা শতকরা ৩০ ভাগ অঞ্চল মরুরূপে চিহ্নিত। মরু অঞ্চলে বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড মৃত্তিকা প্রভৃতি দৃঢ়সঙ্গবদ্ধ না হওয়ায় সহজেই তা বাতাসের আঘাতে ভেঙ্গে যায় এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড বালুকা প্রভৃতিতে পরিণত হয়। এই সমস্ত প্রস্তরখণ্ড ও বালুকা বাতাসের সহিত প্রবাহিত হতে থাকে। বায়ু একস্থান হতে অন্যস্থানে বহুদূরে সুক্ষ্ম বালুকণাসমূহকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। এই প্রক্রিয়ায় ভূমি ভাগ নিচু হয়ে যায় এবং অনেক সময় ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নানারূপ গর্তের সৃষ্টি হয়। এইভাবে ভূমিরূপ পরিবর্তনের বায়ুর প্রভাব কাজ করে।

ভূ-গর্ভের জল ও ভৌমজলের কার্য : ভূ-গর্ভের জল কেবল যে পানীয় জলই সরবরাহ করে তাই নহে। ইহা বিভিন্ন শিলাস্তরের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হবার কালে শিলা ক্ষয় করে ভূ-অভ্যন্তরে বিভিন্ন মর্তি গঠন করে থাকে। এর জন্য অনেক সময় ভূ-অভ্যন্তরে ধসের ফলে ভূ-পৃষ্ঠে বিভিন্ন গহ্বরে সৃষ্টি হয়। বৃষ্টির জল চুইয়ে ভূ-গর্তে প্রবেশ করবার সময় চুনাপাথর জলে দ্রবীভূত হয়। এত ফাটল ও ছিদ্র প্রসারিত হয়। বিভিন্ন ফাটলও ক্ষয়প্রাপ্ত এবং ক্রমশ প্রসারিত হয়ে শিলার এক অংশকে অপর অংশ হতে পৃথক করে রাখে ফলে পৃথিবীর ভূ-পৃষ্ঠের নানা প্রকার পরিবর্তন হয়।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনা হতে আমরা জানতে পারি যে, নানা প্রকার প্রাকৃতিক কাবণের ফলে ভূ-পৃষ্ঠের প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হচ্ছে। পৃথিবীর সৃষ্টির প্রথম থেকে নানা প্রকার প্রাকৃতিক পরিবর্তনের মাধ্যমে বর্তমান অবস্থায় রূপান্তরিত হয়েছে এবং এখনও পরিবর্তন হচ্ছে। এই পরিবর্তন কোন একক কারণে বা কোন নির্দিষ্ট সময়ে হয় নাই এর জন্যে একাধিক কারণ দায়ী। ভূ-পৃষ্ঠের এই পরিবর্তনের জন্য চ্যুতি, অগ্নুৎপাত, ভূমিকম্প, ভূ-অভ্যন্তরে সৃষ্ট শক্তি,

সৌরশক্তি, নদীর প্রবাহ সামুদ্রিক ক্রিয়া ও বায়ু প্রবাহ ইত্যাদি নানা কারণ দায়ী। এছাড়া নানা প্রকার অবক্ষেপণের মাধ্যমেও ভূ-পৃষ্ঠের নানারূপ পরিবর্তন হয়। এই অবক্ষেপণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমেও ভূ-পৃষ্ঠের আকারের পরিবর্তন হয়। ভূ-পৃষ্ঠের কোন কোন পরিবর্তন আকস্মিকভাবে হয় এবং কোন কোন পরিবর্তন অত্যন্ত ধীর গতিতে হয়। কখনও কখনও ভূমিকম্প, অগ্নুৎপাত প্রভৃতি প্রাকৃতিক কারণে ভূ-পৃষ্ঠের বিরাট পরিবর্তন হয়। এই পরিবর্তনের ফলে বহু নগর বাড়িঘর সভ্যতা প্রকৃতি প্রাকৃতিক কারণে ভূ-পৃষ্ঠের বিরাট পরিবর্তন হয়। এই পরিবর্তনের ফলে বহু নগর বাড়ি ঘর সভ্যতা প্রভৃতি ধ্বংসে প্রাপ্ত হতে পারে। অন্যান্য পরিবর্তন ধীর গতিতে বহুদিন ধরে হয়। এইসব প্রাকৃতিক কারণে প্রতিনিয়ত ভূ-পৃষ্ঠের পরিবর্তন হচ্ছে। ভূ-পৃষ্ঠের নানা প্রকার পরিবর্তনে প্রাকৃতিক কারণগুলো বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

৩.১৫ পর্বত সৃষ্টির মতবাদ ও শ্রেণিবিন্যাস

ভূমিকা : খেয়ালী প্রকৃতির সুনিয়ন্ত্রণের ফলে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সকল স্থানই বৈচিত্র্যময় প্রকৃতি তার আপন পছন্দমাফিক ভূ-পৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রূপ ভূ-সংস্থান বিদ্যমান রেখেছেন। আমরা মানবকুল, সৃষ্টির সেরা জীব প্রকৃতির এই ভূ-সংস্থানের গূঢ় রহস্য উন্মোচনকল্পে বিভিন্ন সময় বৈচিত্র্যশীল ভূমিরূপের ইতিহাস তথা সৃষ্টির প্রক্রিয়া এবং সম বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ভূ-প্রকৃতির বিন্যাস সম্পর্কে আলোচনায় উৎসাহ বোধ করি। এর ফলশ্রুতিতে এই অধ্যায়ে বিশেষ প্রাকৃতিক রূপ পর্বত (Mountain) এর সৃষ্টি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রক্রিয়াদি এবং বিশাল ভূ-ভাগে বিস্তৃত অগুনিত পর্বতসমূহকে সহজে উপলব্ধিকল্পে তাদের শ্রেণিবিন্যাস করতে চেষ্টা করছি। প্রকৃতিবিদদের মতানুসারে পারিপার্শ্বিক সমভূমি এমনকি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৯১৫ মিটারের অধিক উচু, সুবিস্তৃত খাড়া ঢালবিশিষ্ট শিলাস্তূপকে পর্বত নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। জ্ঞান তথ্যানুসারে সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ "এভারেষ্ট" এর উচ্চতা প্রায় ৯০০০ মিটার যা পর্বত নামক ভূমিরূপের অন্তর্গত নির্বোধ প্রাণিকুল সুউচ্চ পর্বত শৃঙ্গে এবং পর্বতপার্শ্বে অবাধে বিচরণ করলেও এটি সৃষ্টির প্রক্রিয়াদি নিয়ে কখনও উদ্বেগ বা উৎসাহবোধ করেনি। কিন্তু মানবকুলে জন্মগ্রহণকারী বিভিন্ন চিন্তাশীল মনীষীগণ এর কোন দৃষ্টিতে এবং অনুভূতিক্ষম দেহ ও গভীর চিন্তনশীল মস্তিষ্কে পর্বত সৃষ্টির প্রক্রিয়াদি সম্পর্কে আদিকাল থেকেই অনবরত বিভিন্ন ভাবের উদয় হলে সকলেই যুক্তি প্রমাণসহ মূল রহস্য সম্পর্কিত যে সকল উদঘাটিত তথ্যাদি দিয়ে গেছেন সেগুলো এখানে উপস্থাপন করা হলো। প্রথমেই পর্বত সৃষ্টির বিভিন্ন মতবাদ সম্পর্কে আলোচনা করে অতঃপর শ্রেণিবিন্যাস আলোচনা করা হবে।

পর্বত সৃষ্টির মতবাদসমূহ

১। জেফরি (Jeffrey) এর মত : জেফরির মতে, "আদিকালের উত্তপ্ত পৃথিবী তাপ বিকিরণ করত ক্রমশ শীতল হওয়া প্রাক্কালে সঙ্গতকারণেই সংকুচিত হতে থাকে। উপরিভাগ ক্রমশ শীতল হয়ে পাতলা আবরণের সৃষ্টি করে এবং অসম চাপের দরুন বিভিন্ন স্থানে সংকোচনের পরিমাণ

বিভিন্ন রকম হয়।" তবে ক্রম তাপ বিকিরণের ফলে ভূ-গর্ভস্থ উত্তপ্ত অংশে বিচিত্র পরিমাণে ঊর্ধ্বচাপ সৃষ্টি করলে এই চাপের প্রভাবে ভূ-ত্বকের স্থান ভেদে পাশাপাশি উচ্চ ও নিম্নভূমির সৃষ্টি করলে দৃশ্যমান পর্বতগুলো পূর্বের উচ্চ ভূমিসমূহ বলেই তিনি এ মতবাদ স্থাপনের চেষ্টা করেন।

এই মতবাদ সর্বাধিক প্রাচীন এবং মতবাদের পক্ষে জোরালো সমর্থনের অভাবে পরবর্তীকালে নতুন বিভিন্ন মত প্রকাশের প্রেক্ষিতে তাঁর পবর্ত সৃষ্টি মতবাদ তিমিরাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

২। জন জলি (John Joly) এর মত : জন জলি মনে করতেন যে, "পৃথিবীর বহিঃস্থ (Sial Silicon and Aluminium) সমন্বয় স্তর ক্রমে ঠান্ডা হয়ে যায়। কিন্তু Sial এর নিম্নস্থ Sima (Silicom and Magnesium) স্তর উত্তপ্ত থাকার ফলে তরল Sima স্তরের মাঝে মাঝে Sial স্তর নিমজ্জিত হয়। সেই অবনমিত Sail এর খাদে বিভিন্নভাবে ঠান্ডা পানি সঞ্চিত হলে এই পানির প্রভাবে পরিবহণ প্রক্রিয়ায় শৈত্য প্রবাহ Sima স্তরে ধাবিত হয়। Sima স্তর ক্রমশ শীতল অবস্থা প্রাপ্তি কালে সংকুচিত Sima তার উপর ভাসমান Sial স্তরের মাঝে পার্শ্বচাপ সরবরাহ করলে Sial স্তর উপরের দিকে আঁকাবাঁকা হয়ে উঠে যায়। এইরূপ উর্ধ্বে উত্থিত Sial স্তরই কালক্রমে পর্বত নামক ভূমিরূপ হিসাবে পরিচিত লাভ করে।"

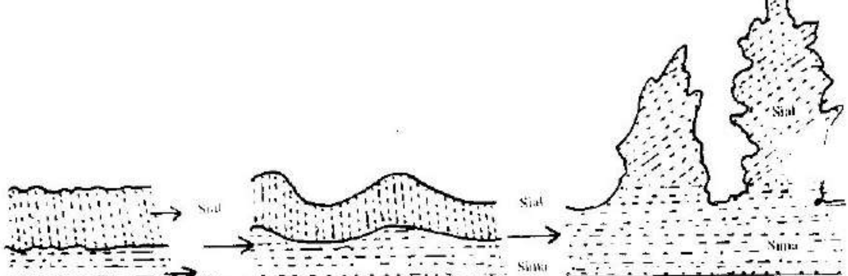

চিত্র : ৪৫. জনজলির পর্বত সৃষ্টির ধাপসমূহ

৩। ভেগনার (Wegener) এর মতবাদ : ভেগনার বলেন যে, "ভূ-ত্বকের উপরাংশের অপেক্ষাকৃত হালকা গ্রানাইট শিলাস্তর Sial দ্বারা এবং নিচের অংশ অপেক্ষাকৃত ভারী ব্যাসল্ট দ্বারা গঠিত থাকে। তবে ব্যাসল্ট স্তর প্রায় সমভাবেই সর্বত্র বিদ্যমান থাকলেও মহাদেশ ব্যতীত

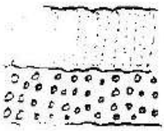

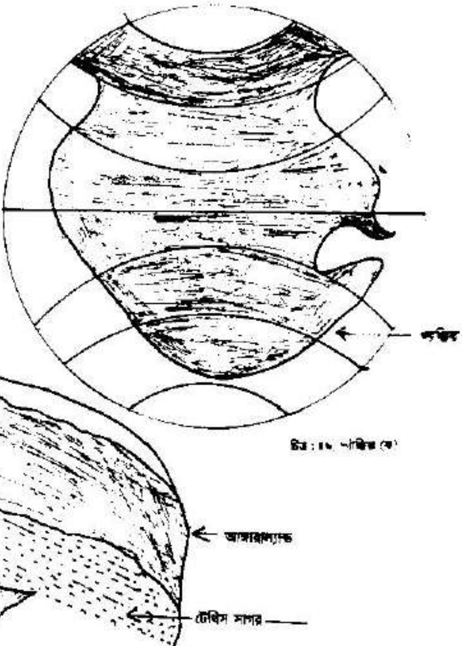

চিত্র : ৪৬ প্যাঞ্জিয়া (ক)

চিত্র : ৪৭ প্যাঞ্জিয়া (খ)

সাগর তলের উপরাংশ খুবই পাতলা গ্রানাইট অথবা গ্রানাইট বিহীনভাবে থাকে।" তার মতে, "সুদূর অতীতে পৃথিবী পৃষ্ঠে ভারী ব্যাসল্ট স্তরের উপরে হালকা গ্রানাইট স্তরের বিশাল ভূ-খণ্ড বিস্তৃত

স্থলভাগ 'প্যাঞ্জিয়া (Pangea) ভাসমান ছিল। তরল ব্যাসল্টের উপর এই প্যাঞ্জিয়া বিশেষভাবে ৪ ঘণ্টায় অক্ষদেশীয় আবর্তনের ফলে একটানের সৃষ্টি হয় এবং এই টানের প্রেক্ষিতেই মূল ভূ-খণ্ডটি দ্বি-বিভাজিত হয়। বর্তমানে পৃথিবী ২৪ ঘণ্টার মাঝে অক্ষদেশীয় আবর্তন হলেও পুরাকালে স্বল্পকালীন আবর্তনের প্রেক্ষিতে বর্তমানে নিরক্ষীয় অঞ্চল বরাবর প্যাঞ্জিয়া বিভক্ত হয়। দক্ষিণের অংশ গন্ডোয়ানা (Gondowana) উত্তর অংশ আঙ্গারা (Angara) এবং মধ্যবর্তী অংশে টেথিস (Tethys) সাগর ছিল। টেথিসের অংশ বিশেষ বর্তমানে ভূ-মধ্যসাগর হিসাবে বিদ্যমান রয়েছে।

কালক্রমে টেথিসের উভয় পার্শ্বস্থ ভূমিভাগ হতে ক্ষয়প্রাপ্ত দ্রব্যসমূহ পরিবাহিত হয়ে সাগরের তলদেশে পুঞ্জিভূত হয়। এর ফলে আঙ্গারা ও গন্ডোয়ানার পারস্পরিক দূরত্ব ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেতে থাকে। পাশাপাশি পরস্পরে কাছাকাছি অবস্থান করলে পুঞ্জিভূত অংশে উভয় দিক থেকে ক্রমান্বয়ে অধিক মাত্রায় চাপ প্রয়োগ করলে সাগর তলদেশে ভাঁজ হয়ে যায় এবং ভাজ প্রাপ্ত অংশ ক্রমবর্ধনে উচু হয়ে পর্বতের সৃষ্টি করে। এর ফলেই বিভিন্ন পর্বতের সৃষ্টি হয়েছে বলে ভেগনার (Wegener) ধারণা দেন।

চিত্র : ৪৮. ভেগনারের পর্বত সৃষ্টির ধাপসমূহ (ক)

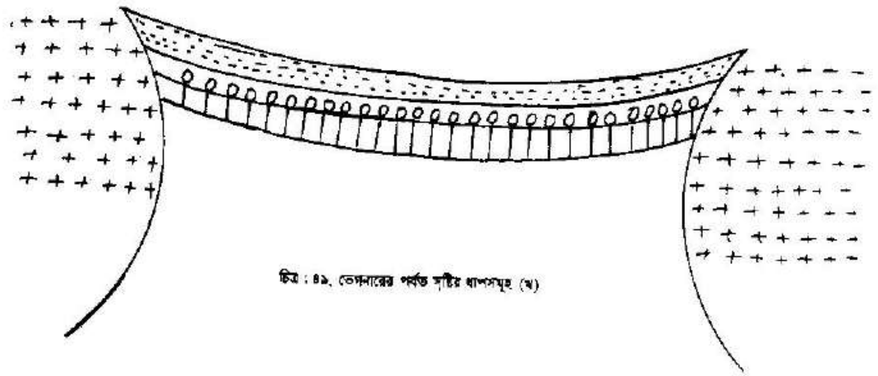

চিত্র : ৪৯, ভেগনারের পর্বত সৃষ্টির ধাপসমূহ (খ)

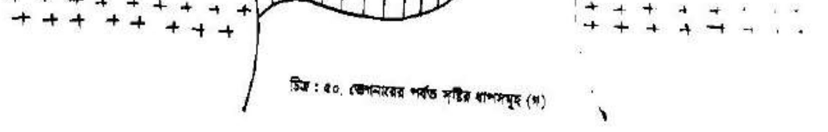

চিত্র : ৫০, ভেগনারের পর্বত সৃষ্টির ধাপসমূহ (গ)

৪। কোবার (Kober) এর মতবাদ : সংকোচন মতবাদের ব্যাখ্যাকারক কোবার বলেন যে, "মূলত ভূ-আন্দোলনের ফলে পৃথিবী পৃষ্ঠের নিম্নভূমিসমূহ মহিখাত (Geocyncline) সৃষ্টি হয়েছে। সৃষ্টির পর হতে অনবরত সংকোচন ক্রিয়ার ফলেই ভূ-আন্দোলন ঘটে থাকে। যা হোক, যে কোনভাবেই সৃষ্ট মহিখাতসমূহে পুনঃপুনঃ অধিক পরিমাণে পলি সঞ্চিত হওয়াতে এই নিম্নভূমি আরও অধিক মাত্রায় নিম্নগামী হতে থাকে। সঞ্চিত পলির মাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকলে সন্নিহিত দুপ্রান্ত দেশের মধ্যবর্তী দূরত্ব হ্রাস পায় এবং মহিখাত এলাকা সংকীর্ণ ও গভীর হতে থাকে। কালক্রমে পরিপূর্ণ মহিখাতে পার্শ্বচাপের প্রতিক্রিয়ায় অবক্ষেপিত পলির মাঝে গিরি জনিক্রিয়ার (Orogenesis) ভাঁজ সৃষ্টি হয় এবং ক্রমবর্ধমান চাপের ফলে ভাজপ্রাপ্ত অঞ্চল আরও উঁচু হয়ে বিশেষ সময়ে পর্বত নামক ভূমিরূপ পর্যায়ে পরিণত হয়। Wegener এর সাথে তার মতবাদের যথেষ্ট মিল আছে। কারণ যেভাবেই হোক সৃষ্টি নিম্নভূমিতে ক্রমবর্ধমানভাবে সঞ্চিত পলিতে পার্শ্বচাপের ফলে সৃষ্ট ভাঁজসমূহ উচু হয়ে পর্বত সৃষ্টি করে। তবে কোবার বিশেষভাবে খাত সৃষ্টির জন্য ভূ-আন্দোলনকেই দায়ী করেন যে আন্দোলন মুখ্যত পৃথিবীর পৃষ্ঠের ও ভূ-গর্ভের ক্রম সংকোচনের প্রেক্ষিতেই হয়ে থাকে।" তাঁর দেয়া মতবাদ তৎকালে ব্যাপক প্রতিবাদের ঝড় তুলেছিল।

(ক) Hall এবং Dana নামক দুজন বিজ্ঞানীর পুরাতন মহিখাতমূলক মতবাদের সাথে তাঁর মতবাদ প্রত্যক্ষভাবে সংযোগ সাধন করে বলে অনেক প্রকৃতিবিদ বিশ্বাস করতেন।

(খ) তিনি সংকোচন মতবাদের ব্যাখ্যাকারক হয়ে আবার সমস্থিতিবাদ (Isotacy) কে সমর্থন করে পর্বত সৃষ্টির ব্যাখ্যা দেন।

(গ) তার মহীখাত ভরাট পূর্বক ভাঁজ সৃষ্টিতে পর্বতের উৎপত্তি মতবাদ সর্বজনগ্রাহ্য নহে।

পর্বতের শ্রেণিবিভাগ

পৃথিবীতে বিরাজমান পর্বতসমূহকে প্রধানত উৎপত্তির তারতম্য অনুসারে ৫ (পাঁচ)টি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়।

পর্বত

↓

ভঙ্গিল বা ভাঁজ পর্বত | স্তূপ পর্বত | ল্যাকোলিথ পর্বত | ক্ষয়জাত পর্বত | সঞ্চয়জাত পর্বত

২। সক্রিয় (বিস্ফোরক) অবিরাম আগ্নেয়গিরি : যে সকল আগ্নেয়গিরি হতে সর্বক্ষণ অগ্ন্যুৎপাত হয় তারা এই শ্রেণির আগ্নেয়গিরি। উদাহরণ — ক্যালিফোর্নিয়ার দ্বীপে লেসেন পিক (Laasen peak) আগ্নেয়গিরি।

(খ) বিস্ফোরক সুপ্ত আগ্নেয়গিরি : যে সকল বিস্ফোরক জাতীয় আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত দীর্ঘকাল যাবৎ বন্ধ আছে কিন্তু যে কোন সময় বিস্ফোরণসহ অগ্ন্যুৎপাত ঘটাতে পারে সে সকল আগ্নেয়গিরিকে বিস্ফোরক সুপ্ত আগ্নেয়গিরি বলে। উদাহরণ — ইন্দোনেশিয়ার ক্রাকাতোয় আগ্নেয়গিরি।

(গ) বিস্ফোরক মৃত আগ্নেয়গিরি : যে সকল আগ্নেয়গিরি অতীতে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটিয়ে এখন পর্যন্ত স্থির হয়ে আছে তাকে বিস্ফোরক মৃত আগ্নেয়গিরি বলে। উল্লেখযোগ্য যে , এই শ্রেণির আগ্নেয়গিরির গতিবিধির ভূ-তাত্ত্বিক দিক পর্যালোচনা করে মনে করা হচ্ছে যে ভবিষ্যতে ঐ সকল আগ্নেয়গিরি হতে আর অগ্ন্যুৎপাত হওয়ার সম্ভাবনা নেই এজন্যই তাদেরকে মৃত আগ্নেয়গিরি বলে। উদাহরণ — মেক্সিকোর পারকুটিন, চিনের ইউনান প্রদেশের তেনচুং আগ্নেয়গিরি।

৩। ফিসার আগ্নেয়গিরি : ফিসার আগ্নেয়গিরি হতে সা পাত বেশ বিস্ফোরণ ঘটেনা। এই শ্রেণির আগ্নেয়গিরি অন্যান্য আগ্নেয়গিরি হতে স্বতন্ত্র ধরনের। ফিস পর প্রচুর গ্যাস বিতে জ্বালামুখ নেই, ভূ-পৃষ্ঠের দীর্ঘ ফাটল দিয়ে আগ্নেয়গিরি হতে স্বতন্ত্র ধরনের। গিরির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট হচ্ছে যে, এর অগ্ন্যুৎপাতে কোন নির্দিষ্ট স্থান উচু হয় র অনেক ছোট ছোট ব্যাসল্ট স্তূপের সৃষ্টি হয়। বর্তমান বিশ্বের কোন ফিসাক ব্যক্তি ১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দে বিস্থায় নেই তবু এই শ্রেণির আগ্নেয়গিরিকে আবার দুটি শ্রেণিতে ভাগ কবংস হয় তার পূর্ণ বিবরণ এক।

(ক) মৃত ফিসার আগ্নেয়গিরি : এই জাতীয় আগ্নেয়গিরি ভয়ঙ্কর অগ্ন্যুৎপাতগুলোকে বহুকাল পূর্বে প্রচুর পরিমাণ লাভা নির্গত হয়ে এদের অস্তিত্ব গ্যাস উপরে উঠে ফুলকপির ক্ষেত্রে লাভাজাত মালভূমির তলদেশে ভূ-পৃষ্ঠের মূল ফাটলনির্গত হয়।

(খ) সুপ্ত ফিসার আগ্নেয়গিরি : পৃথিবীতে কয়েক জাক (Martinique) দ্বীপে মাউন্ট পিলি জাতের কয়েকটি আগ্নেয়গিরি আবার সদ্য সৃষ্ট। এদের মধ্যে করা হয়েছে। এই শ্রেণির অগ্ন্যুৎপাতের সুপ্ত ফিসার আগ্নেয়গিরির নাম উল্লেখযোগ্য। াগ্নেয়নলে এবং জ্বালামুখে জমাট বেঁধে প্রদান করে। এ করাণে আগ্নেয়গিরি

আগ্নেয়গিরি হতে উৎক্ষিপ্ত পদার্থসমূহ

সাধারণত অগ্ন্যুৎপাতের সময় ধুম, ভস্ম, লাভা, ধূলি গ্যাস ফাটল ও জ্বালামুখ দিয়ে ভূ-পৃষ্ঠে উৎক্ষিপ্ত হয়। এ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা — (১) বায়বীয় (২) তরল ও (হল : র দুর্বল অংশে। পৃথিবীর মানচিত্র লক্ষ

বায়বীয় পদার্থ : অগ্ন্যুৎপাতের সময় জ্বালামুখ অথবার নিকটেই আগ্নেয়গিরিগুলোর বেশির জলীয় বাষ্প ও বিভিন্ন প্রকার গ্যাস তীব্র গতিতে বের হয়রিকার বিস্তৃর্ণ ভংগিল পর্বত অঞ্চলেই

পদার্থের মধ্যে শতকরা হিসেবে ৬০ থেকে ৯০ ভাগই জলীয় বাষ্প। একারণে অগ্ন্যুৎপাতের পর পরই পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বৃষ্টিপাত হয়। অন্যান্য গ্যাসের মধ্যে হাইড্রোজেন (H_2), কার্বন-ডাইঅক্সাইড (CO_2), সালফার-ডাই-অক্সাইড (SO_2), এমোনিয়াম ক্লোরাইড (NH_4Cl) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

তরল পদার্থ : আগ্নেয়গিরি হতে নির্গত পদার্থসমূহের মধ্যে তরল বস্তুগুলোই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ভূমি গঠনে এবং আগ্নেয়গিরির আকৃতি নির্ধারণে এটিই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আগ্নেয়গিরি হতে উৎক্ষিপ্ত তরল পদার্থ বলতে লাভা বুঝায়। এই লাভা দুপ্রকার; যথা — আম্লিক (Acidic) এবং ক্ষারকীয় (Basic)। আম্লিক লাভা অপেক্ষাকৃত ঘন বলে অগ্ন্যুৎপাতের অল্প সময় পরেই জমে যায়। ফলে এটি অধিক দূর প্রসারিত হতে পারে না। একারণে আম্লিক লাভা দ্বারা গঠিত আগ্নেয়গিরি খুব খাড়া বা শংকু আকৃতির হয়। অপরদিকে ক্ষারকীয় লাভা অপেক্ষাকৃত বেশি তরল বলে জমাট বাঁধার পূর্বেই বহুদূর প্রসারিত হতে পারে। ফলে এই লাভা দ্বারা গঠিত আগ্নেয়গিরি চ্যাপ্টা ধরনের হয়। ক্ষারকীয় লাভা বেশি তরল হওয়ার কারণে ভূ-ত্বকে এসে জমাট বাঁধলে তার উপরিভাগ বেশ মসৃণ হয়।

কঠিন পদার্থ : প্রচণ্ড বিস্ফো[illegible] ঘটিয়ে অগ্ন্যুৎপাত হলে তার সাথে প্রচুর পরিমাণে কঠিন আগ্নেয় পদার্থ বেরিয়ে আ[illegible] পদার্থের মধ্যে ভূ-পৃষ্ঠের উপরিস্থিত শিলাখণ্ড, আগ্নেয়গিরি নলের ভিতরে অবস্থি[illegible] কঠিন লাভা এবং ম্যাগমা (বায়ুর সংস্পর্শে শক্ত হয়) প্রভৃতি প্রধান। এদেরকে [illegible]াইরোক্লাস্ট (Pyroclast) বলে। আকৃতিগত দিক দিয়ে এদেরকে আ[illegible] ভাগ করা যায়। তন্মধ্যে বৃহদাকৃতির কোণ-বিশিষ্ট প্রস্তর খণ্ডগুলো[illegible]lcanic Block), গোলাকার খণ্ডগুলোকে আগ্নেয় বোমা (Vol[illegible] স্তরখণ্ডগুলোকে ল্যাপিলি (Lapilli) বা সিন্ডার (Cinder) [illegible]স নির্গত হলে এতে বহু ক্ষুদ্র গর্তের সৃষ্টি হয়ে ঝামা বা [illegible]য়। সবচাইতে ক্ষুদ্র কঠিন আগ্নেয় পদার্থ হচ্ছে আগ্নেয় ধূলি। [illegible] খনিজের ভগ্নাংশ মাত্র।

সকল আগ্নেয়গিরির [illegible] তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ[illegible] [illegible]গিরি। নিচে বিভিন্ন শ্রেণির অ[illegible]

১। (ক) শান্ত সক্রিয় আগ্নেয়[illegible] রয়েছে সেগুলো এই শ্রেণির। মাঝে [illegible] — হাওয়াই দ্বীপের মাওনালোয়া।

(খ) শান্ত মৃত আগ্নেয়গিরি : [illegible] সেগুলোকে শান্ত মৃত আগ্নেয়গিরি ব[illegible]

২। (ক) বিস্ফোরক সক্রিয় আ[illegible] গ্যাসের পরিমাণ, চাপ এবং লাভার প্রকৃতির উপর নির্গত প্রচণ্ড বিস্ফোরণ সহ অগ্ন্যুৎপাত হয়[illegible]য়। অগ্ন্যুৎপাতের প্রকৃতি ও তীব্রতা অনুসারে আগ্নেয়গিরির

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে [illegible]করা যায়। যথা : (১) হাওয়াইয় শ্রেণি (Hwaiian type), বিস্ফোরক সক্রিয় আগ্নেয়গিরিগুলো[illegible] Type), (৩) ভ্যালকোনীয় শ্রেণি (Volcanian type), অবিরাম। [illegible], (৫) প্লিনীয় শ্রেণি (Plinian type) ও (৬) পিলীয় শ্রেণি অগ্ন্যুৎপাতের বর্ণনা দেয়া হল :

১। সক্রিয় (বিস্ফোরক) সবির[illegible] অগ্ন্যুৎপাত মধ্য প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত হাওয়াই দ্বীপের পদার্থ বিস্ফোরিত করে তাদেরকে [illegible] হাওয়াইয় শ্রেণি বলে। এই আগ্নেয়গিরিসমূহের লাভা এত ইতালির বিসুভিয়াস।

তরল যে, প্রবল বাতাসে লাভার অংশবিশেষ সুতার ন্যায় উড়তে থাকে। এরূপ সুতার ন্যায় জমাট লাভাকে 'পিলির কেশ' বলে। উল্লেখযোগ্য যে, 'পিলি হচ্ছে হাওয়াই দ্বীপবাসীদের অগ্নিদেবতা। এই শ্রেণির অগ্ন্যুৎপাতের সময় কোন বিস্ফোরণ ঘটেনা।

২। স্ট্রোম্বলীয় শ্রেণি : ভূমধ্যসাগরে অবস্থিত লিপারি (Lipari) দ্বিপের স্ট্রেম্বলি শ্রেণি বলে। এই শ্রেণির আগ্নেয়গিরিতে মাঝারি ধরনের বিস্ফোরণসহ অগ্ন্যুৎপাত ঘটে। অগ্ন্যুৎপাতের সময় উজ্জ্বল প্রজ্বলিত গ্যাস নির্গত হয় বলে স্ট্রোম্বলিকে ভূমধ্যসাগরের আলোক 'স্তম্ভ' (Light house of the Mediterrinean) বলে।

৩। ভ্যালকোনীয় শ্রেণি : উপরোক্ত লিপারি দ্বীপের নিকট অবস্থিত ভ্যালকেনো (Volcano) আগ্নেয়গিরির নাম হতে এই শ্রেণির এরূপ নামকরণ করা হয়েছে। এদের লাভা বেশ সান্দ্র (Viscous) বলে উৎক্ষিপ্ত হয়ে শীতল বায়ুর সংস্পর্শে দ্রুত জমে যায়। এজন্য অগ্ন্যুৎপাতের সময় প্রস্তর খণ্ড উৎক্ষিপ্ত হতে দেখা যায় এবং অগ্ন্যুৎপাতের পূর্বে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হয়।

৪। ইতালির নেপ্‌পলস্‌-এর নিকট বিখ্যাত বিসুভিয়াস আগ্নেয়গিরিতে এরূপ অগ্ন্যুৎপাত দেখা যায় বলে এর নাম বিসুভীয় শ্রেণি রাখা হয়েছে। এর অগ্ন্যুৎপাত বেশ উগ্র প্রকৃতির, অগ্ন্যুৎপাতের ফলে আগ্নেয়গিরির অভ্যন্তরে সঞ্চিত ম্যাগমা নির্গত হবার পর প্রচুর গ্যাস বের হয় এবং এই গ্যাস ফুলকপির ন্যায় আকার ধারণ করে।

৫। প্লিনীয় শ্রেণি : কথিত আছে যে, প্লিনি নামক জনৈক ব্যক্তি ১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দে বিসুভিয়াসের অগ্ন্যুৎপাতে ইতালির হারকুলেনিয়াম ও পম্পেই যেভাবে ধ্বংস হয় তার পূর্ণ বিবরণ একটি চিঠির মাধ্যমে লিখে গিয়েছিলেন। তখন থেকে বিসুভিয়াসের ন্যায় ভয়ঙ্কর অগ্ন্যুৎপাতগুলোকে প্লিনীয় শ্রেণিভুক্ত করা হয়। এই প্রকারের অগ্ন্যুৎপাতের সময় নির্গত গ্যাস উপরে উঠে ফুলকপির আকার ধারণ করে। তবে অগ্ন্যুৎপাতের সময় লাভা কম পরিমাণে নির্গত হয়।

৬। পিলীয় শ্রেণি : পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের মার্টিনিক (Martinique) দ্বীপে মাউন্ট পিলি নামক আগ্নেয়গিরি অগ্ন্যুৎপাত হতে এই শ্রেণির নামকরণ করা হয়েছে। এই শ্রেণির অগ্ন্যুৎপাতের প্রচণ্ডতা সবচেয়ে বেশি। ইহার ম্যাগমা অতি সান্দ্র বলে আগ্নেয়নলে এবং জ্বালামুখে জমাট বেঁধে থাকে এবং ভূ-অভ্যন্তরস্থ গ্যাসকে উপরে উঠতে বাধা প্রদান করে। এ করাণে আগ্নেয়গিরি পার্শ্বদেশ দিয়ে প্রায় সমান্তরালভাবে কালো গ্যাস বের হয়।

পৃথিবীর প্রধান আগ্নেয়গিরি অঞ্চল

পৃথিবীর বেশিরভাগ আগ্নেয়গিরি সৃষ্টি হয়েছে ভূ-পৃষ্ঠের দুর্বল অংশে। পৃথিবীর মানচিত্র লক্ষ করলে দেখা যায় যে, কয়েকটি মহাদেশের বিভিন্ন উপকূলের নিকটেই আগ্নেয়গিরিগুলোর বেশির ভাগ শ্রেণিবদ্ধভাবে বিস্তৃত হয়েছে। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার বিস্তৃর্ণ ভংগিল পর্বত অঞ্চলেই

অধিক সংখ্যক আগ্নেয়গিরি দেখা যায়। এছাড়া এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব অংশ এবং অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব দিকে ভংগিল পর্বত শ্রেণি থেকে আগ্নেয়গিরির দুরত্ব খুব বেশি নয়। সাধারণত আগ্নেয়গিরির দুটি প্রধান শ্রেণি নিম্নরূপ। যথা —

প্রথম শ্রেণি : দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ সীমার হর্ন অন্তরীপ থেকে ঐ মহাদেশের পশ্চিম উপকূল ও পরে উত্তর আমেরিকার পশ্চিম উপকূল দিয়ে বরাবর উত্তর দিকে আলাস্কা পর্যন্ত এই শ্রেণি বিস্তৃত। সেখান থেকে আবার এই শ্রেণি অ্যালিউসিয়ান দ্বীপপুঞ্জ হয়ে পশ্চিম দিকে এশিয়ার পূর্বদিকে অবস্থিত জাপান পর্যন্ত পৌছেছে। তারপর এশিয়ার পূর্বদিকের দ্বীপ অঞ্চলের মধ্য দিয়ে বহুদূর পর্যন্ত দক্ষিণে বিস্তৃত হয়েছে। এই শ্রেণির শাখা-প্রশাখা ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরের বিভিন্ন অংশে বিস্তৃত হয়েছে। এই আগ্নেয় পর্বত শ্রেণি সাধারণত প্রশান্ত মহাসাগরকে ঘিরে রয়েছে বলেই একে প্রশান্ত মহাসাগরের আগ্নেয় মেখলা (Fiery ring of the paci) বলে।

দ্বিতীয় শ্রেণি : ইউরোপের উত্তর-পশ্চিম দিকের আইসল্যান্ড দ্বীপ হতে দক্ষিণ দিকে বহুদূর এসে আটলান্টিক মহাসাগরের পূর্ব অংশের এর্জোস, কের্পভার্ত প্রভৃতি দ্বীপ ঘুরে দক্ষিণ-পশ্চিমে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত গিয়েছে। এর একটি শাখা ভূ-মধ্যসাগরের মধ্যে দিয়ে পূর্ব দিকে গিয়েছে ও পরে আফ্রিকার পূর্বাংশে বিস্তৃত হয়ে দক্ষিণ দিকে গিয়েছে।

উপরোল্লিখিত আগ্নেয়গিরি শ্রেণি ব্যতীত পূর্ব আফ্রিকার গ্রস্ত উপত্যকার এবং পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের নারকোন দ্বীপে দুটি সুপ্ত বা মৃত আগ্নেয়গিরি রয়েছে।

অগ্ন্যুৎপাতের ফলাফল (Effects of the volcanic Eupion)

আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের সুফল এবং কুফল উভয়ই আছে। আগ্নেয়গিরির বিভিন্ন ফলাফলের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হল :

প্রথমত : আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে ভূপৃষ্ঠের অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়। পরিবর্তিতরূপে ভূ-পৃষ্ঠে যেসব ভূমি সৃষ্টি হয় তা হল :

১। **আগ্নেয় দ্বীপ :** পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সমুদ্রের তলদেশে বহু আগ্নেয়গিরি আছ। এই সব আগ্নেয়গিরির বিপুল পরিমাণ লাভা উৎক্ষিপ্ত হয়ে জমাট বেঁধে যে দ্বীপের সৃষ্টি করে তাকে আগ্নেয় দ্বীপ বলে। প্রশান্ত মহাসাগরের হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ এইভাবে উদ্ভব হয়েছে। সম্ভবত এটিই পৃথিবীর বৃহত্তম আগ্নেয় দ্বীপ।

২। **আগ্নেয় গহ্বর :** অনেক সময় আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে ভূ-পৃষ্ঠের বহু জায়গা ধসে গিয়ে বিরাট গহ্বরের সৃষ্টি করে। জানা গেছে, ১৮৮৩ সালে জাভা এবং সুমাত্রা দ্বীপের মধ্যবর্তী একটি দ্বীপে ক্রাকাতোয়া আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে মাত্র চব্বিশ ঘন্টায় দ্বীপের অর্ধাংশ উৎক্ষিপ্ত ও বিলুপ্ত হয় আর অপর অর্ধাংশে এক বিরাট আগ্নেয় গহ্বর দেখা দেয়।

৩। আগ্নেয় হ্রদ : সাধারণত মৃত আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখে বিপুল পরিমাণ বৃষ্টির পানি জমে হ্রদের সৃষ্টি করে। এভাবে সৃষ্ট আলাস্কার মাউন্ট কাটমাই হ্রদের নাম উল্লেখযোগ্য।

৪। আগ্নেয় পর্বত : জীবন্ত আগ্নেয়গিরি হতে উৎক্ষিপ্ত লাভা, শিলাজাত দ্রব্যাদি বহুকাল যাবত একই স্থানে সঞ্চিত হয়ে যে পর্বতের সৃষ্টি হয় তাকেই আগ্নেয় পর্বত বলে। ইতালির বিসুভিয়াস এই শ্রেণির পর্বত।

৫। আগ্নেয় মালভূমি : আগ্নেয়গিরি হতে উৎক্ষিপ্ত পদার্থগুলো তার চারদিকে বহুদূর বিস্তৃত হয়ে যে উচ্চভূমির সৃষ্টি করে তাকে আগ্নেয় মালভূমি বলে।

৬। আগ্নেয় সমভূমি : অনেক ক্ষেত্রে আগ্নেয়গিরির লাভা সঞ্চিত হয়ে পর্বতের পাদদেশে ব্যাপক এলাকায় যে নিচু সমভূমির সৃষ্টি করে তাকে আগ্নেয় সমভূমি বলে।

দ্বিতীয়ত : আগ্নেয়গিরির সুফল

১। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে সৃষ্ট ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। যেমন — দাক্ষিণাত্যের কালোমাটি তুলা চাষের জন্য বিশেষ উপযুক্ত।

২। অগ্ন্যুৎপাতের ফলে অনেক বন্ধুর জায়গা সমতল ভূমিতে পরিণত হয়। এছাড়া অগ্ন্যুৎপাতের ফলে ভূ-পৃষ্ঠের লাভা সঞ্চিত হয়ে মালভূমির সৃষ্টি করে।

৩। অগ্ন্যুৎপাতের কারণে ভূ-অভ্যন্তরের অনেক মূল্যবান খনিজ পদার্থ পৃথিবীর উপরিভাগে উঠে আসে।

৪। সমুদ্রগর্ভে অবস্থিত আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে সমুদ্রগর্ভে লাভা জমে নতুন নতুন দ্বীপ সৃষ্টি করে। হাওয়াই দ্বীপ এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

৫। অনেকের মতে, পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের আগ্নেয় গ্যাস হতে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যুৎ শক্তি ও নানারকম রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রস্তুত করা সম্ভব।

তৃতীয়ত : আগ্নেয়গিরির কুফল

১। আগ্নেয়গিরি হতে হঠাৎ অগ্ন্যুৎপাত হলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভূমিকম্প হয়।

২। আগ্নেয়গিরি হতে নির্গত লাভা প্রচণ্ড বেগে উপরে উঠে চারদিকে ছড়িয়ে পরে। ফলে আশেপাশের গ্রাম, শহর, জনপদ প্রভৃতি ধ্বংস হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ১৯৭৯ সালে হারকুলেনিয়াম এবং পম্পেই নামক দুটি নগর ইতালির বিসুভিয়াস আগ্নেয়গিরির লাভার নিচে ডুবে গিয়েছে।

৩। আগ্নেয়গিরির প্রভাবে অনেক উষ্ণ প্রস্রবন ও গেইসারের সৃষ্টি হয়।

৪। আগ্নেয়গিরির কারণে ভূ-পৃষ্ঠে বহু ফাটল এবং বিরাটাকারের গহ্বর সৃষ্টি হয়। অপর অনেক স্থান পর্বতের ন্যায় উচু হয়, যা মানুষের স্বাভাবিক বসবাসের জন্য প্রতিকূল হয়

৩.১৯ : বায়ুমণ্ডল ও এর বিবরণ

ভূমিকা : ভূ-পৃষ্ঠে একটি আবরণ দ্বারা বেষ্টিত। এই আবরণটি হলো বায়বীয় আবরণ। ভূ-পৃষ্ঠ হতে উর্ধ্ব যে গ্যাসীয় আবরণ পৃথিবীকে বেষ্টন করে আছে তাকেই বায়ুমণ্ডল বলে। এটি পৃথিবীর মাধ্যকর্ষণ শক্তির আকর্ষণের বলে (Gravitational attraction) পৃথিবীর গায়ে লেগে থাকে এবং পৃথিবীর আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আবর্তন করতে থাকে। বায়ুমণ্ডলে অনেক গ্যাস মিশ্রিত অবস্থায় বিরাজ করে। সমুদ্র পৃষ্ঠ হতে তা ক্রমশ উপরের দিকে হালকা হয়ে গিয়েছে। বায়ুমণ্ডলের শতকরা ৯৭ ভাগ পদার্থই ভূ পৃষ্ঠ হতে ২৯ কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থান করলেও বায়ুমণ্ডলের উর্ধ্বসীমা সুদুর প্রসারী। বৈজ্ঞানিকগণ বায়ুমণ্ডলের এই উর্ধ্বসীমাকে ১০,০০০ কিলোমিটার পর্যন্ত ধরে থাকেন।

বায়ুমণ্ডলের গঠন : বায়ুমণ্ডলের উচ্চতা অনুসারে সাধারণত হোমোস্ফিয়ার ও হেটেরস্ফিয়ার এ দুভাগে ভাগ করা হয়। এই দুটি ভাগকে আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপভাগে ভাগ করা হয়েছে। বায়ুমণ্ডলের এরূপ এক একটি ক্ষুদ্র ভাগের মধ্যেও বায়ুর উপাদানগুলোর বিভিন্ন প্রকৃতিক ও রাসায়নিক ধর্ম (Different Physical an Chemical Propoerties) লক্ষ্য করা যায়। উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বায়ুমণ্ডলের উপাদান যে প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক পরিবর্তন, বিশেষত বায়ুর ঘনত্ব (Density) চাপ (Pressure) ও তাপের (emperature) পরিবর্তন ঘটে, সেই অনুসারে বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন গঠন লক্ষ্য করা যায়।

বায়ুমণ্ডলের ঘনত্ব ও চাপ (Density and Pressure of Atmospher) : পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সকল বস্তুকেই এমনকি বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন গ্যাসের অণুগুলোকেও (Molecules) পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করে। ভূ-পৃষ্ঠের নিকটস্থ বায়ুস্তরের ঘনত্ব ও চাপ সর্বাপেক্ষা অধিক হয়, কারণ তার উপরে অবস্থিত.বায়ুস্তরের পরিমাণ সর্বাপেক্ষা অধিক হয়। পৃথিবীর বায়ুস্তরের $\frac{৩}{৪}$ ভাগই থাকে ভূ-পৃষ্ঠ হতে ১০ কিলোমিটারের মধ্যে। বায়ুর এই চাপ ও ঘনত্ব ভূ-পৃষ্ঠ হতে যতই উপরে যাওয়া যায় ততই কমতে থাকে। বায়ুস্তর সেই ভূমিভাগের উপর চাপ দিচ্ছে। যখন এই চাপ কোন নির্দিষ্ট আয়তনের উপর মাপা হয়, তখন তাকে বায়ুমণ্ডলের চাপ বলা হয়।

বায়ুর ঘনত্ব : বায়ুমণ্ডলের গ্যাসে যে পরিমাণ অণু কোন নির্দিষ্ট ঘনমান বা আয়তনকে অধিকার করে থাকে তাকেই বায়ুমণ্ডলের ঘনত্ব বলে। কিন্তু বায়ুমণ্ডল যেহেতু বিভিন্ন গ্যাসের সংমিশ্রণে গঠিত, সেই কারণে একে আরও সহজভাবে বলা যায় যে, "কোন নির্দিষ্ট ঘনফল বা আয়তনে বাতাসের মোট যে পরিমাণ ভর থাকে, তাই হলো বায়ুর ঘনত্ব।" বাতাসের ভর গ্রামে এবং ঘনমান ঘন মিটারে প্রকাশ করা হয়। সমুদ্র পৃষ্ঠে বাতাসের ঘনত্ব প্রতি ঘনমিটারে ১,২০০ গ্রাম অথবা প্রতি ঘনগজে ২ $\frac{৩}{৪}$ পাউন্ড (প্রায়)। ভূ-পৃষ্ঠ হতে ৫ $\frac{১}{২}$ কিলোমিটার উচ্চতায় বায়ুর

ঘনত্ব সমুদ্র পৃষ্ঠের ঘনত্বের প্রায় অর্ধেক কমে যায় এবং ১৯ কিলোমিটার উচ্চতায় এটি সমুদ্র পৃষ্ঠের ঘনত্বের মাত্র $\frac{১}{১৩}$ ভাগ হয়।

উর্ধ্বাকাশে ভূ-পৃষ্ঠ হতে ৬৫-১৪৫ কিলোমিটার উচ্চতায় বাতাসের ঘনত্ব উল্কার (Meteers উজ্জ্বলতা ও গতি (Speed) পরিবর্তনের দ্বারা মাপা হয়। এই অংশে বাতাসের পরিমাণ খুব কম থাকলেও তা উল্কাগুলোকে ঘর্ষণজনিত বাধা দিয়ে উত্তাপ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। এবং তার ফলে উল্কা অনেক সময় সম্পূর্ণরূপে বাষ্পীভূত হয়ে যায়। দেখা গিয়েছে যে, ১৭০ কিলোমিটার উচ্চতায় বাতাসের ঘনত্ব প্রতি ঘনমিটারে মাত্র $\frac{১}{১০,০০,০০০}$ গ্রাম থাকে।

বায়ুর চাপ : আবহাওয়ার একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক উপাদান হল বায়ুর চাপ। তা প্রতিটি আবহাওয়া অফিসে ব্যারোমিটার যন্ত্রের সাহায্যে মাপা হয়। সমুদ্র পৃষ্ঠে বায়ুর চাপের গড় প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে ১৪.৭ পাউন্ড অথবা প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে ১ কিলোগ্রাম। ভূ-পৃষ্ঠ হতে যতই উর্ধ্বে যাওয়া যায় বায়ুর চাপ ততই কমতে থাকে। সমুদ্র পৃষ্ঠের চাপকে যদি শতকরা ১০০ ধরা হয় তা হলে দেখা যায় যে, ১৮ কিলোমিটারের উর্ধ্বে বায়ুর চাপ শতকরা ১০ ভাগে নেমে গিয়েছে। এবং ৩২ কিলোমিটারের উর্ধ্বে বায়ুর চাপ শতকরা মাত্র ১ ভাগে নেমে যায়। সুতরাং বায়ুমণ্ডলের শতকরা ৯৯ ভাগ ভর ৩২ কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থান করে। ১১২ কিলোমিটার উচ্চতায় বায়ুর চাপ সমুদ্র পৃষ্ঠের বায়ুচাপের মাত্র $\frac{১}{১,০০,০০০}$ ভাগ হয়। মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, প্রতি ৯৫০ ফুট উর্ধ্বে বায়ুর চাপ তার প্রায় $\frac{১}{৩০}$ ভাগ হারে কমতে পারে।

পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বত শিখর হিমালয়ের মাউন্ট এভারেস্ট অঞ্চলে ২৯,০০০ ফুট উচ্চতায় বায়ুর চাপ সমুদ্র পৃষ্ঠের বায়ুচাপের $\frac{১}{৩}$ ভাগ। এই অঞ্চলে ব্যারোমিটারের পারদ স্তম্ভ মাত্র ১০ ইঞ্চি বা ২৫ সে.মি. বাতাস দাঁড়িয়ে থাকে। বায়ুর এত কম চাপে বাতাস হতে অক্সিজেন গ্রহণ করতে পর্বতারোহীদের কষ্ট হয় বলে তাঁদের পৃথকভাবে অক্সিজেন সঙ্গে বহন করতে হয়। প্রায় ১৩ কিলোমিটারের উর্ধ্বে বায়ুর চাপ এত কমে যায় যে, মানব দেহের ফুসফুস বায়ুমণ্ডল হতে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন গ্রহণ করতে পারেন। সর্বাধিক অসুবিধা ঘটে ১৮ কিলোমিটার উচ্চতায় উঠলে, সেখানে মানবদেহের রক্তদেহের স্বাভাবিক উত্তাপেই অর্থাৎ ৩৭° সে. তাপমাত্রায় ফুটতে থাকে।

বর্তমানে জেট বিমানগুলো চাপ নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় সাধারণত ৮০,০০০ হতে ৯০,০০০ ফুট উচ্চতার মধ্যে যাতায়াত করে থাকে। এই অংশে বায়ুর চাপ এক ইঞ্চিরও কম থাকে। এই উচ্চতায় বায়ুর ঘনত্ব এত কম থাকে যে, অক্সিজেন বিমানের জ্বালানী জ্বালাতে সক্ষম হয় না ফলে এই উচ্চতায় বিমান চালান সম্ভব হয় না। এছাড়া বিমানটিকে উপর দিকে তুলবার শক্তিও বায়ুর কমে যায়।

বর্তমান যুগে পর্যায়ক্রমে রকেট চালিত মহাকাশযানে বায়ুমণ্ডল ভেদ করে মানুষ চন্দ্রে অবতরণ করে। রকেট চালিত মহাকাশযান চালাতে দহনক্রিয়ার জন্য পৃথকভাবে অক্সিজেন লওয়া হয়। যা জেট ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। এর ফলে খুব অল্প বায়ুচাপেও রকেট ইঞ্জিনে জ্বালানী সমস্যা দেখা যায় না। এই মহাকাশযান সমগ্র বায়ুমণ্ডল ভেদ করে যাতায়াত করায় এবং মহাকাশে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রসহ কতকগুলো আবহ উপগ্রহ (Weather Satellites) স্থাপন করে তার মাধ্যমে বায়ুমণ্ডলের বহু তথ্য সংগৃহীত হওয়ায়, বায়ুমণ্ডল সম্বন্ধে আমাদের চিন্তাধারার এক নতুন দিগন্ত খুলে গিয়েছে।

অন্যান্য পদার্থের মতো বায়ুর ওজন আছে, ফলে বায়ুমণ্ডল চারপাশে বলয় চাপ দেয় কিন্তু এ চাপ বছরের সব সময় সর্বত্র এক রকম হয় না। বিভিন্ন কারণে বায়ু চাপের তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। কারণগুলো নিম্নরূপ :

(১) বায়ুতে জলীয় বাষ্পের তারতম্য

(২) বায়ুর উষ্ণতার তারতম্য।

(৩) ভূ-পৃষ্ঠের উচ্চতা।

বায়ুতে জলীয় বাষ্পের তারতম্য : আমরা জানি জলীয় বাষ্প বিশুদ্ধ বায়ু অপেক্ষা হালকা। এ কারণে জলীয় বাষ্পপূর্ণ আদ্র বায়ুর চাপও কম। অপরদিকে শুষ্ক বায়ু ভারী বলে শুষ্ক বায়ু কর্তৃক চাপমান যন্ত্রে বর্ষাকালে বায়ুচাপ কম এবং শীতকালে বায়ুচাপ বেশি দেখা যায়।

বায়ুর উষ্ণতার তারতম্য : আমরা জানি, বায়ু উত্তপ্ত হলে আয়তনে বাড়ে এবং ঘনত্ব ও ওজন কমে। অপরদিকে বায়ুর তাপ হ্রাস পেলে আয়তনে কমে, ঘনত্বে এবং ওজনে বেড়ে যায়। এসব কারণে তাপমাত্রার বৃদ্ধির কারণে উত্তাপিত হালকা বায়ু কম চাপ দেয়। পক্ষান্তরে তাপমাত্রা হ্রাসের জন্য শীতলাকৃত ভারী বায়ু বেশি চাপ প্রদান করে। অতএব, দেখা যায় বায়ুর উষ্ণতার তারতম্য বায়ুমণ্ডলের চাপের তারতম্যের একটি অন্যতম কারণ।

ভূ-পৃষ্ঠের উচ্চতা : আমরা জানি সমুদ্র পৃষ্ঠ হতে যতই উর্ধ্বে উঠা যায় বায়ুস্তরের গভীরতা ও ওজন ততই কমতে থাকে। সে কারণে উচ্চে বায়ুচাপ কম এবং নিম্নে বায়ুচাপ বেশি পরিলক্ষিত হতে দেখা যায়। বাস্তব ক্ষেত্রে ব্যারোমিটার ব্যবহার করে আমরা দেখতে পাই বায়ুর চাপের অবস্থা। এতে সঠিক ভাবে দেখা গেলে দেখা যায় যে, সমুদ্র পৃষ্ঠে বেশি রিডিং এবং পর্বত চূড়ায় কম রিডিং দেয়। এই পরিমাপের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি বা বায়ুমণ্ডলের উচ্চতার তারতম্যের জন্য চাপের তারতম্য ঘটে।

উর্ধ্বাকাশে বায়ুর তাপ (Vertiacal Distribution of Air Temperature) : আমরা জানি যে, উচ্চ পর্বতে আরোহন করলে অথবা বিমানে উর্ধ্বাকাশে উঠলে উত্তাপ কমতে থাকে। এই উত্তাপ সাধারণ ভাবে প্রতি কিলোমটারে ৬.৪° সেন্টিগ্রেড হারে হ্রাস পেতে থাকে। একেই উত্তাপ হ্রাস পাবার গড় বলা হয়। ভূ-পৃষ্ঠ হতে ১০-১৩ কিলোমিটার উচ্চতায় বায়ুর তাপ এই হারে হ্রাস পেয়ে থাকে।

বায়ুমণ্ডলের নিম্নের স্তরে যেখানে উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে গড়ে প্রতি কিলোমিটারে ৬.৪ সেন্টিগ্রেড অথবা প্রতি ১০০০ ফুট উচ্চতায় $৩\frac{১^{\circ}}{২}$ ফা. এই হারে উত্তাপ হ্রাস পায়। তাকে স্ট্রটোস্ফিয়ার বলে। মধ্যঅক্ষাংশে ট্রপেস্ফিয়ারের উর্ধ্ব সীমানায় উত্তাপ প্রায় ৭০° হতে ৭৫° ফা. বা ৫৭° হতে ৬০° সে. হয়। ট্রপেস্ফিয়ারের উর্ধ্বে যে বায়ুস্তর আছে তাকে স্ট্রটোস্ফিয়ার বলে এই দুটি স্তরের সীমানাকে ট্রপোপস্ বলা হয়। ট্রপোস্ফিয়ার নিরক্ষীয় অঞ্চলে ১৩ কিলোমিটারের কিছু উর্ধ্বে, ৫০° অক্ষকাংশে ৯ কিলোমিটার এবং মেরুপ্রদেশে প্রায় ৬.৪ কিলোমিটার উর্ধ্বে অবস্থান করে। এই ট্রপোস্ফিয়ারেই বায়ুমণ্ডলের অধিকাংশ জলীয় বাষ্প থাকে, অর্থাৎ এই স্তরেই সমস্ত মেঘ ও ঝড় এড়াতে স্ট্রাটোস্ফিয়ারের মধ্য দিয়ে প্রায় ৮০,০০০–৯০,০০০ ফুট উচ্চতায় যাতায়াত করে।

স্ট্রাটোস্ফিয়ারের মধ্যে যতই উর্ধ্বে যাওয়া যায় তত উত্তাপ ক্রমশ বাড়তে থাকে এবং ৫০ কিলোমিটার উচ্চতায় উত্তাপ সর্বোচ্চ অর্থাৎ ৩২° ফা. হয়।

স্ট্রাটোস্ফিয়ারের উর্ধ্বে বায়ুর উত্তাপ পুনরায় ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। এই স্তরকে মেসোস্ফিয়ার বলে। মেসোস্ফিয়ারের উর্ধ্বে ভূ-পৃষ্ঠে হতে ৮৫ কিলোমিটার উচ্চতায় বায়ুর উষ্ণতা সর্বনিম্ন অর্থাৎ ১২০° ফা. বা ৮৩° সে. হয়। এভাবে দেখা যায় ২০০ কিলোমিটার উচ্চতায় তা ৭০০° সে. পর্যন্ত হয়। আরও ১৬০ কিলোমিটার উচ্চতায় উত্তাপ বৃদ্ধির হার কমে যায়।

বায়ুমণ্ডলে বিভিন্ন স্থানে বায়ুর তাপের তারতম্য কতকগুলো কারণের উপর নির্ভর করে। এগুলো নিম্নরূপ —

(১) সূর্যরশ্মির তীর্যক পতন : ভূ-পৃষ্ঠের উপর সূর্য কিরণ সমভাবে পতিত হয় না। কোন স্থানে সূর্য কিরণ লম্বভাবে পড়লে অন্যান্য স্থানে তীর্যকভাবে পতিত হয়। সূর্য কিরণ লম্বভাবে পড়তে তা অল্প স্থানে জুড়ে পড়ে এবং তীর্যকভাবে পড়লে তা অনেক স্থান জুড়ে বিস্তৃত হয়। একারণে সূর্য কিরণ লম্বভাবে পতিত হলে ভূ-পৃষ্ঠ অধিক তাপ গ্রহণ করতে পারে। এবং তীর্যকভাবে পড়লে ভূ-পৃষ্ঠ সৌর কিরণ দ্বারা উত্তপ্ত হলে তা বায়ুমণ্ডলকে উত্তপ্ত করে। তাই পৃথিবীর যে স্থানে লম্বভাবে কিরণ পড়ে সে স্থানের ভূ-পৃষ্ঠের সাথে বায়ুমণ্ডলও অধিকতর উত্তপ্ত হয় এবং তীর্যক স্থানে পড়লে সে স্থানের ভূ-পৃষ্ঠের সাথে বায়ুমণ্ডলও কম উত্তপ্ত হয়। এভাবে ভূ-পৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থানে তাপের তারতম্য পরিলক্ষিত হয়।

(২) বায়ুমণ্ডলের গভীরতা : বায়ুস্তর যত গভীর ও ঘন হয় তাতে বেশি পরিমাণে ধূলিকণা ও জলীয় বাষ্প থাকে। তাই এসব পদার্থ যত বেশি সূর্যকিরণ গ্রহণ করে তত বেশি উত্তপ্ত হয়। এভাবে বলা যায় বায়ুমণ্ডলের গভীরতার উপর তাপের তারতম্য লক্ষ্য করা যায়।

(৩) উচ্চতা : ভূ-পৃষ্ঠ হতে যত উপরে উঠা যায় ততই বায়ু পাতলা ও পরিষ্কার হতে থাকে। পাতলা ও পরিষ্কার বায়ুর তাপ ধারণ ক্ষমতা কম। ফলে একই অক্ষাংশে অবস্থিত হলেও উচ্চতা অনুসারে তাপের তারতম্য হয়।

(৪) দিবা ভাগের দৈর্ঘ্য : পৃথিবীর সর্বত্র দিবা–রাত্রি সমান নয়। কোন স্থানে দিন বড় হলে ভূ-পৃষ্ঠ অধিক উত্তপ্ত হয়। কিন্তু দিনের তুলনায় রাত্রি বড় হলে এর বিপরীত অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। পৃথিবীর সর্বত্র দিবা–রাত্র সমান হয় বলে ভূ-পৃষ্ঠে তাপের তারতম্য দেখা দেয়। আবার ভূ-পৃষ্ঠ তাপিত হওয়ার সাথে বায়ুমণ্ডল তাপিত হওয়ার যোগসূত্র আছে বলে ভূ-পৃষ্ঠের তাপের তারতম্যের জন্য বায়ুমণ্ডলের তারতম্য ঘটে।

(৫) জলীয় বাষ্পের পরিমাণ : কোন স্থানের বায়ুতে জলীয় বাষ্প বেশি থাকলে ঐ স্থানের তাপ প্রখর হতে পারে না। কারণ জলীয় বাষ্প সূর্যকিরণ হতে কিছুটা তাপ শোষণ করে আবার জলীয় বাষ্প সে স্থানের তাপ ধরে রাখে বলে রাতে সে স্থান বেশি শীতল হতে পারে না, সে কারণে সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলের বায়ুতে অধিক জলীয় বাষ্প থাকার দরুণ দিনের উষ্ণতার তীব্রতা কম থাকে আবার রাতে শীত ও প্রচণ্ড হতে পারে না, অপর দিকে মরু অঞ্চলের বায়ুতে জলীয় বাষ্প কম থাকার জন্য সেখানে দিনের বেলাতে প্রখর তাপ এবং রাতে প্রবল শীত অনুভূত হয়।

(৬) সুপ্ততাপের ত্যাগের পরিমাণ : জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয়ে জলবায়ু পরিণত হওয়ার প্রাক্কালে কিছু সুপ্ত তাপ বায়ুমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে বায়ুর উত্তাপ বেড়ে যায়।

(৭) বায়ুপ্রবাহ : বায়ুপ্রবাহ বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতার তারতম্য ঘটায়। উষ্ণমণ্ডল হতে প্রবাহিত বায়ু উষ্ণ হয়। আবার শীতল অঞ্চল হতে প্রবাহিত বায়ু শীতল হয়। তাই কোন স্থানের উপর দিয়ে শীতল বায়ু প্রবাহিত হলে সে স্থানের বায়ুর তাপ দ্রুত কমে যায়।

(৮) সমুদ্র স্রোত : কোন কোন অঞ্চলের বায়ুর তাপ সমুদ্র স্রোতের উপর নির্ভরশীল। নিম্ন অক্ষাংশের সমুদ্র স্রোত হতে প্রবাহিত উষ্ণ উচ্চ অক্ষাংশে অবহিত স্থানে প্রবাহিত হলে ঐ স্থানের উপকূল ও তথাকার বায়ু উত্তপ্ত হয়। আবার উচ্চ অক্ষাংশের সমুদ্র হতে প্রবাহিত শীতল স্রোত দ্বারা নিম্ন অক্ষাংশের স্থানগুলোর বায়ু শীতল হয়।

বায়ুমণ্ডলের উপাদান : বায়ু বিভিন্ন উপাদানের তৈরি। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে বায়ুমণ্ডলের প্রধান দুটি স্তর হল হোমোস্ফিয়ার এবং হেটেরোস্ফিয়ার। নিম্নে এই দুই স্তর যে সকল উপাদান দিয়ে গঠিত তাদের বিষয় আলোচনা করা হলো।

হোমোস্ফিয়ার : হোমোস্ফিয়ার প্রধানত কতগুলো গ্যাসের সংমিশ্রণে গঠিত, (১) শুষ্ক বিশুদ্ধ বাতাস, (২) জলীয় বাষ্প এবং (৩) ধূলিকণা নিয়ে গঠিত। মেঘ এবং কুজ্ঝটিকা বায়ুস্তরের নিম্ন অংশে পৃথিবীব্যাপি ভেসে বেড়ায়।

বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন গ্যাসের মধ্যে নাইট্রোজেনের প্রাধান্যই সর্বাধিক (৭৮.০২% ভাগ) এবং এর পরই অক্সিজেনের (২০.৭১%) ভাগ) স্থান। নাইট্রোজেন একটি নিষ্ক্রিয় গ্যাস। কোন কোন ব্যাক্টেরিয়া বাতাস হতে নাইট্রোজেন উৎপন্ন করে এবং নাইট্রোজেন যৌগ উদ্ভিদমণ্ডলীর বিশেষ কাজে লাগে সহজেই রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় মিশ্রিত হয়ে শিলার আবহিক বিকারে সহায়তা করে। অক্সিজেন ধাতুতে, বিশেষত লৌহে সহজেই মরিচা ধরতে এবং অংগার জ্বালাতে ও জীবজন্তুর মধ্যে শক্তি ও উত্তাপ বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এত বেশি অংশগ্রহণ

করলেও, বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের পরিমাণ প্রায় একই থাকে। কারণ যে পরিমাণ অক্সিজেন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ব্যয়িত হয়, প্রায় সেই পরিমাণ অক্সিজেন উদ্ভিদ মণ্ডলীর মাধ্যমে বায়ুমণ্ডলে ফিরে আসে।

বায়ুমণ্ডলের শতকরা ৯৮.৭৩ ভাগই অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন। বাকী শতকরা ১.২৭ ভাগ আরও ৯টি গ্যাস, যার মধ্যে আবার আর্গন নামক গ্যাস শতকরা $\frac{৮}{১০}$ ভাগ বা ০.৮% ভাগ দখল করে আছে। আর্গন এবং অন্যান্য গ্যাসের মধ্যে নিওন, হিলিয়াম, ক্রিপটন এবং জেনন নিষ্ক্রিয় গ্যাসরূপে পরিচিত। এরা বায়ুমণ্ডল, পৃথিবী অথবা সমুদ্রের অন্যান্য উপাদানের সহিত সরাসরি রাসায়নিক ক্রিয়ায় মিলিত হয় না।

বাতাসে কার্বনডাইঅক্সাইডের পরিমাণ অতি সামান্য (.০৩% ভাগ) হলেও এটি পৃথিবীতে জীবন ধারণ করতে এবং জলবায়ু নিয়ন্ত্রণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। কার্বনডাইঅক্সাইড তাপ শোষণ করে লয় এবং তা উত্তাপ পরিবহণ না করায় ভূ-পৃষ্ঠের নিকট বাতাসের উত্তাপকে নিয়ন্ত্রণ করে। কার্বনডাইঅক্সাইড উদ্ভিদ মণ্ডলীর বৃদ্ধির জন্য একান্ত প্রয়োজন। মানুষের দৈনন্দিন জীবনে কয়লা, কাঠ, খনিজতৈল প্রভৃতি জ্বালানীর ব্যবহার ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ায় বাতাসে কার্বনডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দে যে পরিমাণ কার্বনডাইঅক্সাইড বাতাসে ছিল, তা অপেক্ষা বর্তমানে ১০ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে ভূ-পৃষ্ঠের বিভিন্ন অঞ্চলে এর তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন, মেরু সাগর অঞ্চলের বাতাসে কার্বন-ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ অন্যান্য অঞ্চলের গড় অপেক্ষা প্রায় অর্ধেক থাকে।

বাতাসে যে সকল গ্যাসের পরিমাণ স্থির থাকে, অর্থাৎ মোট গ্যাসের পরিমাণের পরিবর্তন বিশেষ হয় না, তাদের মধ্যে সামান্য পরিমাণে স্থান বিশেষে পরিবর্তিত হয়। এই সকল গ্যাসের মধ্যে ওজন এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এটি বায়ুমণ্ডলের নিম্নস্তরে অল্প পরিমাণে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু বায়ুমণ্ডলের উচ্চস্তরে প্রচুর পরিমাণে থাকে। এটি ব্যতীত বহু শহরের কলকারখানা প্রভৃতি হতে নির্গত সালফারডাইঅক্সাইড, নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড ও অ্যামোনিয়া বাতাসের নিম্নস্তরে ভেসে বেড়ায়।

বায়ুমণ্ডলে বিভিন্ন গ্যাস ব্যতীত দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য উপাদান হল জলীয় বাষ্প। এর অণুগুলো নাইট্রোজেন বা অক্সিজেন গ্যাসের অণুগুলোর মতই বাতাসেও ঘুরে বেড়ায়। বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ ঋতু অনুসারে এবং অঞ্চল ভেদে কম বেশি হয়ে থাকে। এই জলীয় বাষ্প হতেই বিভিন্ন মেঘ ও বৃষ্টির সৃষ্টি হয়। বায়ুমণ্ডলের নিম্নস্তরে অতি সূক্ষ্ম ধূলিকণা যথেষ্ট পরিমাণে ভেসে বেড়ায়। এই সকল ধূলিকণা বাতাসে ও ধূলিঝড়ে, বিশেষত শুষ্ক মরু-অঞ্চল ও পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চল হতে বায়ুমণ্ডল এসে থাকে। জলীয় বাষ্প এই ধূলিকণাকে আশ্রয় করেই মেঘ, বৃষ্টি, কুয়াশা প্রভৃতির সৃষ্টি করে থাকে। বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্প ও ধূলিকণা যেহেতু ভূ-পৃষ্ঠে হতেই ভেসে এসে থাকে। সে হেতু এদের পরিমাণ ভূ-পৃষ্ঠ হতে ঊর্ধ্বে যতদূর যাওয়া যায়, ততই কমতে থাকে।

হেটোরোস্ফিয়ার : হোমোস্ফিয়ারের উর্ধ্বে অর্থাৎ ভূ-পৃষ্ঠ হতে প্রায় ১০০ কিলোমিটার উর্ধ্বে বায়ুমণ্ডলের যে অংশে রয়েছে তাকেই হেটোরোস্ফিয়ার বলে। এটি বিভিন্ন উপাদান এবং চারটি প্রধান স্তর নিয়ে গঠিত। সর্ব নিম্নের স্তরটি প্রধানত নাইট্রোজেন দ্বারা গঠিত বলে একে আনবিক নাইট্রোজেন স্তর বলা হয়। এটি উর্ধ্বে প্রায় ২০০ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত। এটির উর্ধ্বে ২০০-১,১০০ কিলোমিটার পর্যন্ত স্তরটি প্রধানত অক্সিজেন দ্বারা গঠিত বলে এটি পারমানবিক অক্সিজেনস্তর নামে পরিচিত। এই স্তরের উর্ধ্বে ১,১০০-৩৫০০ কিলোমিটার পর্যন্ত স্তরটি প্রধানত হিলিয়াম গ্যাস দ্বারা গঠিত বলে একে হিলিয়াম স্তর বলা হয়। এরপর হল হাইড্রোজেন স্তর। অসীম মহাকাশ পর্যন্ত হাইড্রোজেন পরমাণু সমান হয়ে যায়।

বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তর

বায়ুমণ্ডল স্তরে স্তরে সজ্জিত। এগুলো নিম্নদিক হতে উপরের দিকে ক্রমশ লঘু। বিজ্ঞানীগণ বায়ুমণ্ডলকে সাতটি স্তরে ভাগ করেছেন। যথা —

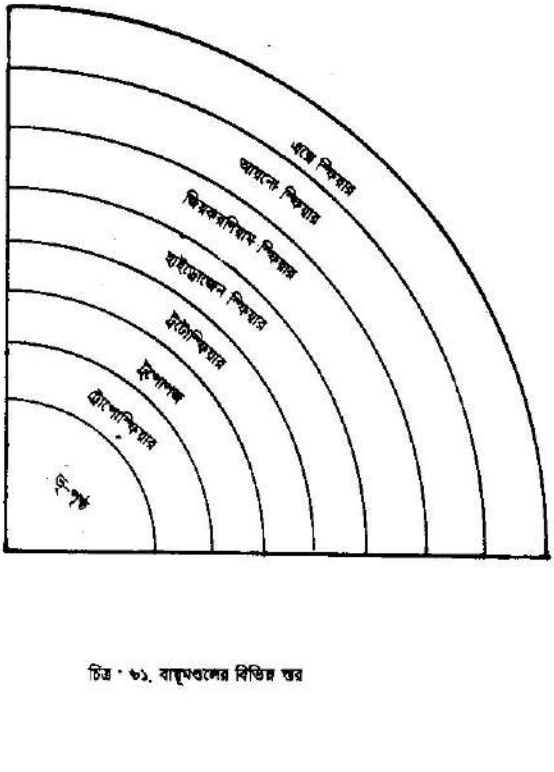

চিত্র : ৬১. বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তর

১। ট্রপোস্ফীয়ার : ভূ-পৃষ্ঠের নিকটবর্তী স্তরকে ট্রপোস্ফীয়ার বলা হয়। নিরক্ষীয় ও মেরু অঞ্চলে এ স্তরের গভীরতা যথাক্রমে ১৭.৬ কিলোমিটার ও ১১.২৬ কিলোমিটার বলে অনুমান করা হয়। আর্দ্রতা, কুয়াশা, মেঘ, বৃষ্টি প্রভৃতি এ স্তরেই অবস্থিত। এ স্তরে উষ্ণতার সর্বাপেক্ষা ব্যতিক্রম ঘটে এবং তাপ ও চাপের পার্থক্যের ফলে বায়ুপ্রবাহের সৃষ্টি হয়।

২। ট্রপোপজ : ট্রপোস্ফীয়ারের ঠিক উপরের স্তরটিকে ট্রপোপজ বলে। এ স্তরের গভীরতা ১.৬ কিলোমিটার প্রায়। এ স্তরে বায়ুপ্রবাহ নেই বললেই চলে।

৩। স্ট্রাটোস্ফিয়ার : ট্রপোপজ স্তরের উপরের স্তরটিই হল স্ট্রাটোস্ফিয়ার। ভূ-পৃষ্ঠের ১২.৮৭ কিলোমিটার উপর হতে প্রায় ৮০.৪ কিলোমিটার পর্যন্ত এ স্তর বিস্তৃত। এ স্তরের বায়ুর তাপ ও চাপের পার্থক্য প্রায় নেই বলে বায়ুর উর্ধ্ব ও নিম্নগতি নেই। তবে বায়ুর সমান্তরাল গতি পরিলক্ষিত হয়। এই স্তরই উর্ধ্বাকাশ। কারণ এর উপর গোধূলী পৌঁছে না।

৪। হাইড্রোজেন স্ফীয়ার : ভূ-পৃষ্ঠের ৮০.৪ কিলোমিটার উর্ধ্ব হতে প্রায় ২০৯ কিলোমিটার উর্ধ্ব পর্যন্ত বিস্তৃত বায়ুস্তরটিকে হাইড্রোজেন স্ফীয়ার বলে। এ স্তরটি প্রধানত হাইড্রোজেন গ্যাস দ্বারা গঠিত এবং নীলাকাশের শেষ সীমা এ স্তরে মেরু জ্যোতি ও উলকাপুঞ্জ দেখা যায়।

৫। জীয়করনিয়াম স্ফীয়ার : ভূ-পৃষ্ঠের প্রায় ২০৯ কিলোমিটার উর্ধ্বে অবস্থিত স্তর টিকে জীয়করনিয়াম স্ফীয়ার বলে। এ স্তরের গভীরতা প্রায় ২৭৩.৫ কিলোমিটার। এ স্তর জীয়করনিয়াম নামক লঘুতম গ্যাসে পরিপূর্ণ। এ স্তরের মধ্যে ধনুকের মতো মেরু জ্যোতি দেখা যায়।

৬। আয়োনোস্ফীয়ার : স্ট্রাটোস্ফীয়ারের উর্ধ্বে এ স্তরটি অবস্থিত। সূর্যের উত্তাপ বিকিরণের ক্ষুদ্র তরংগগুলো বাধাপ্রাপ্ত হয়ায় এস্তরে তড়িৎ প্রবাহ সমতাহীন। এ স্তরেই বিদ্যুৎ চমকাতে দেখা যায়।

৭। অক্সোস্ফীয়ার : ভূ-পৃষ্ঠের ৬৪৩.৫ কিলোমিটার উর্ধ্বে এ স্তরটি অবস্থিত। এই স্তরের পরে বিস্তৃত হল অসীম। এ স্তরে অণু-পরমাণুগুলো সর্বদা উর্ধ্বদিকে চলে যায় বলে এ স্তরকে ধরণা স্তরও বলা হয়।

সারসংক্ষেপ : বায়ুর বিভিন্ন উপাদান স্তর ভেদে বিভিন্ন পরিমাণে থাকে। এই উপাদান নিম্ন স্তরে অপেক্ষাকৃত বেশি এবং যতই উর্ধ্বে উঠা যায় ততই বায়ুর উপাদান চাপ ও ঘনত্ব কমতে থাকে। বায়ুতে যে উপাদান আছে তা আমাদের বেঁচে থাকার জন্য অত্যাবশ্যকীয়। ভূ-পৃষ্ঠ হতে উর্ধ্বাকাশ পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকাই বায়ুমণ্ডল বলে অভিহিত করা হয়। সর্বোপরি বলা যায় যে, বায়ুতে স্তর বিশেষে যদি সঠিকভাবে উপাদান না থাকত তবে জীবজন্তুর বসবাস সম্পূর্ণভাবে ভিত্তি হীন হয়ে পড়ত।

৩.২০ : বায়ুপ্রবাহ ও এর বিবরণ

ভূমিকা : তাপ এবং চাপের পার্থক্যের জন্য বায়ু সর্বদা একস্থান হতে অন্যস্থানে প্রবাহিত হয়। একে বায়ুপ্রবাহ বলে। বায়ুপ্রবাহ সাধারণত কয়েকটি বিশেষ নিয়ম দ্বারা পরিচালিত হয়।

১। নিম্নচাপ মণ্ডলের উত্তপ্ত ও হালকা বায়ু উর্ধ্বে উত্থিত হলে বায়ুমণ্ডলে চাপের অসমতা সৃষ্টি হয়। এই কারণে উচ্চ চাপ মণ্ডল হতে শীতল ও ভারী বায়ু সর্বদা নিম্ন চাপ মণ্ডলের দিকে প্রবাহিত হয়।

২। পৃথিবী পশ্চিম হতে পূর্বদিকে আবর্তনশীল এবং নিরক্ষরেখা হতে মেরু অঞ্চলের দিকে আবর্তনের গতিবেগ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পায়। এ উভয় কারণে ঘূর্ণমান পৃথিবী পৃষ্ঠে গতিশীল পদার্থ (যেমন – বায়ুপ্রবাহ বা জলস্রোত) সরাসরি উত্তর দক্ষিণে প্রবাহিত না হয়ে উত্তর গোলার্ধে ডানদিকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে বামদিকে বেঁকে যায়। ফেরেলের সূত্র অনুসারে ভূ-পৃষ্ঠে বায়ু প্রবাহের দিক নিয়ন্ত্রিত হয়।

৩। বাইস ব্যালট সূত্র অনুযায়ী উত্তর গোলার্ধে যে দিকে বায়ু প্রবাহিত হয় সে দিকে পিছন ফিরে দাঁড়ালে ডানদিকের বায়ু অপেক্ষা বামদিকের বায়ুতে চাপ কম থাকে। কিন্তু দক্ষিণ গোলার্ধে এর বিপরীত অবস্থা দেখা যায়।

৪। বায়ু যেদিক হতে প্রবাহিত হয় সেদিক অনুসারে বায়ুর নামকরণ হয়।

৫। বায়ুর গতি পথে পাহাড়-পর্বতের অবস্থান থাকলে তা ডান বা বামদিকে বেঁকে প্রবাহিত হয়।

পৃথিবীর বায়ুপ্রবাহ প্রধানত চাপ বলয়ের উপর নির্ভরশীল। এই বায়ুপ্রবাহকে প্রধানত চারটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। যথা —

(ক) নিয়ত বায়ু : এই সকল বায়ু সারা বৎসর নির্দিষ্ট দিকে নিয়মিতভাবে প্রবাহিত হয় ; যথা — আয়ন বায়ু, পশ্চিমা বায়ু ও মেরু বায়ু।

(খ) সাময়িক বায়ু : দিবসের বিভিন্ন সময়ে ও বৎসরের বিভিন্ন ঋতুতে চাপ ও চাপের পার্থক্য হেতু বায়ু প্রবাহিত হয় ; যথা — সমুদ্র বায়ু, স্থল বায়ু ও মৌসুমী বায়ু।

(গ) অনিয়মিত বায়ু : এই বায়ু হঠাৎ যে কোন দিক হতে প্রবাহিত হয় ; যথা — ঘূর্ণবাত ও প্রতীপ ঘূর্ণবাত।

(ঘ) স্থানীয় বায়ু : স্থানীয় কারণে এই বায়ুর উৎপত্তি হয় ; যথা — ফন, খামসিন, সিরক্কো প্রভৃতি।

নিয়ত বায়ু : পৃথিবীর চারদিক বায়ুমণ্ডল দ্বারা আবৃত। কিন্তু এই বায়ুর ভাগ সর্বত্র সমান নয়। উত্তাপে বায়ু প্রসারিত, হালকা ও উর্ধ্বগামী হয় এবং তাপ হ্রাস পেলে বায়ু সংকুচিত, পুরু ও নিম্নগামী হয়। কোন স্থানে তাপ অধিক হলে তথায় নিম্নচাপ এবং তাপ কম হলে উচ্চ চাপের সৃষ্টি হয়। বায়ুপ্রবাহ, বায়ু চাপের বন্টনের উপর নির্ভর করে। উচ্চচাপ অঞ্চল হতে বায়ু স্বভাবতঃই নিম্নচাপের দিকে প্রবাহিত হয় নিরক্ষীয় অঞ্চল বৎসরের সকল সময়ই প্রচুর উত্তাপ

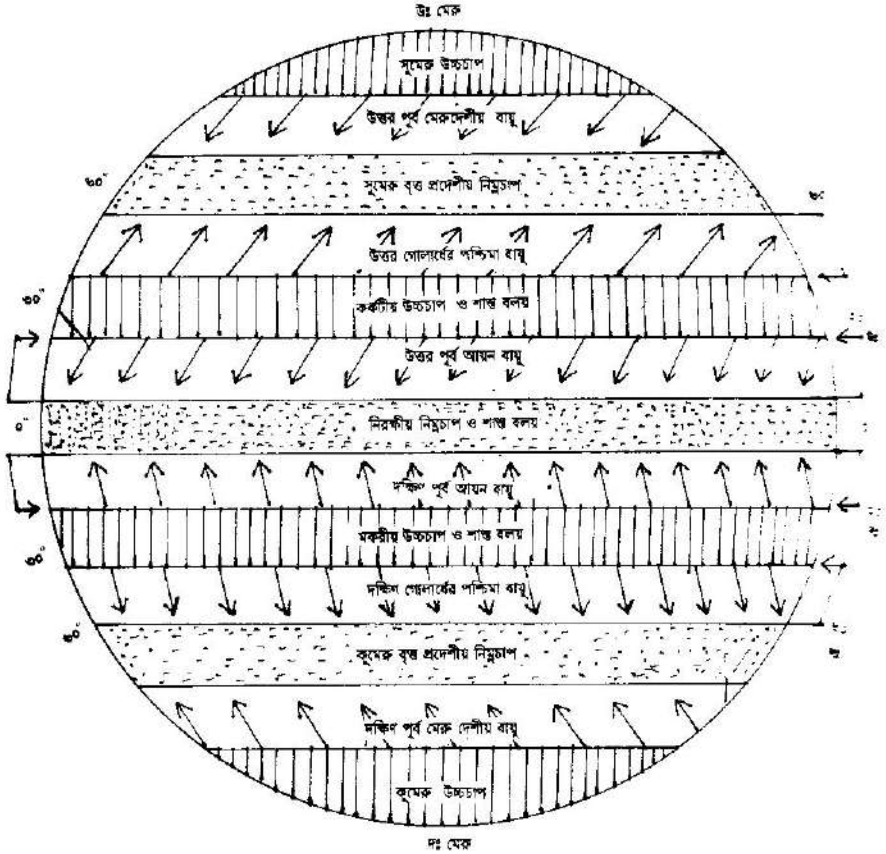

চিত্র : ৬২. পৃথিবীর চাপ বলয় ও নিয়ত বায়ুপ্রবাহ

পৃথিবীর চাপ বলয় ও নিয়ত বায়ুপ্রবাহ।

পায় বলে তথায় নিম্নচাপ বলয়ের সৃষ্টি হয়ে থাকে। পৃথিবীর যে সকল অংশে নির্দিষ্ট উচ্চ ও নিম্নচাপ বলয়ের সৃষ্টি হয়েছে তথায় দুটি চাপ বলয়ের মধ্যভাগে একটি নিয়ত বায়ু প্রবাহিত হয়। সে সকল বায়ু সারা বৎসর নিয়মিতভাবে প্রবাহিত হয় তাদেরকে নিয়ত বায়ুপ্রবাহ বলে হয়। আয়ন বায়ু, প্রত্যায়ন বায়ু ও মেরু দেশীয় বায়ু এর অন্তর্গত।

আয়ন বায়ু : নিরক্ষীয় অঞ্চলের নিম্নচাপের উষ্ণ ও লঘু বায়ু উর্ধ্বে উঠে গেলে চাপের সমতা রক্ষার জন্য কর্কটীয় ও মকরীয় উচ্চ চাপ বলয় হতে দুটি বায়ু সারা বৎসর নিয়মিতভাবে নির্দিষ্ট পথে নিরক্ষীয় অঞ্চলের নিম্নচাপের দিকে প্রবাহিত হয়। এইরূপে নিরক্ষীয় অঞ্চলের দিকে আসার সময় ফেরেলের সূত্রানুসারে উত্তর গোলার্ধে এটি ডানদিকে বেঁকে উত্তর-পূর্ব দিক হতে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে বামদিকে বেঁকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়। এগুলোকে যথাক্রমে উত্তর-পূর্ব আয়ন বায়ু ও দক্ষিণ-পূর্ব আয়ন বায়ু বলে। পূর্বে পালতোলা বাণিজ্য জাহাজ এই বায়ুপ্রবাহ দ্বারা নির্দিষ্ট পথে চালিত হয় বলে বায়ুদ্বয়কে Trade wind বা আয়ন বায়ু বলা হয়। উত্তর-পূর্ব আয়ন বায়ু ঘণ্টায় ১৬ কি.মি. এবং দক্ষিণ পূর্ব আয়ন বায়ু ঘণ্টায় ২২.৪ কি.মি. বেগে প্রবাহিত হয়। এই বায়ু সাধারণত নিরক্ষরেখা হতে কয়েক ডিগ্রি উত্তর ও দক্ষিণ হতে প্রায় ৩৫ ডিগ্রি উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে প্রবাহিত হয়।

আয়ন বায়ু উচ্চ অক্ষাংশ হতে নিম্নঅক্ষাংশে প্রবাহিত হয় বলে এদের জলীয় বায়ু ধারণ করার শক্তি বেড়ে যায়। এজন্যে এই বায়ুতে সাধারণত বৃষ্টি হয় না। এই কারণে এই বায়ু প্রবাহের পথে মহাদেশ সমূহের পশ্চিমে পৃথিবীর অধিকাংশ মরুভূমি অবস্থিত। তবে এই বায়ুর যে অংশ প্রতিহত হয়, সেই অঞ্চলে বৃষ্টিপাত হয়।

পশ্চিমা বায়ু : দুই ক্রান্তীয় উচ্চচাপ বলয় হতে যেরূপ নিরক্ষীয় নিম্নচাপ বলয়ের দিকে বায়ু প্রবাহিত হয়। সেইরূপ ক্রান্তীয় বলয় হতে দুই মেরুবৃত্ত প্রদেশীয় নিম্নচাপ বলয়ের দিকেও দুটি বায়ু সারা বৎসর নির্দিষ্ট পথে প্রবাহিত হয়ে থাকে। এদের পশ্চিমা বায়ু বা প্রত্যায়ন বায়ু বলা হয়। এই বায়ু এই গোলার্ধে ৩৫° হতে ৬০° অক্ষাংশের মধ্যে প্রবাহিত হয়।

এই বায়ু মেরু বৃত্ত প্রদেশের দিকে অগ্রসর হতে হতে ফেরেলের সূত্রানুসারে উত্তর গোলার্ধে ডানদিকে বেঁকে দক্ষিণ পশ্চিম দিক হতে দক্ষিণ পশ্চিমা বায়ুরূপে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে বামদিকে বেঁকে উত্তর পশ্চিম দিক হতে পশ্চিমা বায়ুরূপে প্রবাহিত হয়। আয়ন বায়ুর মতো পশ্চিমা বায়ু সারা বৎসর ঠিক নিয়মিতভাবে প্রবাহিত হয় না।

উত্তর গোলার্ধে জলভাগ অপেক্ষা স্থলভাগ অধিক বলে এবং স্থলভাগে পাহাড় পর্বত থাকায় দক্ষিণ পশ্চিম পশ্চিমা বায়ুর দিক ও গতি অধিক পরিবর্তিত হয়। কিন্তু দক্ষিণ গোলার্ধে জলভাগ অধিক থাকায় উত্তর পশ্চিম পশ্চিমা বায়ু ৪০° – ৬০° দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে সারা বৎসর প্রবল বেগে প্রবাহিত হয়। একেই গর্জনশীল চল্লিশা বলে।

পূর্বে অশ্ব বোঝাই পালতোলা জাহাজকে অনেক সময় আয়ন বায়ু প্রবাহের প্রভাবে কর্কটীয় শান্ত বলয়ে অপেক্ষা করতে হত। পানীয় জলের ব্যয় সংকোচের জন্য নাবিকেরা অশ্বগুলোকে জলে নিক্ষেপ করত। এইজন্য ৩০° – ৩৫° উত্তর অক্ষাংশ অঞ্চলকে অশ্ব অক্ষাংশ বলে।

পশ্চিমা বায়ুতে সকল মহাদেশের পশ্চিম উপকূলে বৃষ্টি হয়। কারণ এই বায়ু পশ্চিমের সমুদ্রের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয় বলে প্রচুর জলীয় বাষ্প বহন করে। শীতকালে জল অপেক্ষা স্থলভাগ অধীক শীতল থাকে বলে এই বায়ুতে শীতকালে অধিক বৃষ্টি হয়।

মেরু বায়ু : সুমেরু ও কুমেরুর উচ্চ চাপ হতে নিয়মিত রূপে দুটি বায়ুপ্রবাহ মেরুবৃত্ত প্রদেশীয় নিম্নচাপ — বলয় দুটির দিকে চলতে থাকে। এই বায়ুও ফেরেলের সূত্রানুসারে বেঁকে উত্তর গোলার্ধে উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ গোলার্ধে দক্ষিণ-পূর্ব বায়ুরূপে প্রবাহিত হয়। মেরু হতে প্রবাহিত হয় বলে এটি শুষ্ক ও শীতল বায়ু বলে পরিচিত। কেবল দক্ষিণ গোলার্ধে এই বায়ুপ্রবাহের ফলে প্রবল ঝড় ওঠে এবং বৃষ্টিপাত হয়।

উপরে বর্ণিত তিন প্রকার নিয়ত বায়ু প্রবাহের বিবরণ হতে দেখা যায় যে, নিম্ন অক্ষাংশে বায়ু প্রধানত পূর্ব দিক হতে নিরক্ষীয় নিম্নচাপ অঞ্চলে মিলিত হয় ; মধ্য অক্ষাংশে পশ্চিম দিক হতে এবং মেরু অঞ্চলে প্রধানত পূর্ব দিক হতে বায়ু প্রবাহিত হয়ে থাকে।

নিরক্ষীয় নিম্নচাপ বলয়ে দুটি আয়ন বায়ু সেখানে প্রায় এক কেন্দ্রাভিমুখী হয়। সেখানে বিভিন্ন প্রকার দুর্বল বায়ু বিভিন্ন দিকে প্রবাহিত হয়। দুই আয়ন বায়ুর সীমানার মধ্যবর্তী পরিবর্তনশীল অঞ্চলকে ইন্টার ট্রপিক্যাল কনভারজেন্স বা নিরক্ষীয় শান্ত বলায় বলে। মধ্য অক্ষাংশে, সেখানে আয়ন বায়ু ও পশ্চিমা বায়ু পরস্পর হতে দূরে প্রবাহিত হয়, সেখানেও অনুরূপ দুর্বল বায়ু বিভিন্ন দিকে প্রবাহিত হয়ে থাকে। এই অঞ্চলকে অশ্ব-অক্ষাংশ বলে। ইহা সাধারণত ৩০° – ৩৫° উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে অবস্থান করে থাকে।

নিয়ত বায়ুর পরিবর্তন : বায়ু প্রবাহের বিভিন্ন কারণের মধ্যে তাপের তারতম্যই প্রধান। তাপ অধিক হলে বায়ু চাপ হ্রাস পায় এবং উচ্চচাপ অঞ্চল হতে বায়ু নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হতে থাকে। পৃথিবীর বার্ষিক গতির ফলে সূর্য রশ্মি বৎসরের বিভিন্ন সময়ে উষ্ণমণ্ডলের বিভিন্ন অংশে লম্বভাবে পতিত হয় এজন্যে সূর্য জুন, জুলাই মাসে নিরক্ষরেখার উত্তর এবং ডিসেম্বর, জানুয়ারি মাসে নিরক্ষরেখার দক্ষিণে সরে যায়। ফলে পৃথিবীর সর্বোচ্চ তাপ বিষুব রেখায় অনুরুপভাবে সূর্যকে অনুসরণ করে উত্তরে ও নিয়ত বায়ুবলয় জুন, জুলাই মাসে কিছু উত্তরে এবং ডিসেম্বর, জানুয়ারি মাসে কিছু দক্ষিণে সরে যায়। বায়ু স্তরগুলো সূর্যকে অনুসরণ করলেও পূর্ণ মাত্রায় সূর্য বরাবর গিয়ে পৌছায় না। সূর্য নিরক্ষরেখা হতে ২৩ $\frac{১}{২}$ সরে যায়, সরে গেলে এ বলয়গুলো উত্তর গোলার্ধে ৫° এবং দক্ষিণ গোলার্ধে ৫° স্থানান্তরিত হয়। উত্তর গোলার্ধে ৩০° থেকে ৪৫° অক্ষাংশে শীতকালে পশ্চিমা বায়ু এবং গ্রীষ্মকালে আয়ন বায়ু প্রবাহিত হয়। এই সকল অঞ্চলে শীতকালে পশ্চিমা বায়ুর প্রভাবে বৃষ্টি হয়। সুতরাং "বৃষ্টি সূর্যের অনুসারী" কথাটি এই সকল দেশের জন্য প্রযোজ্য।

সাময়িক বায়ু : তাপের তারতম্যের জন্য বায়ু চাপের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বায়ু চাপের পার্থক্য দেখতে পাওয়া যায়। সর্বদা উচ্চচাপ বিশিষ্ট স্থান হতে নিম্নচাপ বিশিষ্ট স্থানের দিকে বায়ু প্রবাহিত হয়। পৃথিবীর বার্ষিক গতির ফলে দিবারাত্রির হ্রাস বৃদ্ধি ও ঋতু পরিবর্তন হয়ে থাকে। দিবারাত্রির বিভিন্ন সময়ে এবং বৎসরের কোন নির্দিষ্ট ঋতুতে পানিরাশি ও স্থল ভাগের তাপ গ্রহণ, সংরক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ে অসমতার জন্য যে বায়ুপ্রবাহের সৃষ্টি হয় তাকে সাময়িক বায়ুপ্রবাহ বলে। সাময়িক বায়ু বিভিন্ন প্রকারের যেমন — সমুদ্রবায়ু, স্থলবায়ু, মৌসুমী বায়ু ও পার্বত্য উপত্যকা বায়ু উল্লেখযোগ্য।

সমুদ্র বায়ু : সমুদ্র তীরবর্তী কোন স্থানের বায়ুপ্রবাহ সাধারণত জল ও স্থলে দিন ও রাত্রির উষ্ণতার তারতম্যের উপর নির্ভর করে। জলে ও স্থলে দিবাভাগে সূর্যকিরণ সমভাবে পতিত হলে ও প্রকৃতিগত পার্থক্যের জন্য জলভাগ অপেক্ষা স্থলভাগ শীঘ্র উত্তপ্ত হয় ; আবার রাত্রিতে জলভাগ অপেক্ষা স্থলভাগ শীঘ্র শীতল হয়। সুতরাং দিবাভাগে সূর্যের উত্তাপে সমুদ্রের জল অপেক্ষা নিকটস্থ স্থলভাগ অধিক উত্তাপ্ত হয় এবং স্থলের উপরিস্থিত বায়ু উষ্ণ, প্রসারিত ও লঘু হয়। এই লঘু বায়ু উর্ধ্বে উঠে গেলে সেখানে বায়ুর চাপ নিম্ন হয়। কিন্তু তখন সাগরের উপরিস্থিত বায়ু অপেক্ষাকৃত শীতল ও উচ্চচাপ যুক্ত থাকে। এর ফলে জলভাগ হতে স্থলভাগের দিকে বায়ুপ্রবাহ দেখা যায়। একে সমুদ্র বায়ু বলে।

স্থল বায়ু :

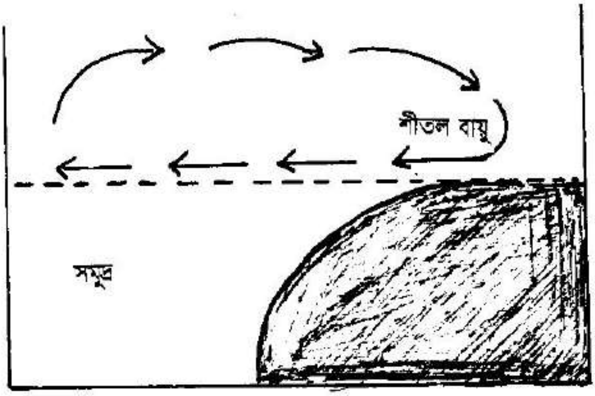

চিত্র : ৬৩. স্থলবায়ু

সন্ধ্যার পূর্ব হতেই উত্তপ্ত স্থলভাগ তাপবিকিরণ করে ক্রমশ শীতল হয়। স্থলের উপরিস্থিত বায়ু সমুদ্রের উপরিস্থিত বায়ুর মতো শীতল হলে সমুদ্রবায়ু বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু রাত্রিকালে

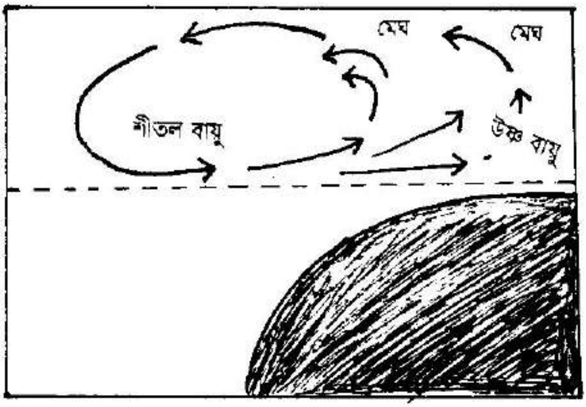

চিত্র : ৬৪. সমুদ্র বায়ু

স্থলভাগের তুলনায় জলভাগ তত শীঘ্র তাপ বিকিরণ করতে পারেনা বলে তা উষ্ণ থেকে যায় জলের উপরিস্থিত বায়ুর চাপ নিম্ন হয় এবং স্থলের উপরিস্থিত বায়ুর চাপ উচ্চ হয়। সুতরাং তখন স্থলভাগ হতে সমুদ্রের দিকে বায়ু প্রবাহিত হয় একে স্থল বায়ু বলে।

মৌসুমী বায়ু : আরবি ভাষায় 'মৌসুম' কথার অর্থ ঋতু ; ঋতু ভেদে যে বায়ু প্রবাহিত হয়, তাকে মৌসুমী বায়ু বলে। শীতল ও গ্রীষ্ম ঋতুতে বিশাল স্থল ভাগ ও জলভাগের উপরের বায়ুর উষ্ণতা ও চাপের পার্থক্যের জন্য মৌসুমী বায়ুর উদ্ভব হয়। মৌসুমী বায়ু সমুদ্রবায়ু ও স্থলবায়ুর ব্যাপক সংস্করণ। এই বায়ু আমাদের দেশে প্রচুর বৃষ্টি দান করে।

গ্রীষ্ম মৌসুমী বায়ু : গ্রীষ্মকালে উত্তর গোলার্ধে সূর্য আপাত গতিতে কর্কটক্রান্তির নিকট আসে। কর্কটক্রান্তীয় অঞ্চলে জলভাগ অপেক্ষা স্থল ভাগ অধিক। এই স্থল ভাগের অন্তর্গত মধ্য এশিয়া, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া, উত্তর পশ্চিম ভারত, আফ্রিকার গিনি উপকূল প্রভৃতি স্থান গ্রীষ্মকালে খুব উত্তপ্ত হয়। এদের উপরিস্থিত বায়ু উষ্ণ ও লঘু হয়। সুতরাং এই সকল স্থানের বায়ুর চাপ নিম্ন হয়। কিন্তু এদের নিকটবর্তী ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরের জলভাগ তেমন উত্তপ্ত হয় না। তাদের উপরিস্থিত বায়ু শীতল ও উচ্চচাপ মুক্ত হয়। গ্রীষ্মকালে এই উচ্চচাপের সমুদ্র বায়ু উপরোক্ত স্থলের নিম্নচাপ

অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয় এবং স্থলের উপরিস্থিত নিম্নচাপের বায়ুকে উর্ধ্বে ঠেলে দেয়। উত্তর গোলার্ধে এই বায়ুকে গ্রীষ্ম মৌসুমী বায়ু বলে।

গ্রীষ্মের প্রথমার্ধে ভারতের সমভূমি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়। এই উত্তাপ মার্চ, এপ্রিল ও মে মাসে যতই বৃদ্ধি পেতে থাকে ততই ভারতের বিভিন্ন অংশে স্থানীয় নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়। এই সময় উত্তর ভারত, আসাম এবং পশ্চিমবঙ্গে ও বাংলাদেশে আকস্মিক ঝড় ও শিলা বৃষ্টি হয়। কিন্তু জুন মাসের মাঝামাঝি পাঞ্জাবের নিম্নচাপ বলয় অধিক শক্তি সম্পন্ন হওয়ায় জল ভরা দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর গতিবেগ হঠাৎ বৃদ্ধি পায়। এবং নিয়মিত ভাবে আরব সাগর ও বংগোপসাগরের উপর দিয়ে বাংলাদেশ ও ভারতে প্রবেশ করে আকস্মাৎ মৌসুমী বর্ষণ শুরু করে।

শীত মৌসুমী বায়ু : দক্ষিণায়নের সঙ্গে সঙ্গে উত্তর গোলার্ধে শীতকালে সূর্য দক্ষিণে মকরক্রান্তির নিকটে সরে যায় এবং লম্বভাবে কিরণ দেয়। সেই জন্য কমরক্রান্তির নিকটবর্তী স্থানের যথা উত্তর-পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ায় ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণাংশের উপরিস্থিত বায়ু উষ্ণ হয় এবং এই সকল অঞ্চলে বায়ুর নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়। কিন্তু উত্তর গোলার্ধের পূর্বোক্ত স্থানগুলো, বিশেষত মধ্য এশিয়া শীতল থাকে। এই সকল স্থানে বায়ুর চাপ উচ্চ হয়। সুতরাং মধ্য এশিয়ায় স্থলভাগ হতে শীতল শুষ্ক বায়ু সাগরের দিকে প্রবাহিত হয়।

ভারতের পাঞ্জাবের উচ্চচাপ বলয় হতে গাংগেয় উপত্যকার মধ্য দিয়ে পূর্বদিকে এসে পরে উত্তর পূর্ব দিক হতে প্রবাহিত হয়। একে উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ু বলে। এটি স্থলভাল হতে আসে বলে এতে বৃষ্টিপাত হয় না। এই বায়ুর একটি অংশ জাপান সাগর অতিক্রম করে আসবার ফলে জাপানে এবং অপর একটি অংশ বঙ্গোপসাগর অতিক্রম করে ভারতের তামিলনাড়ু, ও শ্রিলঙ্কায় শীতকালেও বৃষ্টিপাত ঘটায়। এই মৌসুমী বায়ু নিরক্ষরেখা অতিক্রম করে বামদিকে বেঁকে ভারত মহাসাগর হতে উত্তর-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুরূপে প্রবাহিত হয়ে উত্তর অষ্ট্রেলিয়ায় প্রচুর বৃষ্টিদান করে।

স্থানীয় বায়ুপ্রবাহ : বছরের নির্দিষ্ট সময়ে স্থানীয় কারণবসত তাপ ও চাপের বৈষম্যহেতু বিশিষ্ট বায়ু প্রবাহের সৃষ্টি হয়।এই বায়ুপ্রবাহকে স্থানীয় বায়ু বলে। এটি সাধারণত উচ্চ পর্বত বা মরুভূমিতে উৎপন্ন হয়। সাহারা মরুভূমি হতে চতুর্দিকে প্রবাহিত স্থানীয় বায়ু অত্যন্ত শুষ্ক ও বালুপূর্ণ বলে এটি অত্যন্ত কষ্টদায়ক হয়। স্থানভেদে এই বায়ু বিভিন্ন নামে পরিচিত। যথা মিশরে খামসিন, সিসিলিতে সিরফেফা, গিনি উপকূলে হারমাট্রান ইত্যাদি।

ফন : রাইন-উপত্যকার মধ্য দিয়ে আল্পসের পার্বত্য অঞ্চলে প্রবাহিত স্থানীয় বায়ুকে 'ফন' বলে। এটি আর্দ্র বায়ু। সেই জন্য এটি পর্বত গাত্র অবলম্বন করে উর্ধ্বে উত্থিত হলে অধিক শৈত্যে প্রতিবাত অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত, কখনও কখনও তুষারপাত করে। এই বায়ু পর্বত অতিক্রম করে নিচে নামতে থাকলে সংকুচিত হয়ে উষ্ণ হয়। আবার জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হবার সময় বাষ্প লীনতাপ বায়ু ত্যাগ করে, সতুরাং এই কারণেও বায়ু উষ্ণ হয়। উষ্ণ বায়ু পর্বতের বরফ গলিয়ে ফেলে। এই বরফগলা জলে বসন্তকালে আল্পসের পশুচারণ ভূমি তৃণাচ্ছাদিত হয়। গ্রীষ্মে এই বায়ু প্রবাহে শস্য প্যাকে।

চিনুক : কানাডায় অবস্থিত রকি পার্বত্য অঞ্চলের পূর্বাংশে পশ্চিম হতে প্রবাহিত নিম্নগামী স্থানীয় বায়ুকে 'চিনুক' বলে। এটি উষ্ণ বায়ুপ্রবাহ। শীতকালে প্রেইরি অঞ্চল উত্তরের শীতল বায়ু প্রবাহে বরফাবৃত হয়েও প্রেইরির কিয়দাংশ চিনুকের প্রবাহে বরফ মুক্ত থাকে। এই অঞ্চল ব্যাপক পশুচারণ ক্ষেত্ররূপে ব্যবহৃত হয়। আন্দিজ হতে পম্পাস তৃণভূমির উপর দিয়ে প্রবাহিত বায়ুকে পম্পেরো বলে।

লু : গ্রীষ্মকালে দিবাভাগে উত্তর-পশ্চিম ভারতের স্থলভাগ উত্তপ্ত হয়। বিভিন্ন বায়ু স্তরে দ্রুত তাপের বিনিময় ঘটে। উষ্ণ বায়ু ভূ-পৃষ্ঠের সমান্তরাল প্রবল বেগে প্রবাহিত হয়। সন্ধ্যার পর এর বেগ হ্রাস পায়। দিনের উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বায়ুর গতিবেগ বৃদ্ধি পায়। এই বায়ুকে লু অথবা আঁধি বলে। এটি অত্যন্ত শুষ্ক, উষ্ণ ও পীড়াদায়ক, কিন্তু স্বাস্থ্যকর।

অনিয়মিত বায়ু : যে বায়ুপ্রবাহ অকস্মাৎ আবির্ভূত হয়ে প্রভূত ক্ষতি সাধন করত ধীরে ধীরে অন্যত্র চলে চায় তাকে আকস্মিক বায়ু বলে বা অনয়িমিত বায়ু বলে। প্রচুর উত্তাপে কোন স্থানের বায়ু উত্তপ্ত হলে লঘু চাপের, আবার অত্যাধিক শৈত্যের জন্য কোন স্থানের বায়ু শীতল হলে উচ্চচাপের সৃষ্টি হয়। এবং এর ফলে আকস্মিক অনিয়মিত বায়ু প্রবাহের সৃষ্টি হয় ঘুর্ণিবাত্যা, প্রতীপ ঘুর্ণিবাত্যা এইরূপ বায়ু প্রবাহের উদাহরণ।

ঘুর্নিবার্তা : নিম্নচাপ বিশিষ্ট ঝড়কে ঘুর্ণিবার্তা বা 'ডিপ্রেসন' বলে। ঘুর্ণিবার্তার কেন্দ্রে নিম্নচাপ কেন্দ্রের সৃষ্টি হয়। চাপের সমতা রক্ষার জন্য চতুর্দিকে উচ্চ চাপের শীতল বায়ু ঐ কেন্দ্রের দিকে প্রবলবেগে ধাবিত হয়। এই অভিক্ষিপ্ত ক্রান্তিয় উষ্ণ ও আর্দ্রবায়ু পশ্চিমে, উত্তরে এবং উত্তর পূর্বে শুষ্ক ও শীতল বায়ু দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়। আরও কিছু দূর অগ্রসর হলে দেখা যায় উষ্ণ ও আর্দ্র বায়ুর এক অংশ শীতল বায়ুর উপর তীর্যকভাবে উঠে গিয়েছে এবং অপর অংশে শীতল বায়ুর উপর উঠতে সাহায্য করে থাকে। এইরূপে উষ্ণ ও আর্দ্র বায়ুরাশি শীতল বায়ুর উপর উঠলে তা ঘণীভূত হয়ে বৃষ্টিপাত ঘটায়।

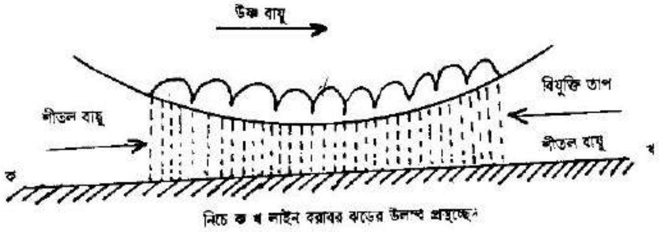

চিত্র : ৬৫. একটি আদর্শ ঘূর্ণাবর্তের বিভিন্ন অংশের প্রস্থচ্ছেদ (ক)

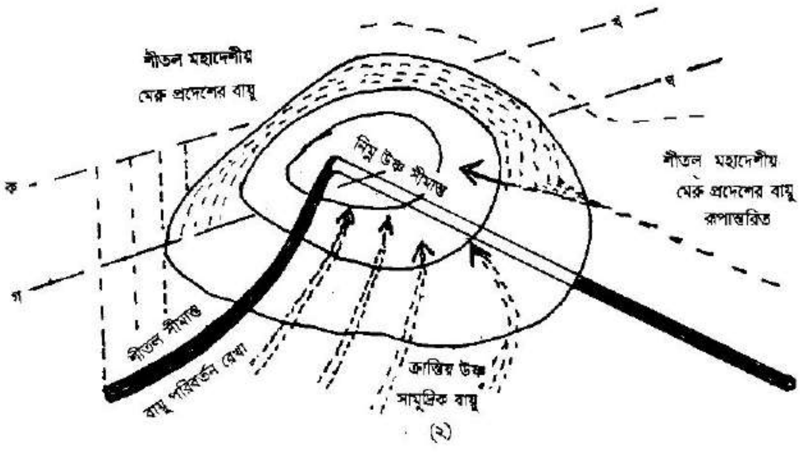

চিত্র : ৬৬. একটি আদর্শ ঘূর্ণাবর্তের বিভিন্ন অংশের প্রস্থচ্ছেদ (খ)

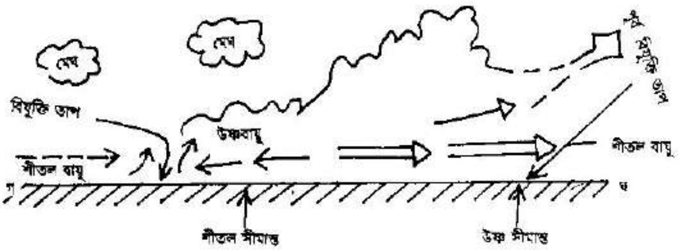

চিত্র : ৬৭. একটি আদর্শ ঘূর্ণাবর্তের বিভিন্ন অংশের প্রস্থচ্ছেদ (গ)

একটি আদর্শ ঘূর্ণবাতের বিভিন্ন অংশের প্রস্থচ্ছেদ

এই দুই ভিন্নধর্মী বায়ুপুঞ্জের উষ্ণবায়ু যেখানে শীতল বায়ুর মধ্যে বেঁকে ঢুকে সেই সীমান্তকে উষ্ণ সীমান্ত এবং উষ্ণ বায়ু রাশির পশ্চাতে যেখানে শীতল বায়ু এসে উষ্ণবায়ুকে আঘাত করে, সেই সীমান্তকে শীতল সীমান্ত বলা হয়। এই অংশে শীতল বায়ু অধিক উদ্যোগী হয় এবং তা উষ্ণ বায়ুকে উপরে উঠতে বাধ্য করে। সাধারণত এই শীতল সীমান্ত উষ্ণ সীমান্ত অপেক্ষা অধিক দ্রুত অগ্রসর হয় এবং তা অচিরেই উষ্ণ সীমান্তকে ধরে ফেলে। এরূপ অবস্থায় মধ্যবর্তী উষ্ণ বায়ু ভূ-পৃষ্ঠ হতে ঊর্ধ্বে উঠে পড়ে। একে অক্লুসান বলে। ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকার পশ্চিমে আগত অধিকাংশ ঘূর্ণবাত এই অক্লুসান অবস্থায় এসে পৌছায়।

প্রতীপ ঘূর্ণিবার্তা : প্রতীপ এটি ঘূর্ণিবার্তা সাধারণত শীতল স্থল বা জলভাগের উপর উচ্চ চাপ সৃষ্টির ফলে গড়ে উঠে। সুতরাং এটি স্বভাবতই মধ্য ও উচ্চ অক্ষাংশে বিশেষত শীতকালে অধিক গঠিত হয়। নিম্ন–মধ্য অক্ষাংশে উপক্রান্তীয় অঞ্চলে ধীর গতি সম্পন্ন উষ্ণ প্রতীপ ঘূর্ণবাত গঠিত হতে দেখা যায়। এদের উৎপত্তি সম্বন্ধে সঠিক তথ্য এখনও পাওয়া যায় নি।

নিম্ন–মধ্য অক্ষাংশের ঘূর্ণবাত ও প্রতীপ ঘূর্ণবাত অনেক সময় উত্তরে অবস্থিত পশ্চিমা বায়ুপ্রবাহ অঞ্চলকে ভেদ করে ঢুকে পড়ে এবং তার ফলে মেরুপ্রদেশীয় ও ক্রান্তীয় বায়ু উভয়ই তাদের উৎপত্তি স্থল হতে অপসারিত হয়। এরূপে ঘূর্ণবাত ও প্রতীপ ঘূর্ণবাত মাধ্যমে মেরু প্রদেশীয় ও ক্রান্তীয় বায়ু ভূ-পৃষ্ঠের বিভিন্ন অংশে উষ্ণতার তারতম্যে একটি সমতা আনয়নের চেষ্টা করে।

বায়ুপ্রবাহের ফল : বায়ুপ্রবাহ ভূ-পৃষ্ঠের তাপের সমতা রক্ষায় সাহায্য করে। নিম্নঅক্ষাংশের উষ্ণ বায়ু উচ্চ অক্ষাংশের দিকে তাপ এবং উচ্চ অক্ষাংশের শীতল বায়ু নিম্নঅক্ষাংশের দিকে শৈত্য বহন করে। সমুদ্র বায়ু সমুদ্র তীরস্থ স্থলভাগকে স্নিগ্ধ করে। নিয়ত বায়ুপ্রবাহগুলো সমুদ্র স্রোত নিয়ন্ত্রিত করে। বায়ু প্রবাহের শক্তিতে কল চালানো হয়।

যেখানে কোন রোগ মহামারী রূপে দেখা দেয় সেখানে বায়ু প্রবাহিত হলে রোগ জীবাণু বহুদূরে চলে যায় এবং রোগের প্রকোপ কমে।

বায়ুপ্রবাহ যেমন আমাদের অনেক উপকার করে, তেমনি অনেক অপকারও করে থাকে। ঝড়, তুফান, টর্নেডো প্রভৃতি বায়ুপ্রবাহ ঘড়বাড়ি, বৃক্ষ প্রভৃতি ধ্বংস হয়।

৩.২১ আবহাওয়া ও এর বিবরণ

আবহাওয়া কি?

কোন স্থানের বায়ুর উষ্ণতা, শৈত্য, চাপ, গতি, দিক, বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ (আর্দ্রতা ও শুষ্কতা) এবং বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রভৃতির সমষ্টিগত দৈনিক বা কয়েক দিনের গড়

অবস্থাকে আবহাওয়া বলে। আবহাওয়ার সর্বদা পরিবর্তন ঘটে। কখনও কখনও বায়ুর উষ্ণতা, চাপ ও বৃষ্টিপাতের তারতম্যের জন্য হঠাৎ আবহাওয়ার পরিবর্তন হয়। বিভিন্ন দিনের, এমন কি কোন দিনের বিভিন্ন সময়ের আবহাওয়ার পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন স্থান থেকে সংগৃহীত স্থানীয় উত্তাপ একত্র করে তার সাহায্যে আগত আবহাওয়ার পূর্বাভাস, বেতার ও খবরের কাগজের মাধ্যমে প্রচার করা হয়।

জলবায়ু কি?

পৃথিবীর কোন স্থানে বা দেশে বছরের সব দিনের আবহাওয়া একরকম থাকে না। কোন দিন উষ্ণ, কোন দিন শীতল, কোন দিন বাতাস শুষ্ক, আবার কোন দিন আদ্র থাকে। কোন বৎসর প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়, আবার কোন বৎসরে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ খুবই কম। এই পরিবর্তনগুলো একত্র করলে কোন স্থানের আবহাওয়ার একটি সমষ্টিগত অবস্থা পাওয়া যায়। এরূপ আবহাওয়ার কয়েক বছরের সমষ্টিগত অবস্থাকেই সেই স্থানের জলবায়ু বলে। আবহাওয়া বিভাগের মতে, "সাধারণত কোন দেশের অন্তত ৩৫ বৎসরের আবহাওয়ার গড় অবস্থার উপর নির্ভর করে সেই দেশের জলবায়ু নির্ণয় হয়"। ভূ-পৃষ্ঠে অঞ্চল ভেদে জলবায়ুরও পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

আবহাওয়া ও জলবায়ুর পরিবর্তন

আবহাওয়ার পরিবর্তন হয় দৈনন্দিন এবং জলবায়ুর পরিবর্তন হয় স্থানের পরিবর্তনে। নিরক্ষীয় অঞ্চলের দৈনিক আবহাওয়ার বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় না। সেজন্য নিরক্ষীয় অঞ্চলের জলবায়ু সারা বছরে প্রায় একরকম। নিরক্ষীয় অঞ্চল থেকে যতই মেরু অঞ্চলদ্বয়ের দিকে যাওয়া যায় ততই জলবায়ুর পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। মৌসুমী অঞ্চলে ঋতুভেদে বিভিন্ন আবহাওয়া ও জলবায়ু দেখা যায়। তাপ, চাপ, আর্দ্রতা এবং বায়ুপ্রবাহ আবহাওয়া ও জলবায়ুর মূল উপাদান। এ উপাদানসমূহ কয়েকটি নিয়ামক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। নিয়ামকগুলো ভূ-পৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থানে জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে। নিচে জলবায়ুর বিভিন্ন নিয়ামকের একটি বিবরণ দেয়া হল :

১। **অক্ষাংশ বা বিষুবরেখা থেকে দূরত্ব** (Latitude) : অক্ষাংশ দ্বারা ভূ-পৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থানের বায়ুর তাপের পার্থক্য বোঝা যায়। নিরক্ষরেখার উপর সূর্য লম্বভাবে পতিত হয় বলে সেখানে সূর্যতাপ অধিক। কিন্তু নিরক্ষরেখা থেকে মেরু প্রদেশের দিকে সূর্যরশ্মি ক্রমান্বয়ে তির্যকভাবে পতিত হয়। ফলে নিরক্ষরেখা থেকে উত্তর-দক্ষিণে তাপমাত্রা ক্রমশ হ্রাস পায়। প্রতি ১° অন্তর দূরত্বে ১° ফা. করে তাপমাত্রা কমে। সেজন্য মেরুঅঞ্চলে বৎসরে ছয়মাস সূর্যতাপ পায় এবং ছয়মাস একেবারেই পায় না।

২. **সমুদ্র সমতল থেকে উচ্চতা** (Altitude) : উত্তপ্ত ভূ-পৃষ্ঠের সংস্পর্শে বায়ু উষ্ণ হয় বলে ভূ-পৃষ্ঠের নিকটস্থ বায়ু অধিক উত্তপ্ত থাকে। উষ্ণ বায়ু উর্দ্ধগামী হয়ে প্রসারিত ও হালকা হয়।

উপরের বায়ু হালকা বলে এটি শীঘ্র তাপ বিকিরণ করে শীতল হয়ে পড়ে। উর্ধ্ব আকাশের বায়ুতে ধূলিকণার পরিমাণ কম থাকায় উপরের বায়ুর তাপ গ্রহণ ও ধারণ করার ক্ষমতা কম শুষ্ক বায়ুমণ্ডলের সাধারণত প্রতি ১০০ মিটার উচ্চতায় প্রায় ১° সেলসিয়াস তাপ কম অনুভূত হয়। কোন স্থান সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে যতই উপরে অবস্থিত ততই ঠাণ্ডা অনুভূত হয়। সমুদ্রপৃষ্ঠ উত্তপ্ত হয়ে বায়ুমণ্ডলকে আস্তে আস্ত উত্তপ্ত করে বলে যতই উপরে উঠা যায় তাপের প্রখরতা ততই কম হয়। এ কারণে একই অক্ষাংশে অবস্থিত হলেও ভিন্ন ভিন্ন উচ্চতার দুটি স্থানের তাপমাত্রার পার্থক্য হয়। দিনাজপুর এবং শিলং প্রায় একই অক্ষাংশে অবস্থিত কিন্তু ৪৬৫ মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট শিলং দিনাজপুর অপেক্ষা অধিকতর শীতল। 'কিটো' শহর যদিও নিরক্ষরেখার উপরে অবস্থিত তবুও এটি উচ্চে অবস্থিত বলে চির বসন্তের দেশ বলে খ্যাত।

৩। **সমুদ্রের প্রভাব** (Influence of Ocean) : সমুদ্রের নিকটবর্তী অঞ্চলসমূহ সামুদ্রিক আবহাওয়া দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। এই কারণে সামুদ্রিক বায়ুর প্রভাবে উপকূল সংলগ্ন এলাকায় শীত ও গ্রীষ্ম এবং দিন ও রাত্রির তাপমাত্রার পার্থক্য খুব বেশি হয় না। এরূপ জলবায়ুকে সমভাবাপন্ন জলবায়ু বলা হয়। কিন্তু সমুদ্র উপকূল হতে দূরবর্তী অঞ্চলে মহাদেশের অভ্যন্তরভাগে শীত ও গ্রীষ্ম উভয়ই চরম হয়। তার কারণ স্থলভাগ জলভাগ অপেক্ষা খুব তাড়াতাড়ি উষ্ণ ও শীতল হয়। এজন্য গ্রীষ্মকালে যেমন স্থলভাগের উপরে বায়ু অত্যন্ত উত্তপ্ত থাকে, শীতকালে তা তত দ্রুত শীতল হয়। এরূপ জলবায়ুকে চরমভাবাপন্ন জলবায়ু বলে আফগানিস্তানে চরম আবহাওয়া দেখা যায়। অর্থাৎ এটি সমুদ্র থেকে দূরে অবস্থিত বলে এখানে গ্রীষ্মে অত্যধিক উত্তাপ এবং শীতে অত্যধিক শীত অনুভূত হয়। আবার, বাংলাদেশে সমুদ্র উপকূলে অবস্থিত বলে সারা বৎসর এই অঞ্চল নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া উপভোগ করে। অর্থাৎ এখানে শীত ও গ্রীষ্মের প্রখরতা অত্যধিক নয়। মধ্য এশিয়া সমুদ্র থেকে বহুদূরে অবস্থিত বলে সেখানে সামুদ্রিক আবহাওয়া পরিলক্ষিত হয়।

৪। **বায়ুপ্রবাহ** (Wind movement) : বায়ুপ্রবাহ দেশের উত্তাপ নিয়ন্ত্রণ করে। বায়ু সমুদ্র থেকে আসার ফলে প্রচুর জলীয় বাষ্প থাকে। ফলে ঐ বায়ু যে অঞ্চলের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয় সেখানে তাপের হ্রাস এবং বৃষ্টিপাত ঘটায়। কিন্তু বায়ু বিরাট স্থলভাগের উপর দিয়ে আসলে তাতে জলীয় বাষ্প থাকে না। শুষ্ক বাতাস তাপের হ্রাস করতে পারে না। ফলে শুষ্ক বায়ু প্রবাহিত অঞ্চলে গ্রীষ্মে উত্তাপ এবং শীতে প্রচণ্ড শীত অনুভূত হয়।

৫। **বৃষ্টিপাত** (Rainfall) : বায়ুপ্রবাহের সাথে প্রচুর জলীয় বাষ্প থাকলে বৃষ্টিপাত হয়। বৃষ্টিপাত আবহাওয়া ও উদ্ভিদ অঞ্চলের উপর প্রভাব বিস্তার করে। বৃষ্টিপাতের ফলে কোন স্থানের উত্তাপ কমে যায়। বাংলাদেশে জুলাই মাসে বৃষ্টিপাত হয় বলে এ সময় পূর্ববর্তী জুন মাস অপেক্ষা কম উষ্ণ থাকে। নিরক্ষ অঞ্চলে সারা বৎসর প্রচুর সূর্যকিরণ পড়ে কিন্তু বৃষ্টিপাতের জন্য সেখানে গরম অপেক্ষাকৃত কম অনুভূত হয়।

৬। **সমুদ্র স্রোত** (Ocean Current) : সমুদ্রস্রোত পরোক্ষভাবে দেশের আবহাওয়ার উপর প্রভাব বিস্তার করে। শীতল স্রোতের উপর দিয়ে প্রবাহিত বায়ু শীতল এবং উষ্ণ স্রোতের উপর দিয়ে প্রবাহিত বায়ু উষ্ণ হয়। এই বায়ু প্রবাহিত হয়ে দেশের অভ্যন্তরে আবহাওয়ার উপর

প্রভাব বিস্তার করে। দক্ষিণ সাগর থেকে আগত শীতল স্রোত দক্ষিণ আমেরিকার, দক্ষিণ অফ্রিকার এবং অস্ট্রেলিয়ার পশ্চিম উপকূল দিয়ে প্রবাহিত হবার সময় ঐ সকল স্থানের বায়ুকে শীতল করে। এরই প্রভাবে এ অঞ্চলের সমুদ্র উপকূলের আবহাওয়া শীতল থাকে। উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোতের প্রভাবে সারা বছর ইউরোপের উত্তর-পশ্চিম উপকূল উষ্ণ এবং শীতল লাব্রাডর স্রোতের প্রভাবে উত্তর আমেরিকার পূর্ব উপকূল শীতল থাকে। উষ্ণ স্রোতের উপর থেকে আগত উষ্ণ বায়ু শীতল স্রোতের সংস্পর্শে এসে সেখানে কুয়াশার সৃষ্টি করে।

৭। **পর্বতের অবস্থান** (Position of Mountain) : পর্বতের অবস্থান বায়ুর গতি নিয়ন্ত্রিত করে। বয়ুপ্রবাহের মুখে পর্বত থাকলে বায়ুগতি পরিবর্তিত করে অন্যদিকে প্রবাহিত হয়। প্রত্যায়নবায়ু বা পশ্চিমা বায়ু প্রবাহের মুখে যদি কোন পবর্ত আসে তবে বায়ু অন্যদিকে বেঁকে যায়। বিশেষ করে দীর্ঘ পর্বতশ্রেণির উভয় পার্শ্বে বিভিন্ন আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়। সমুদ্রের ধারে অবস্থিত হলে এটি প্রাচীরের ন্যায় বর্তমান থেকে সমুদ্রের প্রভাবকে দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশের পথে বাধা সৃষ্টি করে। যদি সমুদ্র থেকে স্থলভাগের দিকে বাতাস প্রবাহিত হয় তাহলে কেবল পর্বতের এক পার্শ্বে বৃষ্টিপাত ঘটায়। অবার পর্বতের নিকটবর্তী স্থানে দূরবর্তী স্থান অপেক্ষা অধিক বৃষ্টি হয়। আমাজান নদীর নিম্ন অববাহিকা অপেক্ষা এন্ডিজ পর্বতের নিকট উচ্চ অববাহিকা অঞ্চলে অধিক বৃষ্টি হয়। পেনাইন পর্বত শ্রেণির নিকট ম্যাঞ্চেস্টারে লিভারপুল অপেক্ষা অধিক বৃষ্টিপাত হয়।

পর্বত কোন স্থানের তাপের উপরও প্রভাব বিস্তার করে। ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তরে হিমালয় পর্বত অবস্থিত থাকায় গ্রীষ্মের দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু তাতে বাধা প্রাপ্ত হয়। ফলে হিমালয়ের উত্তরাংশের দেশগুলো গ্রীষ্মের মৌসুমীবায়ু না পাওয়ায় শুষ্ক বৃষ্টিচ্ছায় (Rain Shadow) অঞ্চলে পরিণত হয়েছে। আবার শীতকালে উত্তর দিক থেকে শীতল বাতাস প্রবাহিত হয়ে হিমালয় পর্বতে বাধাপ্রাপ্ত হয়। ফলে হিমালয়ের দক্ষিণের ভারতীয় উপমহাদেশ প্রবল শীতল প্রবণতা থেকে রক্ষা পেয়েছে। হিমালয়ের অবস্থানের জন্যই এরূপ ঘটে থাকে।

৮। **ভূমির ঢাল** (Slope of the land) : ভূমি সূর্যের দিকে ঢালু থাকলে সূর্যকিরণ লম্বভাবে পতিত হয় এবং ভূমি অধিক উত্তপ্ত হয়। সূর্যের বিপরীত দিকে ঢালু জমিতে সূর্যরশ্মি হেলে পড়ে বলে উষ্ণতা কম থাকে। আল্পস্ ও হিমালয়ের দক্ষিণ ঢালে উত্তাপ্ত ও বৃষ্টিপাত অধিক বলে উৎকৃষ্ট শ্রেণির বৃহৎ উদ্ভিদ জন্মে। কিন্তু এই পর্বদ্বয়ের উত্তর পার্শ্বে অপেক্ষাকৃত কম সূর্যকিরণ পায় বলে সেখানে বৃষ্টিপাত ও উদ্ভিদ উভয়ই কম। সাইবেরিয়ার ভূমি উত্তরে ঢালু বলে এটি কম সূর্যতাপ পায়।

৯। **মৃত্তিকার উপাদান** (Fctors of the soil) : মাটির উপাদানের উপর আবহাওয়া নির্ভর করে। প্রস্তর ভূমি অপেক্ষা কোমল মৃত্তিকা কম উষ্ণ ও কম শীতল হয়। পললযুক্ত ও জঙ্গলময় মৃত্তিকা অধিক পানি ধারণ ও তাপ সংরক্ষণ করতে পারে বলে এস্থানে গ্রীষ্মকালে বা দিবাভাগে অধিক উত্তপ্ত হয় না এবং রাত্রে শীতকালেও অধিক শীত অনুভূত হয় না। কিন্তু শুষ্ক বালুকাময় বা প্রস্তরময় ভূমি পানি ও তাপ ধরে রাখতে পারে না। সেজন্য ঐসব স্থানে গ্রীষ্মে ও দিনের বেলা অত্যন্ত উষ্ণ হয় এবং রাত্রে ও শীতকালে অত্যন্ত শীতল হয়। বাংলাদেশ অপেক্ষা

পাকিস্তানে অদিক শীত ও তাপ অনুভূত হয়। পেশোয়ার উপত্যাকা শুষ্ক এবং গ্রীষ্মে অধিক উষ্ণ ও শীতকালে অধিক শীতল হয়।

১০। **অরণ্যের অবস্থান** (Presence of Forest) : ভূমির উপর গভীর জঙ্গল বা অরণ্য থাকলে সেখানে তাপ বিকিরণ কম হয় বলে ভূমি আর্দ্র থাকে। এজন্য সেই অঞ্চল বেশি উষ্ণ বা বেশি শীতল হয় না। বনভূমি অঞ্চলে বাষ্পীভবনের সাহায্যে বায়ু অধিক জলীয় বাষ্প সংগ্রহ করে। এ জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয়ে বৃষ্টিপাত ঘটায়। সময় সময় বনভূমি ঘূর্ণবাত বা ঝড়ঝঞ্ঝার গতি প্রতিহত করে। বনভূমি দ্বারা আচ্ছাদিত অঞ্চলে সহজে সূর্যরশ্মি পৌছায় না বলে বনভূমি অঞ্চল বনহীন অঞ্চল অপেক্ষা শীতল হয়।

১১। **জলীয় বাষ্প** (Water Vapour) : জলীয় বাষ্প বায়ুমণ্ডলের তাপ ধারণের সহায়তা করে। অধিক জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ু পৃথিবীর থেকে তাপ বিকিরণে বাধা সৃষ্টি করে। সেজন্য মেঘাচ্ছন্ন রাত্রিতে নির্মল রাত্রি অপেক্ষা অধিক গরম অনুভূত হয়। বায়ুতে জলীয় বাষ্প অধিক পরিমাণে থাকলে তা দিনে খুব উষ্ণ ও রাতে খুব শীতল হতে পারে না। মরু অঞ্চলের বাতাসে জলীয় বাষ্প কম বলে সেখানে দিনে খুব গরম ও রাত্রে খুব শীত অনুভূত হয়।

১২। **বায়ুমণ্ডলের গভীরতা** (Depth of the Atmosphere) : অধিক বায়ুস্তর ভেদ করে আসার সময় সূর্যতাপের পরিমাণ কমে যায়। সকাল ও বিকালে সূর্যরশ্মি অধিক বায়ুস্তর ভেদ করে পৃথিবীতে আসে বলে তার তাপ কম অনুভূত হয়। কিন্তু মধ্যাহ্নে অপেক্ষাকৃত অল্প বায়ুস্তর ভেদ করে আসে বলে তখন তাপের পরিমাণ অধিক থাকে।

১৩। **দিবা ভাগের তারতম্য** (Length of the day) : দিবাভাগে সূর্যের তাপে ভূ-পৃষ্ঠ ও বায়মণ্ডল উত্তপ্ত হয় এবং রাতে তাপ বিকিরণ করে পৃথিবী শীতল হয়। দিন বড় হলে ভূ-পৃষ্ঠ অধিক উত্তপ্ত হয় এবং ছোট রাত্রে তাপ বিকিরণের পরিমাণ কম থাকায় বায়মণ্ডল ক্রমান্বয়ে উত্তপ্ত হতে থাকে। কিন্তু দিন ছোট হলে দিনে পৃথিবী যে পরিমাণ তাপ গ্রহণ করে উত্তপ্ত হয় রাত্রে তা বিকিরণ করে পৃথিবী ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে। গ্রীষ্মকালে দিন বড় ও রাত্রি ছোট হওয়ায় অধিক গরম এবং শীতকালে দিন ছোট এবং রাত বড় হওয়ায় অধিক শীত অনুভূত হয়।

১৪। **সূর্যরশ্মির পতন** (Sun Shine) : সূর্যরশ্মি লম্বভাবে ও তির্যকভাবে পতিত হওয়ার জন্য বায়ুমণ্ডল ও ভূ-পৃষ্ঠের উষ্ণতার তারতম্য হয়ে থাকে। সূর্যরশ্মি যত হেলে পড়বে বায়ুমণ্ডল তত কম উষ্ণ হবে। তির্যকভাবে পতিত সূর্যরশ্মি অধিকস্থানে ছড়িয়ে পড়ে এবং অধিক বায়ুস্তর ভেদ করে আসে। লম্বভাবে পতিত সূর্যরশ্মি অপেক্ষাকৃত অল্পস্থানে ছড়িয়ে পড়ে বলে তার তাপে ভূপৃষ্ঠ দ্রুত উত্তপ্ত হয়।

৩.২২ বারিমণ্ডল ও এর বিবরণ

ভূমিকা : মানবজীবনের উপর বারিমণ্ডল প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। ভিন্ন ভিন্ন তাপবিশিষ্ট জলস্রোতের উলম্ব ও আনুভূমিক গতির ফলে উপস্থিত বায়ুর

আর্দ্রতা ও তাপমাত্রার পরিবর্তন হয়। ফলে বায়ুতে উচ্চচাপ ও নিম্নচাপ মণ্ডলের সৃষ্টি হয়। ভূ-পৃষ্ঠের সকল প্রকার বায়ুপ্রবাহে, বৃষ্টি ও তুষারপাত এবং জলবায়ু ও আবহাওয়া সম্পর্কিত সকল বিষয় এ চাপমণ্ডলের সঙ্গে জড়িত। উপকূলীয় অঞ্চলের জলবায়ুতে উষ্ণ ও শীতল সমুদ্রস্রোতের প্রভাব অপরিসীম। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সামুদ্রিক পরিবহণের উপর অতি মাত্রায় নির্ভরশীল। আর তাই বারিমণ্ডল ও সমুদ্রের তলদেশ সম্পর্কে আমাদের সাধারণ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। সাধারণভাবে বলা যায় যে, পৃথিবীর বায়বীয় অবস্থা হতে বর্তমান কঠিন অবস্থায় রূপান্তরের সময় ভূ-আন্দোলনের ফলে ভূ-পৃষ্ঠ অসমানভাবে সংকুচিত হয়েছে। ফলে ভূ-পৃষ্ঠের কিছু অংশ বেশ উঁচু এবং কিছু অংশ বেশ নিচু। ভূ-পৃষ্ঠের এই উঁচু অংশসমূহকে স্থলমণ্ডল (Landmasses) এবং পানিসঞ্চিত অংশসমূহকে বারিমণ্ডল (Hydrosphere) বলে।

স্থল ও জলভাগের বিন্যাস : ভূ-পৃষ্ঠের শতকরা প্রায় ৭১ ভাগ বা প্রায় ৩৬২.৫ মিলিয়ন বর্গকিলোমিটার জলমগ্ন। অবশিষ্ট শতকরা ১৯.২ ভাগ স্থল। এর থেকে বুঝা যায় যে, স্থলভাগের পরিমাণ পৃথিবীর মোট আয়তনের এক তৃতীয়াংশ অপেক্ষা অনেক কম। যদি পৃথিবী পৃষ্ঠে উঁচু এবং নিচু স্থান না থাকত তবে বারিমণ্ডলের এই বিরাট পানিরাশি পৃথিবী পৃষ্ঠের সর্বত্র প্রায় দু'মাইল গভীর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকত।

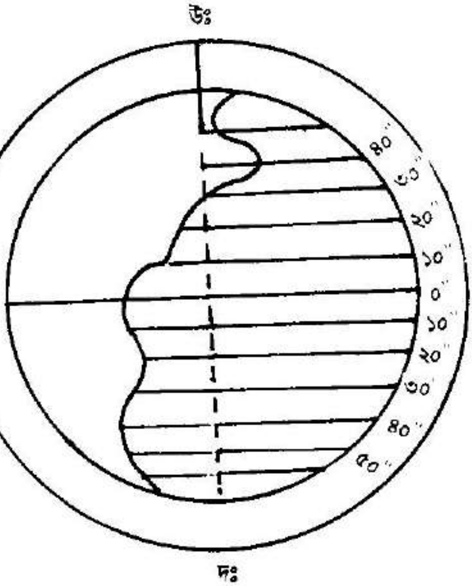

চিত্র : ৬৮ জল ও স্থলের বিন্যাস

জল ও স্থলের বিন্যাস

পৃথিবী পৃষ্ঠের স্থলভাগ কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে আছে। এর একেকটি খন্ডকে মহাদেশ বলে। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে এরকম সাতটি মহাদেশ আছে। যেমন — এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও এন্টার্কটিকা। এ সাতটি মহাদেশের মধ্যে এশিয়া সবচেয়ে বড় এবং অস্ট্রেলিয়া সবচেয়ে ছোট। পৃথিবী পৃষ্ঠের দিকে লক্ষ্য করলে নিচের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়।

চিত্র : ৬৯ জল ও স্থল ভাগ

ক) উত্তর গোলার্ধে স্থলভাগ

চিত্র : ৭০, জল ও স্থল ভাগ

খ) দক্ষিণ গোলার্ধে জলভাগ

জল ভাগ ও স্থল ভাগ

জল ভাগ → দক্ষিণ গোলার্ধে বেশি

স্থল ভাগ → উত্তর গোলার্ধে বেশি।

১। দক্ষিণ গোলার্ধে স্থলভাগের চাইতে জলভাগ বেশি এবং উত্তর গোলার্ধে স্থলভাগের পরিমাণ বেশি।

২। সুমেরু বৃত্তের চারদিকে স্থলভাগের বৃত্তাকারে অবস্থিত।

৩। স্থলভাগের পূর্ব-পশ্চিম বিস্তৃতি অপেক্ষা উত্তর-দক্ষিণ বিস্তৃতি বেশি। অপরপক্ষে, পানিরাশি দক্ষিণে প্রশস্ত এবং উত্তরে সংকীর্ণ হয়েছে। বারিমন্ডল পৃথিবীর বিভিন্ন স্থলভাগকে বেষ্টন করে রয়েছে। পৃথিবীর মানচিত্রের দিকে লক্ষ্য করলে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, পৃথিবী পৃষ্ঠের শতকরা চুয়াল্লিশ ভাগ এলাকায় সমুদ্রের বিপরীত দিকে সমুদ্র, শতকরা এক ভাগের কিছু বেশি এলাকায় মহাদেশের বিপরীত দিকে মহাদেশ এবং অবশিষ্ট সমস্ত এলাকায় মহাদেশের বিপরীত দিকে সমুদ্র।

ভূ-বিজ্ঞানীগণ মনে করেন যে, ভূ-পৃষ্ঠের সমস্ত স্থলভাগ বহুকাল আগে কোন এক সময় অখন্ড ছিল। পরবর্তীকালে সেই অখন্ড স্থলভাগে ফাটল দেখা দেয় এবং স্থলভাগ ছোট ছোট অংশে বিভক্ত হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। যান্ত্রিক ও রাসায়নিক পদ্ধতিতে মহাদেশগুলোর পার্শ্বদেশ ক্ষয়ীভূত হলেও বর্তমানে পৃথিবী পৃষ্ঠের মহাদেশগুলো পাশাপাশি সাজালেও এরা পরস্পর মিলে যায়।

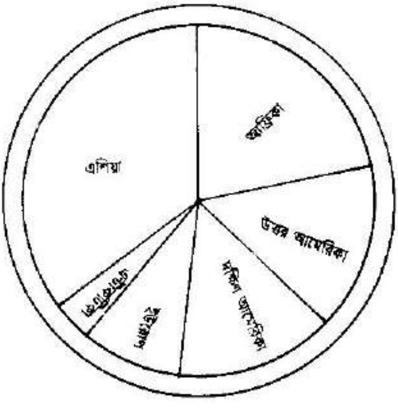

চিত্র : ৭১. বারিমন্ডলের বিভাগ ও গভীরতা (ক)

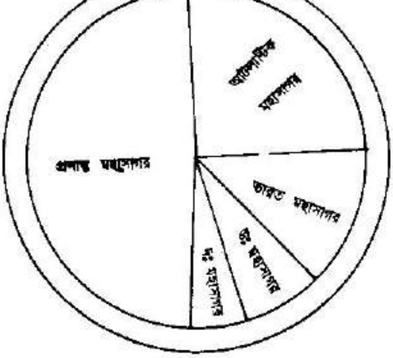

চিত্র : ৭২. বারিমন্ডলের বিভাগ ও গভীরতা (খ)

বারিমন্ডলের বিভাগ ও গভীরতা

আয়তন, গভীরতা ইত্যাদির পার্থক্যের ভিত্তিতে বারিমন্ডলকে চারভাগে ভাগ করা হয়। যথা :

১। মহাসাগর : উন্মুক্ত বিস্তীর্ণ জলরাশিকে মহাসাগর (Ocean) বলে।

২। সাগর : মহাসাগর হতে তুলনামূলকভাবে ক্ষুদ্রাকার জলরাশিকে সাগর (Sea) বলে।

৩। উপসাগর : তিনদিকে স্থলভাগ দ্বারা পরিবেষ্টিত জলরাশিকে উপসাগর (Bay) বলে।

৪। হ্রদ : চতুর্দিকে স্থলভাগ দ্বারা পরিবেষ্টিত জলভাগকে হ্রদ (Lake) বলে।

বারিমন্ডলের গড় গভীরতা প্রায় ৩৮১০ মিটার। গভীরতা ও অক্ষাংশ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বারিমন্ডলের উষ্ণতা হ্রাস পেতে দেখা যায়। মহাসাগরের উপরিভাগ হতে ৩৬৬ মিটার গভীর সীমারেখা পর্যন্ত তাপ হ্রাসের হার অতি দ্রুত। পরবর্তী পর্যায়ে ২১৯৫ মিটার গভীর সীমারেখা পর্যন্ত ধীরে ধীরে তাপ কমতে থাকে। এরপর সাগরতলের আরও গভীর অঞ্চলে তাপ প্রায় অপরিবর্তিত থাকে। সমুদ্র সব জায়গায় সমান গভীর নয়। এর কোন কোন স্থান অত্যন্ত গভীর, আবার কোন কোন স্থানের গভীরতা খুবই কম। সমুদ্রের সর্বাধিক গভীরতা ৬ মাইল এবং গড় গভীরতা ১২,০০০ ফুট।

মহাসাগর : অবস্থান, আয়তন ও গভীরতা অনুসারে বারিমন্ডলের বৃহত্তম ও গভীরতম অংশকে মহাসাগর বলে। মহাসাগরগুলোর সব জায়গা সমান গভীর নয়। কোন কোন জায়গায় সমুদ্রের গভীরতা এত বেশি যে, পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু পর্বতশৃঙ্গকে সেখানে ডুবিয়ে দিলে তা সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে প্রায় অর্ধমাইল নিচে থাকবে।

ভূ-পৃষ্ঠের বড় বড় অংশগুলো ক্রমশ নেমে গিয়ে সাগরের সাথে মিশেছে। পৃথিবীতে মোট পাঁচটি মহাসাগর আছে। যথা :

১। **প্রশান্ত মহাসাগর** (The Pacific Ocean)

২। **আটলান্টিক মহাসগার** (The Atlantic Ocean)

৩। **ভারত মহাসগার** (The Indian Ocean)

৪। **উত্তর মহাসাগর** (The Arctic Ocean)

৫। **দক্ষিণ মহাসাগর** (The Antartic Ocean)

পাঁচটি মহাসাগরের মোট আয়তন প্রায় ১৪ কোটি বর্গমাইল এবং গভীরতা গড়ে প্রায় ২$\frac{১}{২}$ মাইল। এদের মধ্যে প্রশান্ত মহাসাগর বৃহত্তম ও গভীরতম, আটলান্টিক মহাসাগর আয়তনে দ্বিতীয়, কিন্তু গভীরতায় তৃতীয়, ভারত মহাসাগর আয়তনে তৃতীয়, কিন্তু গভীরতায় দ্বিতীয়।

উত্তর ও দক্ষিণ মহাসাগরের আয়তন প্রায় সমান, কিন্তু দক্ষিণ মহাসাগরের গভীরতা বেশি। এখানে বিভিন্ন মহাসাগরগুলোর তুলনামূলক আয়তন ও গভীরতা দেখান হলো।

মহাসাগর	অবস্থান	আয়তন	গড় গভীরতা	উপকূল
প্রশান্ত মহাসাগর	পশ্চিম উপকূলে এশিয়া এবং পূর্ব উপকূলে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা	৬৭৭ লক্ষ বর্গ মাইল	১৪,০০০ ফুট প্রায় ২৫০০ ফ্যাদম	অভগ্ন, অনেকটা সরল, বন্দর কম, দ্বীপ বেশি।
আটলান্টিক মহাসাগর	পূর্ব উপকূলে ইউরোপ ও আফ্রিকা এবং পশ্চিম উপকূলে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা	৩৪৫ লক্ষ বর্গমাইল	১২,০০০ ফুট	ভগ্ন, বন্দর বেশি, দ্বীপ অপেক্ষাকৃত কম।
ভারত মহাসাগর	এশিয়ার দক্ষিণে	২৭০ লক্ষ বর্গমাইল	১২,৮০০ ফুট	খুব ভগ্ন নয়, বন্দর বেশি নাই, দ্বীপ অনেক।
উত্তর মহাসাগর	সুমেরুর চারিদিকে	৫৮ লক্ষ বর্গমাইল	২,৭০০ ফুট	অভগ্ন, বরফাচ্ছন্ন, বন্দর খুব কম।
দক্ষিণ মহাসাগর	এন্টার্কটিকা মহাদেশের উত্তরে।	৫৭ লক্ষ বর্গমাইল	৪,৯২০ ফুট	অভগ্ন, বরফাচ্ছন্ন বন্দর খুব কম।

প্রশান্ত মহাসাগরের সর্বাধিক গভীরতা ৩৫,৪১০ ফুট, আটলান্টিক মহাসাগরের সর্বাধিক গভীরতা ৩০,১৪৩ ফুট, ভারত মহাসাগরের সর্বাধিক গভীরতা ২২,৯৬০ ফুট, উত্তর মহাসাগরের সর্বাধিক গভীরতা ১৭,৮৫০ ফুট এবং দক্ষিণ মহাসাগরের সর্বাধিক গভীরতা ১৮,৮৫০ ফুট।

মহাসাগরের ভূ-প্রকৃতি ও গভীরতা

বৈচিত্র্যপূর্ণ সাগরতলের অনেক তথ্য আজও রহস্যাবৃত। বৈজ্ঞানিকেরা চেষ্টা করছেন বটে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত সাগরতল সম্পর্কে খুব অল্পই আমাদের জানা। মহাসাগর ও সাগরগুলো বিভিন্ন মহাদেশকে এমনভাবে ঘিরে রয়েছে যে, এদের প্রত্যেকটি একটি দ্বীপে পরিণত হয়েছে। এই মহাদেশগুলো সমুদ্র হতে হঠাৎ খাড়া হয়ে ওঠেনি। কাজেই সমুদ্রের তটরেখাই মহাদেশের সীমা নয়। মহাদেশের উপকূলভাগের কিছু অংশ ধীরে ধীরে ঢালু হয়ে সাগরের জলরাশির মধ্যে নেমে গিয়েছে। মহাসাগরগুলোর পরস্পরের মধ্যে আয়তন ও গভীরতার পার্থক্যের জন্যই এদের তলদেশের ভূ-প্রকৃতিতে (Topography of the Ocean Floor) যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। মহাসাগরের তলদেশ থালার মতো সমতল নয়। পৃথিবী পৃষ্ঠের স্থলভাগের মতো সমুদ্রতল ও উঁচু নিচু ও অসমতল। সমুদ্রতলে রয়েছে পাহাড়, পর্বত, আগ্নেয়গিরি, মালভূমি, গভীরখাত

প্রভৃতি। তবে স্থলভাগের তুলনায় সমুদ্রতলের বন্ধুরতা অনেক কম। উনবিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীর বিভিন্ন সাগর, মহাসাগরের তলদেশ সম্পর্কে যথেষ্ট অনুসন্ধান চালানো হয়েছে। এ বিষয়ে কোপেনহেগেনে অবস্থিত সামুদ্রিক গবেষণার আন্তর্জাতিক সমিতির তত্ত্বাবধানে স্যর জন মারে নানসেন, আমুনসেন প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গের অনুসন্ধান কাজ এবং চ্যালেঞ্জার, টুসকারোয়া, মিটিয়র প্রভৃতি বিখ্যাত জাহাজের অভিযান উল্লেখযোগ্য। এর ফলে একদিকে যেমন বারিমন্ডল সম্পর্কে অনেক অজানা বিষয় জানা সম্ভব হয়েছে, অপরদিকে তেমনি মহাদেশগুলোর গঠন সম্পর্কের ধারণা লাভ করা সম্ভব হয়েছে। প্রাচীনকালে লোহার তারের মাথায় ভারী জিনিস বেঁধে তা জাহাজ থেকে পানির মধ্যে নামিয়ে সমুদ্রের গভীরতা মাপা হতো বর্তমানে গভীরতা স্থির করা হয় শব্দ-তরঙ্গের সাহায্যে। এই শব্দ-তরঙ্গ বারিরাশির মধ্যে দিয়ে প্রতি সেকেণ্ডে ৪,৮৪০ ফুট গতিতে নিচে নামে এবং ফিরে আসে। বৈদ্যুতিক টেলিফোনের সাহায্যে কোন তরঙ্গের যাত্রা হওয়ার মুহূর্ত হতে ফিরে আসা পর্যন্ত সময়কে দুভাগে ভাগ করে তার সাহায্যে গভীরতা নির্ভুলভাবে স্থির করা সম্ভব হচ্ছে। গভীরতা অনুসারে মহাসাগরের বিভিন্ন অংশকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়। নিচে এই বিভাগগুলো সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

১। (ক) তটদেশীয় অঞ্চল (Littoral Zone) : জোয়ারভাটার সময় তীরভূমির যে স্থান পর্যন্ত পানি উঠানামা করে, তাকে তটদেশীয় অঞ্চল বলে। স্থল হতে সাগর পর্যন্ত এই অঞ্চল প্রায় দু'মাইল প্রশস্ত হয়। এই অঞ্চলের মোট আয়তন ১০,০০০ বর্গমাইল। এই অঞ্চলকেই সমুদ্রতট বলা হয়।

১। (খ) ঝিনুক অঞ্চল (Neritic Zone) : গ্রিক Neritos শব্দ হতে Neritic শব্দের উত্তপত্তি। Neritos অর্থ ঝিনুক। ভাটার সময়ের পানির রেখা হতে আরম্ভ করে মহীসোপানের প্রান্ত পর্যন্ত এই অঞ্চল বিস্তৃত। এই অঞ্চলের মোট আয়তন প্রায় ১০০ লক্ষ বর্গমাইল। এখানে ঢেউ এর কাজ ও পানির বিন্যাস সুস্পষ্ট।

২। মহীসোপান Continental Shelf) : মহাদেশগুলোর প্রান্তভাগ অল্প অল্প ঢালু হয়ে সমুদ্রের মধ্যে নেমে গিয়েছে। এই রকম যে সকল অংশে সমুদ্রের গভীরতা ১৮০ মিটার বা ৬০০ ফুটের বেশি নয়, এই রকম স্বল্প গভীর ক্রমনিম্ন নিমজ্জিত অংশকে মহীসোপান বলে। এই সকল অংশ ধীরে ধীরে ১° এর চাইতে কম কৌণিকভাবে সমুদ্রের দিকে ঢালু হয়ে যায়। এই মহীসোপানকেই সাধারণত মহাদেশগুলোর শেষপ্রান্ত বলে ধরা হয়। মহাদেশের উপকূলের সমভূমি যত বেশি বিস্তৃত, সেখানকার মহীসোপান তত প্রশস্ত। ইউরেশিয়ার উত্তরে বিস্তৃত সমভূমি থাকায় উত্তর মহাসাগরের মহীসোপান স্থানে স্থানে প্রায় ৮০০ মাইল বিস্তৃত। মহাদেশের উপকূলে মালভূমি, পর্বত প্রভৃতি উচ্চভূমি থাকলে মহীসোপান সংকীর্ণ এবং নিকটস্থ সাগর খুব গভীর হয়। আফ্রিকা মহাদেশের প্রায় সম্পূর্ণ অংশ মালভূমি বলে এর উপকূলের আটলান্টিক ও ভারত মহাসাগরের মহীসোপান অত্যন্ত সংকীর্ণ। ইউরোপের উত্তর-পশ্চিমে পৃথিবীর বৃহত্তম

মহীসোপান রয়েছে। মহীসোপানের দ্বিতীয় বৃহত্তম অংশ উত্তর আমেরিকার পূর্ব উপকূলে দেখতে পাওয়া যায়। স্থলভাগ হতে প্রস্তর, কাকর, বালু, কাদা ইত্যাদি নদী বা বায়ু দ্বারা বাহিত হয়ে বিস্তৃত মহীসোপানে সঞ্চিত হয় এবং কালক্রমে পাললিক শিলায় পরিণত হয়।

৩। মহীঢাল (Continental Slope) : মহীসোপানের শেষ প্রান্ত হতে ভূ-ভাগ হঠাৎ খাড়াভাবে নেমে গভীর সমুদ্রগর্ভে পৌঁছেছে। এই ঢালু অংশকেই মহীঢাল বলা হয়। এই মহীঢালই মহাদেশগুলোর প্রকৃত শেষ সীমা। মহাসাগরগুলোর এইরকম গভীর অংশে জীবজন্তুর দেহাবশেষ ও অন্যান্য জিনিস সঞ্চিত হয়।

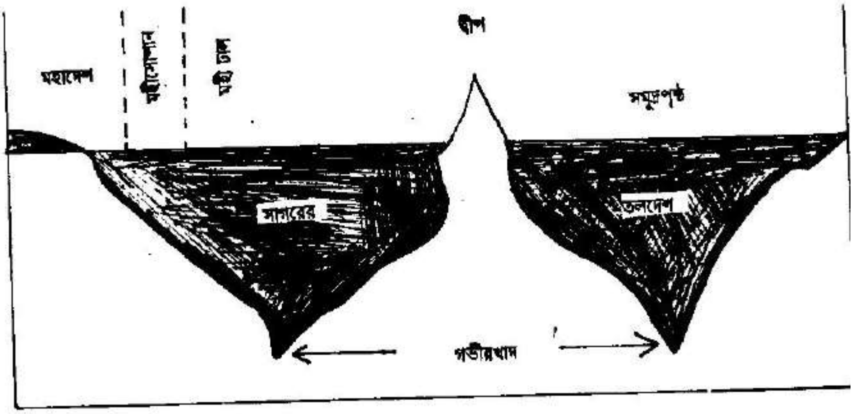

চিত্র : ৭৩. সমুদ্র তলের গভীরতা

৪। গভীর সমুদ্রের সমভূমি (Abyssal Plain) : মহীঢাল ক্রমশ গভীর সমুদ্রগর্ভের যেখানে এসে মিলিত হয়, সেই অঞ্চলকে গভীর সমুদ্রের সমভূমি বলা হয়। এই অঞ্চল নামে সমতল হলেও প্রকৃতপক্ষে উঁচু-নিচু এবং সমুদ্রতলের অধিকাংশই এই অংশ নিয়ে গঠিত। এই অঞ্চলের গভীরতা সাধারণ ১২,০০০ ফুট হতে ১৮,০০০ ফুট। সাগরতলের সমপ্রায় ভূমির আয়তন ভূপৃষ্ঠের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ।

৫। গভীর সমুদ্রখাত (Troughs or Trenches) : গভীর সমুদ্রের সমভূমি অঞ্চলে মাঝে মাঝে আরো গভীর খাত দেখতে পাওয়া যায়। এদের গভীর সমুদ্র খাত বলা হয়। এই গভীর সমুদ্রখাত স্বল্প পরিসর স্থান জুড়ে থাকে এবং সমুদ্রতলের প্রান্তভাগেই প্রধানত দেখতে পাওয়া যায়। গভীর সমুদ্রখাত সাধারণত আগ্নেয়গিরি ও ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চলেই বেশি দেখতে পাওয়া যায়। প্রশান্ত মহাসাগরের তলদেশের পশ্চিম প্রান্তে জাপানের অদূরে টাস্কারোরা খাত (২৭,[illegible] ফুট), ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের অদূরে মিন্ডানাও খাত (৩২,২১০ ফুট), এবং পূর্বপ্রান্তে পে[illegible]

অদূরে আটাকামা খাত, ভারত মহাসাগরের পূর্ব তীরের সুন্ডাখাত (২২,৯৬০ ফুট), আটলান্টিক মহাসাগরের পোর্টোরিকো খাত (২৮,০০০ ফুট) উল্লেখযোগ্য গভীর সমুদ্রখাত।

সামুদ্রিক অবক্ষেপ (Ocean Deposits) : ভূ-পৃষ্ঠের দেশগুলো চারদিক হতে সাগর, মহাসাগর দিয়ে পরিবেষ্টিত হওয়ায় মহাদেশগুলোর প্রত্যেকটিকে এক একটি দ্বীপের মতো মনে হয়। শুধু এশিয়ার পশ্চিম অংশে এবং ইউরোপের পূর্ব অংশে কোন মহাসাগর নেই। কিন্তু সমস্ত ইউরেশিয়া ভূ-খন্ড বিভিন্ন মহাসাগর দিয়ে পরিবেষ্টিত। পৃথিবীপৃষ্ঠের স্থলভাগ ও জলরাশির এ রকম অবস্থানের ফলে স্থলভাগের অন্তর্গত বিভিন্ন দেশ, মহাদেশ, দ্বীপ, দ্বীপপুঞ্জ ইত্যাদি হতে শিলাখন্ড, কাঁকর, বালি, কাদা, চুন প্রভৃতি বিভিন্ন উপাদান নদীপ্রবাহ, বৃষ্টিপাত, বায়ুপ্রবাহ ইত্যাদির মাধ্যমে ক্ষয়িত ও বাহিত হয়ে এইসব উপাদানের বেশিরভাগ সাগর, মহাসাগরের তলদেশে সঞ্চিত হয়। এদেরকে সামুদ্রিক অবক্ষেপ বলে। স্থল ও জলরাজির এসব পদার্থ সাগর, মহাসাগরের তলদেশে দীর্ঘদিন ধরে অত্যন্ত পুরু স্তরে সঞ্চিত হয় এবং চাপ ও অভ্যন্তরীণ তাপে কালক্রমে এগুলো পাললিক শিলায় রূপান্তরিত হয়। সামুদ্রিক অবক্ষেপ দুপ্রকার হয়। যথা —

১। অজৈব পদার্থের অবক্ষেপ (Non-organic Deposits)

২। জৈব পদার্থের অবক্ষেপ (Organic Deposits)

১। অজৈব পদার্থের অবক্ষেপ

নদীপ্রবাহ, বৃষ্টিপাত, বায়ুপ্রবাহ ইত্যাদি প্রাকৃতিক শক্তির মাধ্যমে পৃথিবী পৃষ্ঠ সব সময় ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে। জলস্রোত ও বায়ুপ্রবাহ এসব ক্ষয়িত পদার্থ বহন করে সমুদ্রের উপকূলবর্তী মহীসোপান ও মহীঢাল অঞ্চলে সঞ্চিত করে। ভূ-পৃষ্ঠের এই সব ক্ষয়িত পদার্থই অজৈব পদার্থ। অগভীর সমুদ্রতলে সঞ্চিত এরকম অজৈব পদার্থকে নিকটতম সমুদ্র অবক্ষেপ (Terrigenous Deposit) বলা হয়। এসব পদার্থের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে নীলবর্ণের কর্দম (Bluemud) পরিলক্ষিত হয়।

২। জৈব পদার্থের অবক্ষেপ

সাগর, মহাসাগরে মাছ, কীট, ঝিনুক, শামুক প্রভৃতি জীবজন্তু বাস করে এবং বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ জন্মগ্রহণ করে। এদের দেহাবশেষ সমুদ্রের তলদেশে সঞ্চিত হয়। এসব সঞ্চিত পদার্থকে জৈব অবক্ষেপ বলা হয়। সাধারণত সমুদ্রের গভীরতম অংশকেই জৈব পদার্থ বেশি পরিমাণে সঞ্চিত হয়। এজন্যই এসব অবক্ষেপক দূর সমুদ্র অবক্ষেপ (Pelagic Deposits) বলা হয়ে থাকে।

বিভিন্ন রকমের উপাদান সমুদ্রের বিভিন্ন অংশে সঞ্চিত হয়। সুতরাং স্বভাবতই এদের মধ্যে পার্থক্য থাকে। সমুদ্রের গভীরতা ও এসব উপাদানের পার্থক্য অনুযায়ী সমুদ্রের সঞ্চয়সমূহকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। সঞ্চিত পদার্থের ও বিভাগগুলোর মধ্যে কোন

সুনির্দিষ্ট সীমারেখা নেই। এদের যেকোন বিভাগের মধ্যে পাশাপাশি অন্য বিভাগের অনেক উপাদান দেখা যায়। এরকম দুই মধ্যবর্তী স্থান অন্তবর্তী অঞ্চল (Transitional Zone) নামে পরিচিত। পানির গভীরতা অনুসারে মহাসাগরের সঞ্চিত পদার্থকে দুভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যথা —

ক) অগভীর সমুদ্রের অবক্ষেপ (Shallow Water Deposits)

খ) গভীর সমুদ্রের অবক্ষেপ (Deposits of the Deep Ocean)

অগভীর সমুদ্রের অবক্ষেপ

স্থলভাগে ক্ষয়প্রাপ্ত পদার্থগুলো নদীর স্রোত বা বায়ু প্রবাহের মাধ্যমে বাহিত হয়ে অগভীর অংশে সঞ্চিত হয়। এই অগভীর অংশে সাধারণত অজৈব পদার্থ সঞ্চিত হলেও অল্প পরিমাণে জৈব পদার্থও সঞ্চিত হয়ে থাকে। অজৈব পদার্থের মধ্যে প্রধানত ক্ষুদ্র শিলাখন্ড, কাঁকর, অপেক্ষাকৃত বড় আকৃতির নানা জাতীয় বালু ও কাদা এবং জৈব পদার্থ সমূহের মধ্যে প্রবাল, Shelfish, Sea Urchins, ইত্যাদি যেসব প্রাণী অগভীর সমুদ্রে বাস করে, কেবল তাদের দেহাবশেষ হতে উৎপন্ন বিভিন্ন উপাদান অগভীর সমুদ্রের তলদেশে সঞ্চিত হয়। এদেরকে Meritic deposits বলে। অগভীর সমুদ্র সঞ্চয়কে মোটামুটি চারভাগে ভাগ করা হয়।

১। তটদেশীয় সঞ্চয় (Littoral Deposits) : স্থলভাগ ও জররাশির মিলনস্থলের কাছে পানির গভীরতা খুব কম। এটিই মহীসোপানের সবচেয় উচু অংশ। সেজন্য এই অঞ্চলে জোয়ারভাটার বিশেষ প্রভাব দেখা যায়। এই জায়গায় কাঁকর এবং অপেক্ষাকৃত বড় আকৃতির নানাজাতীয় বালু ও কাদা সঞ্চিত হয়।

২। মহীসোপানের সঞ্চয় (Shelf Deposits) : সমুদ্র উপকূলের পরে মহীসোপানের সীমারেখা পর্যন্ত সমস্ত অংশের সমুদ্রের গভীরতা ৬০০ ফুট বা এর চাইতে কম। এই অঞ্চলে সুক্ষ্ম বালুকণা, পলি, কাদা, চুন, প্রবাল প্রভৃতি যে সকল পদার্থ সঞ্চিত হয় তাদেরকে মহীসোপানের সঞ্চয় বলে। এই সঞ্চিত পদার্থগুলো ক্রমশ পাললিক শিলার সৃষ্টি করে। সামুদ্রিক জীবের দেহাবশেষ, সেই সঙ্গে সমুদ্রের তলদেশে সঞ্চিত এবং শিলার অভ্যন্তরে জীবাশ্মরূপে রক্ষিত হয়।

৩। মহীঢালের সঞ্চয় (Bathyal Depositss) : মহীসোপানের পর সমুদ্রের বিস্তীর্ণ অংশ মহীঢালের অন্তর্ভুক্ত। এই অঞ্চলের সঞ্চিত পদার্থের মধ্যে নীল কাদার (Bluemud) পরিমাণই বেশি। এছাড়া লাল কাদা (Red mud), সবুজ কাদা (Green Clay) এবং জায়গায় জায়গায় প্রবাল দেখা যায়। এই কাদার সাথে বিভিন্ন ধাতব পদার্থ থাকায় এই কাদা বিভিন্ন রংয়ের হয়ে থাকে।

৪। **আগ্নেয় পদার্থ সঞ্চয় (Volcanic Deposits) :** আগ্নেয়গিরি বহুল সমুদ্র অঞ্চলে, বিশেষত প্রশান্ত মহাসাগরের দুতীরবর্তী অঞ্চলে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে উৎক্ষিপ্ত লাভা জাতীয় বস্তু মহীসোপান ও মহীঢালে এবং কখনো কখনো সমুদ্রতলদেশে সঞ্চিত হয়।

গভীর সমুদ্রের অবক্ষেপ (Abyssal Deposits of Deep Ocean)

মহীঢালের পর হতে সমুদ্রের গভীর অংশের তলদেশ ও সমুদ্রখাতের সঞ্চয়কে গভীর সমুদ্র অবক্ষেপক Abyssal Deposits বলা হয়। মহাসাগরগুলোর তলদেশের অতি গভীর খাতসমূহের সঞ্চয়ও এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। এজন্য গভীর সমুদ্র অবক্ষেপকে মোটামুটিভাবে গভীর সমুদ্রতলের সঞ্চয় এবং সমুদ্রখাতের সঞ্চয় দু'ভাগে ভাগ করা হয়। সমুদ্রের এই দুঅঞ্চলে সঞ্চিত অজৈব পদার্থের মধ্যে আগ্নেয়গিরি হতে উৎক্ষিপ্ত সুক্ষ্ম ধূলি কণাই (Volcanic Dust) প্রধান। জৈব পদার্থই এই অংশের প্রধান সঞ্চিত দ্রব্য। সামুদ্রিক উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতের ভস্মসম বিভিন্ন পদার্থ ধীরে ধীরে সমুদ্রের গভীরতম অংশে সঞ্চিত হয়। এই জৈব পদার্থগুলোকে তরল কাদার মতো দেখায়, একে সিন্ধুমল (Ooze —উজ) বলে এবং গভীর সমুদ্রের এই জাতীয় জৈব অবক্ষেপকে Pelagic Ooze বলা হয়। এসব জৈব সিন্ধুমল অত্যন্ত ধীরে ধীরে সঞ্চিত হয়। বিজ্ঞানিগণ অনুমান করেন যে, আটলান্টিক মহাসাগরে প্রতি ইঞ্চি গভীর জৈব সিন্ধুমল সঞ্চয়ের জন্য প্রায় ২০০০ বৎসর সময়ের প্রয়োজন। বিভিন্ন সামুদ্রিক অভিযানের ফলে জানা গেছে যে, সেখানকার সঞ্চিত পদার্থগুলো জায়গায় জায়গায় ১০ হাজার হতে ১২ হাজার ফুট গভীর। এতে প্রমাণিত হয় যে, কোটি কোটি বছর যাবত সেখানে এসব উপাদান সঞ্চিত হচ্ছে। প্রশান্ত মহাসাগরের এসব পদার্থ সঞ্চয়ের জন্য আরো অনেক বেশি সময় লেগেছে। প্রশান্ত মহাসাগরে এসব সঞ্চিত পদার্থ আটলান্টিক মহাসাগরের সঞ্চিত পদার্থের চেয়ে দ্বিগুণ বেশি। এজন্য বিজ্ঞানিগণ অনুমান করেন যে, সেখানে প্রতি ইঞ্চি সিন্ধুমল সঞ্চয়ের জন্য প্রায় ২০,০০০ বছর সময়ের প্রয়োজন হয়। গঠন প্রণালী ও উপাদান ভেদ অনুসারে Pelagic Ooze-কে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন :

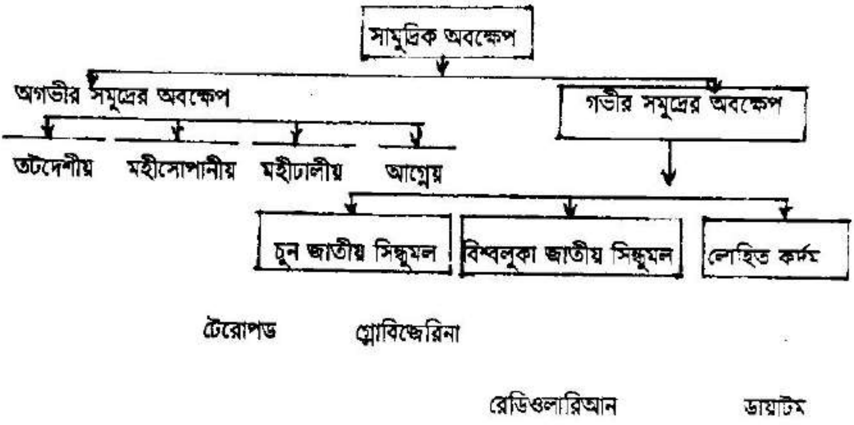

(ক) চুন জাতীয় সিন্ধুমল (Calcareous Ooze) : যেসব সিন্ধুমলে চুন জাতীয় পদার্থের পরিমাণ বেশি থাকে তাদেরকে চুন জাতীয় সিন্ধুমল বলে। এটি দু'প্রকার। যথা — টেরোপড্ এবং গ্লোবিজেরিনা।

(১) টেরোপড সিন্ধুমল (Pteropod Ooze) : টেরোপড্ শব্দের অর্থ সামুদ্রিক প্রজাপতি। এরা এক প্রকার ভাসমান মোচাকৃতি শামুক ও ঝিনুক। উন্মুক্ত, উষ্ণ, অগভীর সমুদ্রে তারা বিচরণ করে। এছাড়া নানা জাতীয় ঝিনুকও সমুদ্রের অগভীর অংশে বিচরণ করে। শক্ত চুন জাতীয় উপাদান দিয়ে এদের দেহাবরণ নির্মিত। সাধারণত ১০,০০০ ফুট গভীর সমুদ্রে এদের দেখতে পাওয়া যায়। আটলান্টিক মহাসাগরের অনেক জায়গা জুড়ে টেরোপড্ সিন্ধুমল রয়েছে।

(২) গ্লোবিজেরিনা সিন্ধুমল (Globigeria Ooze) : ফোরামিনিফেরা (Foraminifera) নামক একরকম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামুদ্রিক কীটের দেহের ভগ্নাবশেষ দিয়ে গ্লোবিজেরিনা সিন্ধুমল গঠিত। চুন জাতীয় পদার্থ দিয়ে এদের দেহ গঠিত। এই ক্ষুদ্র প্রাণীগুলো মৃত্যুমুখে পতিত হলে এদের দেহাবশেষ সমুদ্রের তলদেশের দিকে তলাতে থাকে। কিন্তু প্রায়ই সমুদ্রের তলদেশে পৌঁছানোর আগেই এরা দ্রবীভূত হয়। সমুদ্রে গড় ১২,০০০ ফুট গভীরতায় গ্লোবিজেরিনা সিন্ধুমল দেখতে পাওয়া যায়। সাধারণত ক্রান্তীয় ও নাতিশীতোষ্ণ সমুদ্রে পর্যাপ্ত পরিমাণে গ্লোবিজেরিনা সিন্ধুমলের দীর্ঘ সারি দেখতে পাওয়া যায়।

(ক) বালুকা জাতীয় সিন্ধুমল (Siliceous Ooze) : যেসব সিন্ধুমলের মধ্যে সূক্ষ্ম বালু ও কাদা জাতীয় উপাদান বেশি থাকে তাদেরকে Siliceous Ooze বলে। এই বালুকা জাতীয় সিন্ধুমল দু'রকম। যথা — রেডিওলারিআন সিন্ধুমল ও ডায়াটম সিন্ধুমল।

(১) রেডিওলারিআন সিন্ধুমল (Radiolarian Ooze) : রেডিওলারিআন সিন্ধুমল গঠিত হয় রেডিওলারিয়া নামক এক ধরনের ক্ষুদ্রাকৃতি সামুদ্রিক প্রাণীর জালের মতো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খোসা বা খোলা দেহাবশেষ হতে। এই দেহাবশেষগুলো বালু জাতীয় পদার্থ দিয়ে গঠিত। প্রাণীগুলো মৃত্যুমুখে পতিত হলে গভীর সমুদ্রের তলদেশে তাদের দেহাবশেষগুলো সঞ্চিত হয়ে কালক্রমে কাদায় পরিণত হয়। সমুদ্রের ১৮,০০০ ফুট গড় গভীরতায় এ সিন্ধুমল সঞ্চিত হয়। সাধারণত প্রশান্ত ও ভারত মহাসাগরের উষ্ণ ও গভীর অংশে এদের দেখতে পাওয়া যায়।

(২) ডায়াটম সিন্ধুমল (Diatom Ooze) : শীতল সমুদ্রের তলদেশে ডায়াটম নামক এক রকম ক্ষুদ্রতম (Microscopic) উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়। সূর্যের আলো সমুদ্রের ৬৫০ ফুট গভীরে পর্যন্ত পৌঁছায়। উদ্ভিদের দেহ গঠনের জন্য এই আলো অত্যাবশ্যকীয়। এজন্য উচ্চ অক্ষাংশের শীতল সমুদ্রের স্বল্প গভীর অংশে যে জায়গায় সূর্যের আলো পৌঁছায় সেখানে এ উদ্ভিদ জন্মে থাকে। এ উদ্ভিদের দেহ বালু জাতীয় পদার্থ দিয়ে গঠিত। সমুদ্রতলের সিন্ধুমলে ডায়াটম বিশিষ্ট উপাদান বেশি থাকলে তাকে ডায়াটম সিন্ধুমল বলে।

গ. লোহিত কর্দম (Red Clay) : সমুদ্রের গভীরতম অংশে যেখানে সমুদ্রতল ১২,০০০ ফুটেরও বেশি গভীর, সেখানে একরকম লাল রংয়ের কাদা দেখতে পাওয়া যায়। এ লাল কাদা প্রায় ৫$\frac{১}{২}$ কোটি বর্গমাইল এলাকা, অর্থাৎ সমুদ্র তলদেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ জায়গা দখল করে আছে। বায়ু তাড়িত আগ্নেয়গিরিজাত পদার্থ, উল্কা চূর্ণ, হিমশৈল বাহিত পদার্থ ও সাগরের মধ্যে নিমগ্ন আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে শিলাধূলি জমে এ কাদা গঠিত হয়। এর সাথে মিশ্রিত অবস্থায় ম্যাঙ্গানিজ অক্সাইড, বালু এবং জৈব পদার্থ থাকে। লৌহ কণা দ্রবীভূত হয়ে মিশে থাকে বলে এই কাদার রং লাল হয়।

উপসংহার

মানব জীবনে বারিমন্ডলের প্রভাব অপরিসীম। এ বারিমন্ডল পৃথিবীর স্থলভাগের বিভিন্ন অংশের উত্তাপের তারতম্য ঘটায়, সমুদ্র থেকে আমরা পাই লবণ ও আয়োডিন। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রায় সম্পূর্ণভাবে সমুদ্রের উপর নির্ভরশীল, পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের আবহাওয়া ও জলবায়ু সম্পর্কিত সকল বিষয় এ বারিমন্ডলের সঙ্গে জড়িত। সমুগ্র পৃথিবী পৃষ্ঠের সাত ভাগের প্রায় পাঁচ ভাগ অংশ এ বারিমন্ডল। আর বিশ্বের প্রায় সমস্ত উন্নত নগর, বন্দর, সমৃদ্ধশালী ও শক্তিশালী উন্নত রাষ্ট্র এবং উর্বরা ভূমি এ বারিমন্ডলের কোন না কোন অংশকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। সর্বোপরি সাগর, মহাসাগরের তলদেশ খনিজ ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ যদি সাগরের তলদেশের রহস্য আবিষ্কার করা সম্ভব হয় তবে তা বিশ্বের সকল মানুষের বিশেষ করে দরিদ্র রাষ্ট্রগুলোর জন্য হবে কল্যাণকর।

৩.২৩ : জোয়ারভাটা ও তার বিবরণ

জোয়ারভাটা : সমুদ্রের পানি নির্দিষ্ট সময় অন্তর একস্থানে ফুলে উঠে এবং এক স্থানে নেমে যায়। এভাবে প্রত্যেক সাড়ে বারো ঘণ্টায় সমুদ্রের পানি একবার নিয়মিতভাবে উঠা-নামা করে। সমুদ্রের পানির নিয়মিতভাবে ফুলে উঠাকে জোয়ার এবং নেমে যাওয়াকে ভাটা বলে। চন্দ্র ও সূর্যের আকর্ষণ এবং পৃথিবীর কেন্দ্রাতিগ শক্তির প্রভাবে জোয়ারভাটা হয়ে থাকে। জোয়ারভাটা সমুদ্র-পৃষ্ঠে এবং সমুদ্রের মোহনা হতে নদী পথে কিছু দূর পর্যন্ত অনুভূত হয়। সমুদ্রের মধ্যভাগে পানি সাধারণত ৩০ সে.মি. হতে ৯০ সে.মি. (১-৩ ফুট পর্যন্ত) উঠা নামা করে ; কিন্তু উপকূলের নিকট সাগর উপসাগরের গভীরতা কম বলে সেখানে পানিরাশি অনেক বেশি উঠানামা করে। এজন্যই সমুদ্রের মোহনা হতে নদীসমূহের গতিপথে কয়েক মাইলব্যাপী জোয়ারভাটা অনুভূত হয়।

উন্মুক্ত সাগরের জোয়ার যখন তার উপকূলের অগভীর মহীসোপানে প্রবেশ করে তখন এর উচ্চতা বৃদ্ধি পায়। সমুদ্রের খাড়ি অথবা নদীর মোহনায় পৌছাবার পর জোয়ারের পানি

নদীর গতির বিপরীত দিকে প্রবাহিত হতে থাকে। সরু নদীর ভিতর দিয়ে যখন জোয়ারের পানি স্থলভাগের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে তখন অনেক সময় মনে হয় যেন কয়েক ফুট উঁচু পানির দেয়াল নদী বাহিত হয়ে উজানে উঠে। আবার ভাটার সময় পানি যখন নেমে যেতে থাকে তখন নদী অতিরিক্ত গতিশক্তি লাভ করে। এজন্য ভাটার সময় নদী তুলনামূলকভাবে খরস্রোতা হয়। এতে প্রাকৃতিক উপায়ে নদীর তলানী সমুদ্রে নীত হয়।

অগভীর সামদ্রিক বন্দর এবং পোতাশ্রয়গুলোতে জোয়ারের সময় বড় বড় জাহাজগুলো চলাচল করতে পারে না। এজন্য বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরে জোয়ারের সময় নদীর গভীরতা বৃদ্ধি পেলে বড় বড় জাহাজগুলো প্রবেশ করে অথবা বন্দর হতে ছেড়ে যায়। বন্দরে প্রবেশ করবার পূর্বে জোয়ারের অপেক্ষায় বড় বড় জাহাজগুলো নদীর মোহনায় নোংগর করে থাকে। বঙ্গোপসাগরের জোয়ারের পানি মেঘনা নদীতে ভৈরব বাজারের কাছাকাছি এবং পদ্মা নদীতে গোয়ালন্দের কাছাকাছি পর্যন্ত পৌছায়।

জোয়ারভাটার কারণ : কেন প্রতিদিন কিছু সময়ের জন্য সমুদ্রের পানি ফুলে উঠে আবার তা নিয়মিতভাবে নেমে যায় এ সম্পর্কে স্বভাবতঃই মানুষের মনে কৌতূহল জাগে। প্রাচীনকালে জোয়ারভাটার কারণ সম্পর্কে নানা ধরনের অবাস্তব কল্পনা করা হত। তখন মানুষের ধারণা ছিল পৃথিবীর শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য জোয়ারভাটা হয়। পৃথিবীর শ্বাস গ্রহণের সময় পানি ফুলে উঠে বলে জোয়ার হয় এবং শ্বাস ত্যাগ করার সময় পানি নেমে যাওয়ায় ভাটা হয়। কিন্তু বর্তমানে বিজ্ঞানিগণ মনে করেন যে, পৃথিবীর উপর চন্দ্র ও সূর্যের আকর্ষণ এবং পৃথিবীর নিজের গতি ও আবর্তনের দরুন সৃষ্ট কেন্দ্রাতিগ শক্তিই জোয়ারভাটার জন্য দায়ী। নিম্নে জোয়ারভাটার কারণ আলোচিত হল।

১। মহাকর্ষের প্রভাব : পৃথিবীর সকল পদার্থের আকর্ষণ শক্তি আছে তাই একটি অপরটিকে আকর্ষণ করছে। এই আকর্ষণের নাম মহাকর্ষ। এই মহাকর্ষ শক্তির ফলেই পৃথিবীসহ সকল গ্রহ সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে এবং উপগ্রহ গুলো গ্রহসমূহের চতুর্দিকে পরিক্রমণ করছে। তাই চন্দ্রও পৃথিবীর চতুর্দিকে নিয়মিতভাবে সে স্থানের পানিরাশি অধিক ফুলে উঠে বা স্ফীত হয়। সুতরাং এটি সুস্পষ্ট যে পৃথিবীর কেন্দ্র ও পানির উপরিভাগের উপর চন্দ্রের আকর্ষণ শক্তির তারতম্যই জোয়ারভাটার প্রধান কারণ।

২। কেন্দ্রাতিগ শক্তির প্রভাব : কেবল মহাকর্ষ শক্তির প্রভাবে চন্দ্র ও সূর্যই জোয়ারের জন্য দায়ী নয়। ঘূর্ণশীল পৃথিবীর পৃষ্ঠে যে কেন্দ্রাতিগ শক্তি উৎপন্ন হয়, জোয়ারের জন্য তাও অনেকাংশে দায়ী। কাদাপানিযুক্ত কোন রাস্তা দিয়ে যখন কোন যানবাহন দ্রুতগতিতে চলে তখন তার চাকা হতে কাদাপানি ছিটকিয়ে দ্রুতবেগে চতুর্দিকে নিক্ষিপ্ত হয়। অনুরূপভাবে পৃথিবী তার অক্ষ বা মেরুদণ্ডের উপর থেকে চারদিকে দ্রুতবেগে ঘুরছে বলে তার পৃষ্ঠ হতে তরল পানিরাশিও চতুর্দিকে নিক্ষিপ্ত হবার প্রবণতা লাভ করে। আর একেই কেন্দ্রাতিগ শক্তি বলে।

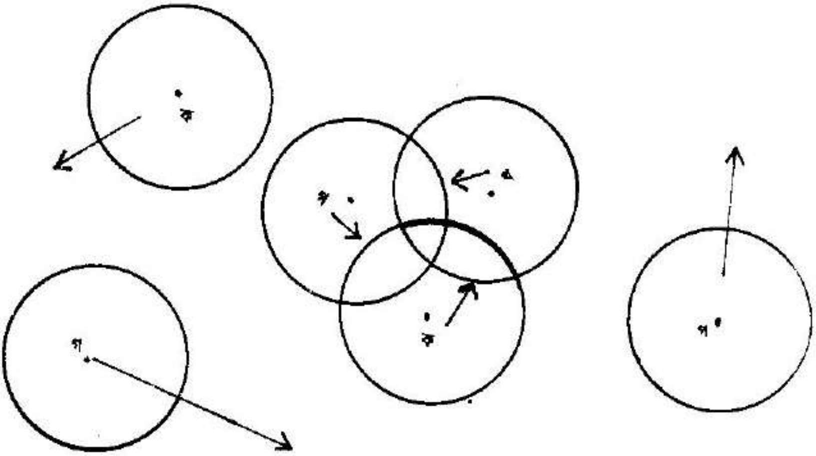

চিত্র : ৭৪. পৃথিবী ও চন্দ্রের আপেক্ষিক গতি

এই আকর্ষণ শক্তির প্রভাবেই পৃথিবীর উপরিস্থিত সরল আবরণ পানিরাশি পৃথিবী হতে বিচ্যুত হতে পারছে না।

কিন্তু মহাকর্ষ শক্তির প্রভাব সর্বত্র সমান নয়। স্বাভাবিকভাবেই যে গ্রহ বা উপগ্রহ যত বড় তার আকর্ষণী শক্তি তত অধিক। কিন্তু দূরত্ব বৃদ্ধি পেলে আকর্ষণ করবার ক্ষমতা হ্রাস পায় কাজেই মহাকর্ষ শক্তির পরিমাণ নির্ভর করে :

(ক) সরাসরি জ্যোতিষ্কগুলোর আয়তনের উপর এবং

(খ) জ্যোতিষ্কগুলেরা দূরত্বের বর্গের ব্যস অনুপাতের উপর।

চন্দ্র এবং সূর্য উভয়ই পৃথিবীকে আকর্ষণ করে এবং উভয়ের আকর্ষণী শক্তির প্রভাবে জোয়ারভাটা সংঘটিত হয়। সূর্য চন্দ্র অপেক্ষা দুই কোটি ষাট লক্ষ গুণ বড়। কিন্তু পৃথিবী হতে সূ চন্দ্র অপেক্ষা তিনশত আশি গুণ দূরে অবস্থিত। এজন্য পৃথিবীর উপর সূর্য অপেক্ষা চন্দ্রের আকর্ষণ অনেক বেশি এবং অধিক কার্যকর। সমগ্র পৃথিবী ও তার পদার্থ সমূহের উপর সূর্য

অপেক্ষা চন্দ্রের কার্যকরী আকর্ষণী শক্তি ২$\frac{১}{২}$ গুণ বেশি। চন্দ্র ও সূর্যের আকর্ষণী শক্তি পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে কাজ করে থাকে। কিন্তু পানি তরল বলে তার উপরিভাগে চন্দ্রের আকর্ষণী শক্তি অধিক কার্যকরী হয়। বস্তুত পানির উপরই আকর্ষণী শক্তির অভাব অনুভূত হয়।

পৃথিবীর যে অংশ যখন চন্দ্রের ঠিক সম্মুখে উপস্থিত হয়, চন্দ্র পৃথিবীর সেই অংশকে তখন সর্বাপেক্ষা বেশি আকর্ষণ করে। এদিক দিয়ে আবার কঠিন স্থলভাগের চাইতে পানিরাশির উপর আকর্ষণ শক্তির প্রভাব ও কার্যকারিতা অধিক। সেজন্য পৃথিবীর যে অংশে যখন চন্দ্রের আকর্ষণ শক্তি সবচাইতে বেশি তখন পৃথিবী ও চন্দ্রের আকর্ষণের জন্যও পৃষ্ঠের তরল ও হাল্কা পানি রাশির উপর কেন্দ্রাতিগ শক্তির প্রভাব অধিক হয়। এর ফলেই পানিরাশি সর্বদা বাইরের দিকে বিক্ষিপ্ত হয় এবং তরল পানিরাশি কঠিন ভূ-ভাগ হতে বিচ্ছিন্ন হতে চায়। এমনিভাবে কেন্দ্রাতিগ শক্তিও জোয়ারভাটার সৃষ্টিতে সহায়তা করছে। তবে কেন্দ্রাতিগ শক্তি অপেক্ষা চন্দ্রের আকর্ষণ শক্তি জোয়ারের জন্য বেশি দায়ী। কারণ কেন্দ্রাতিক শক্তি ভূ-পৃষ্ঠের চতুর্দিকে কার্যকর, কিন্তু চন্দ্রের আকর্ষণী শক্তি প্রধানত একদিকে অধিক কার্যকর।

জোয়ারভাটা কিরূপে সংঘটিত হয়

জোয়ার : চন্দ্র ও সূর্যের আকর্ষণ ও ঘূর্ণনশীল পৃথিবীর কেন্দ্রাতিগ শক্তির প্রভাবেই জোয়ারভাটা সংঘটিত হয়। যদি মনে করা হয়, পৃথিবীর উপরিভাগ সর্বত্র সমান পানিরাশির

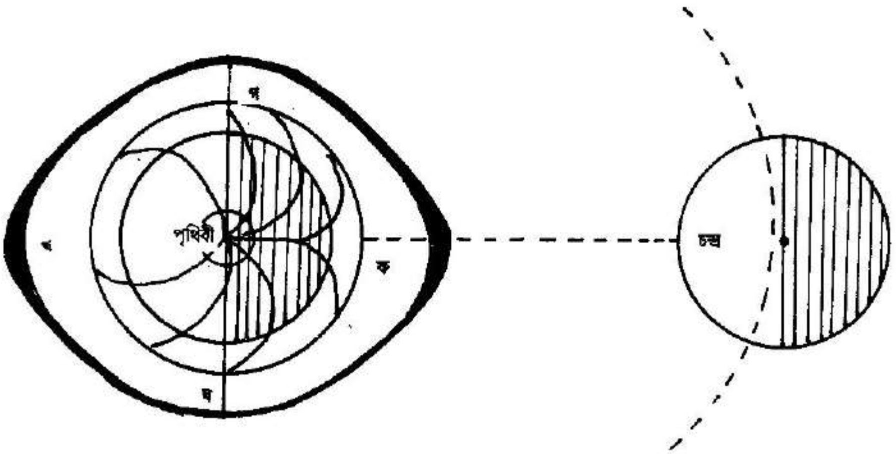

চিত্র : ৭৫. জোয়া ভাটা (ক)

দ্বারা আবৃত। পৃথিবী পৃষ্ঠের 'ক' স্থান চন্দ্রের সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী। সুতরাং চন্দ্রের আকর্ষণ 'ক' স্থানেই সর্বাপেক্ষা বেশি। পানি তরল পদার্থ বলে পৃথিবীর কঠিন অংশ অপেক্ষা সহজেই এবং বেশি পরিমাণে আকৃষ্ট হবে। কাজেই 'ক' স্থানের পানি ফুলে উঠবে এবং 'গ' ও 'ঘ' স্থান দুটি হতে পানি আকৃষ্ট হয়ে 'ক' স্থানের উপরে এসে জমা হবে। তখন 'ক' স্থানে জোয়ার। এই জোয়ারের নাম মুখ্য বা প্রত্যক্ষ জোয়ার। আবার 'ক' স্থানের বিপরীত দিকে 'খ' স্থানের যে পানি আছে। পৃথিবীর কেন্দ্র অপেক্ষা চন্দ্র হতে ৬,৪০০ কি.মি. অধিক দূরবর্তী। সুতরাং পৃথিবীর কেন্দ্র স্থলে চন্দ্রের আকর্ষণ 'খ' স্থানের পানির উপরের আকর্ষণ অপেক্ষা অধিক। আবার 'খ' স্থানের পানির নিচে যে কঠিন স্থলভাগ আছে, তা পৃথিবীর কেন্দ্রের সহিত দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ আছে। সুতরাং তার উপর চন্দ্রের আকর্ষণ কেন্দ্র স্থলের আকর্ষণের সমান। কাজেই চন্দ্র 'খ' স্থানের পানি অপেক্ষা কঠিন পৃথিবীকেই অধিক আকর্ষণ করবে। এই আকর্ষণে পৃথিবীর কঠিন অংশের মাঝখানে যে ফাঁক হবে, গ ও ঘ স্থান হতে কিছু পানি এসে সেই ফাঁকে জমবে। এছাড়া 'খ' স্থানের পানি ভাগের উপর পৃথিবীর মহাকর্ষণ শক্তির প্রভাব কমে যায় এবং কেন্দ্রাতিগ শক্তির প্রভাব বৃদ্ধি পায়। ফলে কেন্দ্রাতিগ শক্তির প্রভাবে চার পার্শ্বস্থ পানিরাশি 'খ' স্থানে প্রবাহিত হয়ে জোয়ারের সৃষ্টি করে, এই জোয়ারের নাম গৌণ বা পরোক্ষ জোয়ার।

ভাটা : পৃথিবীর মোট পানিরাশির পরিমাণ সর্বত্র সমান। যখন পৃথিবীর একপার্শ্বে মুখ্য জোয়ার এবং অপর পার্শ্বে গৌণ জোয়ার হয়, তখন এই দুই জোয়ারের মধ্যবর্তী সমকোণে অবস্থিত অংশদ্বয় হতে পানিরাশি সরে যায় বলে ঐ দুই স্থানে তখন ভাটা হয়।

পৃথিবীর আবর্তনে পৃথিবীর যে অংশ চন্দ্রের সম্মুখে আসে সেই অংশ এবং তার বিপরীত অংশে সমুদ্রের পানি ফুলে উঠে জোয়ার হয়। এদের মধ্যবর্তী সমকোণে অবস্থিত স্থানদ্বয়ে পানি নেমে ভাটা হয়। সুতরাং একই স্থানে প্রতিদিন দুবার জোয়ার ও দুবার ভাটা হয়। জোয়ার ও ভাটা প্রত্যেকের স্থিতিকাল ৬ ঘণ্টা ১৩ মি. প্রায়।

জোয়ারভাটার শ্রেণীবিভাগ

জোয়ারভাটাকে নিম্নলিখিত কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যেমন :

ক. মুখ্য জোয়ার

খ. গৌণ জোয়ার

গ. ভরা কটাল

ঘ. মরা কটাল।

(ক) মুখ্য জোয়ার : আমরা জানি যে, প্রধানত চন্দ্রের আকর্ষণেই জোয়ারভাটা সংঘটিত হয়। কিন্তু চন্দ্র একস্থানে স্থির থাকে না। উহা পৃথিবীর চারদিকে সর্বদা ঘুরছে। আবর্তন কালে পৃথিবীর যে অংশ চন্দ্রের নিকটবর্তী হয়, সেখানে চন্দ্রের আকর্ষণ সর্বাপেক্ষা বেশি হয়। এই আকর্ষণে চারদিক হতে পানি চন্দ্রের ঠিক নিচে ফুলে উঠে এবং জোয়ার হয়। এইরূপে সৃষ্ট জোয়ারকে মুখ্য জোয়ার বা প্রত্যক্ষ জোয়ার বলা হয়।

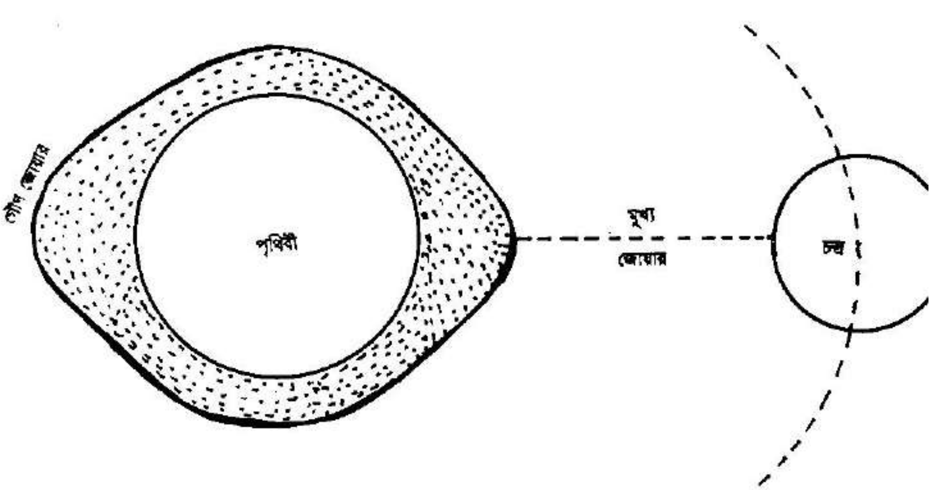

চিত্র : ৭৬. জোয়ার ভাঁটা (খ)

(খ) গৌণ জোয়ার : চন্দ্রের আকর্ষণ স্থলের ঠিক বিপরীত দিকে অর্থাৎ প্রতিপাদ স্থানে পৃথিবীর মহাকর্ষ শক্তির প্রভাব তুলনামূলকভাবে কম। কাজেই ঐ বিপরীত দিকে অবস্থিত স্থানের আশেপাশের পানিরাশি প্রধানত কেন্দ্রাতিক শক্তির প্রভাবে অথবা মহাকর্ষ শক্তি অপেক্ষা কেন্দ্রাতিক শক্তি অধিক প্রবল বলে স্ফীত হয়, ফলে সেখানে বিপরীত দিকে জোয়ারের সৃষ্টি হয়। এইভাবে ভূ-পৃষ্ঠে চন্দ্রের আকর্ষণের বিপরীত দিকে গৌণ জোয়ার বা পরোক্ষ জোয়ার সৃষ্টি হয়।

পৃথিবীর যে দিকে চন্দ্রের আকর্ষণের ফলে মুখ্য জোয়ার হয় তার বিপরীত দিকে পানির নিচে যে কঠিন স্থলভাগ থাকে তা পৃথিবীর কেন্দ্রের সহিত দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত। সুতরাং তার উপর চন্দ্রের আকর্ষণ কেন্দ্র স্থলের আকর্ষণের সমান। ফলে বিপরীত দিকের পানিরাশি অপেক্ষা স্থলভাগ চন্দ্রের দিকে অধিকতর আকৃষ্ট হয়। এই সময় বিপরীত দিকে পানিরাশির উপর

পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাব তুলনামূলকভাবে কমে যায় এবং প্রায় কেবল কেন্দ্রাতিগ শক্তির প্রভাবে আশেপাশের পানিরাশি সেস্থানে প্রবাহিত হয়ে জোয়ারের সৃষ্টি করে।

(গ) ভরা কটাল বা তেজ কটাল : পূর্ণিমা ও অমাবস্যার তিথিতে পৃথিবী, চন্দ্র ও সূর্য প্রায় একই সরলরেখায় অবস্থান করে বলে সূর্যের আকর্ষণ চন্দ্রের আকর্ষণকে সাহায্য করে। ফলে এই দুই সময়ে জোয়ারের পানি খুব বেশি ফুলে উঠে। একে ভরা কটাল বা তেজ কটাল বলে

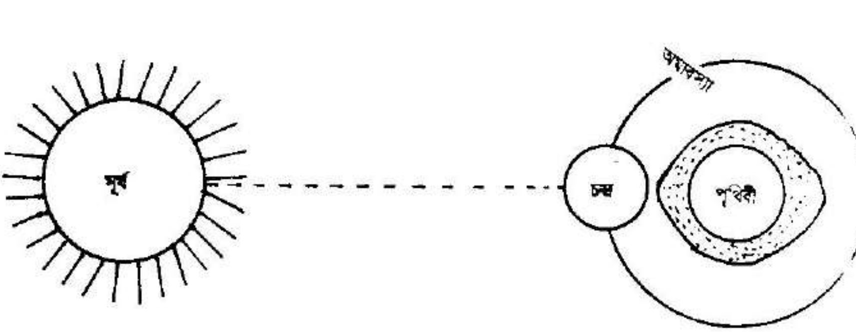

চিত্র : ৭৭, অমাবস্যা তেজ কটাল বা ভরা কটাল।

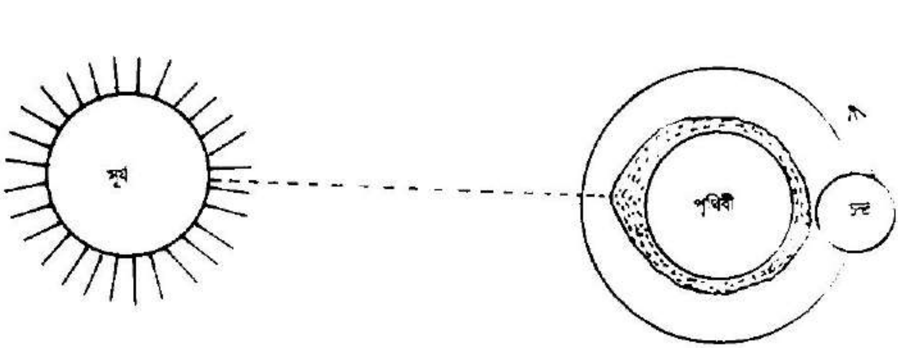

চিত্র : ৭৮, পূর্ণিমায় তেজ কটাল বা ভরা কটাল

হয়। যেমন অমাবস্যায় চন্দ্র ও সূর্য পৃথিবীর একই দিকে তার সহিত সমসূত্রে থাকে। তার ফলে চন্দ্র ও সূর্যের আকর্ষণ শক্তি একই দিক হতে একই সঙ্গে কার্যকরী হয়। সূর্যের আকর্ষণ চন্দ্রের

আকর্ষণের চেয়ে কম হলেও এই সময় উভয়ের মিলিত শক্তিতে আকর্ষণ আরও প্রবল হয়। অতএব ঐ দিন চন্দ্র ও সূর্যের দিকে পূর্ণিমার দিন অপেক্ষাও পানি বেশি ফুলে উঠে অর্থাৎ জোয়ার বেশি হয়। এই জাতীয় জোয়ারকে ভরা কটাল বা তেজ কটাল বলা হয়। আবার পূর্ণিমা তিথিতে পৃথিবীর একদিকে চন্দ্র ও অন্যদিকে সূর্য একই সরলরেখায় অবস্থান করে। চন্দ্রের আকর্ষণে যেখানে মুখ্য জোয়ার হয়, সেখানেই সূর্যের আকর্ষণে গৌণ জোয়ার হয়। আবার চন্দ্রের বিপরীত দিকে যেখানে তার আকর্ষণে গৌণ জোয়ার হয়, ঠিক সেইখানেই সূর্যের আকর্ষণে মুখ্য জোয়ার হয়। এই জন্য পূর্ণিমার দিন উক্ত দুই বিপরীত স্থানেই জোয়ারের বেগ সর্বাধিক হয় এবং পানি বেশ ফুলে উঠে। তাই পূর্ণিমার দিনের এই জোয়ারকেও ভরা কটাল বা তেজ কটাল বলা হয়।

(ঘ) মরা কটাল : অষ্টমী তিথিতে চন্দ্র ও সূর্য সমসূত্রে না থেকে উভয়েই পৃথিবীর এক সমকোণে থেকে পৃথিবীকে আকর্ষণ করে। ঐ দিন তারা পৃথিবীকে আড়াআড়িভাবে আকর্ষণ করে ফলে আকর্ষণের বেগ অনেক কম হয়। তখন চন্দ্রের আকর্ষণে যেখানে জোয়ার হয় সূর্যের আকর্ষণে সেখানে ভাটা হয়। চন্দ্র পৃথিবীর নিকট থাকায় তার কার্যকরী শক্তি সূর্য অপেক্ষা বেশি। তাই ঐ সময় চন্দ্রের দিকে জোয়ার ও সূর্যের দিকে ভাটা হয়। সূর্যের বিরোধিতার কারণে চন্দ্রের দিকে পানি বেশি স্ফীত হতে পারে না বলে এই জাতীয় জোয়ারকে মরা জোয়ার বা মরা কটাল বলে। তাই একমাসে দুবার ভরা কটাল এবং দুবার মরা কটাল হয়ে থাকে।

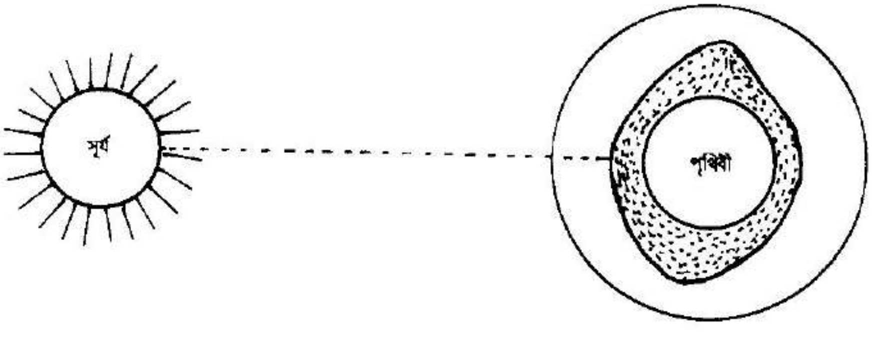

চিত্র : ৭৬ অষ্টমী তিথিতে মরা কটাল

জোয়ার ও ভাটার সময়

পৃথিবী ও চন্দ্রের আবর্তন গতির উপর জোয়ার ও ভাটা অনুষ্ঠানের সময় নির্ভর করে। ভূ-পৃষ্ঠের যে অংশে যখন মুখ্য জোয়ার হয়, তার বিপরীত দিকে প্রতিপাদ স্থানে তখন গৌণ জোয়ার হয়। আবার পৃথিবীর আবর্তন গতির ফলে যে স্থানে যখন মুখ্য জোয়ার হয় তার ঠিক

বারো ঘণ্টা পরে ঐ মুখ্য জোয়ারের স্থানের প্রতিপাদ স্থানটি চন্দ্রের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার কথা। কিন্তু চন্দ্রও সময়ে নিজ গতির জন্য কিছুটা পথ একই দিকে অগ্রসর হয় বলে ঠিক বারো ঘণ্টা পরে না হয়ে বরং তার চাইতে কিছুটা বেশি সময় পরে ঐ স্থানটি চন্দ্রের সোজাসুজি সম্মুখে এসে উপস্থিত হয়। এজন্য পৃথিবীর যে স্থান কোন একদিন সে সময়ে চন্দ্রের ঠিক সম্মুখে উপস্থিত হয় তার পরদিন ঠিক সেই সময়ে অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টা পরে পৃথিবীর সেই স্থান চন্দ্রের ঠিক সম্মুখে উপস্থিত হতে পারে না। বস্তুত পৃথিবী ও চন্দ্র উভয়ই একই দিকে অর্থাৎ পশ্চিম হতে পূর্বদিকে পরিক্রমণ করে। পৃথিবী চব্বিশ ঘণ্টায় নিজ মেরুদণ্ডের উপর একবার আবর্তন করে. এই অবস্থায় চন্দ্র যদি স্থির থাকত তবে পৃথিবীর প্রত্যেকটি স্থান ঠিক ২৪ ঘণ্টা অন্তর একবার করে চন্দ্রের সম্মুখীন হত। ফলে সেখানে চন্দ্রের সরাসরি আকর্ষণে মুখ্য জোয়ার হত। কিন্তু যেহেতু চন্দ্র আপন কক্ষ পথে ২৯$\frac{১}{২}$ দিনে পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করে, ফলে ইহা একদিনে তার কক্ষের ২৯$\frac{১}{২}$ ভাগের একভাগ অগ্রসর হয়। কাজেই পৃথিবীর একবার আবর্তন সময়ে অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টায় চন্দ্র নিজ কক্ষের প্রায় ১৩ ডিগ্রি পথ অগ্রসর হয়। ফলে সম্পূর্ণরূপে একবার ঘুরে আসবার পর ভূ-পৃষ্ঠের কোন নির্দিষ্ট স্থান পুনরায় চন্দ্রের ঠিক নিচে আসতে উক্ত ১৩ ডিগ্রি পথ অধিক অগ্রসর হতে হয়। পৃথিবী এবং চন্দ্র উভয়ে একই দিকে অর্থাৎ পশ্চিম হতে পূর্বদিকে আবর্তন করে বলে পৃথিবীর পক্ষে উক্ত ১৩ ডিগ্রি পথ অগ্রসর হতে আরও (১৩×৪) = ৫২ মিনিট সময় লাগে।

অতএব, ভূ-পৃষ্ঠের কোন একটি নির্দিষ্ট অংশে প্রতিদিন একই সময়ে মুখ্য জোয়ার হয় না। একটি নির্দিষ্ট স্থানে কোন দিন যে সময়ে মুখ্য জোয়ার হয় সেদিন তার ১২ ঘণ্টা ২৬ মিনিট পরে তথায় গৌণ জোয়ার হয়। এবং ঐ মুখ্য জোয়ারের ২৪ ঘণ্টা ৫২ মিনিট পূর্বে পুনরায় সেখানে মুখ্য জোয়ার হয়। উপরোক্ত কারণে প্রত্যেক স্থানে জোয়ারের ৬ ঘণ্টা ১৩ মিনিট পরে ভাটা হয়।

জোয়ারের গতি : পৃথিবীর পশ্চিম হতে পূর্বদিকে আবর্তন করে। ফলে জোয়ারের স্রোত পৃথিবীর গতির বিপরীত দিকে অর্থাৎ পূর্ব হতে পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়। নদ-নদী সমূহের মোহনাতে বা উহাদের মুখে জোয়ারভাটার বেগ অধিক দেখতে পাওয়া যায়। সকল অংশেই গ্রীষ্ম বা শীতকাল অপেক্ষা বর্ষাকালে জোয়ারভাটার প্রভাব বেশি থাকে।

চন্দ্র যখন কোন নির্দিষ্ট স্থান অতিক্রম করে তখন সেই স্থান হতে সোজাসুজি উত্তর দক্ষিণ বরাবর অর্থাৎ উক্ত মধ্যরেখা বরাবর সকল স্থানে একই সঙ্গে জোয়ার দেখা দেওয়ার কথা কিন্তু বাস্তবে সংঘটিত হতে দেখা যায় না। বায়ুপ্রবাহ, সমুদ্রের পার্থক্য, তলদেশের সহিত প্রতিঘাত প্রভৃতি কারণে তার ব্যতিক্রম ঘটে। উপরোক্ত কারণে ভূ-পৃষ্ঠের একই মধ্যরেখায় অবস্থিত বিভিন্ন স্থানে জোয়ারভাটার সময়ের তারতম্য ঘটে। পৃথিবী যদি সম্পূর্ণভাবে পানি দ্বারা আবৃত হত এবং তার কোন প্রকার স্থলভাগ না থাকত, তবে জোয়ারের ঢেউ বিনা বাধায়

চন্দ্রের গতিকে অনুসরণ করত এবং কোন স্থানে সরাসরি চন্দ্রের সম্মুখীন হলে সেখানেও তার বিপরীত দিকে জোয়ার সংঘটিত হত। এরূপ অবস্থায় প্রায় ২৪ ঘন্টা ২ মিনিট পর পৃথিবীর পৃষ্ঠে ক্রমশ পূর্ব পশ্চিমে দুবার জোয়ার তরঙ্গ হত। কিন্তু পৃথিবীর প্রায় $\frac{১}{৪}$ ভাগ স্থল এবং বাকি অংশ পানি। এই কারণে জোয়ারের ঢেউ স্থলভাগে বাধাপ্রাপ্ত হয়। যেমন — অস্ট্রেলিয়ার পশ্চিম উপকূলে জোয়ার দেখা দিলে তার অনেক পরে বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলে জোয়ার হয়। কিন্তু ভারত মহাদেশের সমুদ্র উপকূলে জোয়ার হয়। কিন্তু ভারত মহাদেশের সমুদ্র উপকূলে জোয়ার হয়। কিন্তু ভারত মহাসাগরেব দক্ষিণ দিক খোলা থাকায় ঐ মহাসাগরের দক্ষিণ হতে জোয়ারের ঢেউ ক্রমশ উত্তর দিকে অগ্রসর হতে পারে।

একই সমরেখার উপর অবস্থিত স্থানগুলোতে একই সময়ে জোয়ার না হলেও একই সময়ে সমুদ্রের বিভিন্ন স্থানে জোয়ার আসতে দেখা যায়। সমুদ্রের মধ্যে যে সকল স্থানে একই সঙ্গে জোয়ার হয় সেই স্থানগুলো কাল্পনিক রেখা দ্বারা সংযুক্ত করা হয়। এই রেখাগুলোকে সমজোয়ার রেখা বলে। নাবিকদের জন্য সমজোয়াব রেখার অভিজ্ঞতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তাদের জন্য এই মানচিত্রও বিশেষ প্রয়োজনীয়।

(ক) জোয়ারভাটার টান : জোয়ারের পানি গভীর সমুদ্রে ৯০ সে.মি. হতে ১২০ সে.মি. এর বেশি উচু হয় না। কিন্তু উপকূলের নিকটে নদীর খাড়ি, মোহনা প্রভৃতি স্থানে ৩ মি. হতে ১২মি. পর্যন্ত উচু হয়ে থাকে। ভূ-মধ্যসাগর, লোহিত সাগর, বাল্টিক সাগর ও কৃষ্ণসাগরের প্রায় চারদিক স্থল দ্বারা বেষ্টিত বলে তথায় জোয়ার দেখা যায় না। পৃথিবী পশ্চিম হতে পূর্বদিকে আবর্তন করে, সুতরাং জোয়ারের স্রোত পূর্ব হতে পশ্চিমে যায়। এই স্রোতকে জোয়ারভাটার টান বলে।

(খ) বান : অগভীর মহীসোপান, সংকীর্ণ নদীর মুখ, নদীর মুখে চড়া বা বালির বাধ প্রভৃতি জোয়ারের পানিকে নদীপথে অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে বাঁধার সৃষ্টি করে, ফলে জোয়ারের পানি নদীমুখে প্রবেশ করবার সময় খুব উঁচু হয়ে প্রবল বেগে অগ্রসর হয় একে বান বলে।

ইয়াং-সি-কিয়াং, সেন, সালউইন, গারন, সেভার্ন এবং আমাজান নদীর বান অতিশয় প্রবল। ভাগীরথী নদীতে বানের ফলে পানি গড়ে প্রায় ৪৫ মিটার উঁচু হয়ে থাকে। প্রবল বানের সম্মুখে পড়লে অনেক সময় নৌকা, স্টীমার প্রভৃতি ডুবে যাবে। সাধারণত জুলাই হতে সেপ্টেম্বর মাসে ভাগীরথী নদীর প্রবল বানে পানি প্রায় ৭·৬ মিটার উঁচু হয়। বানের গতি অনিয়মিত কিন্তু জোয়ার তরঙ্গের গতি নিয়মিত।

জোয়ারভাটা সম্পর্কিত মতবাদসমূহ

জোয়ারভাটার সৃষ্টি ও তার গতি প্রকৃতি সম্পর্কে মোটামুটিভাবে নিম্নলিখিত দুটি মতবাদ সর্বাধিক প্রচলিত আছে। যথা :

(১) ক্রম অগ্রসরমান তরঙ্গ মতবাদ।

(২) স্থির তরঙ্গ মতবাদ।

ক্রম অগ্রসরমান তরঙ্গ মতবাদ : ক্রম অগ্রসরমান তরঙ্গ মতবাদে বলা হয়েছে যে, জোয়ার তরঙ্গ কুমেরু মহাসাগরে সৃষ্টি হয়। কুমেরু মহাসাগরে কোন স্থলভাগ না থাকায় সেখানকার স্রোত বা তরঙ্গ কোথাও বাধাপ্রাপ্ত হয় না। এইজন্য স্বাভাবিকভাবে অন্যান্য যে কোন মহাসাগর অপেক্ষা কুমেরু মহাসাগরে চন্দ্র ও সূর্যের আকর্ষণী শক্তি অধিক কার্যকরী হয়। আলোচ্য মতবাদ অনুযায়ী চন্দ্রের আকর্ষণে কুমেরু মহাসাগরে দুটি প্রবল জোয়ার তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। এই তরঙ্গ দুটি চন্দ্রের আবর্তন গতির সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব হতে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়। আফ্রিকার দক্ষিণ উত্তমাশা অন্তরীপের নিকট উক্ত তরঙ্গ পৌঁছলে সেখান হতে একটি গৌণ তরঙ্গের সৃষ্টি হয় এই গৌণ জোয়ার তরঙ্গটি আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূলে দিয় অগ্রসর হয়। ক্রম অগ্রসরমান তরঙ্গ মতবাদ অনুযায়ী পৃথিবীর জলভাগগুলেরা মধ্যে জোয়ার সৃষ্টির জন্য কুমেরু মহাসাগরে সৃষ্ট উক্ত দুটি জোয়ার তরঙ্গই দায়ী। এই তরঙ্গ দুটি চন্দ্রের গতির সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠ পরিক্রমণ করে। ভূ-পৃষ্ঠের যে পার্শ্ব চন্দ্রের দিকে থাকে তথায় এবং তার প্রততিপাদ্য স্থানে জোয়ার তরঙ্গ দুটি কার্যকর থাকে। তরঙ্গ দুটি পৃথিবীর অন্যান্য মহাসাগরগুলোর মধ্যে ক্রমশ বিভিন্নভাবে সঞ্চারিত হয়। যে স্থানগুলোতে জোয়ার হয় তার সঙ্গে সমকোণে অবস্থিত স্থানগুলোতে অর্থাৎ দুই জোয়ার তরঙ্গের মধ্যবর্তী স্থানে একই সঙ্গে ভাটা হয়।

স্থির তরঙ্গ মতবাদ : অধ্যাপক হ্যারিস (Harris) স্থির তরঙ্গ মতবাদের প্রধান প্রবক্তা এই মতবাদ ক্রম অগ্রসরমান তরঙ্গ মতবাদের বিপরীত। এই মতবাদ অনুযায়ী জোয়ার তরঙ্গগুলোকে স্থির হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। পানিভর্তি একটি ট্যাংকের মধ্যে দোলায়মান ঢেউয়ের সঙ্গে সমুদ্রের জোয়ার তরঙ্গের তুলনা করা হয়েছে। ট্যাংকটি নাড়ালে তার ভিতর পানির উপরিভাগ দুলতে থাকে এবং তার মধ্যভাগে প্রবলভাবে প্রতিহত হয়ে দোল খেতে থাকবে। সমুদ্রের জোয়ারভাটার ক্ষেত্রেও অনুরূপভাবে পানি দুলতে থাকে। চন্দ্রের আকর্ষণে সমুদ্রের পানি স্ফীত হয়ে উঠলে যে তরঙ্গের সৃষ্টি হয় তা স্থির তরঙ্গ। হ্যারিসের মতে ক্রম অগ্রসরমান তরঙ্গের মত স্থির তরঙ্গ সমগ্র পৃথিবী পরিক্রমণ করে না বরং চন্দ্রের আকর্ষণে পৃথিবীর যে দিক আকর্ষিত হয় সেইদিক এবং তার বিপরীত দিকে সাময়িকভাবে প্রবল জোয়ার তরঙ্গের সৃষ্টি হয় তা পর্যায়ক্রমে দোল খেতে থাকে। আটল্যান্টিক মহাসাগরে স্থির তরঙ্গের প্রভাবেই জোয়ারের সৃষ্টি হয় এবং তা উক্ত মহাসাগরের উত্তর দক্ষিণ বরাবর দোল খায়। এমনিভাবে পৃথিবীর সবকয়টি মহাসাগরের সৃষ্ট জোয়ার স্থির তরঙ্গের প্রভাবেই হয়ে থাকে।

জোয়ারবিহীন স্থান : পানিরাশির মধ্যে এমন কতকগুলো স্থান রয়েছে যে সকল স্থানে জোয়ারভাটার প্রভাব আদৌ পরিলক্ষিত হয় না এই সমস্ত স্থানকে জোয়ারবিহীন স্থান বলে। এই সকল স্থান হতেই মহাসাগরগুলোর মধ্যে সমজোয়ার রেখা নির্ধারণ করা হয়।

জোয়ারভাটার প্রভাব

মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের উপর জোয়ারভাটার যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। স্থলভাগের উপরে পানিরাশিতে এবং ব্যবসায় বাণিজ্যের উপরে জোয়ারভাটার যথেষ্ট ভূমিকা আছে। এর ফলে মানুষ নানাভাবে উপকৃত হয়ে থাকে। নিম্নে জোয়ারভাটার প্রভাবগুলো আলোচনা করা হল :

(১) জোয়ারের সময় পানি বৃদ্ধি পায় বলে সমুদ্রগামী জাহাজের পক্ষে নদী বন্দরে প্রবেশে সুবিধা হয়। আবার ভাটার স্রোতের সঙ্গে ঐ জাহাজ অনায়াসে সমুদ্রে এসে পড়ে। চট্টগ্রাম, কলকাতা, লন্ডন, প্রভৃতি নদী বন্দরে এইরূপ জোয়ারের টান ও পানি বৃদ্ধির জন্য বন্দরে জাহাজ প্রবেশ এবং ভাটায় জাহাজ বাহির করা হয়।

(২) জোয়ারভাটার জন্য নদীসমূহের পানি নির্মল থাকে। দৈনিক দুবার জোয়ারভাটা হওয়ার ফলে নদীতে পতিত আবর্জনাদি এবং নদীর মোহনার পলিগুলো নিষ্কাশিত হলে নদীর পানি নির্মল হয়।

(৩) জোয়ারভাটার জন্য পলিমাটি পড়ে নদীর মুখ বন্ধ হতে পারে না। ফলে নৌ চলাচলের যোগ্য হয়। ইংল্যান্ডের টেমস নদীতে জোয়ারভাটার দরুণ পলি জমতে পারে না। বলেই সর্বদা নৌ — বাহনযোগ্য থাকে।

(৪) জোয়ারভাটার স্রোতের জন্য নদীখাত গভীর হয়। অবিরাম জোয়ারভাটার টানে পলিমাটি পড়ে নদীর মুখ বন্ধ হতে পারে না।

(৫) জোয়ার শক্তি হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। পৃথিবীর অনেক অংশে বিরাট আকারের জলাধার নির্মাণ করে জোয়ারের সময় পানিতে ভর্তি করে রাখা হয়। ভাটার সময় ঐ পানি সরু পথে নিচে নির্গত করে পানি বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়।

(৬) নদীর জোয়ার পানিসেচের সহায়তা করে। অনেক নদীর পার্শ্ব হতে খনন করা খালে জোয়ারের পানি আটকিয়ে জমিতে সেচ দেয়া হয়।

(৭) জোয়ারভাটার জন্য সমুদ্রের লবণাক্ত পানি নদীর মধ্য দিয়ে দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে বলে নদীর পানি অধিকতর লবণাক্ত হয়। এজন্য শীতপ্রধান দেশে নদীর পানি সহজে জমে না।

(৮) জোয়ারভাটার ফলে নৌচলাচল তথা ব্যবসা-বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা হয়। জোয়ারের সময় নদীর মোহনায় ও তার অভ্যন্তরে পানি অধিক হয় বলে বড় বড় সমুদ্রগামী জাহাজের পক্ষে নদীতে প্রবেশ করা সুবিধা হয়।

(৯) কোন কোন নদীতে জোয়ারের সময় বান ডাকার ফলে অনেক সময় নৌকা, লঞ্চ প্রভৃতি ডুবে যায় বা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং নদীর পাশ্ববর্তী এলাকার জানমালেরও প্রভূত ক্ষতিসাধন হয়।

৩.২৪ : সমুদ্র স্রোত তার এর বিবরণ

সমুদ্র-স্রোতের সংজ্ঞা, কারণ ও প্রভাব

ভূমিকা : আমাদের এই পৃথিবীর তিন চতুর্থাংশে পানি। পৃথিবীতে রয়েছে অনেক সাগর মহাসাগর। কিন্তু এই সমুদ্রের পানি কখনও একস্থানে স্থির থাকে না। তা সর্বদা চলাচল করছে বায়ুর গতির মতো সমুদ্রের পানিও একস্থান হতে অন্যস্থানে প্রবাহিত হচ্ছে। সমুদ্র স্রোতের প্রভাব নানাভাবে দেখতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন সমুদ্র ও মহাদেশ সমূহের উপকূলে বিভিন্ন উষ্ণ ও শীতল স্রোতের প্রভাব লক্ষ্য করা হয়। এই সকল সমুদ্র স্রোতগুলো পর্যবেক্ষণ করে মানুষ তাদেরকে নানাভাবে ব্যবহার করছে। দেশের জলবায়ু ও বাণিজ্যের উপর সমুদ্র স্রোতের প্রভাব অত্যাধিক।

সংজ্ঞা : সমুদ্রের পানি সর্বদাই চলাচল করছে। বায়ুর গতির মতো সমুদ্রের পানিও সমুদ্রের একস্থান হতে অন্যস্থানে প্রবাহিত হচ্ছে। সমুদ্রের একস্থান হতে অন্যস্থানে সমুদ্রের পানির নির্দিষ্ট ও নিয়মিত গতিকে সমুদ্র স্রোত বলে।

সমুদ্র স্রোতের কারণ : বিভিন্ন কারণে সমুদ্রের উপরিভাগে জলরাশির সমতার যে ব্যতিক্রম ঘটে, নিতান্তই স্বাভাবিক নিয়মে জলরাশির উপরিভাগের সেই সমতাবিধানের জন্য জলরাশির কিছুটা অংশ সমুদ্রের একস্থান হতে অন্যস্থানের দিকে প্রবাহিত হয়। যে সকল বিভিন্ন কারণে সমুদ্র স্রোতের উদ্ভব হয় নিম্নে তাদের সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল।

১। বায়ুপ্রবাহ : বিশেষজ্ঞগণের মতে বায়ুপ্রবাহই সমুদ্র স্রোতের প্রধান কারণ। পৃথিবী আবর্তনের ফলে ভূ-পৃষ্ঠে কতকগুলো নির্দিষ্ট নিয়ত বায়ুপ্রবাহের সৃষ্টি হয়। এই নিয়ত বায়ুপ্রবাহগুলো কোন না কোন নির্দিষ্ট পথে প্রবাহিত হয়। সমুদ্রের উপর দিয়ে প্রবাহিত হবার সময় এই বায়ুগুলোর ঘর্ষণে সাগরের উপরের স্তরের জলরাশি একস্থান হতে অন্যস্থানের দিকে প্রবাহিত হয়। প্রধান প্রধান সমুদ্রস্রোতগুলোকে ভূ-পৃষ্ঠের প্রধান প্রধান প্রবাহগুলোর পথ অনুসরণ করতে দেখা যায়। আয়নবায়ু প্রবাহিত এলাকায় সমুদ্রস্রোত পূর্ব হতে পশ্চিম দিকে এবং প্রত্যায়ন বায়ুপ্রবাহিত এলাকায় স্রোত পশ্চিম হতে পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়। ভারত মহাসাগরে ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে যখন মৌসুমী বায়ুপ্রবাহের গতি পরিবর্তিত হয় তখন তথায় সমুদ্র স্রোতও পরিবর্তিত হয়ে বায়ুর গতিপথ অনুসরণ করে। সে জন্য বায়ুপ্রবাহের মানচিত্রের সহিত সমুদ্রস্রোতের মানচিত্রের অপূর্ব সামঞ্জস্য দেখা যায়।

২। উষ্ণতার তারতম্য : সমুদ্রের বিভিন্ন অংশে উত্তাপের তারতম্য সমুদ্র স্রোতের অন্যতম কারণ। নিরক্ষীয় অঞ্চলে সূর্যরাশ্মি সোজাসুজি এবং মেরু প্রদেশে তীর্যকভাবে পড়ে। ফলে মেরু প্রদেশ অপেক্ষা নিরক্ষীয় অঞ্চলে সমুদ্রের পানি অধিক উত্তাপে উত্তপ্ত হয়ে আয়তনে বৃদ্ধি প্রাপ্ত ও হালকা হয় এবং তার ঘনত্ব কমে যায়। কিন্তু মেরু প্রদেশে সংকোচনের ফলে পানিরাশি ভারী হয়। নিরক্ষীয় অঞ্চলের উষ্ণ ও হালকা পানিরাশির সমুদ্র পৃষ্ঠে উঁচু হয়ে ভেসে উঠে এবং শীতল মেরু প্রদেশের দিকে উষ্ণ পৃষ্ঠ প্রবাহ বা বহিঃ স্রোত (Hot Surface Current) রূপে সমুদ্রের উপরিভাগ দিয়ে প্রবাহিত হয়। নিরক্ষ প্রদেশের এই শূন্যস্থানপূরণ করবার জন্য মেরু অঞ্চলের

শীতল ও ভারী পানি শীতল অন্তঃপ্রবাহ (Cold Under Current) রূপে নিরক্ষীয় অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয়। একে পানির "পরিচলন" বলে।

উষ্ণ সমুদ্র স্রোত শীতল অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হবার সময় তার পানিরাশি ক্রমশ অধিক শীতল হতে থাকে। সে জন্য তা শীতল পানির সহিত ধীরে ধীরে মিশে ভারী হয় এবং ডুবে যায়। পক্ষান্তরে শীতল স্রোত নিরক্ষীয় প্রদেশের দিকে প্রবাহিত হবার সময় তার পানিরাশি ক্রমশ উষ্ণ ও হাল্কা হয়। সে জন্য উষ্ণমণ্ডলে পৌছার পর সে স্থানের উষ্ণ স্রোতের সহিত মিশে পৃষ্ঠ প্রবাহে পরিণত হয়। এজন্য নিরক্ষীয় প্রদেশের উপর হতে নিচে এবং মেরু অঞ্চলে নিচ হতে উপরের দিকে পানি প্রবাহিত হয়। ফলে এই দুটি স্থানে উপর নিচ (Up and Down) প্রবাহ সৃষ্টি হয়। এই প্রবাহকে পরিচলন স্রোত (Conection Current) নামে অভিহিত করা হয়।

৩। বাষ্পীভবনের তারতম্য : উষ্ণমণ্ডলে সমুদ্রের পানি অধিক উত্তাপ লাভ করে প্রচুর পরিমাণে বাষ্পে পরিণত হয়। কিন্তু নাতিশীতোষ্ণ ও শীতল অঞ্চলের পানি সেরূপ উত্তাপ পায় না বলে অপেক্ষাকৃত কম বাষ্পীভূত হয়। উত্তাপের পার্থক্যের উপর বাষ্পীভবনের তারতম্য নির্ভর করে। সমুদ্রের কোন অংশে উষ্ণতার জন্য বাষ্পীভবন বেশি হলে জলরাশির সমতা রক্ষা করার জন্য চারদিক হতে শীতল স্রোত সেদিকে প্রবাহিত হয়। এইরূপে বাষ্পীভবনের তারতম্যের জন্য সমুদ্র স্রোতের উৎপত্তি হয়। নিরক্ষীয় ও ক্রান্তীয় অঞ্চলে যে সমস্ত সাগর প্রায় চার দিকে স্থল দ্বারা বেষ্টিত এবং প্রণালী দ্বারা মহাসাগর বা অপর কোন সাগরের সহিত সংযুক্ত বাষ্পীভবনের তারতম্য বশত সাধারণত এই সকল সাগরের পরস্পরের মধ্যে স্রোত উৎপন্ন হয়। স্থল বেষ্টিত সমুদ্রে বাষ্পীভবন বশত পানি কমে গেলে তাতে পতিত নদীসমূহ যদি সেই শূন্যতা পূরণ করতে না পারে তবে সেই অভাব পূরণের জন্য নিকটবর্তী সমুদ্র হতে পৃষ্ঠ প্রবাহ তার দিকে এসে থাকে। ভূমধ্যসাগরে যে পরিমাণ পানি বাষ্পীভূত হয় নদী বা বৃষ্টির পানি সে অভাব পূরণ করতে পারে না। সেজন্য জিব্রাল্টার প্রণালী দিয়ে একটি পৃষ্ঠপ্রবাহ আটল্যান্টিক মহাসাগর হতে ভূমধ্যসাগরের দিকে অগ্রসর হয়। বাল্টিক সাগরে বাষ্পীভবন হেতু পানি হ্রাস, নদী আনিত পানি অপেক্ষা কম বলে তা হতে পৃষ্ঠপ্রবাহ উত্তর সাগরে এবং উত্তর সাগর হতে অন্তঃপ্রবাহ বাল্টিক সাগরে আসে।

৪। লবণাক্ততার তারতম্য : অধিক লবণাক্ত পানি, উষ্ণ ও কম লবণাক্ত পানি অপেক্ষা ঘন ও ভারী বলে তার চাপ বেশি। এজন্য অধিক লবনাক্ত পানি নিচের দিকে নেমে যায় এবং লঘুতর ও অপেক্ষাকৃত কম লবণাক্ত পানি উপরের দিকে উঠে আসে। এরূপে ঊর্ধ্ব স্রোত এবং নিম্নস্রোতের সৃষ্টি হয়। বাষ্পীভবন বশত কোন সাগরের পানি কমে গেলে তার লবণাক্ততা বৃদ্ধি পায়। তাতে অধিক লবণাক্ত সমুদ্র হতে অল্প লবণাক্ত সমুদ্রের দিকে অন্তঃপ্রবাহ এবং অল্প লবণাক্ত সমুদ্র হতে অধিক লবণাক্ত সমুদ্রের দিকে পৃষ্ঠ প্রবাহ সৃষ্টি হয়। ভূমধ্যসাগরের পানি অধিক লবণাক্ত বলে আটলান্টিক মহাসাগর ও কৃষ্ণ সাগর হতে কম লবণাক্ত পানি পৃষ্ঠ প্রবাহরূপে ভূমধ্যসাগরের দিকে প্রবাহিত হয়।

৫। ভূ-ভাগের অবস্থান : সমুদ্র স্রোত প্রবাহিত হবার সময় তার সম্মুখে কোন স্থলভাগ পড়লে স্রোতের গতি পরিবর্তিত হয়। নিরক্ষ প্রদেশে কোন স্থল ভাগ না থাকলে নিরক্ষীয় স্রোত বরাবর পশ্চিম দিকে চালিত হতো। কিন্তু এই স্রোত আটলান্টিক মহাসাগরের ব্রাজিলের পূর্ব উপকূলে, প্রশান্ত মহাসাগরে পূর্ব ভারতীয় দ্বীপ পুঞ্জে এবং ভারত মহাসাগর আফ্রিকার দক্ষিণ পূর্বে মাদাগাস্কার দ্বীপে বাধা পেয়ে দুই বা তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে উত্তর ও দক্ষিণ দিকে বেঁকে প্রবাহিত হয়।

৬। পৃথিবীর আহ্নিক গতি : পৃথিবী নিজ অক্ষের উপর পশ্চিম হতে পূর্বদিকে ঘুরছে পৃথিবীর এই আহ্নিক গতির ফলে সমুদ্রের পানি পশ্চিম হতে পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়ে সমুদ্র স্রোতের সৃষ্টি করে। ফেরেলের সূত্র অনুযায়ী এই স্রোত উত্তর গোলার্ধে ডান দিকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে বাম দিকে বেঁকে চলে।

৭। গভীরতা : গভীরতা হিসাবে উষ্ণতার বৈষম্য হয়। অল্প গভীর স্থানের পানি সহজে উত্তপ্ত হয়ে উপরে উঠে আসে এবং শীতল পানি নিচে নেমে যায়। এইরূপে উর্ধ্বগামী ও নিম্নগামী স্রোতের ফলে সমুদ্রে নিয়মিত প্রবাহের সৃষ্টি হয়।

সমুদ্রে স্রোতের দিক : পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের সাগর ও মহাসাগরের পানির সমতা রক্ষার জন্য এবং নিয়ত বায়ুপ্রবাহের ফলে যে সমুদ্র স্রোতের উদ্ভব হয় তা প্রধানত (১) বায়ু প্রবাহের দিক অনুসরণ করে। উষ্ণমন্ডলের আয়ন বায়ুর দিক অনুসারে সমুদ্র স্রোত উত্তর পূর্ব বা দক্ষিণ পশ্চিম বা উত্তর পশ্চিম দিক হতে প্রবাহিত হয়। (২) পৃথিবীর আবর্তনের ফলে সমুদ্র স্রোত বায়ু প্রবাহের ন্যায় উত্তর গোলার্ধে ডানদিকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে বামদিকে বেঁকে যায়। এরই নাম ফেরেলের সূত্র। (৩) উষ্ণ স্রোত সমুদ্রের উপরিভাগ দিয়ে পৃষ্ঠপ্রবাহরূপে এবং শীতল স্রোত উপরিভাগের পানিরাশির কিছু নিচু দিয়ে অন্তঃপ্রবাহরূপে প্রবাহিত হয়। (৪) পথিমধ্যে বাধা পেলে সমুদ্র স্রোত দিক পরিবর্তন করে। (৫) গভীর সমুদ্রে স্রোতের বেগ কিছু দ্রুত।

বাণিজ্যের উপর সমুদ্র স্রোতের প্রভাব

১। হিমমন্ডলে অবস্থিত বা নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের শীতলতর অংশে অবস্থিত সমুদ্রের পানি শীতকালে জমে যায়। পৃথিবীর অনেক দেশে বছরের বেশির ভাগ সময় সমুদ্রের পানি জমে থাকে। কিন্তু সমুদ্রে ঐরূপ অংশে উষ্ণ স্রোত প্রবাহিত হলে উষ্ণস্রোতের প্রভাবে তথায় শীতকালেও বরফ জমতে পারে না। উষ্ণ উত্তর আটলান্টিক স্রোতের প্রভাবে ইউরোপের উত্তর পশ্চিমাংশে নরওয়ের উত্তরেও সারা বৎসর জাহাজ চলাচল করতে পারে। পক্ষান্তরে তার দক্ষিণে বাল্টিক সাগরে পানি জমে যায়। আবার নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের উচ্চতর অংশের সমুদ্র শীতল স্রোত প্রবাহিত হলে ঐ শীতল স্রোতের প্রভাবে সে স্থানের পানিরাশি জমে যেতে পারে। উষ্ণ জাপান স্রোতের প্রভাবে কানাডার পশ্চিম উপকূল ও ভ্যাঙ্কভার দ্বীপ বরফমুক্ত থাকে। কিন্তু শীতল ল্যাব্রাডার স্রোতের প্রভাবে কানাডার পূর্ব উপকূলে এবং শীতল বেরিং স্রোতের প্রভাবে প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের পূর্ব উপকূল বরফাচ্ছন্ন হয়।

২। সামুদ্রিক জাহাজ চলাচলের উপর সমুদ্রস্রোতের প্রভাব খুব স্পষ্ট। স্রোতের অনুকূলে জাহাজ চালনাকরে শীঘ্র গন্তব্যস্থানে পৌছান সম্ভব হয়। কিন্তু প্রতিকূলে জাহাজ চালাতে ভীষণ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। উত্তর আমেরিকা হতে ইউরোপগামী জাহাজ উপসাগরীয় স্রোতের গতিপথে অগ্রসর হয়ে খুব শীঘ্র গন্তব্যস্থানে পৌছায়। কিন্তু ইউরোপ হতে উত্তর আমেরিকাগামী জাহাজ পূর্বোক্ত পথে অগ্রসর হয়ে বেশ কিছু বিলম্বে গন্তব্যস্থানে পৌছায়।

৩। উষ্ণ স্রোতের গতিপথে জাহাজ চালনা করা নিরাপদ। কিন্তু শীতল স্রোত উষ্ণ অক্ষাংশ হতে আসার সময় বহুল পরিমাণে হিমশৈল ভাসিয়ে আনে। ঐ সকল হিমশৈলের সহিত সংঘাতে জাহাজ ক্ষতিগ্রস্থ এমন কি নিমজ্জিত হয়। বিশ্ব বিখ্যাত টাইটানিক জাহাজ হিমশৈলের আঘাতে নিমজ্জিত হয়ে ছিল।

৪। শীতল স্রোতের সহিত আগত ভাসমান হিমশৈল উষ্ণ স্রোতের সংস্পর্শে আসলে ভেংগে যায়.এবং তার সহিত আনিত গ্রাম রেখার কাদা, বালু, কাঁকর, প্রচুর নুড়ি প্রভৃতি উভয় স্রোতের মিলনস্থলে সমুদ্রের তলদেশে সঞ্চিত হয়ে মগ্নচড়ার সৃষ্টি করে। উত্তর আমেরিকার নিউফাউন্ডল্যান্ডের নিকট বিখ্যাত গ্রান্ড ব্যাঙ্কস এবং ইউরোপের নিকট উত্তর সাগরের ডগার ব্যাঙ্কস এরূপে সৃষ্টি লাভ করেছে।

৫। বিভিন্ন উষ্ণ ও শীতল স্রোতের মিলনস্থলে মগ্নচড়ার নিকট অধিক পরিমাণে অক্সিজেন ও প্লাংকটন জাতীয় ও অন্যান্য উদ্ভিদ থাকায় মৎস্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। শীতল স্রোতের সহিত প্রচুর মৎস্য ভেসে আছে এবং তারা শীতল ও উষ্ণস্রোতের সন্ধিস্থল মগ্নচড়ার নিকট থেকে যায়। এ সকল কারণে নিউফাউন্ডল্যান্ড, বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ, নরওয়ে এবং জাপানের উপকূলে শ্রেষ্ঠ মৎস্য চারণক্ষেত্রগুলো রয়েছে। এ সকল স্থানে প্রচুর মৎস্য পাবার সুযোগ সুবিধা থাকায় পাশ্ববর্তী ভূ-ভাগে অনেক মৎস্য ব্যবসার কেন্দ্র গড়ে উঠেছে।

জলবায়ুর উপর সমুদ্র স্রোতের প্রভাব

১। যে দেশের উপকূলের নিকট দিয়ে সমুদ্র স্রোত প্রবাহিত হয় সে দেশের জলবায়ুর উপর এর প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। উষ্ণ স্রোত উপকূলস্থ দেশসমূহের উত্তাপ বৃদ্ধি করে। আবার শীতল স্রোত উপকূলস্থ দেশসমূহের জলবায়ুকে অপেক্ষাকৃত শীতল করে। উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোতের প্রভাবে ইংল্যান্ড ও নরওয়ের এবং উষ্ণ করোশিও স্রোতের প্রভাবে জাপানের শৈত্য হ্রাস পায়। লন্ডন অপেক্ষা নিউইয়র্ক দক্ষিণে অবস্থিত হলেও নিউইয়র্কের নিকট দিয়ে শীতল লাব্রাডার স্রোত প্রবাহিত হয় বলে তথায় শীতকালে লন্ডন অপেক্ষা তীব্র শীত অনুভূত হয় এবং সেন্ট লরেন্স নদীর পানি জমে যায়।

২। উষ্ণ স্রোতের উপর দিয়ে সমুদ্র বায়ু স্থল ভাগের দিকে প্রবাহিত হবার সময় প্রচুর পরিমাণে জলীয়বাষ্প আহরণ করে। এই বায়ু শীতল প্রদেশে প্রবাহিত হলে উপকূলের নিকট অধিক বৃষ্টিপাতের সৃষ্টি করে। আবার শীতল স্রোতের উপর দিয়ে প্রবাহিত বায়ুর প্রভাবে

উপকূলস্থ দেশের বায়ুশীতল হয়। এরূপ বায়ু দ্বারা বৃষ্টি না হয়ে তুষারপাত হয়। এজন্য লাব্রাডার স্রোতের প্রভাবে উত্তর আমেরিকার লাব্রাডার উপদ্বীপে প্রচুর তুষারপাত হয়।

৩। উষ্ণ স্রোত ও শীতল স্রোতের মিলনস্থলে সেগুলোর পরস্পরের তাপের অধিক পার্থক্যের জন্য এবং অতি অল্প স্থানে অধিক তাপের পরিবর্তনের ফলে কুয়াশা ও ঝড় বৃষ্টি উৎপন্ন হয়। যথা — লাব্রডার উপকূলে হ্যরিকেন ও জাপান উপকূলে টাইফুন ঝড় প্রবাহিত হয়। এরূপ আবহাওয়ার মধ্য দিয়ে নৌ চলাচলে বিপদের সম্ভাবনা থাকে।

৩.২৫ মহাসাগরের তলদেশের ভূ-প্রকৃতি (Topography of the Ocean Floor)

প্রশান্ত মহাসগারের তলদেশ (The floor of the pacific Ocean) : প্রশান্ত মহাসাগরের তলদেশ অন্যান্য মহাসাগরের তলদেশ অপেক্ষা বেশি গভীর। এই মহাসাগরের অধিকাংশই গভীর সমুদ্রের সমভূমি (The deep sea plains) অঞ্চল দ্বারা গঠিত তার গভীরতা গড়ে ৭.২৪ কি.মি. (৪০০ ফ্যাদম)। তবে এই মহাসাগরের প্রায় ৭৫ ভাগ স্থানের গভীরতা ৩.৬৫ কিলোমিটারের বেশি।

এই মহাসাগরের তলদেশের বিভিন্ন প্রকার ভূমিরূপ নিচে আলোচিত হল —

(ক) মহীসোপান ও মহাঢাল : এই মহাসাগরের মহীসোপান খুবই কম। এশিয়া মহাদেশের উপকূলের নিকটবর্তী সাগরগুলো বাদে সমগ্র প্রশান্ত মহাসাগরের চতুর্দিকে মহীসোপান খুবই অপ্রশস্ত এবং কোন কোন স্থানে সমুদ্রের তীরস্থ অংশ খাড়াভাবে গভীর সমুদ্রে প্রবেশ করেছে এই মহাসাগরের পূর্ববর্তীর বরাবর উত্তর দক্ষিণে রঞ্জিকও আন্দিজ পর্বতশ্রেণী থাকায় এই উপকুল মহীসোপানবিহীন মহীসোপান কম থাকায় এই মহাসাগরে মহীঢালের পরিমাণই বেশি।

(খ) তলদেশের উচ্চ ভূমিসমূহ : প্রশান্ত মহাসাগরের তলদেশের উচ্চ ভূমির মধ্যে কতিপয় মালভূমি ও শৈলশিরা এবং ছোট বড় অসংখ্য দ্বীপ রয়েছে।

মালভূমি : স্থলভাগের উপর অবস্থিত মালভূমির মতো এই মহাসাগরের তলদেশে কয়েকটি মালভূমি রয়েছে। কোন কোন স্থানে এই মালভূমি এত উচ্চ যে এদের উপরিভাগে পানির গভীরতা প্রায় ১৮০ মিটার। এই মালভূমিগুলোর মধ্যে সর্বপ্রধান ও বিখ্যাত মালভূমি হল অ্যালবট্রস মালভূমি (Albatross Plateau)। এটি প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্ব প্রান্তে কালিফোর্নিয়া উপদ্বীপের দক্ষিণ সীমা হতে দক্ষিণ আমেরিকার ইকোয়েডর পর্যন্ত বিস্তৃত। চিলির পশ্চিম দিকে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত অপর একটি মালভূমিও আছে। একেই দক্ষিণ পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরীয় মালভূমি (South Eastern Pacific Plateau) বলা হয়।

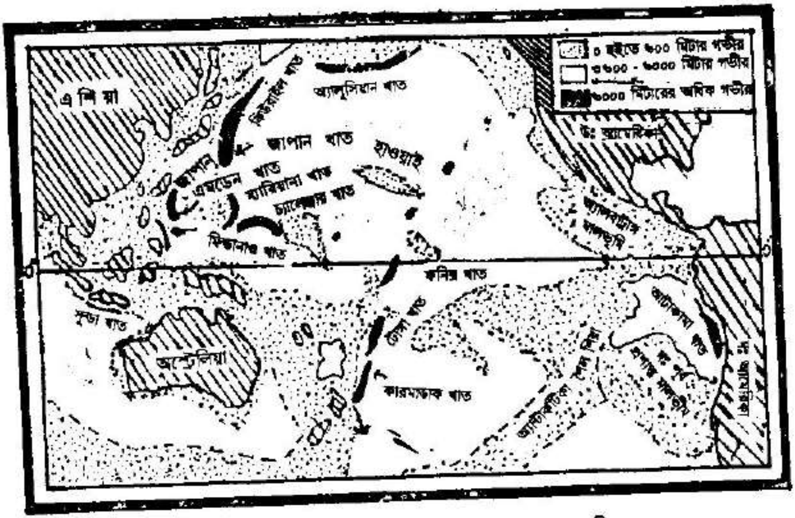

চিত্র : ৮০. প্রশান্ত মহাসাগরের তলদেশের ভূ-প্রকৃতি

শৈলশিরা

স্থলভাগের সুউচ্চ পর্বতমালার মতো প্রশান্ত মহাসাগরের তলদেশে সুবিস্তৃত শৈলশিরা রয়েছে। এই মহাসাগরের দক্ষিণ সীমা ও অ্যান্টার্কটিকা বা কুমেরু মহাদেশের মধ্যে এইরূপ এক বিশাল শৈলশিরা অবস্থান করে। একে প্যাসিফিক অ্যান্টার্কটিকা শৈলশিরা বলে। এই শৈলশিরা অ্যালবাট্রস মালভূমি ও দক্ষিণ পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরীয় মালভূমির সহিত উচ্চ অংশ দ্বারা সংযুক্ত।

এটি মূল প্রশান্ত মহাসগারীয় তলদেশকে দক্ষিণ আমেরিকা ও অ্যান্টার্কটিকা হতে পৃথক করে রেখেছে। এই প্যাসিফিক অ্যান্টার্কটিকা শৈলশিরা নিরক্ষরেখার দক্ষিণ দিকে পশ্চিম দিকে প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত।

এই মহাসাগরের সমগ্র পশ্চিম প্রান্তব্যাপী একটি অপ্রশস্ত ও সুদীর্ঘ শৈলশিরা অবস্থিত এটি জাপান হতে দক্ষিণ দিকে অস্ট্রেলিয়ার পূর্বপ্রান্ত ও নিউজিল্যান্ড হয়ে কুমেরু মহসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। অবশ্য এই শিরাটি সর্বত্র অবিচ্ছিন্ন না হয়ে কয়েকটি স্থানে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আছে। এছাড়া আরও কয়েকটি উচ্চভূমি এই মহাসাগরে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় রয়েছে।

দ্বীপসমূহ : মহাসাগরের মধ্যে অবস্থিত দ্বীপগুলি সমুদ্রতলের উচ্চভূমিরই অংশ বিশেষ এই মহাসাগরে ছোট বড় প্রায় বিশ হাজার দ্বীপ রয়েছে। বৃহদাকার দ্বীপগুলোর অধিকাংশই মহাদেশের নিমজ্জিত বিচ্ছিন্ন অংশ নিয়ে গঠিত। এর পূর্ব প্রান্তে অ্যালুসিয়ান দ্বীপ ও চিলির দ্বীপপুঞ্জে মহাদেশের বিভিন্ন অংশ হতে উদ্ভূত। পশ্চিম প্রান্তেও অনেকগুলো দ্বীপুঞ্জ রয়েছে এদের মধ্যে জাপান দ্বীপপুঞ্জ, কিউরাইল দ্বীপুঞ্জ, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপপুঞ্জ এবং নিউজিল্যান্ড দ্বীপ বিশেষ প্রসিদ্ধ। এছাড়া উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরের হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সকল দ্বীপপুঞ্জ ছাড়াও আগ্নেয়গিরি ও প্রবালকীট দ্বারা গঠিত অনেকগুলো দ্বীপপুঞ্জ প্রশান্ত মহাসাগরে দেখতে পাওয়া যায়।

গভীর খাত : প্রশান্ত মহাসাগরে প্রান্তদেশে বহুসংখ্যক সুদীর্ঘ গভীর সমুদ্রখাত এর তলদেশের অন্যতম বৈশিষ্ট। এই সুগভীর সমুদ্রখাতগুলোর অধিকাংশই ভূ-পৃষ্ঠের উচ্চ পর্বতের নিকটতম স্থানে অবস্থিত। কোন কোন স্থানে সমুদ্রখাতগুলো পর্বতসমূহের সহিত সমান্তরালভাবে অবস্থিত। গভীর সমুদ্রখাত মহাসাগরের পশ্চিম প্রান্তেই অধিক দেখতে পাওয়া যায়। এই সকল গভীর সমুদ্র খাতের মধ্যে গুয়াম দ্বীপের ৩২২ কি.মি. দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত ম্যারিয়ানা খাত (Mariana Trench) সর্বাপেক্ষা গভীর। এর গভীরতা ১০·৮৬ কি.মি. বা ৫,৯৪০ ফ্যাদাম এবং ইহাই পৃথিবীর গভীরতম স্থান। এটির পূর্বেই রয়েছে চ্যালেঞ্জার খাত (Challenger Depth) অন্যান্য খাতগুলোর মধ্যে ফিলিপাইনের উত্তর পূর্বে এমডেন খাত (Emden ৫৯০২ ফ্যাদম), ফিলিপাইনের দক্ষিণ পূর্বে মিনুনোও দ্বীপের পার্শ্বে মিন্ডানাও খাত ৫৯০০ ফ্যাদম), জাপানের দক্ষিণ পূর্বে জাপান খাত (৫৭৭১ ফ্যাদাম), কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জের পূর্বে কিউরাইল বা টাস্কারোয়া খাত (Tuscrora, ৪৬৫৫ ফ্যাদম) এবং আরও উত্তরে অ্যালুসিয়ান দ্বীপপুঞ্জের দক্ষিণে অ্যালুসিয়ান খাত (৪,৯৯৯ ফ্যাদম) অবস্থিত। এসকল খাত এশিয়ার পূর্ব উপকূলে অনেকটা সারিবদ্ধরূপে কারমাডেক দ্বীপের নিকট কারমাডেক খাত (৫,১৫৫ ফ্যাদম) এর উত্তরে টোঙ্গা দ্বীপপুঞ্জের পার্শ্বে টোঙ্গা খাত (৪,৭৬২ ফ্যাদম) এবং আরও উত্তরে ফনিক্স দ্বীপের নিকট ফনিক্স খাত অবস্থিত।

এই মহাসাগরের পূর্ব প্রান্তে দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূলের নিকটে কেবল আটাকামা খাত (৪,১৭৫ ফ্যাদম) উল্লেখযোগ্য। এছাড়া উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে উত্তর পূর্ব ও দক্ষিণেও ক্ষুদ্রাকৃতি কয়েকটি খাত রয়েছে।

প্রান্তদেশীয় সাগরসমূহ (Marginal seas) **:** প্রশান্ত মহাসাগরের প্রান্তভাগে কতগুলো সাগর রয়েছে। এরা প্রধান জলরাশি হতে বিচ্ছিন্ন আছে। সাগরগুলোর মধ্যে বেরিং, সাগর, ওখটস্ক সাগর, জাপান সাগর, পীত সাগর, পূর্বচিন সাগর, দক্ষিণ চিন সাগর ও শ্যাম সাগর

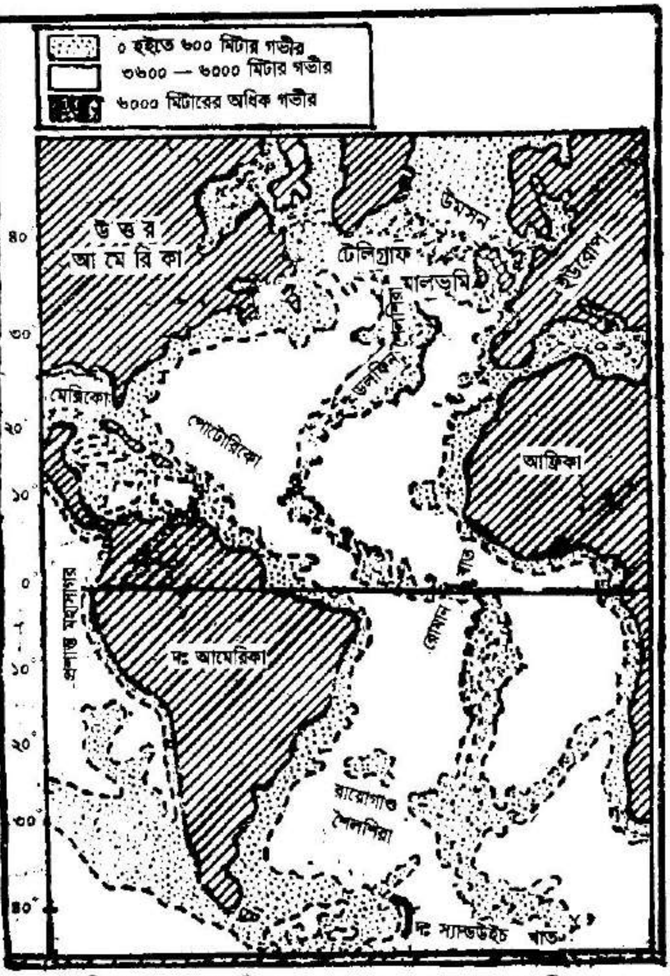

চিত্র : ৮১. আটলান্টিক মহাসাগরের তলদেশের ভূ-প্রকৃতি
[চিত্রে উত্তর দিকে গ = গ্রীনল্যান্ড শৈলশিরা এবং
বর্গ = বেফিন গ্রীনল্যান্ড শৈলশিরা।]

বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এসকল সাগরের গভীরতা ২,৪৩৮ মিটার হতে প্রায় ২,৭৪৩ মিটার পীত সাগরের গভীরতা খুবই কম। পূর্ব উপকূলে সাগর নেই বললেই চলে। দক্ষিণে রয়েছে ক্যালিফোর্নিয়া উপসাগর। এছাড়া অস্ট্রেলিয়ার উত্তর পূর্বদিকে পপুয়া সাগর ও কোরাল সাগর অবস্থিত।

আটলান্টিক মহাসাগরের তলদেশ (The floor of the Atlantic Ocean) :

আটলান্টিক মহাসগরের তলদেশ প্রশান্ত মহাসাগরের মতো অত গভীর নয়। এর মহীসোপান পৃথিবীর অন্যান্য মহাসাগর অপেক্ষা অনেক বেশি। কিন্তু এই মহাসাগরের গভীর সমুদ্র খাতের সংখ্যা খুবই কম। নিচে এই মহাসাগরের তলদেশের বিভিন্ন ভূমিরূপের বিবরণ দেয়া হল :

মহীসোপান ও মহীঢাল : আটলান্টিকের উত্তর দিকে সুবিস্তৃত মহীসোপান অবস্থিত। কিন্তু দক্ষিণ আটলান্টিকের উপকূলে মহীসোপান খুবই সরু। এ কারণে উত্তর আটলান্টিকে মহীঢালের পরিমাণ কম এবং দক্ষিণ আটলান্টিকে মহীঢালই বেশি।

উত্তর আটলান্টিকের পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলের অগীর সাগর ও উপসাগরগুলোর এই মহীসোপানেরই অংশ বিশেষ। উত্তর আটলান্টিকের পূর্বদিকের উত্তর সাগর, বাল্টিক সাগর প্রভৃতি এবং পশ্চিম দিকের বেফিন ও হাডসন উপসাগর এই মহীসোপানের অন্তর্গত। এই সকল সাগর ও উপসাগরে পানির গভীরতা ১৮০ মিটার বা তারও কম। এছাড়া পূর্ব উপকূলে ভূমধ্যসাগর এবং পশ্চিম উপকূলের মেক্সিকো উপসাগরের পানির গভীরতা ৩,৭৫০ মিটারের কম। দক্ষিণ আটলান্টিকের উভয় উপকূলে মহীসোপান খুব কম বিস্তৃত। এরপর থেকে মহাসাগরের মহীঢাল ক্রমশ ঢালু হয়ে গভীর সমুদ্রতলে প্রবেশ করেছে।

তলদেশের উন্নত অংশসমূহ : অন্যান্য মহাসাগরের তলদেশের মতো আটলান্টিকের তলদেশেও সুবিস্তৃত উচু অংশ রয়েছে। এই উচু অংশগুলো শৈলশিরা ও অন্তঃমহাসাগরীয় মালভূমিরূপে অবস্থিত।

আটলান্টিক মহাসাগরের তলদেশের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর মধ্যভাগে অবস্থিত উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত এক বিশাল শৈলশিরা। এটি মধ্য আটলান্টিক শৈলশিরা (Mid Atlantic Ridge) নামে পরিচিত। এটি একটি পানিমগ্ন শৈলশিরা। এর আকৃতি মহাসাগরের নিজস্ব আকৃতি ইংরেজি 'S' অক্ষরের মতো। এটি দুটি অংশে বিভক্ত। বিষুবরেখার উত্তরে অবস্থিত এর উত্তরাংশকে ডলফিন শৈলশিরা (Dolphin Ridge) এবং দক্ষিণাংশকে চ্যালেঞ্জার শৈলশিরা (Challenger Ridge) বলা হয়। এই উচ্চভূমির গভীরতা সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে প্রায় ৩,৩৪৮ মিটার। ভূ-বিজ্ঞানীদের মতে অতীতে এই শৈলশিরা বরাবর আটলান্টিক মহাসাগরের মধ্যস্থান দিয়ে উত্তর দক্ষিণে একটি সুদীর্ঘ ফাটল ছিল এবং এই ফাটল দিয়ে ভূআভ্যন্তরীণ পদার্থসমূহ উপরে উত্থিত ও সঞ্চিত হয়ে এই শৈলশিরার সৃষ্টি করেছে।

ডলফিন শৈলশিরার উত্তরাংশ প্রশস্ত হয়ে সুবিস্তৃত মালভূমিতে পরিণত হয়েছে। এর নাম টেলিগ্রাফ মালভূমি (Telegcraph plateau)। গ্রিনল্যান্ড ও বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের মধ্যবর্তী অংশে এর উচ্চতা এত অধিক যে এই স্থানে পানি রাশির গভীরতা গড়ে ৯১৪ হইতে ১০৬৭ মিটার। বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের পশ্চিম দিকে এই মালভূমির পূর্বাংশ উইভিল টমসন শৈলশিরা (Wyvill Tomson Ridge) এবং ফ্যারো আইসল্যান্ড শৈলশিরা নামে পরিচিত। গ্রিনল্যান্ড শৈলশিরা ও আইস ল্যান্ডের মধ্যবর্তী উন্নত অংশের নাম গ্রিনল্যান্ড শৈলশিরা এবং গ্রিনল্যান্ডের পশ্চিম পার্শ্ব দিয়ে বেফিন উপসাগরের দিকে বিস্তৃত উন্নত ভূমিকে বেফিন গ্রিনল্যান্ড শৈলশিরা (Baffin Greenland Rid ge) বলা হয়।

উত্তর আটলান্টিকের মতো দক্ষিণ আটলান্টিকেও কতিপয় শৈলশিরা রয়েছে।

মহাসাগরীয় দ্বীপসমূহ

এই মহাসাগরে দ্বীপের সংখ্যা প্রশান্ত মহসাগরের তুলনায় অনেক কম। উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরের পূর্ব উপকূলে বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ এবং পশ্চিম উপকূলে নিউফাউন্ডল্যান্ড দ্বীপ প্রকৃতপক্ষে মহীসোপানের উচ্চতম অংশ। কতিপয় দ্বীপ ও দ্বীপপুঞ্জ বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের উত্তর সীমা ও গ্রিনল্যান্ডের মধ্যে পূর্ব পশ্চিমে বিস্তৃত অংশে অবস্থিত। আইসল্যান্ড এদের মধ্যে সর্ব প্রধান। এই দ্বীপ ও দ্বীপপুঞ্জ শৈলশিরাকে অবলম্বন করে অবস্থিত। পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ মূল ভূ-ভাগের খুব নিকটে অবস্থিত হলেও ইহা মহীসোপানের উপর অবস্থিত। এর পর হতেই মহীসোপান মহীঢালে পরিণত হয়ে ক্রমশ অধিক গভীর অবস্থায় সমুদ্রের তলদেশে পর্যন্ত পৌছেছে। এই মহাসাগরের মধ্যভাগে অবস্থিত মধ্য আটলান্টিক শৈলশিরা। এই শৈলশিরার উভয় পার্শ্বে বিস্তীর্ণ অংশের তলদেশ খুবই গভীর। মাঝে মাঝে এই শৈলশিরাকে অবলম্বন করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ বিদ্যমান রয়েছে। সেন্ট হেলেনা, য্যাজেস এদের মধ্যে প্রধান। অন্যান্য দ্বীপমালার মধ্যে মাডিরা (Maderia) দ্বীপ সম্পূর্ণ আগ্নেয়গিরি হতে উৎক্ষিপ্ত পদার্থ দ্বারা গঠিত। এটি পূর্বদিকের ১০° পশ্চিমে ও ৩০° উত্তর অক্ষাংশে অবস্থিত। বারমুডা পশ্চিম দিকে ৬৪° ও ৩২ উত্তর অক্ষাংশে অবস্থিত একটি প্রধান দ্বীপপুঞ্জ।

গভীর খাত

আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূলে প্রশান্ত মহাসাগরের ন্যায় ভঙ্গিল পর্বত নেই। এমনকি প্রান্ত মহাসাগরের তুলনায় এই মহাসাগরের গভীর খাতও তেমন নেই। আটলান্টিক মহাসাগরের অগভীরতম খাত পোর্টোরিকো খাত (Puerto Rico Deep) পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের উত্তরে পোর্টেরিকো দ্বীপের নিকট অবস্থিত। এর গভীরতা ৪,৮১২ ফ্যাদম ৮,৪৭৪ মিটার। এটি মহাসাগরের দ্বিতীয় বৃহত্তম খাত। দক্ষিণ স্যান্ডউইচ খাত (South Sandwitch Trench) দক্ষিণ আটলান্টিক মহসাগরের দক্ষিণ অংশে হর্ন অন্তরীপের সোজাসুজি দক্ষিণ স্যান্ডউইচ দ্বীপের নিকট অবস্থিত। এর গভীরতা ৪,৫৪৫ ফ্যাদম (৮,২৩০ মিটার)। রিক্ষরেখা বরাবর ২০° পশ্চিম

দ্রাঘিমা রেখার নিকট অবস্থিত রোমানসে খাত (Romanche Deep) মধ্য আটলান্টিক শৈলশিরাকে দ্বিখণ্ডিত করেছে। এর আয়তন অতিশয় স্বল্প এবং গভীরতা ৭,৩১৫ মিটার (৪০৩০ ফ্যাদম)।

প্রান্তদেশীয় সাগরসমূহ (Marginal Seas)

দক্ষিণ আটলান্টিক মহসাগরে সাগর বা উপমহাসাগরের সংখ্যা অনেক কম। কিন্তু উত্তর আটলান্টিক ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকা মহাদেশের তীরবর্তী অঞ্চলে এদের সংখ্যা বেশি ইউরোপ মহাদেশ বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপদ্বীপ নিয়ে গঠিত বলে এই অঞ্চলে অনেকগুলো সাগর ও উপসাগরের সৃষ্টি হয়েছে। এদের মধ্যে বাল্টিক সাগর, উত্তর সাগর, বিস্কে উপসাগর, আড্রিয়াট্রিক সাগর, ভূমধ্যসাগর প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সমুদ্র পৃষ্ঠ হতে উত্তর সাগর ও বাল্টিক সাগরের গভীরতা ১৮৩ মিটারের কম। এই কারণে এই সাগরদ্বয় উত্তর আটলান্টিক মহীসোপানের অন্তর্ভুক্ত। ডেনমার্ক ও সুইডেনের মধ্যস্থিত এই উভয় সাগরের সংযোগস্থল মাত্র ১৮·২৮ মিটার গভীর। ভূমধ্যসাগরও বেশ গভীর এবং এর সবচেয়ে গভীরতম অংশের গভীরতা প্রায় ৪,৫৭২ মিটার। উত্তর আটলান্টিকের পশ্চিম উপকূলের বেফিন ও হাডসন উপসাগরের গভীরতা ১৮৩ মিটারেরও কম। মেক্সিকো উপসাগরের গভীরতা প্রায় ভূমধ্যসাগরের সমান। এর সবচেয়ে গভীরতম অংশের গভীরতা ৩,৮১০ মিটারের মতো। ক্যারিবিয়ান সাগরের গভীরতা প্রায় ৭,১৬২৮ মিটার।

(খ) ভারত মহাসাগরের তলদেশ (The floor of the Indian Ocean) :

ভারত মহাসাগরের তলদেশ প্রশান্ত ও আটলান্টিক মহাসাগরের তলদেশের ন্যায় বৈচিত্র্য পূর্ণ নহে। এর অধিকাংশ অঞ্চল গভীর সমুদ্রের সমভূমি দ্বারা গঠিত। এই সমুদ্রতলের গড়

গভীরতা ২,০০০ হতে ৩,০০০ ফ্যাদম। এর তলদেশের শতকরা ৬০% ভাগেরই গভীরতা ৩,৬৫৭ মিটারের বেশি।

সুমেরু মহাসাগরের তলদেশ (Floor of the Arctic Ocean)

স্থায়ীভাবেই এই মহাসাগরের বারিরাশি তুষারাবৃত। সুমেরু মহাসাগরের গড় গভীরতা ৩,৮৪০ মিটার বা ২,০০০ ফ্যাদম। তবে এর সঠিক গভীরতা সম্বন্ধে এখনও সম্পূর্ণ তথ্য অবগত হওয়া মানুষের পক্ষে সম্ভবপর হয়নি। ভৌগলিকগণ অনুমান করেন যে এর তলদেশ একটি বিশাল পর্যংক (Externsive Basin) দ্বারা গঠিত। আজকাল ৭৮° উত্তর অক্ষাংশ এবং ১৭৫° পশ্চিম দ্রাঘিমাংশ এর গভীরতা অংশ বলে প্রমাণিত হয়েছে। এই অংশের গভীরতা ৩,০৭৬ ফ্যাদম বা ৫,৪৮৬ মিটার। পার্শ্ববর্তী সাগরসমূহের গভীরতা ১,০০০ ফ্যাদম এরও কম।

এই মহাসাগরের উপকূলে কয়েকটি অগভীর সাগর বর্তমান। তন্মধ্যে সাইবেরিয়ার উত্তর উপকূলে পূর্ব সাইবেরিয়া ও ল্যাপটিক সাগর, নরওয়ে ও স্পিটসবার্গের মধ্যে অবস্থিত ব্যারেন্ট

সাগর, নোভায়া জেম্বালিয়া ও ওব নদীর মোহনার মধ্যবর্তী কারা সাগর, আলাস্কার নিকটবর্তী বিউবোর্ট সাগর এবং বেফিন দ্বীপের উত্তর অবস্থিত বেফিন সাগরের নাম করা যেতে পারে। এই সকল সাগর উপসাগরগুলো মহাদেশীয় স্থলভাগসমূহের উত্তরাংশে অবস্থিত। এছাড়া বহুসংখ্যক প্রণালী কানাডার উত্তরাংশের দ্বীপ ও দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে বিশৃংখলভাবে বিদ্যমান রয়েছে।

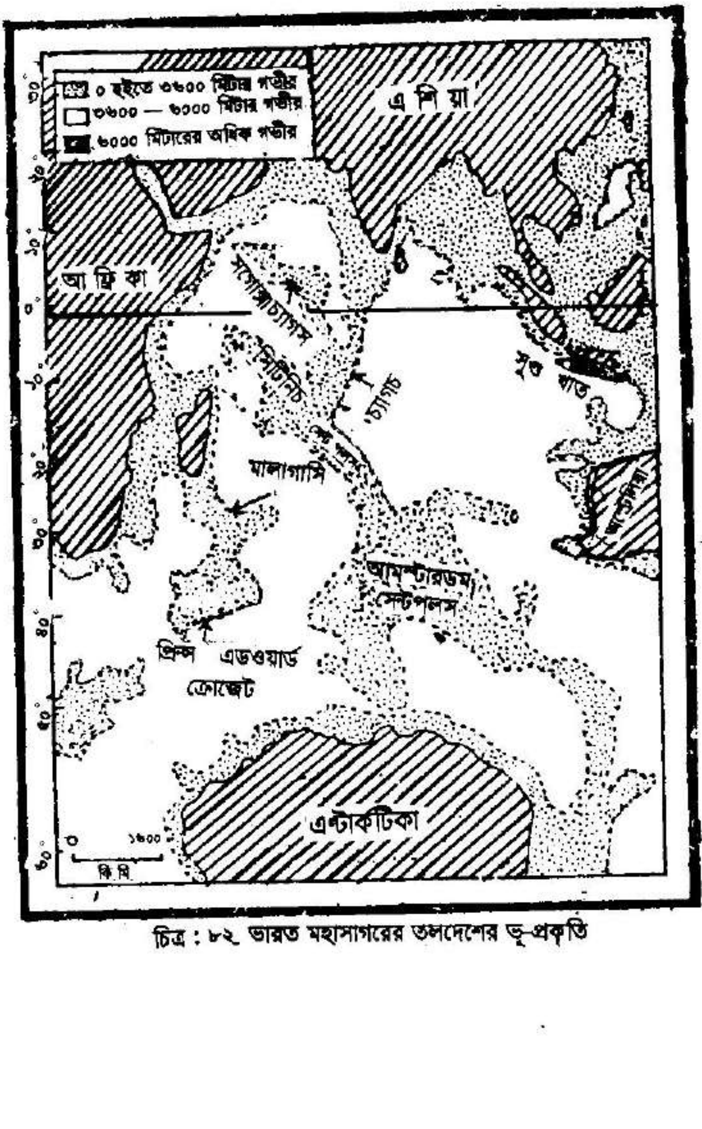

চিত্র : ৮২ ভারত মহাসাগরের তলদেশের ভূ-প্রকৃতি

অন্যান্য মহাসাগরগুলোর মতো সুমেরু মহাসাগরের মধ্যেও অনেক দ্বীপ ও দ্বীপপুঞ্জ বর্তমান। এদের প্রায় সবগুলোই মহাসাগরের অববাহিকার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে অবস্থিত। নিউ সাইবেরিয়া দ্বীপপুঞ্জে, কানাডার সংলগ্ন দ্বীপপুঞ্জ এবং বক্ররেখার ন্যায় অবস্থিত সুদীর্ঘ নোভায় জেম্বালিয়া দ্বীপের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এদের সবগুলোই স্থলভাগের নিমগ্ন অংশ বিশেষ। এই দ্বীপগুলোর উপকূলবর্তী সাগরের তলদেশে দীর্ঘ ও প্রশস্ত মহীসোপান রয়েছে। এই মহাসাগরের অন্তবর্তী মগ্ন শৈলশিরা কোন কোন স্থানে উঁচু হওয়ার দরুণ যে সকল দ্বীপের সৃষ্টি হয়েছে তাদের মধ্যে বিয়রি, স্পিটবার্গের জানমায়েন বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কুমেরু মহাসাগরের তলদেশ (Floor of Antarc tic Ocean)

কুমেরু মহাসাগর বা দক্ষিণ মহাসাগর দক্ষিণ মেরুর নিকটস্থ এন্টার্কটিকা মহাদেশের চতুর্দিকে বিস্তৃত। এটি সর্বদাই বরফাচ্ছন্ন থাকে। পৃথিবীর বৃহত্তম ৩টি মহাসাগর আটলান্টিক ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণ দিক এই মহাসাগরের সহিত সংযুক্ত বলে এর সঠিক সীমারেখা নির্ণয় করা সম্ভবপর হয়নি। মোটামুটিভাবে ৪০ ডিগ্রি হতে ৫০ ডিগ্রি দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে এই মহাসাগর অবস্থিত বলে অনুমান করা হয়। সুমেরু মহাসাগর যেমন উত্তর মেরুর চতুর্দিকে বিস্তৃত, ইহা ঠিক তেমন নহে। বরং কুমেরু মহাসাগর দক্ষিণ মেরুর নিকটবর্তী এন্টার্কটিকা মহাদেশের চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত এবং এর গভীরতা সুমেরু মহাসাগরের অর্ধেক। এন্টার্কটিকা এবং অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের মধ্যবর্তী এই মহাসাগরের তলদেশ নিমগ্ন একটি মালভূমি।

৩.২৬ সমুদ্র স্রোত

সমুদ্রের জলরাশি এক স্থান হতে অন্য স্থানে নিয়মিতভাবে প্রবাহিত হয়। সমুদ্র জলের এই গতিকে সমুদ্রস্রোত বলে। নিচে পৃথিবীর তিনটি প্রধান গুরুত্বপূর্ণ মহাসাগরের প্রধান প্রধান স্রোতগুলোর বর্ণনা দেওয়া হল :

১. আটলান্টিক মহাসাগরীয় স্রোত

(ক) বেঙ্গুয়েলা (Benguelacurrent) স্রোত : দক্ষিণ মহাসাগর হতে শীতল কুমেরু স্রোত প্রবাহিত হয়। এই স্রোত পশ্চিমা বায়ুর প্রভাবের মধ্যে এসে পূর্বে বেঁকে যায়। পরে আফ্রিকার দক্ষিণ পশ্চিম উপকূলে প্রতিহত হয়ে উত্তরে বঙ্গুয়েলা স্রোত নামে অগ্রসর হয়ে আটলান্টিক এ প্রবেশ করে।

(খ) উত্তর ও দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোত : উত্তর পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব আয়ন বায়ুর প্রভাবে এবং পৃথিবীর আবর্তনের জন্য আটলান্টিক মহাসাগরের নিরক্ষীয় অঞ্চলে দুটি উষ্ণ স্রোতের উৎপত্তি হয়। এই স্রোতদ্বয়কে উত্তর ও দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোত বলে।

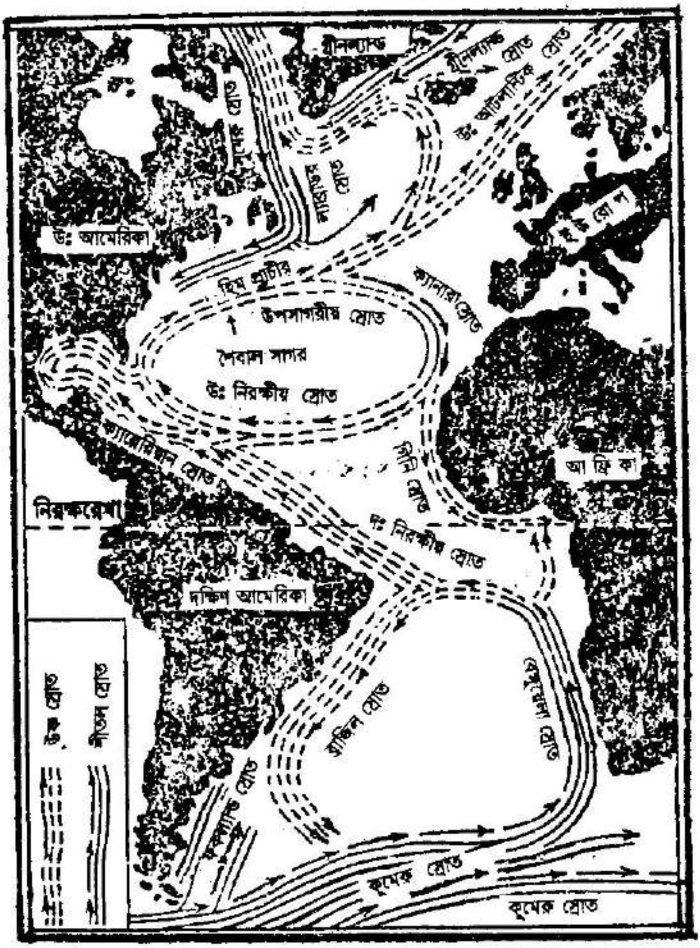

চিত্র : ৮৩. আটলান্টিক মহাসাগরীয় স্রোত

(গ) ব্রাজিল স্রোত : বেঙ্গুয়েলা স্রোত পরে দক্ষিণ পূর্ব আয়ন বায়ুর প্রভাবে পশ্চিমে বেঁকে দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোতের সহিত মিশে যায়। এই মিলিত স্রোতে পশ্চিমে কিছুদুর অগ্রসর হয়ে দক্ষিণ আমেরিকার সেন্টরক অন্তরীপে প্রতিহত হয়ে উত্তর ও দক্ষিণ শাখায় বিভক্ত হয়। দক্ষিণ শাখা ব্রাজিল স্রোত (উষ্ণ) নামে ব্রাজিলের পূর্ব উপকূল বরাবর অগ্রসর হয় এবং পুনরায় কুমেরু স্রোতের সহিত মিশে যায়।

উপসাগরীয় স্রোত (Gulf Stream) :

উপরোক্ত দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোতের উত্তর শাখা দক্ষিণ আমেরিকায় উত্তর পূর্ব উপকূল ধরে অগ্রসর হয়। পরে এটি ক্যারিবিয়ান সাগরে প্রবেশ করে উত্তর নিরক্ষীয় স্রোতের দক্ষিণ শাখার সহিত মিলি হয়। এই মিলিত স্রোত তখন মেক্সিকো উপসাগরে প্রবেশ করে। মেক্সিকো উপসাগরে উৎপত্তি বলে এই স্রোতের নাম উপসাগরীয় স্রোত। এটি সংকীর্ণ ফ্লোরিডা প্রণালীর মধ্য দিয়ে বেগে প্রবাহিত হয়ে উত্তর নিরক্ষীয় স্রোতের উত্তর শাখার সহিত মিলিত হয়। এই স্থানে এর গতি ঘন্টার প্রায় ৮ কিলোমিটার জলের উষ্ণতা প্রায় ২৭.২ সে. এবং বর্ণ গাঢ় নীল। এই মিলিত স্রোত উত্তর পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়ে মধ্যআটলান্টিকে তিনটি শাখায় বিভক্ত হয়। যথা :

(ক) এর প্রধান ও প্রশস্ত শাখা উষ্ণ স্রোতরূপে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ ও উত্তর পশ্চিম ইউরোপের পশ্চিম পার্শ্ব দিয়ে নরওয়ের উত্তরে শেষ হয়। একে উত্তর আটলান্টিক স্রোত (North, Attlantic Drift) বলে। ইহা ইউরোপের শীতল উত্তর পশ্চিম উপকূলকে উষ্ণ রাখে।

(খ) দক্ষিণ শাখা পর্তুগালের উপকূলে প্রতিহত হয়ে প্রথমে দক্ষিণে ও পরে পশ্চিমে বেঁকে উত্তর নিরক্ষীয় স্রোতের সঙ্গে মিলিত হয়। একে ক্যানারী স্রোত (Canary Current) বলে। এটি শীতল স্রোত। এই জলাবর্তের অভ্যন্তরে কোন স্রোত প্রবাহিত হয় না। এই স্রোতহীন জলে ভাসমান আগাছা ও শৈবাল সঞ্চিত হয় এবং কিছু উদ্ভিদ জন্মায়। এটি শৈবাল সাগর (Sargasso Sea) বলে পরিচিত।

(গ) উত্তর শাখা গ্রীনল্যান্ডের পশ্চিমপার্শ্ব দিয়ে উত্তর দিকে প্রবাহিত হয়। উত্তর ও দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোতের মধ্যবর্তী সাগরে পশ্চিম হতে পূর্বগামী একটি স্রোতের উৎপত্তি হয়। এটি নিরক্ষীয় প্রতিস্রোত (Equatorial Counter Current) নামে পরিচিত।

ল্যাব্রাডর স্রোত (Labrador Current)

উত্তর মহাসাগর হতে দুটি শীতল স্রোত গ্রীণল্যান্ডের পশ্চিম ও পূর্ব পার্শ্ব দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ল্যাব্রাডর উপদ্বীপের নিকট মিলিত হয়। এই মিলিত স্রোতকে শীতল ল্যাব্রাডর স্রোত

বলে। ল্যাব্রাডর স্রোত নিউফাউণ্ডল্যান্ডের নিকটবর্তী হয়ে উপসাগরীয় স্রোতের উষ্ণ ও গাঢ় নীল জলের সীমারেখা সুন্দরভাবে দেখা যায়। এই সীমারেখাকে হিম প্রাচীর (Cold Wall) বলে। শীতল জল উষ্ণ জল অপেক্ষা ভারী বলে এই স্রোত আরও একটু দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে উপসাগরীয় স্রোতের নিম্নে ডুবে যায়। ল্যাব্রাডর স্রোতের সঙ্গে ভাসমান হিমশৈল্য উষ্ণ উপলসাগরীয় স্রোতের সংস্পর্শে এসে তার বরফ গলে যায়। হিমশৈল বাহিত কর্দম ও শিলা মুক্তি পেয়ে সমুদ্রতলে সঞ্চিত হয়ে মগ্ন চড়া সৃষ্টি করে। আবার উপসাগরীয় স্রোতের উপর দিয়ে প্রবাহিত বায়ু উষ্ণ ও আদ্র হয় এবং ল্যাব্রাডর স্রোতের উপর দিয়ে প্রবাহিত বায়ু শীতল ও শুষ্ক হয়। এই দুই বায়ুর সংমিশ্রণে এই অঞ্চলে ঝড় প্রবাহিত হয় এবং ঘন কুয়াশার উৎপত্তি হয়। হিমশৈলগুলো জাহাজ চলাচলে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে।

২. প্রশান্ত মহাসাগরীয় স্রোত

পেরু স্রোত (Peru Current) : দক্ষিণ মহাসাগর হতে পশ্চিমাবায়ুর প্রভাবে উৎপন্ন শীতল কুমেরু স্রোতের একটি শাখা দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ পশ্চিম কোণে প্রতিহত হয়ে উত্তরে বেকে চিলির উপকূল দিয়ে প্রবাহিত হয়। এর নাম পেরু বা হামবোল্ড (Humboldt) স্রোত। একে শীতল বেশুয়েলা স্রোতের মতো।

উত্তর ও দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোত : উত্তর পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব আয়ন বায়ুর প্রভাবে নিরক্ষীয় অঞ্চলে যথাক্রমে উষ্ণ উত্তর ও দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোতের উৎপত্তি হয়।

নিউ সাউথ ওয়েলস স্রোত : পেরু স্রোত নিরক্ষরেখার নিকটবর্তী হয়ে উষ্ণ হয় এবং দক্ষিণ পূর্ব আয়ন বায়ুর প্রভাবে পশ্চিমমুখী হয়ে দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোতের সহিত মিলিত হয়। এই মিলিত স্রোত প্রায় ১২,৮৮০ কি.মি. পশ্চিমে অগ্রসর হয়ে অস্ট্রেলিয়ার উপকূলে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে তিনটি ভাগে বিভক্ত হয়। একটি শাখা অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব উপকূল দিয়ে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়। এটি পূর্ব অস্ট্রেলিয়া বা নিউ সাউথ ওয়েলস স্রোত বলে পরিচিত। এটি পুনরায় কুমেরু স্রোতের সহিত মিশে যায়। দ্বিতীয় শাখা অস্ট্রেলিয়ার উত্তর দিয়ে পশ্চিমমুখে অগ্রসর হয়ে ভারত মহাসাগরে প্রবেশ করে।

উত্তর ও দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোতের মধ্য দিয়ে একটি বিপরীত স্রোত পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়। একে নিরক্ষীয় প্রতিস্রোত বলে।

কুরোশিয়ো স্রোত : উত্তর নিরক্ষীয় স্রোত পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ও এশিয়ার পূর্ব উপকূলে বাধা হয়ে উত্তর দিকে প্রবাহিত হয় এবং দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোতের তৃতীয় শাখার সহিত মিলিত হয়। এই মিলিত স্রোত জাপানের পূর্ব উপকূল দিয়ে কুরোশিয়ো বা জাপান স্রোত নামে প্রবাহিত হয়। এটি উষ্ণ স্রোত। কুরোশিয়ো স্রোত উপসাগরীয় স্রোতের মতো, তবে তার গতি অপেক্ষাকৃত

মন্থর। এটির প্রধান শাখা পশ্চিমাবায়ুর প্রভাবে ক্রমাগত পূর্বদিকে অগ্রসর হয়ে কানাডার নিকট দুভাগে বিভক্ত হয়। একটি শাখা শীতল ক্যালিফোর্ণিয়া স্রোত নামে প্রথমে দক্ষিণে, পরে পশ্চিমে বেঁকে উত্তর নিরক্ষীয় স্রোতের সঙ্গে মিশে যায়। এদের জলাবর্তের মধ্যে একটি শৈবাল সাগর সৃষ্ট হয়। কুরোশিয়ো স্রোতের অপর শাখা উত্তরে এসে অ্যাল্যুসিয়ান দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত প্রবাহিত হয়।

বেরিং স্রোত : শীতল কুমেরু স্রোতের একটি শাখা বেরিং স্রোত নামে উষ্ণ কুরোশিয়ো স্রোতের উত্তর শাখার সহিত মিলিত হয়। উষ্ণ ও শীত স্রোতের উপর দিয়ে প্রবাহিত বায়ুর মিলনে তথায় ঝড় ও নিবিড় কুয়াশার সৃষ্টি হয়।

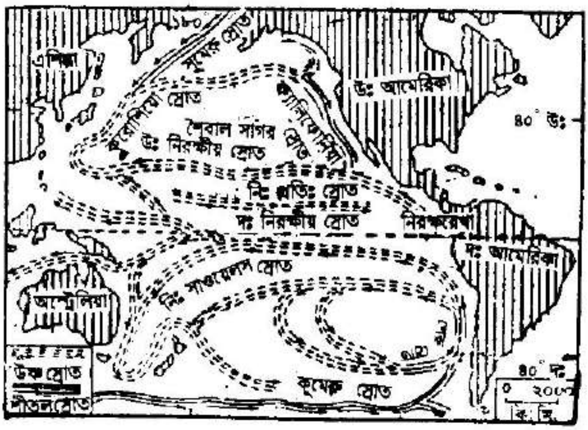

চিত্র : ৮৪. প্রশান্ত মহাসাগরীয় স্রোত

৩. ভারত মহাসাগরীয় স্রোত

দক্ষিণ মহাসাগর হতে শীতল কুমেরু স্রোতের একটি শাখা পশ্চিমাবায়ুর প্রভাবে অস্ট্রেলিয়ার পশ্চিম উপকূলে বাধা পেয়ে উত্তর দিকে প্রবাহিত হয়। এর নাম পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া স্রোত। এটি শীতল স্রোত। দক্ষিণ পূর্ব আয়ন বায়ুর প্রভাবে তা পশ্চিম দিকে বেঁকে দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোতের সঙ্গে মিশে যায়। এই মিলিত স্রোত বরাবর পশ্চিমে প্রবাহিত হয়ে মাদাগাস্কার দ্বীপের নিকট বিভক্ত হয়। একটি শাখা মাদাগাস্কারের দক্ষিণ ঘুরে মাদাগাস্কার স্রোতরূপে ও অপর শাখা আফ্রিকার পূর্ব উপকূল ধরে মোজাম্বিক স্রোতরূপে দক্ষিণে অগ্রসর হয়। এই স্রোতদ্বয় মিলিত হয়ে আগুলহাস স্রোত নামে কুমেরু স্রোতের সহিত মিশে যায়

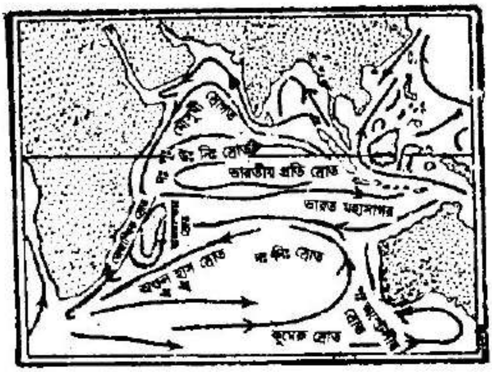

চিত্র : ৮৫. শীতকালীন ভারত মহাসাগরীয় স্রোত

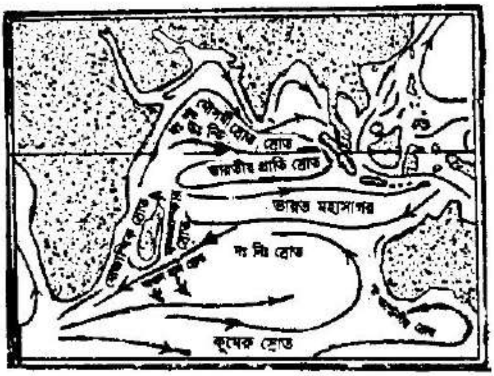

চিত্র : ৮৬. গ্রীষ্মকালীন ভারত মহাসাগরীয় স্রোত

ভারত মহাসাগরের উত্তরাংশের স্রোত প্রধানত মৌসুমী বায়ু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। গ্রীষ্মকালে দক্ষিন পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোতের একটি শাখা সোমালি স্রোত নামে আফ্রিকার উত্তর পূর্ব দিকে পরে আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ করে সুমাত্রা দ্বীপ পর্যন্ত অগ্রসর হয়। শীতকালে উত্তর পূর্ব মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে এই স্রোতের গতি বিপরীতমুখী হয়। (চিত্র নং-)

চতুর্থ অধ্যায়

মানবিক ও অর্থনৈতিক ভূগোল

৪.১ পৃথিবীর জনসংখ্যা

৪.১.১ ভূমিকা : পৃথিবীর জনসংখ্যা বলতে আমরা যা বুঝে থাকি তা হল পৃথিবীতে মোট কত লোক বাস করে তার পরিমাণ। এযাবৎ পৃথিবীতে কত লোক মারা গেছে তার হিসাব আমরা এখানে টেনে আনতে পারব না। আমাদের এই পৃথিবীর বর্তমানে জীবিত মানুষেরই একটি গাণিতিক হিসাবকে পৃথিবীর জনসংখ্যা বলে মনে করব। প্রাচীনকালে বিশ্বে কোন আদমশুমারির ব্যবস্থা ছিল না। এজন্যই তৎকালীন সময়ের জনসংখ্যা সম্বন্ধে আমাদের জানা সম্ভব হয় নাই। ১৭৫০ সালে আমেরিকায় এবং ১৮০০ সালে ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডে আদমশুমারি শুরু হয় এবং বর্তমানে সারা বিশ্বে এই প্রথা চালু হয়েছে। এই প্রথার হিসাব অনুযায়ী বর্তমানে পৃথিবীর জনসংখ্যা প্রায় ৫০০ কোটির মতো। জনসংখ্যার এই পরিমাণ কখনই স্থির নয়। এটি প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। এই পরিবর্তনটা উর্ধ্বমুখী। এর ফলে খাদ্য সমস্যা বৃদ্ধি, মাথাপিছু আয় হ্রাস, পরিবেশের ভারসাম্যহীনতা ইত্যাদি নানাবিধ সমস্যা উদ্ভূত হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে আমরা এখানে জনসংখ্যার পরিবর্তন, এর সাথে খাদ্য, অর্থনীতি ও সম্পর্কিত ফলাফল নিয়ে আলোচনা করে দেখব।

৪.১.২ বিশ্ব জনসংখ্যার পরিবর্তন

একটু পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আদমশুমারি প্রাচীনকালে কখনও হয়নি। যার ফলে অনেক আগের লোকসংখ্যার পরিমাণ জানা সম্ভব নয়। তবে নৃতত্ত্ববিদ ও ঐতিহাসিকদের মতে কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তনের আগে এই পৃথিবীতে আনুমানিক ৫০ লক্ষ থেকে ১ কোটি পশু শিকারী ও ফলমূল সংগ্রহকারী প্রতিপালনে সক্ষম মানুষ ছিল। অবশ্য সময়টা কল্পনা করা হয় খ্রিষ্টপূর্ব ৮০০০ সাল। এর আগে পৃথিবীর লোকসংখ্যা ছিল আনুমানিক ৮০ লক্ষ। অথচ এই জনসংখ্যা ১ খ্রিষ্টাব্দে এসে দাড়ায় ৩০ কোটিতে। এই বৃদ্ধির হার প্রতি হাজারে ছিল ০.৩৬।

জাতিসংঘের আর একটি হিসাব অনুযায়ী ৫০ খ্রিষ্টাব্দে পৃথিবীর লোকংখ্যা ২৫ থেকে ৫০ কোটি ছিল। ১৬৫০ সালে এই সংখ্যার পরিমাণ ৫০ কোটিতে উন্নীত হয়। সর্বশেষে ১৯৯১ সালে পৃথিবীর লোকসংখ্যা ৫০০ কোটিতে দাঁড়িয়েছে। এর কারণ ১৯৮১ সালের হিসাব অনুযায়ী বিশ্বে জন্ম হার প্রতি হাজারে ২৮ ও মৃত্যু হার ১১। জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার ১.৭। এর ফলে পৃথিবীতে

বর্তমানে প্রতি বছরে প্রায় ৭ কোটি ৩৫ লক্ষ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ১৬৫০ সালের আগে পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল বেশ কম ও বৃদ্ধির গতি ছিল মন্থর। কারণ এই সময় উচ্চ মৃত্যু হার জনসংখ্যা বৃদ্ধিটাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। ১৩৪৬–১৩৫৩ সালের বুবোনিয়ান–প্লেগ মহামারী আকার ধারণ করলে ইউরোপের ২৫ শতাংশ জনসংখ্যা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতকে দুর্ভিক্ষ, প্লেগ ও যুদ্ধে ফ্রান্সের জনসংখ্যার ৩৩–৫০ শতাংশ মারা যায়। ফলে জনসংখ্যা তেমন বাড়তে পারেনি। ভারতবর্ষে গণদুর্ভিক্ষের ফলে ১৬০০ সালে লোকসংখ্যা খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের সমান হয়ে যায় (১১০ মিলিয়ন)। এই ভাবে ১৬৫০ সালের আগে পর্যন্ত পৃথিবীর জনসংখ্যা বিভিন্ন উল্লিখিত কারণে বাড়তে পারেনি।

১৯৮১ সালের গণনার সাথে তুলনা করলে দেখা যায় ১৯৫০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের জনসংখা বৃদ্ধির হার ছিল বেশ মন্থর। এই সময়কালের পর থেকে এদেশের জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৮১ সালের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যা ৮ কোটি ৯৯ লক্ষ ৪০ হাজার দাড়িয়েছে। ১৯৯০ সালে এর পরিমাণ দাড়িয়েছে ১০ কোটি ৮৯ লক্ষ ৯,৩০০ জন। এইভাবে বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় সকল অনুন্নত দেশেই জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকায় এই বৃদ্ধির হার সর্বাধিক। ১৬৫০ থেকে ১৮৭২ সাল পর্যন্ত ২২২ বছরে বাংলাদেশের লোকসংখ্যা বেড়ে হয়েছে যা ছিল তার সমপরিমাণ অথচ ২৪ বৎসরে তা (১৯৫১–১৯৭৫) দ্বিগুণ হয়েছে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির এই হারের কারণ হিসাবে আমরা বলতে পারি শিশু মৃত্যু হার হ্রাস। বর্তমানে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে ১৬ বছরের নিচের বয়সী ছেলে মেয়েদের সংখ্যাই অধিক। এটির পিছনে রয়েছে বর্তমানে চিকিৎসা শাস্ত্রের ব্যাপক উন্নতি। এখন কলেরা, বসন্ত, যক্ষ্মা ইত্যাদির বিশেষ চিকিৎসা বেরিয়ে গেছে।

এ পর্যায়ে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের জনসংখ্যার হিসাব নিচের সারণীতে দেখানো হল :

গণনার বৎসর	বিশ্বের মোট জনসংখ্যা (মিলিয়ন)	শিল্পোন্নত অঞ্চল				অনুন্নত অঞ্চল		
		মোট সংখ্যা	ইউরোপ	উত্তর আমেরিকা	ওসেনিয়া	এশিয়া	ল্যাটিন আমেরিকা	আফ্রিকা
১৬৫০	৫০৭	১০৬	১০৩	১	২	২৯২	১০	১০০
১৮৫০	১১৩৯	৩০২	২৭৪	২৬	২	৬৯৮	৩৩	৯৮
১৯৩০	২০১৫	৬৭১	৫৩২	১৩৫	১০.৪	১০৭২	১০৯	১৫৭
১৯৫০	২৫০৯	৭৫৮	৫৭৬	২৬৭	১৩.০	১৩৮৪	১৬২	২০৭
১৯৭৫	৪১০৮	৯৮৬	৭২৮.৩	২৩৬.৪	২১.৩	২৩৯৩.২	৩২০.২	৪০৮.৫
১৯৭৯	৪৪০৬	১০১২	৭৪৫.৫	২৪৪.৪	২২.৫	২৫৮২.১	৩৫২.৮	৪৫৮.২
১৯৮১	৪৪৯২	১০৩১	৭৫৪	২৫৪	২৩	২৬০৮.৪	৩৬৬	৪৮৬
১৯৯১								

উৎস : World population data sheet, 1981, population Reference Bureau Inc., Washingtor. D.C.

বিশ্বের জনসংখ্যা বৃদ্ধির গড় হার

মহাদেশের নাম	১৯৫০–৫৫	১৯৫৫–৬০	১৯৬৫–৭০	১৯৭০–৭৫	১৯৭৫–৮০
বিশ্ব	১.৯	২.০	২.১	১.৯	১.৭
এশিয়া	২.০	২.১	২.৫	২.২	১.৯
আফ্রিকা	২.২	২.০	২.৬	২.৭	২.৯
উত্তর আমেরিকা	১.৮	২.৮	২.৭	২.৫	২.৪
দক্ষিণ আমেরিকা	২.৬	১.৮	১.১	০.৯	০.৮
ওসেনিয়া	২.৩	২.৩	২.০	১.৯	১.৩

উৎস : World population ; 1979. U.S. Department of Commerce., 1980.

উল্লিখিত সারণী দুটো থেকে আমরা পৃথিবীর বিভিন্ন মহাদেশের জনসংখ্যার পরিমাণ ও বৃদ্ধির হার সম্বন্ধে জানতে পারি। এ দুটো সারণীই আমেরিকান জনসংখ্যাবিদদের হিসাব থেকে সংগৃহীত। জনসংখ্যা পরিবর্তনের বিভিন্ন তথ্য সারণী দুটোতে সন্নিবেশিত আছে।

৪.১.৩ বিশ্বে জনসংখ্যা পরিস্থিতি

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশে বর্তমানে জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধির ফলে এসব দেশের জাতীয় জীবনে এর প্রভাব প্রতিফলিত হচ্ছে আধুনিক বিশ্বে জনসংখ্যা একটি মারাত্মক চ্যালেঞ্জ। এজন্য জনৈক অর্থনীতিবিদ বলেছে, "পারমাণবিক যুদ্ধ ব্যতীত বিশ্ববাসীর সম্মুখে অন্যতম সমস্যা হল জনসংখ্যা বৃদ্ধি। এটি যুদ্ধের চেয়েও ভয়াবহ এ কারণে যে এটি সংঘবদ্ধভাবে নিয়ন্ত্রণের কোন উপায় নেই"। বাংলাদেশে এটিকে বর্তমানে জনসংখ্যা বিস্ফোরণ হিসাবে অভিহিত করা হয়ে থাকে। এতে আমাদের দেশসহ পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই আর্থ–সামাজিক উন্নতির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি করছে।

প্রসিদ্ধ জনমিতি বিশারদ ফিলিপ্ হৌজার এর মতে খ্রিষ্টীয় ৫০ সালে পৃথিবীর লোক সংখ্যা যেখানে ছিল ৩০ কোটির মতো সেখানে ইউনেস্কো কর্তৃক প্রকাশিত একটি পুস্তিকা (Population in Asia : A source book 5 : Rreference tables and charts থেকে বলা যায় যে ১৯০০ সালে পৃথিবীর জনসংখ্যা দাঁড়ায় ১৬৫ কোটিতে। ১৯৯০ সালে এই পরিমাণ ৫০০ কোটিতে দাঁড়িয়েছে। আমরা আগের প্রথম সারণীতে পৃথিবীর জনসংখ্যা সম্বন্ধে জানতে পেরেছি। ওসেনিয়া মহাদেশেই মাত্র লোকবসতি সবচেয়ে কম ছিল।

ইউনেস্কো কর্তৃক প্রকাশিত পূর্বোক্ত সোর্স বুক থেকে বুঝা যায় যে ১৯৮০ সালে পৃথিবীর লোকসংখ্যা ধরা হয়েছিল ৪৪৫ কোটি ৭০ লক্ষের মতো। এ সংখ্যার অর্ধেকের বেশি থাকবে এশিয়ায়। এ তুলনায় আফ্রিকাতে দেখানো হয়েছে কম। মাত্র ৪৫ কোটি ৭০ লক্ষ। ওসেনিয়াতে বৃদ্ধির হারও অনেক কম।

আমরা দেখতে পাচ্ছি তুলনামূলকভাবে বিশ্বের শিল্পোন্নত দেশগুলোর চেয়ে স্বল্পোন্নত মহাদেশগুলোতেই (যেমন ল্যাটিন আমেরিকা, এশিয়া, আফ্রিকা) জনসংখ্যার বিস্ফোরণ সর্বাধিক। এভাবে চলতে থাকলে এ সকল মহাদেশে এই অবস্থা বিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্তও অব্যাহত থাকবে। বিশেষ করে পূর্ব এশিয়া ও দক্ষিণ, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতে এই জনসংখ্যার সামগ্রিক বিস্ফোরণ অত্যধিক। অর্থাৎ পৃথিবীর অনুন্নত অঞ্চলে ও এশিয়ার মধ্যে জনসংখ্যার আধিক্য সর্বাধিক।

এশিয়া মহাদেশে জাপান ছাড়া প্রায় সকল দেশেই জনসংখ্যার বৃদ্ধি বেশি। চিন, জাপান ও শ্রিলংকা ব্যতীত এশিয়ার অন্যান্য শেগুলোতে জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার ২% ভাগ এর অধিক। বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, চিন, ফিলিপাইনস, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশে জনসংখ্যা আয়তনের তুলনায় অত্যধিক। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারও এই সকল দেশে অন্যান্য দেশের বৃদ্ধির তুলনায় মোটামুটি বেশি। পৃথিবীর প্রায় ৪০% ভাগের বেশি লোক এই সকল দেশে বাস করে।

৪.১.৪ খাদ্য ও জনসংখ্যা

জীবন ধারণের জন্য মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলোর শীর্ষস্থানে অবস্থান করছে খাদ্য। বর্তমান পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছে, আবার অনেক দেশে নিজেদের প্রয়োজনে এবং প্রয়োজনের অধিক খাদ্য উৎপাদন করছে। খাদ্য শস্যের ফলন প্রত্যেক দেশেই বেড়ে চলেছে। তবুও অনেক লোক অনাহারে অপুষ্টিতে ভুগছে এমনকি খাদ্যাভাবে মারাও যাচ্ছে। সুদান, ইথিওপিয়া এর অন্যতম উদাহরণ। উন্নত কলাকৌশল প্রয়োগ করে বনজঙ্গল সাফ করে আবাদি জমি তৈরি করে মানুষ উৎপাদন বাড়িয়েই চলেছে, কিন্তু এতে কূল পাচ্ছে না। উন্নয়নশীল দেশগুলো বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার অভাবে কৃষি কাজে তেমন সফলতা অর্জন করতে পারছে না ঠিকই কিন্তু তাই বলে খাদ্য উৎপাদন বাড়েনি তা নয়। এদের খাদ্য উৎপাদনও বাড়ছে আবার জনসংখ্যাও বাড়ছে। উভয়ের এই বৃদ্ধির মাঝে একটি অমিল রয়েছে বলেই খাদ্য সমস্যা দেখা দিচ্ছে। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ মালথাসের মতে, খাদ্য উৎপাদন বাড়ে গাণিতিক হারে আর জনসংখ্যা বাড়ে জ্যামিতিক হারে।

খাদ্য – ১, ২, ৩, ৪, ৫, ... হারে

জনসংখ্যা – ১, ২, ৪, ৮, ১৬ .... হারে

১৯৫১ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বিশ্ব পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে বিশ্বে প্রধান প্রধান খাদ্য শস্যের উৎপাদন দ্বিগুণেরও বেশি হয়েছিল কিন্তু সেক্ষেত্রে জনসংখ্যা বাড়ে মাত্র ৫০% ভাগ এর কম। তখন খাদ্যশস্য প্রাপ্তির পরিমাণ ৪০% ভাগ এর মতো বৃদ্ধি পেয়েছিল।

কিন্তু এই সুফল মাত্র কিছু কিছু দেশ পেয়েছিল। কারণ গরীব দেশগুলো এই সুফল লাভ করতে পারেনি।

উন্নয়নশীল দেশগুলোতে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে মন্থর গতিতে কিন্তু মানুষ বাড়ছে দ্রুতগতিতে। ফলে তাদের খাদ্য পরিস্থিতি খুবই শোচনীয়। এসব দেশে খাদ্য উৎপাদন হচ্ছে না বা বাড়ছে না এটি কিন্তু বলা যায় না। উৎপাদন বাড়লেও খাদ্য সমস্যা হতে পারে। যেমন ফিলিপাইনে গত ১৫ বছরে ৩% ভাগ হারে খাদ্য উৎপাদন বেড়েছে কিন্তু তাতে খাদ্যাভাব দূর হয় নি বরং দরিদ্ররা দরিদ্রই হচ্ছে। আসলে উৎপাদিত পণ্যের সম বন্টন না হলে শুধু জনসংখ্যাকে দোষ দিয়ে লাভ নেই।

জনসংখ্যা যে খাদ্য সমস্যা ঘটাচ্ছে না তা নয়। উন্নত উৎপাদন ব্যবস্থার ফলে খাদ্যোৎপাদন যেমন বাড়ছে আবার বসতবাড়ি নির্মাণের জন্য আবাদি জমিও নষ্ট করা হচ্ছে অন্যদিকে অল্প আয়ের লোকদের ঘরে যদি অনেক লোক জন্ম নেয় তাহলে তার ঘরে খাদ্যের অভাব থাকা স্বাভাবিক। সুতরাং স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে জনসংখ্যার পরিমাণের সাথে খাদ্যের একটা সম্পর্ক রয়েছে।

৪.১.৫ জনসংখ্যা বৃদ্ধির অর্থনৈতিক ও সামাজিক ফলাফল

বর্তমানকালে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাপকাঠিতে সাধারণত উন্নয়নশীল ও উন্নত এই দু'ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। গুটিকতক দেশ ছাড়া পৃথিবীর প্রায় সকল দেশই উন্নয়নশীল। গুটিকতক দেশে উন্নয়নের ধারা এমন শিখরে উপনীত হয়েছে যে তাদের জীবনযাত্রার মান খুবই উচু। এরাই প্রায় সকল উন্নত কলাকৌশল ও প্রযুক্তি আবিস্কার করছে। এ দেশগুলোতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিমাপক নির্ণয়ের বহুবিধ পদ্ধতি প্রচলিত আছে। যদিও এদের সুনিশ্চয়তা সম্বন্ধে সন্দেহ থেকে যায়। এদের দুই একটি পদ্ধতি এখানে আলোচনা করা হল।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন : আধুনিক অর্থনীতিবিদের অধিকতর জাতীয় আয় ও মাথাপিছু জাতীয় আয়ের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে বোঝাতে চেষ্টা করেন। উইলিয়াম্স এবং বুটিক এর মতে "দীর্ঘ সময়ের মাথাপিছু উৎপাদন ও সেবার বৃদ্ধিকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলা যায়"। প্রফেসর মেয়ার এবং বলুডইন-এর মতে, 'পদ্ধতির মাধ্যমে দীর্ঘ সময়ে যদি প্রকৃত জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায় তাকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলা হয়"।

একটি দেশের কৃষি, খনিজ, ব্যবসা, পরিবহণ, যোগাযোগ ইত্যাদি বিভিন্ন উপায়ে যে পরিমাণ দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদন করে থাকে এবং শিক্ষক, চিকিৎসক, চাকুরীজীবী, আইনজীবী, গায়ক ইত্যাদি শ্রেণীর লোক যে পরিমাণ সেবামূলক কাজ করে থাকে এই উভয়ের সমষ্টিকে সে বছরের জাতীয় উৎপাদন বলা হয়। এই জাতীয় উৎপাদনের অর্থমূল্যকে মোট জাতীয় আয় বলা হয়ে থাকে। এই মোট জাতীয় আয়কে মোট জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে মাথাপিছু আয় পাওয়া যায়।

মাথাপিছু আয়ের দিক দিয়ে জাপান এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে উপরে আছে। তার কারণ জাপানে জনসংখ্যার বৃদ্ধি সবচেয়ে কম এবং সেখানে কাম্য জনসংখ্যা রয়েছে। জাতীয় আয়ের সাথে জনসংখ্যার একটি প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে। বাংলাদেশে এভাবে মাথাপিছু আয় কম এবং জনসংখ্যার বৃদ্ধি বেশি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে মাথাপিছু আয় তথা মোট জাতীয় আয়ের সাথে জনসংখ্যা বৃদ্ধি অধিকতর এবং সামঞ্জস্যহীনভাবে হতে থাকলে মাথাপিছু আয় কমে যায়। সারণীতে উন্নত ও অনুন্নত দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার দেখানো হল :

দেশ	মোট জাতীয় উৎপাদন (বার্ষিক পরিবর্তনের হার %)	মাথাপিছু জাতীয় আয় (বার্ষিক পরিবর্তনের হার %)
তাইওয়ান	১২.৮৯	১০.২৮
জাপান	১৬.৩৭	১৪.৮৭
থাইল্যান্ড	১০.৫৩	৭.৮৯
মালয়েশিয়া	১০.৬৩	৮.৯৪
ভিয়েতনাম	১৬.২৮	১১.৭৬

উৎস : ওয়ার্ল্ড পপুলেশন ডাটা সিট, ১৯৭৯, পপুলেশন রেফারেন্স ব্যুরো, ওয়াশিংটন।

লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, এ দেশগুলোর জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার অপেক্ষা মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির হার কম। তার কারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার জাতীয় আয় বৃদ্ধির হারের চেয়ে বেশি। নিচের সারণীতে গড় আয় কিভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে প্রভাবিত হয় তা দেখানো হল।

মাথাপিছু আয় ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার

দেশ	মাথাপিছু জাতীয় আয় (ডলার)	জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার
জাপান	৮,৮০০	০.৮
তাইওয়ান	১,১৮০	২.০
কোরিয়া (দক্ষিণ)	১,৫০০	১.৭
থাইল্যান্ড	৫৯০	২.০
ভিয়েতনাম	১৭০	২.৩
বাংলাদেশ	১০০	২.৬

সুতরাং বুঝা যাচ্ছে যে জন্মহার বেশি হলে জাতীয় আয় কমে যায়, জাতীয় আয় কমে গেলে জীবন যাত্রার মান কমে যায়। ফলে গড় আয়ু কমে যাওয়াটাও স্বাভাবিক। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, পৃথিবীর জনসংখ্যা কমতে থাকলে জাতীয় আয়ও বাড়বে আবার জাতীয় আয় বাড়লে মাথাপিছু গড় আয় বেড়ে যাবে। এজন্যই পৃথিবীর জনসংখ্যা একটি কাম্য পরিমাণে রাখা উচিত।

৪.১.৬ জনসংখ্যা ও পরিবেশ

আদিকালে মানুষ বসবাসের প্রথম স্তর থেকে শুরু করে শিল্প বিপ্লবের আগ পর্যন্ত পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিবেশ মোটামুটি এক রকম ছিল। কিন্তু তারপর থেকে মানুষ বিজ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশ করার সাথে সাথে মানুষের মৃত্যু হার হ্রাস পেতে থাকে। মানুষ তার প্রয়োজনে প্রকৃতিকে কাজে লাগাতে শুরু করলে প্রকৃতির উপর এর একটা চাপ পড়ে। আবার জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে অনেক বসবাসের আযোগ্য জায়গা স্বাস্থ্যকর স্থানে পরিণত হয়েছে এমন নজিরও আছে। তবে অধিক জনসংখ্যা আমাদেরকে সুফলের তুলনায় কুফলের দিকটাই বেশি করছে। আমরা এখানে পৃথিবীর জনসংখ্যার আধিক্যের কারণে বিশ্বে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিচ্ছে তা আলোকপাত করার চেষ্টা করব।

নিম্নলিখিতভাবে জনসংখ্যা পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করছে —

১। বৃক্ষ শূন্যতা : মানুষ বাড়লে খাদ্য উৎপাদন বাড়াতে হয়, খাদ্য উৎপাদন বাড়ানোর জন্য প্রয়োজন আবাদযোগ্য জমির। এই অতিরিক্ত জমি বাড়ানোর জন্য সবুজ অরণ্য নির্বিচারে কেটে সাফ করা হচ্ছে। জ্বালানী হিসাবে ব্যবহারের জন্য প্রচুর কাঠ কাটা হচ্ছে। এতে পৃথিবী তার স্বাভাবিক ভারসাম্য হারাচ্ছে। এতে দেখা যাচ্ছে বিশ্বের একদিকে প্রচণ্ড খরা, অন্যদিকে প্রচন্ড বৃষ্টিপাত হচ্ছে। আবার তার ফলে দেখা যাচ্ছে যে, পৃথিবীতে গ্রিণ হাউস প্রতিক্রিয়ার মতো মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে। এই সকল অবস্থার মারাত্মকতা এড়ানোর জন্য আমাদের জনসংখ্যার স্ফীতি অবশ্যই রোধ করা উচিত।

২। কৃষি জমির অনুর্বরতা : খাদ্য উৎপাদন বাড়ানোর জন্য জমিতে বার বার চাষ করার ফলে জমির উর্বরতা হ্রাস পাচ্ছে। কৃত্রিম সার ব্যবহার করায় জমি আশগুলো ধরে রাখতে পারছেনা, ফলে সামান্য বৃষ্টিতেই মাটি কেটে চলে যাচ্ছে নিচু অঞ্চলে। বার বার কর্ষণের ফলে জমির মাটিও ঢিলা হয়ে যাচ্ছে এবং উর্বরতা হ্রাস পাচ্ছে। জনসংখ্যা কম থাকলে জমিতে এত চাপও পড়ত না ক্ষতিও হতনা।

৩। নদী ভরাট : গাছপালা মাটিকে আটকে রাখে। কিন্তু গাছ না থাকায় তা আর আবদ্ধ থাকছেনা। আর বার বার মাটি কর্ষণের ফলে তা বৃষ্টিতে, পাহাড়ী ঢলে নদীতে এসে জমা হচ্ছে এবং চর পড়ছে। এতে নদীগুলো তার নাব্যতা হারাচ্ছে। নদী ভরাটের ফলে জলপ্রবাহেও ক্ষতি হচ্ছে।

৪। বায়ুমণ্ডল : কল কারখানা ও যানবাহন মানুষের চাহিদা বাড়ার সাথে সাথে বেড়েই চলেছে। আর এর সাথে সাথে এদের পরিত্যক্ত গ্যাস ও বর্জ্য পদার্থের পরিমাণও বেড়ে যাচ্ছে। ফলে বায়ুমন্ডল অধিক তাপমাত্রা ধারণ করছে ফলে পৃথিবী উষ্ণ হয়ে পড়ছে। তার দ্বারা পৃথিবীর পানির উপরি ভাগ ফুলে ফেপে উঠছে। তাতে অনেক নিচু স্থলভাগ তলিয়ে যেতে পারে ও জনবসতির স্বল্পতা দেখা দিতে পারে। আবার ওজনস্তর হ্রাস পাওয়ায় আকাশের তেজস্ক্রিয় রশ্মি আমাদের ভু-পৃষ্ঠে আসা শুরু করেছে। যার ফলে অনেক চর্মরোগ দেখা দিতে পারে। ওটাও জনস্ফীতির অন্যতম প্রতিক্রিয়া।

৫। বস্তীবৃদ্ধি ও অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ : প্রতি বছর নদীভাঙ্গন, খাদ্য স্বল্পতা ও কাজের প্রয়োজনে অনেক লোক শহরে এসে ভিড় জমাচ্ছে। তারা শহরের বিভিন্ন স্থানে বস্তী আকারে বসবাস করছে ও এক অপরিচ্ছন্ন পরিবেশের সৃষ্টি করছে। তার ফলে এক অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ আমাদের মাঝে জেগে উঠছে। জনসংখ্যার আধিক্য না হলে এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হত না।

তাছাড়া আরও অনেক সমস্যা পরিবেশগত ভাবে দেখা যায়। যেমন ভূ-গর্ভের পানিরস্তর নিচের দিকে যাচ্ছে, বাসস্থানের স্বল্পতা ইত্যাদি। পৃথিবীর জনগণই পৃথিবীকে ধ্বংস করছে এই ব্যাপারে এখন আর কারো দ্বিমত নেই।

৪.১.৭ উপসংহার

এতক্ষণ আমরা পৃথিবীর জনসংখ্যা ও তার প্রভাবে যে সকল পবিরর্তন ঘটে এবং তার সাথে সম্পর্কিত অনেক বিষয়ের কিছু অংশ নিয়ে আলোচনা করা হল। পৃথিবীর বর্তমান জনসংখ্যা অনেক আগে হয়তো কল্পনাই করা যেত না। অর্থনীতি, খাদ্য, পরিবেশ ইত্যাদির সাথে তার বিশেষ সম্পর্ক আমরা সংক্ষেপে দেখতে চেষ্টা করেছি। তথ্য যা পরিবেশিত হয়েছে তা আমাদের দেশের হিসাব অনুযায়ী নয়। এগুলো পাশ্চাত্য থেকে ধার করে নেয়া। তবুও এর থেকে আমরা পৃথিবীর জনসংখ্যা ও তার প্রভাব সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা পেতে পারি। উৎসাহী ব্যক্তিরা এ তথ্যাবলি জেনে উপকৃত হবেন এটিই কাম্য। সাথে সাথে এই ব্যাপারে সচেতনা ফিরে পেলে দেশ ও জাতি সামাজিক অর্থনৈতিক ইত্যাদি বিষয়ে সফল হবে। বর্তমানে পৃথিবীর বসতযোগ্য জায়গার তুলনায় জনসংখ্যা অনেক বেশি। এটি কাম্য সংখ্যায় নিয়ে আসা উচিত। এজন্য সকলের আন্তরিকতা দরকার।

৪.২ পৃথিবীর খনিজ সম্পদ

৪.২.১ সূচনা :

খনিজ সম্পদের ব্যবহার বহুপ্রাচীন যুগ হতেই চলে আসছে। প্রস্তর যুগের পর মানুষ তাম্র ব্যবহার করতে শিখে এবং সে যুগটি তাম্রযুগ নামে পরিচিত। তাম্রযুগের পর ব্রোঞ্চ এর ব্যবহার

শুরু হয় যা ব্রোঞ্জযুগ নামে পরিচিতি লাভ করে। ব্রোঞ্জযুগের পর আসে লোহ যুগ এবং ম... সভ্যতার ইতিহাসে তা একটি বলিষ্ট পদক্ষেপ। মানুষের বুদ্ধি ও বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে ম... ক্রমশ আরো নতুন নতুন খনিজদ্রব্যের অনুসন্ধান ও তার ব্যবহার করে চলছে প্রকৃতপ... খনিজ শিল্পের উন্নতির সূত্রপাত হয় শিল্পবিপ্লবের সূচনা হতে। সম্প্রতি আণবিক খনিজ ব্যবহার মানব সভ্যতাকে উন্নতির চরম শিখরে পৌছিয়ে দিয়েছে।

৪.২.২ সংজ্ঞা

ভূ-পৃষ্ঠের অভ্যন্তর ভাগের শিলাস্তর হতে মাটি খুঁড়ে যে প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ করা হ... তাকে খনিজ বলে। খনিজ সম্পদ একটি অজৈব পদার্থ। উত্তোলন ও ব্যবহার ছাড়া এ সম্প... সৃষ্টিতে মানুষের করণীয় কিছু নেই। প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে ভূ-পৃষ্ঠের অভ্যন্তরে শিলাস্তরে... মধ্যে বিভিন্ন প্রকার শিলার উপাদান অথবা যুগ যুগ ধরে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় শিলাসমূ... ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে যে সব যৌগিক পদার্থ সৃষ্টি করে সেগুলোকে খনিজ পদার্থ বা খনিজ সম্পদ বলে। যেমন — সোনা, রূপা, তামা, লৌহ, খনিজ তেল, গ্যাস ইত্যাদি।

৪.২.৩ খনিজ সম্পদের বৈশিষ্ট্য

১. ভূ-পৃষ্ঠের অভ্যন্তরের শিলাস্তরের মধ্য থেকে অনুসন্ধান ও আবিষ্কার করে খনিজ সম্পদ বেড় করা হয়।

২. আবিষ্কারের পরে বৈজ্ঞানিক উপায়ে ভূ-পৃষ্ঠের উপরে উত্তোলন বা আহরণ করতে হয়।

৩. ভূ-পৃষ্ঠের অভ্যন্তরের মাঝে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় খনিজ সম্পদ সৃষ্টি হয়।

৪. খনিজ সম্পদের পরিমাণ প্রকৃতি দ্বারা সীমাবদ্ধ। উত্তোলনের ফলে তা ক্রমশঃ হ্রাস পেতে থাকে।

৫। কখনো বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কোন কোন খনিজ সম্পদের চাহিদা ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়। যেমন যুদ্ধাবস্থায় লৌহ।

৬. পৃথিবীর কোন দেশই খনিজ সম্পদে স্বয়ং সম্পূর্ণ নয় বলে এক দেশ অন্য দেশের উপর নির্ভরশীল।

৭. খনিজ সম্পদের উত্তোলনের পরিবহণের জন্য কখনো কোন দেশের পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠে নি।

৮. খনিজ সম্পদ উত্তোলনের জন্য অনেক শ্রমিক দরকার।

৯. খনিজ সম্পদ উত্তোলনের জন্য উন্নত কারিগরি জ্ঞান, আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা ও যন্ত্রপাতি অন্যতম পূর্বশর্ত।

১০. ভূ-গর্ভের শিলাস্তরের নির্দিষ্ট স্থানে কেন্দ্রীভূত অবস্থায় খনিজ পাওয়া যায়।

১১. অধিকাংশ খনিজ সম্পদের পৌনঃপুনিক ব্যবহার ও উপযোগিতা সৃষ্টি করা যায়, কিন্তু জ্বালানী খনিজ যেমন — কয়লা, খনিজ তেল, গ্যাস ইত্যাদি সম্পদ একবারই ব্যবহার করা যায়।

১২. খনিজ সম্পদ উত্তোলনের ফলে যতই তা নিঃশেষিত হবে ততই উত্তোলন ব্যয় বৃদ্ধি পাবে।

১৩. খনিজ সম্পদ উত্তোলন মানুষকে প্রতিকূল পরিবেশযুক্ত অঞ্চলে বসতি স্থাপনে উদ্বুদ্ধ করে। আবার খনিজ সম্পদ একেবারে নিঃশেষিত হলে খনিজ শ্রমিকেরা অপর খনির সন্ধানে যাযাবর বৃত্তি গ্রহণে বাধ্য হয়।

১৪. খনিজ সংরক্ষণ নীতির ফলে অনেক সময় বিশ্ব রাজনীতি প্রভাবিত হয়।

১৫. দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর খনিজ উত্তোলন নির্ভর করে।

৪.২.৪ খনিজ সম্পদ উত্তোলনের অনুকূল উপাদানসমূহ (Factors for Exploitation a Mineral Resources)

খনিজ সম্পদের আবিষ্কারই শেষ কথা নয়। খনিজ সম্পদের উত্তোলনের উপরই তাদে ব্যবহার ও উপযোগিতা নির্ভরশীল। যে বিশেষ কতগুলো প্রাকৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতি অবস্থার উপর খনিজ সম্পদের উত্তোলন নির্ভর করে নিচে তা উল্লেখ করা হলো :

১. ভূ-প্রকৃতি
২. জলবায়ু
৩. পর্যাপ্ত পানি সরবাহ
৪. সম্পদের পর্যাপ্ত
৫. সুষ্ঠু যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থা
৬. দক্ষ ও কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন বিশেষজ্ঞ।
৭. সুলভ ও দক্ষ শ্রমিক
৮. পর্যাপ্ত মূলধন
৯. চাহিদা
১০. রাজনৈতিক অবস্থা।

৪.৩.৫ খনিজ সম্পদের শ্রেণী বিভাগ :

খনিজ সম্পদ

ধাতব খনিজ সম্পদ

অধাতব খনিজ

জ্বালানী খনিজ
যথা : কয়লা, গ্যাস

লৌহ বর্গীয় ধাতব খনিজ
যথা : লৌহ

লৌহ শংকর ধাতব খনিজ
যথা : ম্যাংগানিজ, নিকেল

অলৌহ বর্গীয় ধাতব খনিজ

সাধারণত ধাতব খনিজ
যথা : তামা, টিন, সীসা
দস্তা, এ্যালুমিনিয়াম

মূল্যবান ধাতব খনিজ
যথা : স্বর্ণ, রৌপ্য, হীরক
প্লাটিনাম, প্যালাডিয়াম

গৃহ নির্মাণে ব্যবহৃত খনিজ
যথা : চুন, মার্বেল চুনাপাথর

রাসায়নিক শিল্পে ব্যবহৃত
খনিজ, যথা : লবণ গন্ধক,
পটাশ।

অন্যান্য ধাতব খনিজ
যথা : অভ্র, গ্রাফাইট
প্রভৃতি।

খনিজ সম্পদের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Mineral Resources)

পৃথিবীতে খনিজ সম্পদের পরিমাণ অসংখ্য। গঠন প্রণালী, প্রকৃতি, ব্যবহার ইত্যাদির ভিত্তিতে খনিজ সম্পদকে প্রধানত তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

১. ধাতব খনিজ সম্পদ
২. অধাতব খনিজ সম্পদ
৩. শক্তি উৎপাদক খনিজ

এ তিন প্রকার খনিজ আবার বিভিন্নভাগে বিভক্ত। নিচে এগুলোর বর্ণনা করা হলো :

১. ধাতব খনিজ সম্পদ (Metallic Mineral Resources) :

যে সকল খনিজ সম্পদ কোন না কোন ধাতু দ্বারা গঠিত তাদেরকে ধাতব খনিজ সম্পদ বলে। এর মধ্যে লৌহ জাতীয় পদার্থ বা আকরিক লৌহ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ধাতব খনিজ সম্পদ আবার তিন প্রকার —

ক. লৌহ বর্গীয় ধাতব খনিজ
খ. লৌহ শংকর ধাতব খনিজ
গ. অলৌহ বর্গীয় ধাতব খনিজ।

লৌহ বর্গীয় ধাতব খনিজ (Ferrous Metal)

বর্তমান যন্ত্র সভ্যতার প্রধান ধারক ও বাহক লৌহ বর্গীয় ধাতব খনিজ বা আকরিক লৌহ। আকরিক লৌহ একটি মৌলিক পদার্থ হলেও খনি হতে সরাসরি পাওয়া যায় না। ভূ-পৃষ্ঠের বিভিন্ন প্রকার শিলার সাথে মিশ্রিত থাকে একে আকরিক লৌহ বলে।

আকরিক লৌহ সংগ্রহ ও শোধন পদ্ধতি

সাধারণত খনি হতে লৌহ মিশ্রিত শিলা উত্তোলন করে শোধনের মাধ্যমে লৌহ সংগ্রহ করা হয়। যে শিলাতে কম পক্ষে ৩৩% ভাগ লৌহ থাকে না তা উত্তোলন করে লৌহ সংগ্রহ করা লাভজনক হয় না। আকরিক লৌহ উত্তোলন ও শোধনের জন্য নিম্নোক্ত উপাদান প্রয়োজন — যেমন :

ক) শক্তি সম্পদের উপস্থিতি
(খ) রাসায়নিক পদার্থ
(গ) উন্নত যাতায়াত ও পরিবহণ ব্যবস্থা
(ঘ) ব্যবহার

খনি হতে প্রাপ্ত আকরিক লৌহের সাথে চুনাপাথর, কোক, কয়লা ইত্যাদি মিশ্রিত করে তাদের গলায়ে কাঁচা লৌহ (pig Iron) তৈরি করা হয়। আবার কাঁচা লৌহের সাথে ম্যাগানিজ, ক্রোমিয়াম, টাংস্টেন, এন্টিমনি, নিকেল প্রভৃতি শংকর জাতীয় ধাতু মিশ্রিত ইস্পাত তৈরি করা হয়। কাঁচা লৌহ অপেক্ষা ইস্পাত অধিক মজবুত ও শক্তিশালী।

আকরিক লৌহের শ্রেণীবিভাগ

রং ও খাটি লৌহ প্রাপ্তির পরিমাণ বিবেচনা করে আকরিক লৌহকে প্রধানত চারভাগে ভাগ করা হয় যথা :

ম্যাগনেটাইট : কালো রং এর এ আকরিক সর্বোৎকৃষ্ট শ্রেণীর। এতে লোহার পরিমাণ ৭০% ভাগ এর চেয়ে বেশি। সুইডেনে এ লোহার পরিমাণ সবচেয়ে বেশি।

হ্যামাটাইট : ধূসর লাল রংয়ের এ আকরিক লৌহ উন্নতমানের এতে লোহার পরিমাণ ৬০% – ৭০% ভাগ। যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়াতে সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায়।

লিমোনাইট : মধ্য মানের আকরিক লিমোনাইটে ৪৫% – ৬০% ভাগ আকরিক থাকে। এর রং হলদে বাদামি। ইংল্যান্ড, ভারত, চিনে সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায়।

সিডেরাইট : নিম্নমানের আকরিক সিডেরাইট ধূসর বাদামি রংয়ের। এতে ৩০% – ৪৫% ভাগ লোহা থাকে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এ আকরিক প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

৪.২৬ পৃথিবীর বিভিন্ন খনিজের উৎপাদন ও বণ্টন

পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে কম বেশি আকরিক লৌহ পাওয়া গেলেও অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক নয় বলে মাত্র নির্দিষ্ট কয়েকটি দেশে খনি হতে আকরিক লৌহ উত্তোলন করা হয়। নিম্নে পৃথিবীর প্রধান প্রধান আকরিক লৌহ উৎপাদনকারী দেশসমূহের উৎপাদন ও বণ্টনের উল্লেখ করা হলো :

সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ইউরোপের দেশসমূহ

আকরিক লৌহ উৎপাদনে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন বর্তমানে বিশ্বে প্রথম স্থানের অধিকারী। এখানকার অধিকাংশ আকরিক উচ্চ শ্রেণীর হেমাটাইট ও ম্যাগনেটাইট প্রধান আকরিক লৌহ খনি অঞ্চলগুলো হচ্ছে —

১. ইউক্রেন ও ক্রিমিয়া অঞ্চল
২. ইউরাল পার্বত্য অঞ্চল
৩. অন্যান্য অঞ্চল, যথা — তুরস্ক, কুজবাস, তেলবিস, মারসাম্বক, বৈকাল, কা... উপদ্বীপ ব্লাডিভস্টক, টুলা, মোরকস্ক, লেনিনগ্রাড।

সুইডেন : লৌহ আকরিক উত্তোলনকারী দেশগুলোর মধ্যে সুইডেনের স্থান অষ্টম। সর্বোৎকৃষ্ট শ্রেণীর ম্যাগনেটাইট ও হেমাটাইট আকরিক লৌহ উত্তোলনে সুইডেন প্রসিদ্ধ। প্রধান খনিগুলো মেরু বলয়ের উত্তরদিকের কিরুনা, সালিভার, মামবারজেট অঞ্চলে অবস্থিত। অন্যান্য খনিগুলো দক্ষিণের বার্গসল্যাগেন, গ্রাঞ্জিবর্গ, ডানিমোয়া, কোপারবার্গ, স্ট্রাম... বেলেমোয়া, পিটিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে অবস্থিত।

ফ্রান্স : আকরিক লৌহ উৎপাদনে ফ্রান্সের স্থান দশম। এটি লিমোনাইট জাতীয়, তবে চু... মিশ্রিত থাকায় গলাতে সুবিধা হয়। লোরেন, বার্গাডি, পীরেনিজ পার্বত্য অঞ্চল, নর্মান্ডি... ব্রিন্টাপিতে খনি অবস্থিত।

যুক্তরাজ্য : যুক্তরাজ্য এক সময় লৌহ আকরিক উত্তোলনে খুব উন্নত থাকলেও বর্তমানে অন্য দেশের উপর নির্ভরশীল। ব্রিটেনের প্রধান লৌহ আকরিক উত্তোলন অঞ্চলগুলোর মধ্যে

ক্লীভল্যাণ্ড, মিডল্যাণ্ড, ক্যামবারল্যাণ্ড, নর্দার্ন স্পটনশায়ার এবং উত্তর ল্যাঙ্কাশায়ার বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পশ্চিম জার্মানি : পশ্চিম জার্মানিতে সিজারল্যান্ড, ভোজেলসবার্গ, সালজনিটার, থুরিনজার, হার্জ ও ওয়েস্টফ্যালিয়া, এরজেবার্গ এবং মার অঞ্চলের খনি হতে আকরিক লোহা উত্তোলন করা হয়।

উত্তর আমেরিকার দেশসমূহ

যুক্তরাষ্ট্র : আকরিক লৌহ উৎপাদনে যুক্তরাষ্ট্র বর্তমানে পঞ্চম স্থানের অধিকারী। যুক্তরাষ্ট্রে প্রধানত চারটি অঞ্চলে লৌহ আকরিক উত্তোলন করা হয় :

সুপিরিয়ার হ্রদ অঞ্চল : এ অঞ্চলে ট্যাকোনাইট নামে এক প্রকার খনিজ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, যা থেকেই হেমাটাইট ও ম্যাগনেটাইট লৌহ আকারের সৃষ্টি হয়। সুপিরিয়ার হ্রদের দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত মিশিগান, উইসবনসিন, মিনেসোটা রাজ্যের মেসাবি, কুইনা, লৌহ পর্বত, বার্মিলিয়ান পর্বত, গোজেবিফ, মনোমিনি, মারকোয়েট প্রভৃতি অঞ্চলে প্রধান খনিগুলো অবস্থিত।

দক্ষিণ পূর্বের আলবামা অঞ্চল : উৎকৃষ্ট শ্রেণীর হেমাটাইট, নিকৃষ্ট শ্রেণীর লিমোনাইট ও সিডেরাইট আকরিক লৌহ মজুদ রয়েছে বামিংহাম ও রেড মাউন্টেন অঞ্চলের খনিগুলোতে।

উত্তর পূর্বাঞ্চল : নিউইয়র্কের অ্যাডড়িনডাক এবং পেনসালভেনিয়ার কর্নওয়াল অঞ্চলে ম্যাগনেটাইট জাতীয় লৌহ আকরিক উত্তোলন করা হয়।

পশ্চিমাঞ্চল : রকি পার্বত্য অঞ্চলের খনিগুলো হতে সিডেরাইট উত্তোলিত হয়।

কানাডা : নিউফাউণ্ডল্যান্ডের সেন্টজন, নোভাস্কো শিয়া, ব্রিটিশ কলম্বিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে খনিগুলো অবস্থিত।

এশিয়ার দেশসমূহ

চীন ও মাঞ্চুরিয়া : দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়া, ইয়াংসি নদীর উপত্যকা, কোয়ানটুং, চুংকিং এবং সানসির, তাইয়ুয়ান অঞ্চলে লৌহ খনিগুলো অবস্থিত।

জাপান : মুরোরান, কামিসি ও সেনিন অঞ্চলে লৌহ আকরিক উত্তোলন করা হয়।

ভারত : ভারতে প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন শ্রেণীর আকরিক লৌহ মজুদ রয়েছে। উড়িষ্যা, বিহার, কর্নাটক, অন্ধ্র, মহারাষ্ট্র এবং মধ্য প্রদেশে লৌহ আকরিক উত্তোলন করা হয়।

দক্ষিণ আমেরিকার দেশসমূহ

ব্রাজিল : দক্ষিণ গোলার্ধের প্রধান আকরিক উৎপাদনকারী দেশের প্রধান খনিগুলো রয়েছে সিনাগেরারে, মাটোগ্রাসো, কোরাম্বা, মাবাহেরা, ও সাওপালোতে

ভেনেজুয়েলো : উচ্চ শ্রেণীর লৌহ আকরিক সঞ্চিত রয়েছে গুইনার উচ্চ ভূমি, এল পাও, মোরো বলিভাবে।

চিলি, বলিভিয়া ও পেরু : তিনটি দেশই লৌহ আকরিক বেশ কিছু উত্তোলন করে।

অস্ট্রেলিয়া : দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার আয়রন নব ও নিউ সাউথ ওয়েলসের আয়রন মোনার্ক বাদেও মাউন্টব্রুস, মাউন্ট হোয়েলব্যাক, মাউন্ট গোডসওয়ার্দিতে প্রচুর উচ্চ শ্রেণীর লৌহ আকরিক পাওয়া যায়।

আফ্রিকা মহাদেশের দেশসমূহ

উত্তর ও পশ্চিম আফ্রিকার লাইবেরিয়া, আলজিরিয়া, তিউনিসিয়া, পশ্চিম আফ্রিকার মৌরিতানিয়া, গিনি, নাইজেরিয়া, এঙ্গোলা এবং দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রান্সভালে প্রচুর পরিমাণে লৌহ আকরিক উত্তোলন করা হয়।

ব্যবহার : যন্ত্র সভ্যতার যুগে লৌহ আকরিকের ব্যবহার সর্বাপেক্ষা অধিক। কৃষি যন্ত্রপাতি থেকে শুরু করে শিল্পকর্ম এমনকি গৃহস্থালীর দ্রব্যাদিতেও লৌহ ও ইস্পাতের ব্যবহার ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বাণিজ্য : প্রধান রপ্তানিকারক দেশ — সুইডেন, স্পেন, অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল, ভারত, লাইবেরিয়া, মালয়েশিয়া, মরক্কো, কোরিয়া, ফ্রান্স, রাশিয়া। প্রধান আমদানিকারক দেশ — জাপান, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, বেলজিয়াম।

লৌহ শংকর ধাতব খনিজ : লৌহের সাথে এক বা একাধিক ধাতব পদার্থের রাসায়নিক মিশ্রণকে লৌহ শংকর বলে। লৌহ শংকর প্রস্তুত করতে খাদ হিসাবে যে সমস্ত ধাতব পদার্থ মিশ্রিত করা হয় সেগুলোকে লৌহ শংকর ধাতব খনিজ পদার্থ বলে। লৌহ শংকর ধাতব পদার্থ ব্যবহারের সুবিধাবলি নিচে উল্লেখ করা হল :

১. লৌহ শংকর ধাতব খনিজ পদার্থ ব্যবহার করে উন্নত মানের ও গুণের ইস্পাত উৎপাদন করা হয়।
২. ম্যাংগানিজ মিশ্রিত ইস্পাত অত্যন্ত শক্ত, মজবুত ও দৃঢ় হয়।
৩. ম্যাংগানিজ ও টাংস্টেন মিশ্রিত ইস্পাতের ক্ষয়রোধ ক্ষমতা বাড়ে।
৪. ম্যাংগানিজ ও নিকেল মিশ্রিত ইস্পাতে দাগ বা মরিচা পড়ে না।

৫. নিকেল মিশ্রিত ইস্পাতের প্রসারণ ক্ষমতা বাড়ে।
৬. নিকেল ও ক্রোমিয়াম মিশ্রিত ইস্পাত ক্ষার/প্রাকৃতিক ক্রিয়া বা প্রতিক্রিয়ায়ও বিকৃত হয় না।
৭. ক্রোমিয়াম, ট্যাংস্টেন, এন্টিমনি, মলিবডেনাম ইত্যাদি মিশ্রণের ফলে ইস্পাতের তাপ ধারণ ক্ষমতা বাড়ে।
৮. ক্রোমিয়াম ও নিকেল মিশ্রিত ইস্পাতের রং অত্যন্ত চকচকে ও উজ্জ্বল হয়।

ম্যাংগানিজ

ব্যবহার : পৃথিবীর ম্যাংগানিজের ৯০% ভাগ লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে ফেরোম্যাংগানিজ নামক শংকর ধাতু ও ম্যাংগানিজ স্টীল নামক ইস্পাত শিল্পে ব্যবহৃত হয়। বাকী ১০% ভাগ রসায়নিক এনামেল, বৈদ্যুতিক সামগ্রী, কাচ, প্লাস্টিক, বার্নিশ প্রভৃতি শিল্পে ব্যবহৃত হয়।

ম্যাংগানিজ আকরিকের শ্রেণীবিভাগ

১. পাইরোলুসাইট
২. সিলোসিলেন।

ইলেকট্রোলাইটিক পদ্ধতির সাহায্যে এসব আকরিক থেকে ম্যাংগানিজ নিষ্কাশন করা হয়।

উৎপানকারী দেশ : সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ও দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাংগানিজ উৎপাদনে বিশ্বে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকারী দেশ। এছাড়া ব্রাজিল, চিলি, ভারত, ঘানা, কাঙ্গো আইভরিকোস্ট, অস্ট্রেলিয়া, গ্যাবন, চিন, জাপান, মালয়েশিয়া, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানি, চেকোশ্লোভাকিয়া প্রভৃতি দেশে ম্যাংগানিজ পাওয়া যায়।

বাণিজ্য : লৌহ ইস্পাত শিল্পে সমৃদ্ধ দেশগুলো সবচেয়ে বেশি ম্যাংগানিজ ব্যবহার করে। যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, কোরিয়া, বৃটেন, জার্মানি, বেলজিয়াম প্রধান আমদানিকারক দেশ। ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা, গ্যাবন, ঘানা, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন, মরক্কো, ব্রাজিল প্রধান রপ্তানিকারক দেশ।

নিকেল

ব্যবহার : পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক নিকেল ইস্পাত প্রস্তুতে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া স্টেনলেস স্টীল, নিকেল প্লেট, সংকর ধাতু, ইলেকট্রোপ্লেটিং, জেট বিমান, মনেল মেটাল, জার্মান সিলভার, মুদ্রা প্রস্তুতে ব্যবহৃত হয়।

উৎপাদনকারী দেশ

পৃথিবীর প্রায় ৪০% ভাগ নিকেল কানাডায় উৎপাদিত হয়। অন্যান্য উৎপাদনকারী দেশগুলো হচ্ছে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন, অস্ট্রেলিয়া, ফিলিপাইন, কিউবা, ইন্দোনেশিয়া, দঃ আফ্রিকা, গ্রিস, অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাষ্ট্র ইত্যাদি।

বিশ্ব বাণিজ্য

আমদানিকারক দেশ : যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, পশ্চিম জার্মানি, জাপান, ফ্রান্স, বেলজিয়াম

রপ্তানিকারক দেশ : শিল্পে উন্নত দেশগুলো বাদে অন্যান্য দেশে উৎপাদিত প্রায় সমস্ত নিকেলই বিদেশে রপ্তানি করা হয়।

ক্রোমিয়াম

ক্রোমিয়াম ইস্পাতের সাহায্যে অস্ত্র চিকিৎসার সামগ্রী, তৈজসপত্র, রান্নার বাসন, যানবাহনের উপকরণ, ছুরি, কাঁচি, বিয়ারিং, বৈদ্যুতিক সামগ্রী ইত্যাদি তৈরি হয়।

উৎপাদনকারী দেশ : দক্ষিণ আফ্রিকা, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন, আলবেনিয়া, ফিলিপাইন, জিম্বাবুয়ে, তুরস্ক, ব্রাজিল, ভারত, পাকিস্তান, ইরান, মাদাগাস্কার ইত্যাদি।

আমদানিকারক দেশ : যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, পশ্চিম জার্মানি, বেলজিয়াম।

ট্যাংস্টেন

ব্যবহার : উচ্চ গতিসম্পন্ন কাটবার যন্ত্র, যন্ত্রপাতি, ব্লেড, যুদ্ধের বর্ম, জেট ইঞ্জিন, ট্যাংক, রকেট, মিশাইল, বৈদ্যুতিক বাল্ব ইত্যাদি প্রস্তুতে ব্যবহৃত হয়।

উৎপাদনকারী দেশ : চিন, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, বলিভিয়া, কানাডা, ফ্রান্স, গেবন, জায়ারে, পেরু, কোরিয়া, মায়ানমার, থাইল্যান্ড, আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, পর্তুগাল প্রভৃতি।

আমদানিকারক দেশ : ফ্রান্স, ব্রিটেন, জার্মানি, ভারত, জাপান।

রপ্তানিকারক দেশ : চিন, কোরিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, বলিভিয়া, ব্রাজিল, মায়ানমার, পর্তুগাল প্রভৃতি।

এন্টিবডি

ব্যবহার : সামরিক যন্ত্রপাতি, পাইপ, ছাপাখানার টাইপ, বন্দুকের গুলি, স্টোরেজ ব্যাটারী প্রভৃতি তৈরিতে এন্টিবডি ব্যবহৃত হয়।

উৎপাদনকারী দেশ : চিন, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন, মেক্সিকো, বলিভিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা।

আমদানিকারক দেশ : যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, পাকিস্তান ও ইউরোপীয় দেশসমূহ।

রপ্তানিকারক দেশ : চিন, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন, মরক্কো, থাইল্যান্ড, বলিভিয়া।

মলিবডেনাম

ব্যবহার : সামরিক সরঞ্জাম, বিমান, বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক শিল্প এবং মটর গাড়ি নির্মাণে এ ধাতু ব্যবহৃত হয়।

উৎপাদনকারী দেশ : কানাডা, মেক্সিকো, চিলি, নরওয়ে, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন, চিন, জাপান, যুক্তরাষ্ট্র।

আমদানিকারক দেশ : ইউরোপের দেশগুলো এ ধাতু সবচেয়ে বেশি আমদানি করে।

রপ্তানিকারক দেশ : কানাডা, মেক্সিকো, চিলি, নরওয়ে, চিন প্রভৃতি দেশ রপ্তানি করে।

ভ্যানাডিয়াম

ব্যবহার : রেলগাড়ি, মোটরগাড়ি, যুদ্ধাস্ত্র, চামড়া ও ঔষধ শিল্পে।

উৎপাদনকারী দেশ : যুক্তরাষ্ট্র, পেরু, মেক্সিকো, দক্ষিণ আফ্রিকা।

আমদানিকারক দেশ : পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলো।

রপ্তানিকারক দেশ : যুক্তরাষ্ট্র প্রথম রপ্তানিকারক দেশ।

অলৌহ বর্গীয় ধাতব খনিজ

যেসব ধাতুর ভিতর লৌহ নেই সাধারণ কথায় তাই অলৌহ বর্গীয় ধাতব খনিজ পদার্থ। বিভিন্ন শিল্পের কাঁচামাল ও খাদ হিসাবে অলৌহ বর্গীয় খনিজ পদার্থের অর্থনৈতিক ও ব্যবহারিক গুরুত্ব অনেক বেশি। এদের আবার গুণাগুণের ভিত্তিতে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে—

সাধারণ ধাতব খনিজ

নিচে কয়েকটি সাধারণ ধাতব খনিজের বর্ণনা দেয়া হলো :

তামা (Copper)

ব্যবহার : বর্তমান যুগে তামা প্রধানত ব্যবহৃত হয় বিদ্যুত শিল্পে। বৈদ্যুতিক তার, যন্ত্রপাতি মোটর, ট্রান্সফরমার, জেনারেটর, ব্যাটারী প্রস্তুতে, যুদ্ধাস্ত্র, চিকিৎসা শাস্ত্রে, বাসনপত্র, জাহাজের আবরণ, রং, কীটনাশক ঔষধ প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হয়।

উৎপাদনকারী দেশ : যুক্তরাষ্ট্র, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন, চিলি, ফিলিপাইন জাম্বিয়া, কানাডা, ভারত।

আমদানিকারক দেশ : যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, যুক্তরাজ্য, জাপান, প. জার্মানি।

রপ্তানিকারক দেশ : চিলি, পেরু, জায়ারে, জাম্বিয়া, রোডেশিয়া।

সীসা (Lead)

ব্যবহার : বৈদ্যুতিক তারের আচ্ছাদন নির্মাণে, টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ, পানি সরবরাহ ও গ্যাস পাইপ, প্রিন্টিং, টাইপ, বন্দুকের গুলি, রং, কীটনাশক ঔষধ ইত্যাদি তৈরি ও মেরামতে সীসা ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে পারমাণবিক, ইলেকট্রনিক ও তাপবিদ্যুত কেন্দ্রে ব্যবহৃত হয়।

উত্তোলক দেশ : যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, মরক্কো, মেক্সিকো, যুগোশ্লাভিয়া, স্পেন, পোল্যান্ড।

আমদানিকারক দেশ : যুক্তরাজ্য, জাপান, জার্মানি, বেলজিয়াম, ভারত, পাকিস্তান।

রপ্তানিকারক দেশ : যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, মরক্কো।

রাং

ব্যবহার : টিন প্লেট প্রস্তুত, গৃহের ছাদ নির্মাণে, ড্রাম, কৌটা তৈরিতে, সিগারেট, চকলেট মুড়িবার কাজ, কাসা, পিতল, থালা, বাসন তৈরিতে।

উৎপাদনকারী দেশ : মালয়েশিয়া, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন, থাইল্যান্ড়, চিন, ইন্দোনেশিা, বলিভিয়া।

আমদানিকারক দেশ : যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জাপান, জার্মানি, ইটালি, ফ্রান্স।

রপ্তানিকারক দেশ : মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল, বলিভিয়া, জায়ারে, দক্ষিণ আফ্রিকা ইত্যাদি।

দস্তা (Zinc)

ব্যবহার : গ্যালভানাইজিং, ফটো এনগ্রেভিং ও ব্লক প্রস্তুতে, মোটর গাড়ির রং, ব্যাটারীর আধার, ঔষধ শিল্পে, কাসা, পিতল তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

উৎপাদনকারী দেশ : রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, কানাডা, জার্মানি, অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, বেলজিয়াম পোলান্ড, স্পেন।

আমদানিকারক দেশ : যুক্তরাজ্য, বেলজিয়াম, ইতালি, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র।

রপ্তানিকারক দেশ : উৎপাদনকারী দেশগুলোই।

এলুমিনিয়াম (Aluminium)

ব্যবহার : বিমান, মটর গাড়ি, রেলগাড়ি, জাহাজ, লঞ্চ, স্টীমার, থালা, বাসন, খেলনা, বৈদ্যুতিক তার, অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুতিতে।

উৎপাদানকারী দেশ : যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, কানাডা, জাপান, জার্মানি, যুক্তরাজ্য, নরওয়ে, ফ্রান্স।

আমদানীকারী দেশ : শিল্পে উন্নত দেশসমূহ।

রপ্তানিকারক দেশ : উৎপাদনকারী দেশসমূহই।

বক্সাইট (Buxite)

ব্যবহার : ধাতব এ্যালমিনিয়াম নিস্কাশনে ও রাসায়নিক শিল্পে ব্যবহৃত হয়।

উৎপাদনকারী দেশ : গিনি, জ্যামাইকা, ব্রাজিল, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন, সুরিনাম, যুগোশ্লাভিয়া, গ্রিস, হ্যাংগেরি, ইত্যাদি।

আমদানিকারক দেশ : যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জাপান, কানাডা, নরওয়ে।

রপ্তানিকারক দেশ : উৎপাদনকারী দেশসমূহ।

১.৩.২ মূল্যবান ধাতব খনিজ

সোনা (Gold)

ব্যবহার : প্রধানত অলংকার ও মুদ্রা তৈরিতে। তাছাড়া আয়ুর্বেদীয় ও কবিরাজী ঔষধ তৈরিতে এবং নানা প্রকার কারু শিল্পে ব্যবহৃত হয়।

উৎপাদনকারী দেশ : দক্ষিণ, আফ্রিকা, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন, কানাডা, ঘানা, যুক্তরাষ্ট্র, ফিলিপাইন, অস্ট্রেলিয়া, জিম্বাবুয়ে।

রপ্তানিকারক দেশ : উৎপাদনকারী দেশগুলো।

রূপা (Silver)

ব্যবহার : মুদ্রা, অলংকার, তৈজসপত্র, ফুলদানি, কারুশিল্পে ব্যবহার হয়।

প্রধান উৎপাদনকারী দেশ : মেক্সিকো, পেরু., সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন, কানাডা।

অধাতব খনিজ সম্পদ (Non Metallic Mineral Resources)

এটি তিন প্রকার। যথা :

গৃহ নির্মাণে ব্যবহৃত খনিজ : গৃহ নির্মাণে ব্যবহৃত খনিজগুলোর মধ্যে চুন, চুনাপাথর, মার্বেল, স্লেট, গ্রানাইট, ব্যাসল্ট। এসবেসটার্স ইত্যাদি প্রধান, এছাড়া মাটি ও বালি গৃহ নির্মাণে ব্যবহৃত হয়।

রাসায়নিক শিল্পে ব্যবহৃত খনিজ

লবণ (Salt)

ব্যবহার : সাধারণত মানুষের খাদ্য হিসাবে লবণের ব্যবহার সর্বাধিক। তাছাড়া রাসায়নিক শিল্পে লবণের ব্যবহার দেড় হাজারেরও অধিক।

প্রধান উৎপাদনকারী দেশ : পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই কম বেশি লবণ উৎপাদিত হলেও যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, রাশিয়া, কানাডা, ভারত, পাকিস্তান প্রসিদ্ধ।

বাণিজ্য : লবনের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিশেষ লক্ষ্য করা যায় না। মহাদেশের মধ্যেই লবণের কিছু কিছু বাণিজ্য হয়ে থাকে।

গন্ধক (Sulpher)

ব্যবহার : প্রধানত সালফিউরিক এসিড তৈরিতে গন্ধক ব্যবহৃত হয়। কাগজ, বার্নিশ, দিয়াশলাই, ব্যাটারী, বিস্ফোরক প্রস্তুতিতে গন্ধক ব্যবহৃত হয়।

প্রধান উৎপাদনকারী দেশ : যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, ভারত, কানাডা, চিন, স্পেন, ইটালি, রাশিয়া ইত্যাদি।

পটাশ

ব্যবহার : সার, বার্নিশ, কাচ, সাবান, কাগজ, ফটোগ্রাফ তৈরিতে।

উৎপাদনকারী দেশ : ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, স্পেন, পোলান্ড, রাশিয়া।

আমদানিকারক দেশ : শিল্পোন্নত দেশসমূহ।

অন্যান্য অধাতব খনিজ সম্পদ

অভ্র (Mica)

ব্যবহার : বিদ্যুৎ, আনবিক শক্তি বিকিরণে, বেতার যন্ত্র গ্রাহক, মোটর গাড়ি, বিমানপোত নির্মাণ, টেলিভিশন, আলোর চিমনী, প্রচণ্ড তাপযুক্ত, চুল্লীর জানালা প্রভৃতি বহু কাজে লাগে।

প্রধান উৎপাদানকারী অঞ্চল : ভারত, ব্রাজিল, দক্ষিণ আফ্রিকা, ফ্রান্স, স্পেন, পোলান্ড, রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, আর্জেন্টিনা।

প্রধান আমদানিকারক দেশ : যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জাপান, জার্মানি।

রপ্তানিকারক দেশ : ভারত, ব্রাজিল, আফ্রিকা।

গ্রাফাইট (Graphite)

ব্যবহার : পেন্সিলের সীস, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

উৎপাদনকারী দেশ : রাশিয়া, জার্মানি, মেক্সিকো, ইতালি, শ্রিলংকা, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, চিলি কোরিয়া প্রভৃতি।

শক্তি উৎপাদক খনিজ

কয়লা (Coal)

ব্যবহার : রন্ধন কাজে, শিল্পের স্থানীয়করণ ও সম্প্রসারণে, জ্বালানী হিসাবে রেলগাড়ি, স্টীমার জাহাজ, বিমান, ইস্পাত শিল্পে এবং শীত প্রধান অঞ্চলে ঘরের উষ্ণতা বৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করা যায়।

প্রধান উৎপাদনকারী দেশ : যুক্তরাষ্ট্র, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন, চিন, জার্মানি, যুক্তরাজ্য, কানাডা, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া ইত্যাদি।

প্রধান আমদানিকারক দেশ : জাপান, ফ্রান্স, কানাডা, ইটালি, সুইডেন, পাকিস্তান, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা প্রভৃতি।

রপ্তানিকারক দেশ : উৎপাদনকারী দেশগুলোই।

খনিজ তৈল বা পেট্রোলিয়াম (Mineral oil or Petroleum)

ব্যবহার : পেট্রোগ্যাস হিসাবে, প্রেট্রোল ও ডিজেল তাপ বিদ্যুত উৎপাদন, কেরোসিন, পিচ্ছিল তৈল, পিচ বা এসফ্যাল্ট, প্যারাফিন, বিভিন্ন শিল্পে নেপথ্যে, প্লাষ্টিক, বার্নিশ, রং কালি এবং বিভিন্ন প্রকার সুগন্ধী দ্রব্য তৈরিতে ব্যবহার করা হয়।

উ্যপাদনকারী দেশ : মধ্য প্রাচ্যের দেশসমূহ, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র ল্যাটিন আমেরিকা, আফ্রিকা, ইউরোপ, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া, কানাডা ও ওসানিয়া।

আমদানিকারক দেশ : যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জাপান, ইতালি, এশিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকার উন্নত দেশগুলো।

রপ্তানিকারক দেশ : উৎপাদনকারী দেশগুলো।

প্রাকৃতিক গ্যাস (Natural Gas)

ব্যবহার : গৃহস্থালী রন্ধন কার্যে, শিল্প কারখানায়, তৈল শোধনের জ্বালানী, গবেষণাগারে ব্যবহৃত হয়।

উৎপাদনকারী দেশ আমেরিকা, সোভিয়েত, ইউনিয়ন, কানাডা হল্যান্ড, রুমানিয়া, যুক্তরাজ্য, নরওয়ে, মেক্সিকো প্রভৃতি।

বাণিজ্য : গ্যাসের ব্যবহার অভ্যন্তরীণ। ফলে বিশ্ববাণিজ্যে প্রভাব নেই বললেই চলে।

উপসংহার

আধুনিক সভ্যতার উন্নতিতে খনিজ সম্পদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। কেননা খনিজ সম্পদের আবিষ্কারের ফলেই মানব সভ্যতা দ্রুততর হয়েছে। সমৃদ্ধশালী দেশগুলোর অর্থনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে সকল দেশের প্রযুক্তিক, অর্থনৈতিক, কারিগরি উন্নতির মূলে রয়েছে ঐ সকল দেশের খনিজ সম্পদ। যুক্তরাষ্ট্র, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন, যুক্তরাজ্য, জার্মানি, চিন প্রভৃতি সমৃদ্ধশালী দেশ খনিজ সম্পদে যথেষ্ট সমৃদ্ধ। আবার অনেক দেশের খনিজ সম্পদের উদ্ভাবন ও উত্তোলন হয়নি। বর্তমানে পৃথিবীর উন্নতিকামী দেশগুলো তাদের দেশে সঞ্চিত খনিজ সম্পদ সম্বন্ধে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করবার জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করছেন।

৪.৩ পৃথিবীর শিল্প সম্পদ ও বিশ্ববাণিজ্য

৪.৩.১ সূচনা :

বর্তমান যুগ শিল্পের যুগ। আধুনিক কালে অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূলে রয়েছে শিল্পোন্নয়ন শিল্পোন্নয়নের ফলে দেশের প্রাকৃতিক উপকরণগুলোর গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। নতুন ধরনের দ্রব্য সামগ্রীর উদ্ভব ঘটে, জাতীয় চরিত্রের আমুল পরিবর্তন হয়, সময়ানুবর্তিতা, কর্মদক্ষতা, পার্থিব ভোগের প্রতি আসক্তি ও জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের আকাঙ্ক্ষা বাড়ে শিল্পোন্নয়নের ফলে এর ফলে বৈদেশিক বাণিজ্য বৃদ্ধি পায়, বিবিধ বৈজ্ঞানিক উন্নতি সম্ভব হয়েছে। মোট কথা, শিল্পোন্নয়নের ফলে মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে এক বিপ্লবের সৃষ্টি হয়েছে। যে কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

৪.৩.২ শিল্প কি ?

শিল্প সম্পর্কে আলোচনা করতে হলে প্রথমে জানতে হবে শিল্প বলতে কি বুঝায়।

যে কর্ম প্রচেষ্টা ও প্রক্রিয়ার দ্বারা মানুষ বিভিন্ন প্রকার দ্রব্য আহরণ করে এবং এর পরিবর্তন ঘটিয়ে মানুষের ব্যবহারের উপযোগী করে তাকে শিল্প বলে। মৎস্যাহরণ, বনজদ্রব্য আহরণ, কৃষিকার্য ও খনিজ উত্তোলনকে প্রাথমিক কাজ কর্ম বলা হয়। মানুষের শ্রম ও নৈপুণ্য প্রয়োগে প্রাকৃতিক দ্রব্যগুলো অধিকতর কার্যকরী ও মূল্যবান হয়ে উঠে। প্রাথমিক কাজকর্ম দ্বারা আহরিত দ্রব্যাদির এই পরিবর্তনকে শিল্প বলে। যেমন — আকরিক লৌহ যখন উত্তোলিত হয়

তখন তা মানুষের কোন কাজে লাগেনা যতক্ষণ পর্যন্ত না তা গলিয়ে লৌহ ও ইস্পাতে পরিণত করে যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত করা হয়।

তাই সংক্ষেপে বলা যায়, কাঁচামালকে তৈরি পণ্যে পরিণত করার নামই শিল্প।

৪.৩.৩ শিল্পের প্রকৃতি

বর্তমানের শিল্প একশ বছর পূর্বের শিল্প অপেক্ষা যথেষ্ট ভিন্ন প্রকৃতির। আজকের শিল্পের লক্ষ্য বিশ্ব বাজার বা ভূ-মণ্ডলীর স্বার্থরক্ষা করা। অধিকাংশ বড় বড় শিল্প আন্তর্জাতিক সংস্থা বা কোম্পানীতে সীমাবদ্ধ। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে অধিকাংশ শিল্পই উৎপাদিত সামগ্রির জন্য অধিক পরিমাণে কাঁচামাল ব্যবহার করত। অতীতের শিল্পগুলোকে মন্থর এবং ব্যয় বহুল পরিবহণ ব্যবহস্থার উপর নির্ভর করতে হতো। বর্তমানে অধিকাংশ পণ্যের জন্য ব্যবহারকারীকে খুব সামান্য পরিমাণ পরিবহণ খরচাদি বহন করতে হয়। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, পরিবহণ খরচাদির গুরুত্ব লোপ পেয়েছে। বহু শিল্প প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেখানে পরিবহণ ব্যয়ের সামান্য তারতম্যের উপর নির্ভর করছে ঐ সব শিল্পের সাফল্য এবং ব্যর্থতা। আধুনিক শিল্প বিজ্ঞানেরই সৃষ্টি। অতীতের শিল্পে বিজ্ঞানের অবদান ছিলনা এমন নয়। তবে এর ধারা ছিল অন্যরূপ। আজকের শিল্প ক্ষেত্রে অগ্রগতির অর্থই হচ্ছে বিজ্ঞানের অগ্রগতি।

শিল্পের শ্রেণীবিভাগ

শিল্পের কাঁচামালের প্রকৃতি ও উৎস, শিল্পের ধরন, শিল্পজাত দ্রব্যের প্রকৃতি ও এদের ব্যবহার প্রভৃতির উপর ভিত্তি করে শিল্পকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা —

(১) আদিম বা গৃহজ শিল্প : হাতের শক্তির দ্বারা নিজ গৃহে যে শিল্প গড়ে উঠে তাকে আদিম বা গৃহজ শিল্প বলে। এ জাতীয় শিল্প সাধারণত পরিবারের সদস্যদের ভোগের নিমিত্ত গড়ে উঠে এবং শিল্পজাত দ্রব্য কদাচিৎ স্থানীয় বাজারে প্রেরিত হয়ে থাকে। এ ধরনের শিল্পের মাধ্যমেই মানব সভ্যতার সূচনা হয়েছিল। আজও সবদেশে এর প্রচলন রয়েছে। 'কুকিং রেঞ্জ' সেলাই মেশিন প্রভৃতির প্রচলন হওয়া সত্ত্বেও রন্ধন, সেলাই প্রভৃতি কার্য সর্বত্রই হাতে করা হয়ে থাকে। গৃহজ শিল্পের প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল, তুর্কি লম্বল, ইরানি গালিচা কাশ্মিরি শাল ইত্যাদি। তবে অনুন্নত উপজাতিদের মধ্যে এ জাতীয় শিল্পের প্রচলন খুবই বেশি। কিরঘিজ এবং এস্কিমোরা মূলত তাদের গৃহনির্মিত দ্রব্যের উপর নির্ভরশীল। এদের পশমী বস্ত্রাদি এবং তাঁবু হাতে তৈরি করা হয়ে থাকে।

(২) গোষ্ঠীগত শিল্প : গোষ্ঠীগত শিল্প দূর দূরান্ত থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ, সামান্য পরিমাণ গতিদায়ক শক্তির ব্যবহার এবং কিছু সংখ্যক শ্রমিক নিয়োজিত করে স্থানীয় লোকজনের ব্যবহারের জন্য পণ্যাদি উৎপাদন করে থাকে। দৈনিক সংবাদপত্র, বরফ, বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রভৃতির জন্য কোন এক এলাকাভুক্ত জনসমাজ অন্য আর এক জনসমাজের উপর নির্ভরশীল

হতে চায় না। প্রত্যেকেই ছাপাখানা, বরফের কারখানা, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, রুটির কারখানা, মোটর ও রেলগাড়ি মেরামত কারখানা প্রভৃতি সহজলভ্য উপায়ে পেতে চায়।

(৩) সরল প্রকৃতির শিল্প : সরল প্রকৃতির শিল্পের উদ্দেশ্য হল কাঁচামালের আকৃতি ও ওজন হ্রাস করা অথবা এদের সংরক্ষণ বা পরিবহণযোগ্য করা। এরা সাধারণত উন্নত শিল্পের জন্য দ্রব্যাদি প্রস্তুত করে থাকে। আকরিক পরিপাটিকরণ, সরল প্রকৃতির শিল্পের একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

(৪) যৌগিক শিল্প : শিল্প বিপ্লবের ফলে যৌগিক শিল্পের আবির্ভাব ঘটেছে। এ শিল্পে প্রচুর পরিমাণে শক্তি, যথেষ্ট পরিমাণে নানা ধরনের কাঁচামাল, বহু সংখ্যক শ্রমিক এবং জটিল যন্ত্রপাতির ব্যবহার হয়ে থাকে। 'মূলধন পণ্য' বা 'Capital' এবং ব্যবহার্য পণ্য উৎপাদিত হয় এ শিল্পে। উৎপাদিত পণ্য কেবল স্থানীয় বাজারেই প্রেরিত হয়না, দেশ দেশান্তরেও যায়। এসব শিল্প জটিল পরিবহণ ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছে।

৪.৩.৫ পৃথিবীর প্রধান প্রধান শিল্পাঞ্চল

যেসব অঞ্চলে অনুকূল ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থাকে ভিত্তি করে বিভিন্ন প্রকার শিল্পের সমাবেশ দেখতে পাওয়া যায় তাকেই শিল্পাঞ্চল বলে। শিল্পোন্নত পৃথিবীর মানচিত্র লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, পৃথিবীর অল্প কয়েকটি অঞ্চল শিল্পে উন্নতি লাভ করেছে এবং পৃথিবীর অধিকাংশ স্থান বিশেষত দক্ষিণ গোলার্ধ শিল্পে অত্যন্ত অনুন্নত।

নিচে পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য শিল্পাঞ্চল সম্বন্ধে আলোচনা করা হল —

(১) উত্তর আমেরিকার শিল্পাঞ্চল : এই অঞ্চল কানাডার উত্তর পূর্বাংশ হতে শুরু করে যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব দিক দিয়ে এর দক্ষিণাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত। এটি ৩টি বিভাগে বিভক্ত — ক. কানাডার দক্ষিণ পূর্বাঞ্চল, খ. যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর পূর্বাঞ্চল এবং গ. যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চল

(ক) কানাডার দক্ষিণ পূর্বাঞ্চল : এই অঞ্চলেই কানাডার শতকরা ৮০ ভাগ শিল্পজাত দ্রব্য উৎপন্ন হয়ে থাকে। এর কুইবেকের কনট্রিক ও অন্টারিওর টরেন্টো শহরেই অধিকাংশ শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এই অঞ্চলের কাগজ, কাষ্ঠমণ্ড, গম ভাংগান, দুগ্ধজাত দ্রব্য, টিনে ভর্তি মৎস্য, চর্ম, কার্পাস, পশম, রসায়ন, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, মোটর গাড়ি, লৌহ ও ইস্পাত প্রভৃতি শিল্প বিশেষ প্রসিদ্ধ। কাগজ ও কাষ্ঠমণ্ডই এর প্রধান সম্পদ এবং এর রপ্তানি বাণিজ্যের একষষ্ঠাংশ অধিকার করে আছে।

(খ) যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চল : এটি যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় প্রধান শিল্পাঞ্চল এবং ভার্জিনিয়া হতে আলাবামা পর্যন্ত বিস্তৃত। বার্মিংহাম, কলম্বাস, আটলান্টা প্রভৃতি এর শিল্প প্রধান শহর এই অঞ্চলের শীর্ষস্থানীয় শিল্প শহর। এই অঞ্চল কার্পাস, লৌহ ইস্পাত, পশম, রেশম, কৃষিযন্ত্রপাতি, মোটর গাড়ি, রেলইঞ্জিন, কাগজ, কাষ্ঠমণ্ড, কৃত্রিম রেশম প্রভৃতি শিল্পে বিশেষ উন্নত।

(গ) **যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চল :** এটি যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় প্রধান শিল্পাঞ্চল এবং ভার্জিনিয়া হতে আলাবামা পর্যন্ত বিস্তৃত। বার্মিংহাম, কলম্বাস, আটলান্টা প্রভৃতি এর শিল্প প্রধান শহর। এই অঞ্চলের প্রধান শিল্পের মধ্যে কার্পাস বয়ন, লৌহ ও ইস্পাত, কৃত্রিম রেশম, কৃষি যন্ত্রপাতি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

(২) ইউরোপের শিল্পাঞ্চল : এ শিল্পাঞ্চলকে ক. উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও খ. রাশিয়ার শিল্পাঞ্চল এই দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়।

(ক) উত্তর পশ্চিমাঞ্চল : বৃটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ড, জার্মানি, নরওয়ে, সুইডেন, লুক্সেমবার্গ, সুইজারল্যান্ড ও চেকোশ্লোভাকিয়া এই অঞ্চলের অন্তর্গত। সর্বপ্রথম বাষ্পীয় ইঞ্জিন ও যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের ফলে পৃথিবীর এই অংশে শিল্প বিপ্লব আরম্ভ হয়। এই অঞ্চল কাপার্স, লৌহ ও ইস্পাত, রেশম, কাগজ, রেল ইঞ্জিন, জাহাজ নির্মাণ, কাষ্ঠমণ্ড, মৎস্য প্রভৃতি শিল্পে খ্যাতি অর্জন করেছে।

(খ) সাবেক সোভিয়েত রাশিয়ার শিল্পাঞ্চল : সোভিয়েত ইউনিয়নের শিল্পাঞ্চলগুলোর মধ্যে মস্কো, লেনিনগ্রাড, ইউক্রেন, ইউরাল, কুজনেৎস্ক, বৈকাল হ্রদ্ব্লাডিভস্টক প্রভৃতি অঞ্চল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এসব অঞ্চল লৌহ ও ইস্পাত, কার্পাস বয়ন এ্যালুমিনিয়াম, রসায়ন প্রভৃতি শিল্পে খুবই উন্নত।

(৩) এশিয়ার শিল্পাচঞ্চল : এশিয়ার দক্ষিণ পূর্বাঞ্চল শিল্পে খুবই উন্নত। এ অঞ্চলের শিল্পে উন্নত দেশগলোর মধ্যে জাপান, চিন, ভারত, কোরিয়া প্রভৃতি প্রধান। লৌহ ও ইস্পাত, কার্পাস বয়ন, রেশম, জাহাজ নির্মাণ, রসায়ন, কাগজ, দিয়াশলাই, প্রভৃতি এই অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য শিল্প।

(৪) দক্ষিণ গোলার্ধের শিল্পাঞ্চল : কয়লার অপ্রাচুর্য এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতার অভাবই এ অঞ্চলের শিল্পে অনগ্রসরতার প্রধান কারণ। কেননা, এখানকার তুলা, পশম প্রভৃতি কাঁচামাল ও বৃটেন, যুক্তরাষ্ট্রে প্রভৃতি দেশের শিলেপ্প নিয়োজিত হয়। বর্তমানে দক্ষিণ গোলার্ধের কয়েকটি দেশ শিল্পে সামান্য উন্নতি লাভ করেছে। এসব দেশের মধ্যে দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিল আর্জেন্টিনা ও মধ্যচিলি, দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

৪.৩.৬ পৃথিবীর প্রধান প্রধান শিল্প

লৌহ ও ইস্পাত শিল্প : সাধারণ অর্থে যে শিল্পে লৌহপিন্ড ও ইস্পাত প্রস্তুত হয় তাকে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প বলে। আধুনিক শিল্পায়ন লোহা নির্ভর। অন্যান্য শিল্পের ভিত্তি এর উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। সামান্য একটি আলপিন হতে আরম্ভ করে বৃহদাকার যন্ত্রপাতি পর্যন্ত সকল দ্রব্যই লৌহ শিল্প কেন্দ্রে প্রস্তুত করা হয়। মোট কথা, ঘরবাড়ি নির্মাণ, পরিবহণ যান নির্মাণ, শিল্প কারখানা স্থাপন অস্ত্রোপচারের যন্ত্রপাতি, যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণ, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি প্রভৃতিতে লৌহ প্রধান উপাদান।

উৎপাদন পদ্ধতি : লোহা আকরিক গলানোর পর শোধন করা হয়। এ কাজে জ্বালানী হিসেবে কোককয়লা এবং খাদ হিসেবে চুনাপাথর দরকার। প্রচুর পানি এবং বাতাসেরও প্রয়োজন। তাল লোহা বা 'পিগ আয়রণ' অত্যন্ত নরম বলে অনেক ক্ষেত্রেই সরাসরি ব্যবহার করা যায় না। এ করাণে এর সাথে ম্যাঙ্গানিজ, টাংস্টেন, ক্রোমিয়াম, নিকেল প্রভৃতি মিশিয়ে ইস্পাত প্রস্তুত করা হয়। ইস্পাত প্রস্তুতের জন্য মুচি প্রক্রিয়া, বেসিমার, ওপেন হার্থ, ব্লাস্ট ফার্নেস বা মারুত চুল্লি, বৈদ্যুতিক চুল্লি প্রভৃতি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়।

উৎপাদনকারী অঞ্চলসমূহ : পৃথিবীতে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন, জাপান, চিন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, ব্রাজিল, ফ্রান্স, ইতালি, পোলান্ড, ভারত, যুক্তরাজ্য, চেকোশ্লোভাকিয়া, কানাডা প্রভৃতি দেশসমূহ লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে প্রসিদ্ধ। এছাড়া স্পেন, রুমানিয়া, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশেও এই শিল্প গড়ে উঠেছে।

বিশ্ব বাণিজ্য : বর্তমান যুগে লৌহ ও ইস্পাত বিশ্ব বাণিজ্যে এক বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। উন্নত দেশগুলোতে লৌহ ও ইস্পাত অধিক উৎপন্ন হয় বটে কিন্তু এসব দেশের চাহিদাও খুব বেশি। চাহিদা পূরণ করে উদ্বিত্ত থাকলে তারা রপ্তানি করে। বেলজিয়াম, ওলুক্রোমবার্গ, জার্মানি ও ফ্রান্স প্রধান রপ্তানিকারক দেশ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন, জাপান ও কানাডা কিছু ইস্পাত রপ্তানি করে থাকে। আমদানিকারক দেশগুলোর মধ্যে যুক্তরাজ্য, নরওয়ে, সুইডেন, ইতালি, সুইজারল্যান্ড, ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, বার্মা, ইরাণ, ইরাক, শ্রিলংকা, মিশর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

বয়ন শিল্প

যা কিছু বোনা চলে তাই বয়ন শিল্প। যেমন সুতাকাটা, কাপড় বোনা, অন্যান্য দ্রব্যাদি বুনন, বয়ন শিল্পের অন্তর্ভূক্ত। এই বোনা কাজ হস্তচালিত তাঁতে বা আধুনিক যন্ত্রচালিত কারখানায় সম্পন্ন হতে পারে। বয়ন শিল্পের প্রধান উদ্দেশ্য মানুষের বস্ত্রাদি প্রস্তুত করা। পরিধেয় বস্ত্র, গালিচা, চট প্রভৃতি এ শিল্পজাত উৎপন্ন দ্রব্য এবং তুলা, পশম, রেশম রেয়ন, নাইলন, অতসী, পাট ও সিসল এ শিল্পে কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

নিচে বিভিন্ন প্রকার বয়নশিল্পের বর্ণনা দেয়া হল —

(ক) কার্পাস বয়ন শিল্প : যে বয়ন শিল্পে কাপার্স হতে সূতা এবং সুতা হতে বস্ত্র উৎপাদন করা হয় তাকে কার্পাস বা বস্ত্রবয়ন শিল্প বলে। পৃথিবীর প্রায় সব মানুষেরই বস্ত্রের প্রয়োজন হয়। তাই সর্ব প্রকার বয়ন শিল্পের মধ্যে কার্পাস বয়ন শিল্পই সর্ব প্রধান।

উৎপাদনকারী অঞ্চল : গ্রীষ্ম প্রধান অঞ্চলগুলো তুলা উৎপাদন করে এবং তুলাজাত দ্রব্যাদি ব্যবহার করে। কাঁচামালের উৎস এবং তৈরি পণ্যের বাজার একই অঞ্চলভুক্ত হওয়ার দরুন বৃটেন মহাদেশীয় ইউরোপ এবং উত্তর পূর্ব যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বকালীন কার্পাস বয়ন শিল্পের কেন্দ্রগুলো অবনতির পথে। এগুলো এখন চিন, ভারত, যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাংশ, রাশিয়ার দক্ষিণাংশ, জাপান, থাইল্যান্ড, হংকং, বাংলাদেশ প্রভৃতি উষ্ণতর অঞ্চলগুলোতে গড়ে উঠেছে।

বিশ্ব বাণিজ্য : কার্পাস বস্ত্র রপ্তানিতে পৃথিবীতে জাপান প্রথম এবং ভারত দ্বিতীয়। এছাড়া চিন, পাকিস্তান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ফ্রান্স, হল্যান্ড, জার্মানি, যুক্তরাজ্য প্রভৃতি দেশও কার্পাস বস্ত্র রপ্তানি করে। আমদানিকারক দেশগুলোর মধ্যে কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, হল্যান্ড, শ্রিলংকা, ইন্দোনেশিয়া মায়ানমার, মালয়েশিয়া, বাংলাদেশ ও মধ্য প্রাচ্যের দেশগুলো বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(খ) পশম বয়ন শিল্প : শীত প্রধান দেশের জন্য পশমজাত বস্ত্র সর্বোৎকৃষ্ট। গ্রীষ্ম প্রধান দেশেও শীতঋতুতে পশমি দ্রব্যের চাহিদা দেখা যায়। পশম শিল্প কাপার্স শিল্প অপেক্ষা প্রাচীন। পশমাত বস্ত্র ছাড়া পশম শিল্পের অন্যান্য উৎপাদিত দ্রব্য গুলোর মধ্যে শাল, কার্পেট, কম্বল, গালিচা ইত্যাদি প্রধান।

উৎপাদনকারী অঞ্চল : সর্বোৎকৃষ্ট শ্রেণীর পশমি বস্ত্র উৎপাদনে বৃটেন পৃথিবীর মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ছিল কিন্তু বর্তমানে তার এ গৌরব ম্লান হয়েছে। বর্তমানে পশম শিল্পে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন বিশ্ব প্রথম, জাপান দ্বিতীয়, পোল্যান্ড তৃতীয়, যগোশ্লাভিয়া চতুর্থ। এছাড়া ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য, রুমানিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, জার্মানি, চিন, ভারত হাঙ্গেরি, ইতালি, স্পেন ইত্যাদি দেশও এ শিল্পে খুবই উন্নত। তবে অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল, চিলি, আর্জেন্টিনা ও দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশেও এ শিল্প গড়ে উঠেছে।

বিশ্ব বাণিজ্য : জাপান ও যুক্তরাজ্য অধিক এবং যুক্তরাষ্ট্র কিছু কম পশমি বস্ত্র রপ্তানি করে। আমদানিকারক দেশগুলোর মধ্যে সুইডেন, নরওয়ে, ডেনমার্ক, ইতালি, কানাডা প্রভৃতি প্রধান।

(গ) রেশম বয়ন শিল্প : রেশম উচ্চ পর্যায়ের বিলাস সামগ্রী। এ শিল্প কার্পাস ও পশম বস্ত্রের মতো আর্দ্র জলবায়ু, প্রচুর শক্তির উৎস, দক্ষ অথচ সুলভ শ্রমিক, উত্তম পরিবহণ ব্যবস্থা প্রভৃতির উপর নির্ভরশীল। কাঁচামাল হিসেবে রেশম সুতা ব্যবহৃত হয়। রেশমের গুটিপোকার লালা হতে রেশম প্রস্তুত হয়। রেশম সুতা খুব হাল্কা বলে আমদানিকৃত সুতার উপর নির্ভর করেও এ শিল্প গড়ে উঠতে পারে। পূর্বে রেশমবস্ত্র অধিক মূল্যে বিক্রয় হতো। কিন্তু রেয়ন আবিষ্কারের পর এর মূল্য অনেক হ্রাস পেয়েছে।

উৎপাদনকারী অঞ্চল : রেশম সুতা উৎপাদনে জাপান, চিন, ভারত, ইতালি, ফ্রান্স, স্পেন, তুরস্ক, সিরিয়া প্রভৃতি দেশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু রেশম বস্ত্র উৎপাদনে যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, চিন, ভারত, বৃটেন, ফ্রান্স, ইতালি, জার্মানি, সুইজারল্যান্ড, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রভৃতি দেশ প্রসিদ্ধ।

বিশ্ব বাণিজ্য : জাপান ও চিন অধিক রেশম ও রেশমি বস্ত্র রপ্তানি করে। বস্ত্র আমদানিতে ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য, ইন্দোনেশিয়া, শ্রিলংকা, মায়ানমার প্রভৃতি দেশ উল্লেখযোগ্য।

(ঘ) রেয়ন শিল্প : খাঁটি রেশমের শতকরা আশি ভাগ এশিয়াতে তৈরি হয় এবং এর মূল্য খুব বেশি। সেজন্য স্প্রুস, পাইন প্রভৃতি সরলবর্গীয় গাছের কোমল কাঠের মন্ড, কার্পাসের মন্ড, প্রভৃতির সাহায্যে রাসায়নিক উপায়ে সেলুলোজ তৈরি করে তাদের সাহায্যে কৃত্রিম রেয়ন প্রস্তুত

করা হয়। রেশম দ্রব্য হতে এর দাম অনেক সস্তা। অনেক সময় পশম অথবা রেশমের সাথে এটি মিশিয়ে বস্ত্রাদি তৈরি করা হয়।

উৎপাদনকারী অঞ্চল : রেয়ন শিল্পে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রথম, ভারত দ্বিতীয়, জাপন তৃতীয়, এবং যুক্তরাষ্ট্র চতুর্থ। এছাড়া জার্মানি, যুক্তরাজ্য, হাঙ্গেরি প্রভৃতি দেশও এ শিল্পে উন্নত।

বিশ্ব বাণিজ্য : জাপান, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, বেলজিয়াম, জার্মানি প্রভৃতি প্রধান রেয়ন বস্ত্র রপ্তানিকারক দেশ। আমদানিকারক দেশগুলোর মধ্যে অস্ট্রেলিয়া, এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলো বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(ঙ) লিনেন বয়ন শিল্প : অতসি বা মঙ্গিনা গাছের তন্তু হতে উৎপাদিত দড়ি বা সুতা, জাল, বস্ত্র, চট, ত্রিপল প্রভৃতি লিনেন শিল্পের অন্তর্গত। কার্পাস বস্ত্র অপেক্ষা লিনেন প্রস্তুত করতে অধিকতর শ্রমিক প্রয়োজন হওয়ায় এবং লিনেন বয়ন অধিক ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার বলে কার্পাস বস্ত্র অপেক্ষা লিনেন বস্ত্রের মূল্য অধিক।

উৎপাদনকারী অঞ্চল : অতসি নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের শীত প্রধান উত্তর পশ্চিম ইউরোপ ও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নে জন্মে থাকে। এজন্য কাঁচামালের সহজপ্রাপ্তি ও শিল্প নৈপুণ্যের জন্য ইউরোপের দেশগুলো লিনেন শিল্পে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করছে।

বিশ্ববাণিজ্য : লিনেন বস্ত্র রপ্তানিকারক দেশগুলোর মধ্যে যুক্তরাজ্য, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন, জার্মানি, ফ্রান্স, বেলজিয়াম প্রভৃতি এবং আমদানিকারক দেশগুলোর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, জাপান, অস্ট্রেলিয়া, প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(চ) পাট শিল্প : তন্তুজাতীয় সামগ্রীর মধ্যে পাটজাতদ্রব্যই সর্বাপেক্ষা সস্তা ও এর চাহিদাও অধিক ব্যাপার। পাট হতে থলি, মোটা কাপড়, কম্বল, দড়ি, চট ইত্যাদি প্রস্তুত হয়। পাট পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কাঁচামাল হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। এর তৈরি বস্তায় করে মালপত্র চালান দেয়া বেশ সস্তা ও সুবিধাজনক। কিন্তু বর্তমানে পৃথিবীর অনেক দেশ পাটের পরিবর্তে কাগজ, তুলা ও শন দ্বারা তৈরি বস্তা ব্যবহৃত হচ্ছে। এছাড়া পলিথিনের ব্যাগ পাটের তৈরি থলের পরিবর্তে ব্যাপক হারে ব্যবহৃত হচ্ছে। এতে পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা ব্যাপকভাবে কমে যাচ্ছে।

উৎপাদনকারী অঞ্চল : পাট ও পাটজাত দ্রব্য উৎপাদনে একদা বাংলাদেশ ছিল পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশের এ গৌরব লোপ পেতে বসেছে। বর্তমানে পাট উৎপাদনকারী দেশগুলোর মধ্যে ভারত, বাংলাদেশ ও বৃটেন প্রধান। তাছাড়া ফ্রান্স, চিন, ফরমোজা, ব্রাজিল, জার্মানি, যুক্তরাষ্ট্র, ইতালি, স্পেন ও জাপানে পাট বয়ন শিল্প গড়ে উঠেছে। এসব দেশ বাংলাদেশ হতে কাঁচাপাট আমদানি করে থাকে।

বিশ্ব বাণিজ্য : ভারত ও বাংলাদেশ প্রধান পাটজাত দ্রব্য রপ্তানিকারক দেশ। আমদানিকারক দেশগুলোর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া,

ইন্দোনেশিয়া, আর্জেন্টিনা, জাপান, কিউবা, চিন, ব্রাজিল প্রধান। তবে পাটশিল্পে যুক্তরাজ্যের ডান্ডি অগ্রণী।।

(ছ) নাইলন : রসায়ন বিজ্ঞান ১৯০৮ সালে নাইলন নামে একটি নতুন তন্তু প্রদান করে। কয়লা, পানিতে বায়ুর সমন্বয়ে নাইলন প্রস্তুত হয়ে থাকে। টেকসই এবং স্থিতিস্থাপকতায় নাইলন সকল প্রকার তন্তুকে ছাড়িয়ে গেছে। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময়ে নাইলন মিত্রপক্ষের সৈন্যকে প্যারাসুট সরবরাহ করেছিল। গৃহসজ্জার উপকরণ, নৌকার পাল, দড়ি প্রভৃতি নতুন নতুন ক্ষেত্রে নাইলনের প্রবেশ হচ্ছে।

উৎপাদনকারী অঞ্চল : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, শীর্ষস্থানীয় নাইলন উৎপাদনকারী। এর পরেই বৃটেন, রাশিয়া, জাপান, জার্মানি, ফ্রান্স এবং ইতালির স্থান। জার্মানির 'পার্টন' এবং জাপানের 'অ্যামিলান' নাইলনের অনুরূপ কৃত্রিম তন্তু।

পূর্ত শিল্প

লৌহ ও ইস্পাত শিল্প এবং দক্ষ কারিগরি বিদ্যার উপর নির্ভর করে যে শিল্প গড়ে উঠে তাকেই পূর্ত শিল্প বলে। লৌহ আকরিক গলিয়ে যে ঢালাই লৌহ, পেটাই লৌহ, বিভিন্ন প্রকারের ইস্পাত প্রভৃতি পাওয়া যায় তাই পূর্তশিল্পের প্রধান কাঁচামাল। কৃষি ও শিল্পের যন্ত্রপাতি, পরিবহণ শিল্প, যেমন — রেল, মোটর, জাহাজ, বিমান প্রভৃতি শিল্প, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, নির্মাণ শিল্প ও এদের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নির্মাণের শিল্প পূর্তশিল্পের অন্তর্গত।

পূর্তশিল্পের প্রসার ও উন্নতি কতিপয় অনুকূল অবস্থা, যেমন — কাঁচামাল, শক্তিসম্পদ, মূলধন, শ্রমিক বাজার, সুলভ পরিবহণ ব্যবস্থা প্রভৃতির উপর নির্ভরশীল। এদের মধ্যে কাঁচামাল, কারিগরিবিদ্যা ও চাহিদা এ শিল্প স্থাপনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে থাকে। এসব বিষয়ের সুবিধার ফলে যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, জার্মানি, যুক্তরাজ্য, সুইজারল্যান্ড, ইতালি, অস্ট্রেলিয়া, বেলজিয়াম, জাপান, চিন, ভারত প্রভৃতি কয়েকটি দেশ এ শিল্পে অধিক উন্নতি লাভ করছে। আর এসব দেশের উৎপাদিত শিল্প দ্রব্য আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও এশিয়ার দেশগুলোতে রপ্তানি করা হয়।

অন্যান্য কতিপয় শিল্প

কাগজ : পৃথিবীর সর্বপ্রথম কাগজ তৈরি হয় চিন দেশে। সেখান হতে পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে কাগজ তৈরি শুরু হয়। নরম, কাঠ, বাঁশ, ঘাস, ছেড়া কাগজ, ছেড়া কাপড় ও পরিত্যক্ত শন, পাট প্রভৃতি হতে কাগজ প্রস্তুত হয়। তবে পৃথিবীর শতকরা নব্বই ভাগ কাগজ প্রস্তুত হয় কাষ্ঠমন্ড হতে।

উৎপাদনকারী অঞ্চল : কাগজ শিল্পে উন্নত দেশগুলো হচ্ছে কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, ফিনল্যান্ড, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন, সুইডেন, জার্মানি, চিন, ভারত প্রভৃতি দেশ। এছাড়া অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ওকোরিয়ায় প্রচুর কাগজ উৎপন্ন হয়।

বিশ্ব বাণিজ্য : পৃথিবীর উৎপাদিত কাগজের প্রায় ২৫% ভাগ বৈদেশিক বাণিজ্যের ব্যবহৃত হয়। নরওয়ে, সুইডেন, ফিনল্যান্ড, প্রচুর কাগজ রপ্তানি করে। আমদানিকারক দেশগুলোর মধ্যে যুক্তরাজ্য, ভারত, হল্যান্ড, ফ্রান্স ও ইউরোপের অন্যান্য দেশ উল্লেখযোগ্য।

সিমেন্ট শিল্প : সিমেন্ট কৃত্রিম পাথর। একে যে কোন আকার বিশিষ্ট করা যেতে পারে সিমেন্ট যেসব কাজে ব্যবহৃত হয় তার মধ্যে বাড়িঘর, খাল, সেতু এবং বাঁধ নির্মাণ প্রধান। 'শেল' অথবা কাদার সাথে চুনাপাথরের গুড়ো মিশিয়ে প্রচুর উত্তাপে পোড়ানো হয়। পড়ে সামান্য পরিমাণে জিপসাম মিশিয়ে সিমেন্ট প্রস্তুত করা হয়।

রাশিয়া শীর্ষস্থানীয় সিমেন্ট উৎপাদনকারিদেশ। রাশিয়ার পরেই চিন এবং তারপরই জাপান ও যুক্তরাষ্ট্রের স্থান। তাছাড়া ইতালি, জার্মানি, ভারত, ব্রাজিল, পোলান্ড, রোমানিয়া প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ সিমেন্ট উৎপাদনকারী অঞ্চল।

রাসায়নিক শিল্প : যে শিল্প কারখানায় রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রস্তুত হয় তাকে রাসায়নিক শিল্প বলে। প্রকৃত প্রস্তাবে বর্তমান যুগকে রাসায়নিক যুগ বলা হয়। রাসায়নিক শিল্পে ব্যবহৃত ছয়টি উপাদান হল — পানি, বায়ু, খনিজ লবণ, গন্ধক ও চুনাপাথর। বিভিন্ন ঔষধপত্র, প্রসাধন সমগ্রী, বিস্ফোরক দ্রব্য, রং, কৃষির সার, অসংখ্য শিল্পজাত সামগ্রী, পানীয় জল, পরিশোধন দ্রব্য ইত্যাদি রাসায়নিক শিল্প হতে পাওয়া যায়।

উৎপাদনকারী অঞ্চল : শিল্প বিপ্লবের সাথে সাথে ন্যাঙ্কাশায়ারকে কেন্দ্র করে বৃটেন — এ রাসায়নিক শিল্পের সূত্রপাত হয়। রাসায়নিক শিল্পে উন্নত দেশগুলোর মধ্যে রাশিয়া ইতালি, ফ্রান্স এবং জাপান উল্লেখযোগ্য।

বিশ্ব বাণিজ্য : বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য রপ্তানিকারক দেশগুলোর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন, জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি, জাপান প্রভৃতি প্রধান। ভারত, বার্মা, বাংলাদেশ, চিন, আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, শ্রিলংকা, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশ রাসায়নিক দ্রব্য আমদানি করে।

রবার : পূর্বে কেবল পেন্সিলের দাগ উঠাতে রবার ব্যবহৃত হতো। বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই রবার ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। নিরক্ষীয় অঞ্চলের হেভিয়া, ব্রাসিলিয়েনসিস (Havea Brasilinesis) নামক গাছের নিঃসৃত রসের দ্বারা স্বাভাবিক রবার প্রস্তুত হয়। বর্তমানে কৃত্রিম উপায়ে রবার প্রস্তুত করা হচ্ছে।

উৎপাদনকারী অঞ্চল : কৃত্রিম রবার উৎপাদনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বিশ্বে প্রথম সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন দ্বিতীয়, জাপান তৃতীয় এবং ফ্রান্স চতুর্থ। এছাড়া জার্মানি, ব্রাজিল, ইতালি, কানাডা, নেদারল্যান্ড, চিন, ভারত, শ্রিলংকা প্রভৃতি দেশেও কৃত্রিম রবার প্রস্তুত করা হয়।

এ্যালমিনিয়াম : এ্যালমিনিয়াম ভূ-ত্বকের সর্বাপেক্ষা সাধারণ ধাতু। এটি হাল্কা, নরম, প্রসার্য এবং উৎকৃষ্ট বিদ্যুৎ পরিবাহী। সাধারণত উড়োজাহাজ তৈরির কাজে এর ব্যবহার হয়ে থাকে। এ্যালুমিনিয়াম থেকে নানা প্রকার তৈজস পত্রাদিও প্রস্তুত করা হয়।

এ্যালুমিনিয়াম উৎপাদনের প্রথম পর্যায় হচ্ছে আকরিক পরিপাটিকরণ। গরম কস্টিক সোডায় এ্যালুমিনিয়াম আকরিক বক্সাইটকে গলিয়ে লোহা ও সিলিকা, টিটেনিয়াম প্রভৃতি মলিনতা দূরীভূত করে অ্যালুমিনিয়ামকে পৃথক করা হয়। এর ফলে যে সাদা দ্রব্যটি পাওয়া যায় তা অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড বা অ্যালুমিনা নামে পরিচিত।

ইটালি, সুইজ্যারল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি এবং নরওয়ের পার্বত্য অঞ্চলে গুরুত্বপূর্ণ অ্যালুমিনিয়াম কারখানাগুলো অবস্থিত।

প্লাস্টিক : প্লাস্টিক বর্তমানে লোহা, কাঠ এবং অন্যান্য তন্তুর প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। বাড়িঘর নির্মাণ আসবাবপত্রের সঙ্গে প্লাস্টিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। রেয়ন, নাইলন এবং অন্যান্য কৃত্রিম তন্তু স্বাভাবিক তন্তুগুলোর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছে। প্লাস্টিকজাত দ্রব্যাদি অসংখ্য রকমের এবং বিভিন্ন ধরনের। প্লাস্টিকের গুণাবলি বহুবিধ। একে অ্যালুমিনিয়ামের মতো হাল্কা, ইস্পাতের মতো শক্ত এবং রেশমের মতো সূক্ষ্ম করা যেতে পারে। কোনো কোনো প্লাস্টিক আগুন ও অ্যাসিডের প্রতিক্রিয়া প্রতিরোধ করতে সক্ষম। প্লাস্টিক কাচের মতো স্বচ্ছ অথবা ঘনমেঘের মতো অস্বচ্ছ হয়।

প্লাস্টিক উৎপাদনে কাঠ ও তুলাজাত সেলিউলোজ, দুধ, রক্ত ও সয়াবিনের মতো প্রোটিনজাতীয় দ্রব্য, কার্বলিক অ্যাসিডজাত ফেনল অথবা কৃত্রিম রজন, কয়লা, চুন প্রভৃতি কাঁচামাল ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

১৯৮৩ সালে যুক্তরাষ্ট্র ৩০৩৩৩, জাপান ১৩৩৩১, জার্মানি ১০৬৩৪, ইটালি ৪৪৭০ এবং রাশিয়া ৪৩৯২ হাজার মেট্রিক টন প্লাস্টিক এবং প্লাস্টিকজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন করে।

কাচ : থালাবাসন, রান্নাঘরের বাসনপত্র, বোতল, লেন্স, জানালার শার্সি প্রভৃতি প্রস্তুতে কাচ ব্যবহৃত হয়। কাচ স্বচ্ছ, ঈষৎ স্বচ্ছ অথবা অস্বচ্ছ হতে পারে। এটি ইস্পাতের মতো শক্ত অথবা সুতোর মতো সূক্ষ্মও হয়। স্বল্প লোহা এবং অ্যালুমিনাসম্পন্ন বিশুদ্ধ বালি প্রধান কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সোডা, অ্যাশ, চুন এবং ভাংগা কাচেরও প্রয়োজন হয়।

কাচ উৎপাদনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শীর্ষ স্থানীয় এবং পিট্সবার্গ কাচ শিল্পের বৃহৎ কেন্দ্র। যুক্তরাষ্ট্রের পরেই জার্মানির স্থান। উৎকৃষ্ট সুলভ কাচ উৎপাদনের জন্য বেলজিয়ামের পৃথিবী জোড়া খ্যাতি রয়েছে। চেকোশ্লোভিকিয়া টুকরো কাচ প্রস্তুত করে। সম্প্রতি জাপান কাচ শিল্পে প্রভূত উন্নতি সাধন করেছে।

৪.৩.৭ বাংলাদেশের প্রধান প্রধান শিল্প

বাংলাদেশ মূলত কৃষি প্রধান দেশ। এদেশের অর্থনীতি কৃষিভিত্তিক হলেও এদেশে শিল্পের গুরুত্বকে খাটো করে দেখা যায় না। কারণ স্থিতিশীল ও ভারসাম্য বিশিষ্ট উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য আমাদেরকে কৃষি ও শিল্প উভয়েরই যুগপৎ উন্নয়ন সাধন করতে হবে। এছাড়া কৃষি ও শিল্প পরস্পরের সাথে এমন গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত যে, এদের একটির উন্নতি অপরটির উপর নির্ভরশীল।

নিচে বাংলাদেশের বৃহদায়ন শিল্পগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হল :

পাট শিল্প : পাট বাংলাদেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী ফসল। একে 'সোনালী আঁশ' বলা হয়। বছরে আমাদের দেশে প্রায় ৬০ লক্ষ গাইট পাট উৎপন্ন হয়। কাঁচা পাট ও পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি করে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার প্রায় ৩৫% ভাগ অর্জিত হয়। বাংলাদেশে প্রায় ৫০ লক্ষ লোক পাট চাষ এবং প্রায় দুই লক্ষ শ্রমিক পাট ব্যবসায় নিয়োজিত রয়েছে। বাংলাদেশে বর্তমানে ৭৭টি পাটকল আছে। ১৯৮৭–৮৮ সনে বাংলাদেশে ৫.৫ লক্ষ টন পাটজাতদ্রব্য উৎপন্ন হয় এবং উক্ত বছরে পাট ও পাটজাতদ্রব্য রপ্তানি করে বাংলাদেশ ১১৮৪ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। ১৯৮৮–৮৯ সনে পাট ও পাটজাতদ্রব্য রপ্তানি করে ১২৫০ কোটি টাকা অর্জিত হয়েছে।

ময়মনসিংহ জেলায় দেশের অধিকাংশ পাট উৎপন্ন হয়। তাছাড়া ঢাকা কুমিল্লা অঞ্চলেও পাট জন্মে। পাট ব্যবসার প্রধান কেন্দ্র নারায়নগঞ্জ।

বস্ত্র শিল্প : বাংলাদেশ বস্ত্রশিল্পে অনুন্নত। তুলা উৎপাদনের পরিমাণ আমাদের খুবই কম। তুলার জন্য আমরা সম্পূর্ণরূপে বিদেশের উপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশে বর্তমানে ৮১টি কাপড় ও সুতাকল আছে। এসব কলে বছরে প্রায় ৬ কোটি কি.গ্রা. সুতা উন্নপন্ন হয় এবং ৬ কোটি মিটার কাপড় বয়ন করা হয়। এছাড়া আমাদের তাঁত শিল্পে বছরে আরও ৪০ কোটি মিটার কাপড় উৎপন্ন হয়। তবে এটি আমাদের মোট চাহিদার এক নগন্য অংশমাত্র। বছরে মাথাপিছু ১০ মিটার কাপড় ব্যবহার করা হলেও আমাদের ১০০ কোটি মিটার কাপড়ের প্রয়োজন। সুতরাং কাপড়ের এই ঘাটতি পুরণ করার জন্য প্রতি বছর আমাদেরকে বিপুল পরিমাণ কাপড় বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়।

কাগজ শিল্প : চন্দ্রঘোনায় অবস্থিত 'কর্ণফুলী পেপার মিল' বাংলাদেশের বৃহত্তম কাগজের কল। বর্তমানে বাংলাদেশে কাগজ ও বোর্ড সংস্থার অধীনে চালু শিল্পগুলোর মধ্যে খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিল, কর্ণফুলী পেপার মিল, নর্থবেঙ্গল পেপার মিল, বাংলাদেশ পেপার মিল, একটি হার্ডবোর্ড মিল ও একটি পার্টিকেল বোর্ড মিল রয়েছে। বর্তমানে দেশের চাহিদা মিটানোর পরও কিছু কাগজ ও নিউজপ্রিন্ট বিদেশে রপ্তানি করা হয়। ১৯৮৮–৮৯ সনে কাগজ ও নিউজপ্রিন্ট রপ্তানি করে ২.২ কোটি টাকা অর্জিত হয়েছে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দেশে কাগজ ও নিউজপ্রিন্ট উৎপাদনের লক্ষ্য মাত্রা এক লক্ষ টন ধার্য করা হয়েছিল।

কর্ণফুলী পেপার মিল এর কাঁচামালের যোগানের উৎস বাঁশ এবং সুন্দর বনের গেওয়া কাঠ খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

চিনি শিল্প : বাংলাদেশে বর্তমানে ১৬টি চিনিকল রয়েছে। বাংলাদেশের চিনিকলগুলোর বার্ষিক উৎপান্ন ক্ষমতা প্রায় ১ লক্ষ ৯০ হাজার টন। পক্ষান্তরে দেশে বার্ষিক চিনির চাহিদা প্রায় ২০ লক্ষ ২০ হাজার টন। সুতরাং আমাদের দেশে চাহিদার তুলনায় চিনিকলগুলোর উৎপাদন ক্ষমতা কম। তদুপরি ইক্ষুর অভাবে আমাদের চিনিকলগুলোতে উৎপাদন ক্ষমতার চেয়ে অনেক কম পরিমাণ চিনি উৎপাদিত হয়। ফলে দেশে বর্তমানে প্রচুর চিনির ঘাটতি রয়েছে। এই সমস্যা দূর করতে হলে একদিকে নতুন চিনিকল স্থাপন এবং অন্যদিকে ইক্ষু চাষের পরিমাণ ও ইক্ষুর ফলন বৃদ্ধি করতে হবে। উন্নত পদ্ধতিতে চাষাবাদের ব্যবস্থা করে আমাদের দেশে ইক্ষুর ফলন বহুলাংশে বৃদ্ধি করা সম্ভব।

সার কারখানা : জামালপুর জেলার তারাকান্দি নামক স্থানে নির্মিত সার কারখানা দেশের বৃহত্তম সার কারখানা। ২৬ ডিসেম্বর ১৯৯১ এই কারখানায় ইউরিয়া সার উৎপাদন শুরু হয়। সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জের সার কারখানায় প্রতি বছর ১ লক্ষ ৬ হাজার মেট্রিক টন ইউরিয়া এবং ১২.৫ হাজার মেট্রিক টন অ্যামোনিয়া উৎপন্ন হয়। নরসিংদিতে ঘোড়াশাল সার কারখানা, চট্টগ্রামে টি এসপি সার কারখানা, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জের জিয়া সার কারখানা, নরসিংদীর পলাশ সার কারখানা এবং চট্টগ্রামের ইউরিয়া সার কারখানা। এসব সার কারখানায় কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয় প্রাকৃতিক গ্যাস।

সিমেন্ট শিল্প : সিলেট জেলার ছাতকে একটি সিমেন্ট কারখানা রয়েছে এর উৎপাদন ক্ষমতা বছরে প্রায় এক লক্ষ মেট্রিক টন। বর্তমানে কারখানাটি সম্প্রসারণ করে এর উৎপাদন ক্ষমতা দুই লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীত করা হয়েছে। বাংলাদেশের সিমেন্টের মোট বার্ষিক চাহিদা প্রায় ১২ লক্ষ মেট্রিকটন। চার কোটি টাকা ব্যয়ে চট্টগ্রামে আরেকটি সিমেন্ট কারখানা স্থাপিত হয়েছে। এ কারখানা বছরে প্রায় ৩ লক্ষ মেট্রিকটন উৎপাদন করতে সক্ষম। এছাড়া জয়পুর হাটে একটি সিমেন্ট কারখানা স্থাপনের কাজ হচ্ছে। এর বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা হবে ৭ লক্ষ মেট্রিক টন।

লৌহ ও ইস্পাত শিল্প : চট্টগ্রামে একটি লৌহ ও ইস্পাত কারখানা আছে। জাপানের সহযোগিতায় নির্মিত এই কারখানাটির বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ১.৫ লক্ষ মেট্রিক টন।

জাহাজ নির্মাণ শিল্প : বাংলাদেশের চট্টগ্রামে ও খুলনায় জাহাজ নির্মাণের কারখানা রয়েছে। খুলনার কারখানায় লঞ্চ, বার্জ, টাগ প্রভৃতি জলযান নির্মাণ করা হয়। এছাড়া এখানে চিনিকলের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিও প্রস্তুত করা হয়। চট্টগ্রাম ড্রাইডকে সমুদ্রগামী জাহাজ মেরামত ও প্রস্তুত এবং নারায়নগঞ্জ ডকইয়ার্ডে জাহাজ, লঞ্চ প্রভৃতি মেরামত করা হয়।

কর্ণফুলী রেয়ন প্রকল্প : চট্টগ্রাম জেলার চন্দ্রঘোনার কাছে কর্ণফুলী নদীর তীরে বাংলাদেশের একমাত্র রেয়ন মিলটি অবস্থিত। এ কারখানায় মুলী বাঁশের মণ্ড থেকে রেয়ন

উৎপন্ন হয়। রেয়ন সুতা গেঞ্জি, মোজা ও তাঁতে বোনা বিভিন্ন ধরনের বস্ত্র তৈরিতে ব্যবহার করা যায়।

ঔষধ ও রাসায়নিক শিল্প : শিল্পোন্নয়ন কর্পোরেশনের উদ্যোগে চট্টগ্রামে একটি ডি, ডি, টি ফ্যাক্টরি ও টংগীতে একটি ঔষধ তৈরির কারখানা স্থাপিত হয়েছে। এছাড়া ঢাকায় একটি স্ট্রেপটোমাইসিন কারখানা ও ভিটামিন উৎপাদনের জন্য একটি কারখানার নির্মাণ কাজ অনেকদূর অগ্রসর হয়েছে। বাংলাদেশের রাসায়নিক শিল্প সংস্থার উদ্যোগে সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জের একটি পলিথিন ব্যাগ নির্মাণের কারখানা স্থাপন করা হয়েছে।

মেশিন টুলস ফ্যাক্টরি : টংগীতে বাংলাদেশের যন্ত্রপাতি নির্মাণের একমাত্র কারখানাটির কাজ শুরু হয়েছে। এই কারখানায় প্রতি বছর প্রায় ১২ হাজার টন যন্ত্রপাতি উৎপন্ন হয়। এছাড়া কারখানা থেকে সেচের জন্য পাম্প মেশিনও উৎপন্ন হচ্ছে। বর্তমানে চট্টগ্রামে বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম তৈরির জন্য একটি কারখানা নির্মিত হয়েছে। এছাড়া জয়দেবপুরে একটি অস্ত্র কারখানা ও একটি ডিজেল কারখানা আছে।

তৈল শোধনাগার : তেল পরিশোধনের জন্য ১৫ লক্ষ মেট্রিক টন তেল পরিশোধনের ক্ষমতাসম্পন্ন একটি সোধনাগার স্থাপিত হয়েছে।

এছাড়া বাংলাদেশে দেয়াশলাই, চামড়া, সিগারেট, সাবান, নাইলন্ প্রভৃতি উৎপাদনের কারখানাও রয়েছে।

৪.৪ পৃথিবীর আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রধান আমদানি ও রপ্তানি দ্রব্য

৪.৪.১ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

বর্তমান যুগ পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও সহযোগিতার যুগ। বর্তমান কালে পৃথিবীর কোন দেশই স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়। ফলে কোন দেশই অপরাপর দেশসমূহ হতে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে না। একটি দেশে কখনই তার জনগণের সব ধরনের চাহিদা মেটানোর উপকরণ এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য প্রয়োজনীয় সব ধরনের সামগ্রী পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকতে পারে না। সে কারণে দেশটি তার যে সব উপকরণের অভাব বা স্বল্পতা আছে তা অন্য দেশ থেকে সংগ্রহ করে এবং নিজের যে সব জিনিস উদ্বৃত্ত আছে তা অন্যদেশের কাছে বিক্রি করে। এক দেশের সাথে অপর দেশের এই যে লেনদেন তাকেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলে।

মূলত উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রী ভোগকারীদের কাছে পৌঁছে দেয়ার যে কাজটি সেটিই বাণিজ্য। একটা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যখন কাজটি পরিচালিত হয় তখন আমরা তাকে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বলি। পক্ষান্তরে বিভিন্ন সার্বভৌম দেশের মধ্যে যে বাণিজ্য পরিচালিত হয় তাকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলে।

৪.৪.২ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সুবিধা

বর্তমান বিশ্বে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর সুবিধাসমূহ নিম্নে বর্ণনা করা হলো —

(১) ভোগকারীদের সুবিধা : একটি দেশে যে সমস্ত দ্রব্য উৎপাদন করা সম্ভব হয় না, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে সে দেশটি বিদেশ থেকে সেই সব দ্রব্য আমদানি করে দেশের ভোগকারীদের চাহিদা মেটাতে পারে।

(২) উৎপাদন বৃদ্ধি : আন্তর্জাতিক বাণিজ্য থাকলে প্রত্যেক দেশ নিজের সুবিধামতো দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদনে নিয়োজিত থাকে। এতে প্রতিটি দেশের উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর মোট উৎপাদনও বৃদ্ধি পায়।

(৩) অর্থনৈতিক উন্নয়ন : আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সহায়ক। এর মাধ্যমে উন্নত দেশ থেকে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি আমদানি করে অনুন্নত দেশসমূহ তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করতে পারে।

(৪) প্রাকৃতিক সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার : আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে বিভিন্ন দ্রব্যের বাজার বিস্তৃত হয় ফলে প্রত্যেক দেশের পক্ষে তাদের প্রাকৃতিক সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার করা সম্ভব হয়।

(৫) উৎপাদিত পণ্যের ব্যবহার : আন্তর্জাতিক বাণিজ্য থাকলে উৎপাদন অত্যন্ত বেশি বা কম হওয়ার কুফল ভোগ করতে হয় না। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য থাকার ফলে উদ্বৃত্ত দ্রব্য রপ্তানি করা যায় এবং কোন দ্রব্যের ঘাটতি থাকলে আমদানি করে তা পূরণ করা যায়।

(৬) উৎপাদন ব্যয় হ্রাস : আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে আন্তর্জাতিক শ্রম বিভাগের সুবিধাগুলো পাওয়া যায়। এতে বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদনে বিশেষত্ব অর্জন করে। এরূপ বিশেষায়নের ফলে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পায়।

(৭) আন্তর্জাতিক সম্প্রীতি বৃদ্ধি : আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে বিভিন্ন দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক আদান প্রদান ঘটে এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক আদান প্রদানের পথ সুগম হয়। যার ভিতর দিয়ে বিশ্ব শান্তি ও বিশ্ব মৈত্রীর সোপান রচিত হয়।

৪.৪.৩ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অসুবিধা

নানাবিধ সুবিধা থাকা সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কিছু কিছু অসুবিধা রয়েছে। নিচে এগুলো বর্ণিত হলো —

(১) বিদেশের উপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি : আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে প্রত্যেক দেশ কতকগুলো দ্রব্যের জন্য বিদেশের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। যুদ্ধ বা এ ধরনের কোন জরুরি অবস্থায় এই নির্ভরশীলতা দেশের জন্য বিপদ ডেকে আনে।

(২) সুষম উন্নয়নের পথে বাধা : আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে অনেক সময় দেশের সুষম উন্নয়নের পথে বাধা সৃষ্টি করে।

(৩) বিলাস দ্রব্য আমদানি : আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে অনেক সময় অনাবশ্যক ও ক্ষতিকর বিলাস দ্রব্য আমদানি হয়। যা জাতীয় সম্পদের অপচয় ঘটায়।

(৪) আন্তর্জাতিক বিরোধ : আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে অনেক সময় রপ্তানি বাজার দখল নিয়ে বিভিন্ন দেশের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বীতা সৃষ্টি হয় যা আন্তর্জাতিক বিরোধ এমনকি বিশ্বযুদ্ধের জন্ম দেয়।

(৫) অসাধু বিদেশী প্রতিযোগিতা : অনেক সময় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সুযোগ নিয়ে এক দেশ অন্য দেশের শিল্পকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্য কমদামে প্রয়োজন বোধে লোকসান দিয়ে দ্রব্য সরবরাহ করে। এরূপ প্রতিযোগিতার চাপে গরীব দেশগুলো ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

(৬) অর্থনৈতিক শোষণ : সকল দেশ অর্থনৈতিক সম্পদ, সামার্থ ও দক্ষতায় সমান নয় বলে অপেক্ষাকৃত দক্ষ ও সমৃদ্ধ দেশগুলোর সাথে অসম প্রতিযোগিতার ফলে দুর্বল ও পশ্চাদপদ দেশগুলো ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এতে দুর্বল দেশগুলো অর্থনৈতিক শোষণের শিকার হয়।

অবাধ বাণিজ্য : আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উপর কোনরূপ সরকারি নিয়ন্ত্রণ বিধিনিষেধ আরোপ করা না হলে তাকে অবাধ বাণিজ্য বলে। অর্থাৎ এক দেশের সাথে অপর দেশের বাণিজ্যে যখন আমদানি ও রপ্তানির উপর কোন শুল্ক ধার্য করা হয় না এবং আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণ যখন সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয় না, সেরূপ বাণিজ্যকে অবাধ বাণিজ্য বলে। এ্যাডাম স্মিথ, জন স্টুয়ার্ট মিল প্রমুখ ক্লাসিকেল অর্থনিতিবিদগণ অবাধ বাণিজ্যের উৎসাহী সমর্থক ছিলেন।

সংরক্ষণ : সরকারের সরাসরি হস্তক্ষেপের দ্বারা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে নিয়ন্ত্রণের নীতিকে সংরক্ষণ বলে। প্রতিটি দেশের সরকার বিদেশী প্রতিযোগিতার হাত হতে দেশীয় শিল্পকে রক্ষা করার উদ্দেশ্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উপর বিভিন্ন বিধিনিষেধ আরোপ করে। সাধারণত আমদানি দ্রব্যের উপর শুল্ক ধার্য করে কিংবা আমদানি দ্রব্যের পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দিয়ে বা দেশীয় উৎপাদন কারীদের আর্থিক সাহায্য প্রদান করে সংরক্ষণ নীতি কার্যকর করা হয়। শিল্প রক্ষার জন্যই একটি দেশ সংরক্ষণ নীতি গ্রহণ করে।

৪.৪.৪ প্রধান আমদানি ও রপ্তানি দ্রব্য

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রধানত দুই ধরনের দ্রব্যের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়।

(ক) কৃষি পণ্য এবং

(খ) শিল্পজাত দ্রব্য।

ক. কৃষিপণ্য : আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে যে কৃষি পণ্যসমূহের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায় তা হলো —

ধান : পৃথিবীর যে সমস্ত দেশ ধান উৎপাদন করে তাদের প্রধান খাদ্য ধান। তাই পৃথিবীর মোট উৎপাদিত ধানের ৫% ভাগ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে আসে।

প্রধান রপ্তানি কারক দেশ — চিন, থাইল্যান্ড, মায়ানমার, কাম্পুচিয়া, ভিয়েতনাম, ফার্মোজা, ব্রাজিল, স্পেন, ইটালি ইত্যাদি।

প্রধান আমদানি কারক দেশসমূহ — ইন্দোনেশিয়া, শ্রিলংকা, বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া, কোরিয়া, হংকং, সিঙ্গাপুর, সৌদি আরব।

গম : প্রধান রপ্তানিকারক দেশ — উপর পশ্চিম ইউরোপের বৃটেন, ইটালি, পোলান্ড, বেলজিয়াম।

আমদানিকারক দেশ — বাংলাদেশ, শ্রিলংকা, ইন্দোনেশিয়া, সিঙ্গাপুর।

চা : প্রধান রপ্তানিকারক দেশ — ভারত রপ্তানি করে ২১.৭% ভাগ, শ্রিলংকা করে ২০.৮% ভাগ। অন্যান্য দের মধ্যে চিন, বাংলাদেশ প্রধান।

প্রধান আমদানিকারক দেশ — বৃটেন আমদানি করে ২২.২% ভাগ যুক্তরাষ্ট্র ৮.৯% ভাগ, অস্ট্রেলিয়া ২.৬% ভাগ, কানাডা ২.৪% ভাগ। এছাড়া সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মিশরও প্রধান আমদানিকারক দেশ।

কফি : প্রধান রপ্তানিকারক দেশ ব্রাজিল, কলাম্বিয়া ও আফ্রিকান রাষ্ট্রসমূহ। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে মোট রপ্তানিকৃত কফির ১৫% ভাগ ব্রাজিল, ১৭% ভাগ কলাম্বিয়া, ২৬% ভাগ আফ্রিকান দেশসমূহ রপ্তানি করে।

প্রধান আমদানিকারক দেশ — যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, পশ্চিম জার্মানি, ফ্রান্স মোট আমদানি কৃত কফির ৩০.৩% ভাগ যুক্তরাষ্ট্র, ২৪.৮% ভাগ বৃটেন, পশ্চিম জার্মানি ১২.১% ভাগ এবং ফ্রান্স ৮.২% ভাগ আমদানি করে।

ইক্ষু : ইক্ষুজাত চিনি রপ্তানিকারক দেশগুলোর মধ্যে সর্ব প্রধান কিউবা, ৩৩.৯% ভাগ এর পর অস্ট্রেলিয়া ১১.৮৫% ভাগ, ব্রাজিল, ফিলিফাইন ইত্যাদি দেশ উল্লেখযোগ্য।

চিনি আমদানিকারক প্রধান প্রধান দেশ যুক্তরাষ্ট্র ২৩.৬% ভাগ, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ২১%, জাপান ১৪% ভাগ, বৃটেন ৬.৪% ভাগ।

পাট : প্রধান প্রধান পাট রপ্তানিকারক দেশ–বাংলাদেশ, থাইল্যান্ড, নেপাল।

প্রধান প্রধান আমদানিকারক দেশ হচ্ছে, পাকিস্তান, বৃটেন, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র জার্মানি, কানাডা, জাপান ও ইটালি।

রবার : প্রধান রপ্তানিকারক দেশ মালয়েশিয়া ৪৮.৪% ভাগ ইন্দোনেশিয়া ২৫.৪% ভাগ, থাইল্যান্ড ১৫.২% ভাগ, শ্রিলংকা ৩.৭৫% ভাগ।

প্রধান আমদানিকারক দেশসমূহ হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র ২২% ভাগ, জাপান ১০.৯% ভাগ, চিন ৮.৮৫% ভাগ, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ও কানাডা প্রভৃতি দেশসমূহ।

শিল্পজাত দ্রব্য

বস্ত্র : প্রধান প্রধান রপ্তানিকারক দেশ হচ্ছে — জাপান, ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ইত্যাদি।

প্রধান আমদানিকারক দেশসমূহের মধ্যে অস্ট্রেলিয়া, ইন্দোনেশিয়া, কাম্পুচিয়া, থাইল্যান্ড, প্যাকিস্তান।

ইস্পাত ও ইস্পাতজাতদ্রব্য : প্রধান রপ্তানিকারক দেশ জাপান, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ইত্যাদি

আমদানিকারক দেশসমূহের মধ্যে প্রধান উত্তর আমেরিকার দেশসমূহ ৫১% ভাগ ও চিন

মোটরগাড়ি : প্রধান রপ্তানিকারক দেশ — যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, ফ্রান্স, বৃটেন।

আমদানিকারক দেশ — ল্যাটিন আমেরিকার দেশসমূহ, ফিলিপাইন ও থাইল্যান্ড।

বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি : প্রধান রপ্তানিকারক দেশ, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, হংকং চিন, কোরিয়া ইত্যাদি।

প্রধান আমদানিকারক দেশ — মেক্সিকো, ব্রাজিল, কলাম্বিয়া, ফিলিপাইন, বাংলাদেশ, শ্রিলংকা ইত্যাদি।

এটি মোটামুটি স্পষ্ট যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে কৃষি পণ্যের প্রধান রপ্তানিকারক দেশ হচ্ছে, প্রধানত উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশসমূহ এবং শিল্পজাত দ্রব্যের রপ্তানিতে উন্নত বিশ্বের দেশসমূহ প্রাধান্য বিস্তার করে আছে।

৪.৫ মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলির উপর ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব

৪.৫.১ ভূমিকা

মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলির উপর ভৌগোলিক পরিবেশের যে প্রভাব রয়েছে তার অবতারণা করাই হল এ রচনা। এ রচনার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করতে হলে প্রথমেই আমাদের জানত হবে যে, মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলি বলতে কি বোঝায়, মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলির পরিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়গুলো কি কি এবং মানুষের প্রধান প্রধান অর্থনৈতিক কার্যাবলিই বা কি। তারপর জানতে হবে ভৌগোলিক পরিবেশ কাকে বলে এবং ভৌগোলিক পরিবেশের শ্রেণীবিভাগ। পরিশেষে ভৌগোলিক পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান কিভাবে

মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলির উপর প্রভাব বিস্তার করে তার বিস্তারিত আলোচনা। মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলি এবং ভৌগোলিক পরিবেশ সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা লাভ না করা পর্যন্ত মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলির উপর ভৌগোলিক পরিবেশ কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে তা বোঝা সম্ভবপর হয়ে উঠবে না। কেননা, ভৌগোলিক পরিবেশের ব্যাপকতা যেমন আছে যেমনি মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলির ক্ষেত্রও ব্যাপক। ভূগোলের উৎপত্তি যেমন পৃথিবীর জন্মলগ্ন থেকে, তেমনি মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলিও শুরু হয়েছে সেই আদিম যুগ থেকে।

৪.৫.২ মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলি বলতে কি বোঝায়

জীবিকা নির্বাহের জন্য মানুষ প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে যে সমস্ত কার্যাবলি সম্পাদন করে এর সমষ্টিকে মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলি বলে। অন্য কথায় বলতে গেলে মানুষের যে সমস্ত কার্যাবলি অর্থ উপার্জনের সাথে সম্পর্কিত সেগুলোকে মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলি বলা হয়। যেমন কৃষিকাজ, মৎস্য চাষ, পশু পালন, পশু শিকার, পণ্য দ্রব্য উৎপাদন ও বন্টন, পরিবহণ, ব্যাংকিং বীমা, শিক্ষকতা, ডাক্তারী আইন ব্যবসায়, রিক্সাচালনা, দর্জির কাজ ইত্যাদি। এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে অর্থ বা অর্থের মূল্যে পরিমাপ করা যায় না মানুষের এরূপ কার্যাবলি অর্থনৈতিক কার্যাবলি হিসেবে গণ্য হবে না। যেমন মায়ের স্নেহ, স্ত্রীর ভালবাসা ইত্যাদি। তবে অর্থের বিনিময়ে নার্সের সেবাকে অর্থনৈতিক কার্য বলা যাবে।

অতএব, অর্থ অথবা আর্থিক মূল্যে নিরূপণযোগ্য মানুষের যাবতীয় কার্যাবলিই অর্থনৈতিক কার্যাবলি হিসেবে গণ্য। পরিবেশের তারতম্যের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলি বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। যেমন : বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ কৃষিজীবী, তুন্দ্রা অঞ্চলের মানুষ শিকারী, নরওয়ের মানুষ মৎস্যজীবী।

৪.৫.৩ মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলি পরিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়

মানুষের পারিপার্শ্বিক অবস্থা নিয়ত পরিবর্তনশীল। আর এ পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলিও পরিবর্তিত হয়েছে। এ পরিবর্তনের পর্যায়কে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায় —

(ক) মানুষের প্রথম পর্যায়ের কার্যাবলি : আদিম মানুষ ছিল সম্পূর্ণ প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। তারা তখন প্রকৃতি হতে প্রাপ্ত ফলমূলাদি সংগ্রহ, পশুপাখি শিকার, মৎস্য শিকার ইত্যাদি কার্য করে জীবিকা নির্বাহ করত। কালক্রমে তারা কৃষিকাজ ও পশুপালন শিখল।

(খ) মানুষের দ্বিতীয় পর্যায়ের কার্যাবলি : দ্বিতীয় পর্যায়ে মানুষ প্রকৃতির উপর নির্ভর না করে নিজেদের বুদ্ধি বলে প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ করে নিজেদের দরকারমতো পণ্যের অধিক

উপযোগিতা বৃদ্ধি করতে শিখল। ফলে তারা উৎপাদন কার্যের সাথে ব্যাপক মাত্রায় পরিচিত হলো এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে শিল্প বিপ্লবের সূচনা হয়।

(গ) মানুষের তৃতীয় পর্যায়ের অর্থনৈতিক কার্যবলি : এ পর্যায়ে মানুষ দেশের অভ্যন্তরে ও বহির্বিশ্বের সাথে ব্যবসা বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ঘটায়। উদ্বৃত্ত পণ্য বেচা কেনা ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে এ ব্যবস্থা সম্ভব হয়।

৪.৫.৪ মানুষের প্রধান প্রধান অর্থনৈতিক কার্যাবলি

মানুষকে দৈনন্দিন জীবনে জীবিকা নির্বাহের জন্য নানাবিধ কাজ করতে হয়। মানুষের প্রধান প্রধান অর্থনৈতিক কার্যাবলিকে নিম্নোক্ত ছকে বিভক্ত করা যেতে পারে।

মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলি

প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ — উৎপাদন — নির্মাণ — ব্যবসায় বাণিজ্য — সেবা কর্ম

কৃষিকাজ — পশুপালন — পশু শিকার — মৎস চাষ ও শিকার — খনিজ সম্পদ উত্তোলন — বনজ সম্পদ সংগ্রহ

উপরের ছক অনুযায়ী মানুষের অর্থনৈতিক কাজকে প্রধানত পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়েছে যথা — প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ করা, উৎপাদন, নির্মাণ, ব্যবসায় বাণিজ্য ও সেবাকর্ম প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণের মধ্যে জড়িত কাজগুলো হচ্ছে — কৃষিকাজ, পশুপালন, পশুশিকার, মৎস্যচাষ ও শিকার, খনিজ সম্পদ উত্তোলন, বনজ সম্পদ সংগ্রহ করা ইত্যাদি।

কৃষি কাজ : সাধারণত বিশ্বের যে সকল অঞ্চল উর্বর ও সমতল এবং জলবায়ু চাষাবাদের উপযোগী সে সমস্ত অঞ্চলের মানুষের প্রধান উপজীবিকা হল কৃষি। বাংলাদেশ, ভারত, মায়ানমার, পাকিস্তান, চিন, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, শ্রিলংকা, আফ্রিকার অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা হল কৃষি।

পশু পালন : বিশ্বের সকল তৃনাঞ্চলে পশু পালন বাসিন্দাদের প্রধান পেশা। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের তৃনভূমিতে এবং ক্রান্তিয় অঞ্চলের তৃনভূমি এলাকায় বিশ্বের সব চাইতে বেশি পশু পালন ক্ষেত্র গড়ে উঠেছে। উত্তর আমেরিকা, নিউজিল্যান্ড, আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, পোল্যান্ড, হল্যান্ড, জার্মানি, ডেনমার্ক, মঙ্গোলিয়া, রাশিয়ার কিরগিজ অঞ্চলে পশু পালন ক্ষেত্র গড়ে উঠেছে।

পশু শিকার : চরম ভাবাপন্ন জলবায়ু অঞ্চলের বাসিন্দাদের প্রধান জীবিকা হল পশু শিকার। গ্রীনল্যান্ড, আলাস্কা প্রভৃতি এলাকার মানুষেরা পশু শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে।

মৎস্য চাষ : সাধারণত অপেক্ষাকৃত নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের মানুষ এ পেশায় নিয়োজিত। জাপান, নরওয়ে, নিউজিল্যান্ড, থাইল্যান্ড, ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের মানুষের প্রধান জীবিকা হল মৎস্য চাষ।

খনিজ সম্পদ উত্তোলন : বিশ্বের যে সমস্ত এলাকায় খনিজ সম্পদ পাওয়া যায় সেখানকার মানুষের জীবিকা হল খনিজ সম্পদ উত্তোলন। যুক্তরাষ্ট্রে, রাশিয়া, যুক্তরাজ্য, দক্ষিণ আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের মানুষেরা বেশি মাত্রায় এ কাজে নিয়োজিত।

বনজ সম্পদ সংগ্রহ : নিরক্ষীয় অঞ্চলের দেশগুলোতে বনশিল্প গড়ে উঠেছে। সরলবর্গীয় ও পর্ণমোচী বৃক্ষের উপকণ্ঠে বিভিন্ন কাঠ শিল্প গড়ে উঠেছে। কাগজ, দিয়াশলাই ইত্যাদি শিল্পের কাঁচামাল বন থেকে সংগ্রহ করা হয়।

উৎপাদন : পৃথিবীর অসংখ্য লোক শিল্প কারখানায় প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে পন্য দ্রব্য উৎপাদনের কাজে নিয়োজিত রয়েছে। শিল্পোন্নত দেশের মানুষেরা শ্রমের বিনিময়েই জীবিকা নির্বাহ করে থাকে।

নির্মাণ শিল্প : ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, ঘরবাড়ি নির্মাণ, রাস্তাঘাট তৈরি ও মেরামত প্রভৃতি গঠনমূলক শিল্পে বিশ্বের অসংখ্য লোক নিয়োজিত রয়েছে।

ব্যবসায় বাণিজ্য : বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অসংখ্য লোক ব্যবসায় বাণিজ্যকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেছে। তাদের প্রধান কাজ হল উৎপাদিত কৃষি পণ্য ও শিল্পজাত দ্রব্য ক্রয় বিক্রয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ ও বণ্টন করা।

সেবা কার্য : বিশ্বের বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন পেশায় দক্ষ, কিছু লোক ডাক্তারী, প্রকৌশলী, শিক্ষকতা, আইন জীবী, সেবিকা, পরামর্শদাতা ইত্যাদি পেশায় নিয়োজিত থেকে জীবিকা নির্বাহ করছে। এর মধ্যে চাকুরিজীবীও রয়েছেন।

৪.৫.৫ ভৌগোলিক পরিবেশ কাকে বলে

মানুষ যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে বসবাস করে তাকেই তার ভৌগোলিক পরিবেশ বলে। মানুষের সব কার্যাবলিই তার পরিবেশের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ভৌগোলিক পরিবেশের উপর ভিত্তি করে মানুষ তার জীবন নির্বাহ করে। অর্থাৎ মানুষের কর্ম দক্ষতা, খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, আচার–আচরণ, জীবন যাত্রা প্রণালী, রীতিনীতি ইত্যাদিও ভৌগোলিক পরিবেশের

উপর নির্ভরশীল। সুতরাং ভৌগোলিক পরিবেশ হলো এমন একটি অবস্থা যার মধ্যে মানুষ বাস করে এবং উক্ত অবস্থার প্রভাব মানুষের জীবনযাত্রাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। সে জন্যই বলা হয় "কোন অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনযাত্রা প্রণালী একটি আকস্মিক ঘটনা নহে বরং ইহা পরিবেশেরই ফল।

মোট কথা, যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে মানুষ বাস করে তাই তার ভৌগোলিক পরিবেশ। ভৌগোলিক পরিবেশ ব্যপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। এর ক্ষেত্র ও আওতা খুবই ব্যপক।

৪.৫.৬ ভৌগোলিক পরিবেশের প্রকার ভেদ

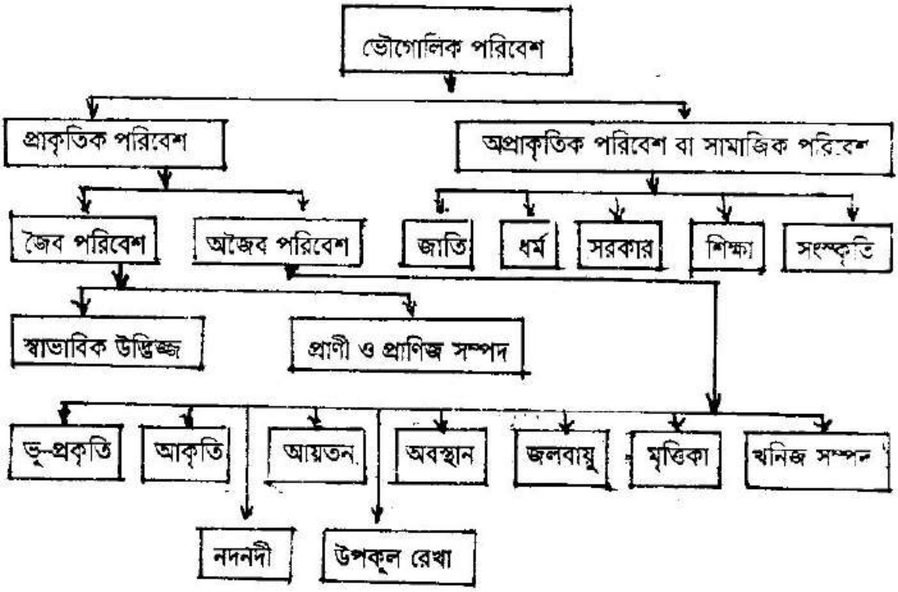

৪.৫.৭ মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলির উপর ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব

নিচে মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলির উপর ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব আলোচনা করা হলো :

প্রাকৃতিক পরিবেশ

ভূ-প্রকৃতি : মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলিতে ভূ-প্রকৃতি এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ভূ-প্রকৃতি সমভূমি, মালভূমি অথবা পার্বত্য যে কোন প্রকার হতে পারে। পর্বতময়

এলাকায় মানুষের প্রধান উপজীবিকা হল কাষ্ঠ সংগ্রহ ও বন্যজন্তু শিকার। মালভূমিতে পশু পালন, কাষ্ঠ সংগ্রহ ও খনিজ সম্পদ উত্তোলন, উর্বর সমভূমিতে কৃষিকাজ ও শিল্পকাজ এবং মরু অঞ্চলের মানুষ যাযাবর ও পশুপালক হয়। অতএব দেখা যায় ভূ-প্রকৃতির তারতম্যের জন্য মানুষের পেশার তারতম্য ঘটে থাকে।

অবস্থান : মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলিতে ভৌগোলিক অবস্থানের প্রভাব অনস্বীকার্য। কেননা, ভৌগোলিক অবস্থান এর তারতম্যের জন্যই পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের মানুষ বিভিন্ন পেশায় লিপ্ত থেকে তাদের জীবিকা নির্বাহ করছে। তাইতো সমুদ্র উপকূলে অবস্থানকারী মানুষ সাধারণত দক্ষ ডুবুরি ও নাবিক হয়, পাহাড়িয়া এলাকায় মানুষ পশুপালক, শহরের মানুষ ব্যবসায়ী এবং গ্রামের মানুষ সাধারণত কৃষিজীবী হয়। ভৌগোলিক অবস্থান গত কারণেই মানুষের এই পেশার ভিন্নতা দেখা যায়।

আয়তন : কোন দেশের মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলিতে সেই দেশের আয়তনও প্রভাব রাখে। বড় আয়তনের দেশের সম্পদও বেশি থাকে। তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সাবেক সোভিয়েত রাশিয়া, চিন, ভারত প্রভৃতি দেশের আয়তন বড় হওয়ায় তারা বিপুল সম্পদের মালিক এবং তাদের অর্থনৈতিক কার্যের অভিজ্ঞতাও বেশি।

জলবায়ু : মানুষের জীবনযাত্রা যেমন জলবায়ুর উপর নির্ভরশীল তেমনি মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলি। যেমন — কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, পরিবহণ, মৎস্য চাষ ইত্যাদিও জলবায়ুর উপর নির্ভরশীল। অনুকূল জলবায়ুর ফলে বাংলাদেশের মানুষ কৃষিজীবী। আদ্র জলবায়ু থাকার জন্য ইংল্যান্ডের ম্যানচেষ্টার, জাপানের ওসাকা, ভারতের বোম্বে কার্পাস বয়ন শিল্প গড়ে উঠেছে। বহু লোক এ সব এলাকার কার্পাস শিল্পের সাথে জড়িত হয়ে তাদের জীবিকা নির্বাহ করছে।

মৃত্তিকা : মানুষ তার প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্য প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে মৃত্তিকা থেকে পেয়ে থাকে। উর্বরা পলিমাটিতে কৃষি কাজ সম্ভব কিন্তু পাথুরে পাহাড়ী মাটি ও মরুভূমিতে সম্ভব নয়। তাই মৃত্তিকার গঠন প্রকৃতি দ্বারাও মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলি নির্ধারিত হয়।

খনিজ সম্পদ : খনিজ সম্পদ আহরণ মানুষের অন্যতম অর্থনৈতিক কাজ। খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ দেশগুলো প্রধানত শিল্পোন্নত দেশে পরিণত হয়েছে। এবং তাদের দেশের মানুষ বেশির ভাগ শিল্পের উপর নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করে। ফলে খনিজ সম্পদ অর্থনৈতিক কার্যাবলিতে প্রভাব রাখে।

নদনদী : মানুষের উন্নতি ও সভ্যতার অন্যান্য প্রাকৃতিক উপাদানগুলোর মধ্যে নদীর ভূমিকা অনেক বেশি। কাগজ, পাট, কার্পাস শিল্পের জন্য পানি অত্যাবশ্যক। কৃষিকাজ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার নদনদী বিশেষ ভূমিকা রাখে। সে জন্য নদী অববাহিকা অঞ্চলের লোকেরা কেহ শিল্পজীবী, কেহ কৃষিজীবী কেহ মৎস্য জীবী, কেহ বা পরিবহণ ব্যবস্থার সাথে জড়িত।

উপকূল রেখা : মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলির উপর উপকূল রেখার প্রভাবও কম নয়। কেননা উপকূল রেখা বক্র ও ভগ্ন হলে পোতাশ্রয় ও বন্দর নির্মাণ সহজ হয়। তাই জাপান ও

ইংল্যান্ডের মানুষেরা ব্যবসায় বাণিজ্য, নৌ-শিল্পে ও পোতাশ্রয় নির্মাণে উন্নতি করেছে। আবার এসব এলাকা মৎস্য শিল্পের জন্য উপযুক্ত। তাই অনেক লোক তাদের জীবিকা নির্বাহ করে থাকে এসব কাজের মাধ্যমে।

স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ : প্রাকৃতিগত পার্থক্য অনুসারে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদ জন্মে। এ সকল উদ্ভিদ হতে মানুষ কাঠ, জ্বালানী ছাল, পাতা, বেত ইত্যাদি সংগ্রহ করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে।

প্রাণী ও প্রাণিজ সম্পদ : পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে পৃথক পৃথক পরিবেশে ছোট বড় প্রাণী বাস করে। এ সকল প্রাণী থেকে মানুষ নানা রকম মূল্যবান সম্পদ সংগ্রহ করে থাকে যা মানুষের জীবিকা অর্জনে সহায়ক। ফলে প্রাণী ও প্রাণিজ সম্পদের সাথে মানুষের অর্থনৈতিক সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।

অপ্রাকৃতিক পরিবেশ

জাতি : মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের উপর জাতিগত বৈশিষ্ট্যের ভূমিকা ব্যাপক। যে জাতি পরিশ্রমী ও উদ্যোমশীল তারা অর্থনৈতিক উন্নতিতে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে পারে যেমন — নিগ্রো জাতি।

ধর্ম : পৃথিবীতে বিভিন্ন ধর্ম ও ধর্মের নিয়ম ও অনুশাসন প্রচলিত রয়েছে যা মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলির উপর প্রভাব বিস্তার করে। যেমন সুদ প্রথা নিষিদ্ধ হওয়ায় মুসলিম বিশ্বে ব্যাংকিং ব্যবসায় উন্নতি লাভ করেনি।

সরকার : অপ্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে সরকারই মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলির নিয়ন্ত্রণ করে বেশি মাত্রায়। সরকারের পদক্ষেপ, উৎসাহ, নীতি ও পৃষ্ঠপোষকতার কোন দেশের মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলির গতি বৃদ্ধি পায় আবার হ্রাসও পায়।

জনসংখ্যা : যাবতীয় অর্থনৈতিক কার্যাবলি মানুষ দ্বারা সম্পাদিত হয়। কাম্য স্তরের কম জনসংখ্যা যেমন ক্ষতিকর বেশি জনসংখ্যাও তেমনি অর্থনৈতিক উন্নয়নে অন্তরায়। কম জনসংখ্যার জন্য অস্ট্রেলিয়ার চারণ ভূমির সৃষ্টি হয়েছে।

শিক্ষা : শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষা মানুষকে বেশি দক্ষতা এনে দিতে পারে তাই দেখা যায় যে দেশের শিক্ষিত লোক বেশি তারা অর্থনৈতিক দিক থেকে বেশি উন্নত।

সংস্কৃতি : সংস্কৃতি মানুষের মানবিক উন্নতি সাধন করে যা প্রশান্ত চিত্তে কাজ করবার জন্য সহায়ক। ইংল্যান্ড সংস্কৃতির দিক থেকে উন্নত হওয়ার তারা অর্থনৈতিক দিক থেকেও উন্নত। অতএব উন্নত সংস্কৃতি অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত।

৪.৫.৮ উপসংহার

উপরের আলোচনা হতে প্রতীয়মান হয় যে ভৌগোলিক পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলিতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে।

পঞ্চম অধ্যায়

ব্যবহারিক ভূগোল

৫.০ মানচিত্র পঠন (Map reading)

৫.১ মানচিত্রের পটভূমি :

মানচিত্রের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের ধারণা লাভ করতে হলে প্রথমে এর আকৃতি–প্রকৃতি এবং গঠনের কিছুটা জ্ঞান লাভ করা দরকার। নিচে এ বিষয়ের সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা হলো।

ধরা হয় প্রাক্-গ্রিক কালে প্রাচীনতম মানচিত্র প্রস্তুত করা হয়েছিল। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও স্থানীয় এলাকাগুলোর সাথে ঘনিষ্ঠতার উপর ভিত্তি করেই প্রাচীন মানচিত্রগুলো আঁকা হয়েছিল। এসব মানচিত্রে বনভূমির মধ্য দিয়ে পার্শ্ববর্তী বসতি এলাকা, শিকার, মিষ্টিপানি ও লবণ প্রাপ্তির সম্ভাবনাময় অঞ্চলগুলোর দিকে যাতায়াতের পথ দেখানো হয়েছে। এ সময়ে মানচিত্রকে দুভাগে ভাগ করা হয় —

১। স্থানীয় এলাকার প্রতিরূপ উপস্থাপন এবং

২। সমগ্র পৃথিবীর প্রতিরূপ উপস্থাপন.

মানচিত্র তৈরির প্রাচীনতম প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় ব্যবিলনে। সম্রাট সারগণের সময়ে ভূসম্পত্তির পরিসীমা জানার জন্য ক্যাডাস্ট্রাল জরিপ করা হয়েছিল। বৃটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত পোড়ামাটির ফলকে এরূপ জরিপের নজির পাওয়া যায়। হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের যাদুঘরে রক্ষিত এ পোড়ামাটির ফলকে মানচিত্রটি সম্ভবত প্রাচীনতম মানচিত্র।

পরবর্তীতে এ্যানাক্সিম্যান্ডার (৫৮০ খ্রি.পূ.) বিভিন্ন দেশের সীমারেখাসহ সর্বপ্রথম ভূ-পৃষ্ঠের মানচিত্র প্রকাশ করেন।

এর পরে এরাটোসথেনিসের মানচিত্রে আমরা সর্বপ্রথম অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখার অস্তিত্ব দেখতে পাই, কিন্তু এ রেখাগলো সমদূরে আঁকা হয়।

রোমান মানচিত্র বিসারদরা অরবিস টেরারাস নামক পৃথিবীর পরিসীমা স্থাপন করে এ মানচিত্রে কম বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে তিনটি বৃহৎ মহাদেশ দেখানো হয়েছে।

৪৮০ খ্রি. ম্যাক্রোবিয়াসের বলয় মানচিত্রে নিরক্ষরেখা দ্বারা উত্তর ও দক্ষিণ ভূ-খণ্ডে বিভক্তি দেখানো হয়। এ মানচিত্রে দু'টি সূর্যের সাহায্যে সূর্যের উত্তরায়ন ও দক্ষিণায়নের শেষ সীমাদ্বয় দেখানো হয়েছে।

ভূগোলে মানচিত্রের ইতিহাসে ক্লাউডিয়াস টলেমি মানচিত্রাঙ্কনবিদ হিসেবে সভ্য জগতের সাথে সাথে পরিচিত হন। তিনি পরিচিত পৃথিবীর জন্য একটি এবং বিভিন্ন অঞ্চলের জন্য ২০টি স্বতন্ত্র মানচিত্র অংকন করেছিলেন।

টলেমির মানচিত্রাঙ্কন পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য এবং অবদান :

১। তিনি সর্বপ্রথম স্কেলের ধারণা দেন।

২। তিনি মানচিত্রে উত্তর দিক উপরে, দক্ষিণ দিক নিচে, পূর্বদিক ডানে এবং পশ্চিম দিক বাম পার্শ্বে ধরে আঁকতেন।

৩। মানচিত্রে পূর্ব পশ্চিম ঠিক করেন।

৪। পৃথিবীর মানচিত্র উভয় অক্ষাংশ ও দেশান্তরের উপর ভিত্তি করে আঁকতেন।

৫। ৩০° অক্ষাংশ ছিল তার নিরক্ষরেখা, যা আসোয়ানের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেছিল এবং ০° – কে মধ্যরেখা ধরা হয়েছিল।

৬। তাঁর উদ্ভাবিত অভিক্ষেপের অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমা রেখাগুলো চাপ আকৃতি বিশিষ্ট রেখা ছিল।

৭। এই রেখাকে তিনি ৬০ ডিগ্রিতে বিভক্ত করে প্রত্যেক ডিগ্রিকে আবার ৬০ ভাগে ভাগ করতেন, এই প্রত্যেক ক্ষুদ্র ভাগকে বলা হয় মিনিট। ১ মিনিটের ৬০ ভাগের ১ ভাগকে ১ সেকেন্ড বলা হয়।

৮। টলেমি বক্ররেখা দ্বারা তৈরি ছকের মধ্যে পৃথিবীর মানচিত্র এঁকে ছিলেন।

মানচিত্রাঙ্কন বিদ্যায় মুসলমানদের অবদানে টলেমির প্রভাব (আলবেরুনি ও অন্যান্যদের) বহুলাংশে লক্ষ্য করা যায়, তবে টলেমির মানচিত্রের চেয়ে এ সময়কার মানচিত্র বেশি উন্নত ছিল না। আলবেরুনি বহু স্থানের অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ নির্ণয় করেন তিনি স্টেরোগ্রাফিক অভিক্ষেপের সহজ পদ্ধতি প্রবর্তন করেন এবং পৃথিবী ও আকাশের মানচিত্র অংকন করার জন্য অভিক্ষেপ অংকন পদ্ধতি নির্ণয় করেন। সমুদ্রের অবস্থান ব্যাখ্যা করার জন্য তিনি পৃথিবীর একটি গোলাকার মানচিত্র অংকন করেন। ইদ্রিসি ও ইবনে খালদুন জলবায়ু অঞ্চল ভেদে মানচিত্র অংকন করেন। এ সময়ে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের জন্য নিয়মিতভাবে মানচিত্রগুলো ব্যবহৃত হতো, এগুলো ছিল অনেক চিত্তাকর্ষক।

১৫৬৯ খ্রি. মার্কেটরের আঁকা বিশাল মানচিত্রটি সর্বমোট ২৪ খণ্ড কাগজের উপর আঁকা হয়েছিল, মোট আকৃতি ছিল ২০৮ × ১৩১ বর্গ সে.মি.। এ মানচিত্রটিই ছিল তদানীন্তন ইউরোপিয়দের জানা পৃথিবীর প্রতিচ্ছবি।

সপ্তদশ শতাব্দীতে ফিলিপ বুয়াচে (Philip Buache) সমোন্নতি রেখা দ্বারা অংকিত বন্ধুরতার মানচিত্রের উপর এক ধরনের রেখা চিত্রাকার তুলে ধরেন। এই পদ্ধতি ভূগোলবিদসহ সর্বস্তরে হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল।

এ শতাব্দীতে মানচিত্রাঙ্কনে আরো বৈজ্ঞানিক কৌশল আরোপ করা হয়েছে।

৫.২ মানচিত্রের সংজ্ঞা

সমগ্র পৃথিবীর বা কোন দেশের বা তাদের অংশ বিশেষের প্রতিকৃতি বা আকৃতিকে অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাসহ নির্দিষ্ট স্কেল অনুসারে অংকন করা হলে তাকে মানচিত্র বলা হয়। একে একটি প্রণালীবদ্ধ জ্ঞানের (Systematised Knowledge) মাধ্যম বা কৌশল বলা হয়। ভূ-গোলক (Globe) এবং মানচিত্র (Map) এই দুটি শব্দ অনেক সময় সমার্থকভাবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এদের গঠন এবং ব্যবহারের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে।

যেহেতু পৃথিবী গোল, পৃথিবীর আকৃতি বুঝতে ভূ-গোলকের সাহায্য নেয়া হয়। এটি মহাদেশ ও মহাসাগরসমূহের আকৃতি সঠিকভাবে নির্দেশ করে এবং ভূ-পৃষ্ঠের কোন নির্দিষ্ট স্থানের পরিপ্রেক্ষিতে অন্যান্য স্থানসমূহের সঠিক অবস্থান সম্মন্ধে ধারণা করতে সাহায্য করে থাকে। অক্ষরেখা এবং দ্রাঘিমারেখা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা করতে ভূ-গোলকের প্রয়োজন হয়। ভূ-পৃষ্ঠের যেকোন স্থানের সঠিক অবস্থান নির্ধারণে ভূ-গোলকের দরকার হয়। এছাড়া ভূগোলের অংক সম্বন্ধীয় বিষয়বস্তু বুঝবার জন্য গ্লোবের প্রয়োজন হয়। অপরপক্ষে পৃথিবীর কোন অংশ-বিশেষকে সমতল ক্ষেত্র বিশিষ্ট মানচিত্রের মাধ্যমে দেখানো হয়। মানচিত্রে বিভিন্ন তথ্য সন্নিবেশিত থাকে। সেজন্য মানচিত্রকে বিভিন্ন তথ্য সন্নিবেশ করার ভিত্তিরূপে গণ্য করা হয়।

এছাড়া বিভিন্ন ভূগোলবিদ বিভিন্নভাবে মানচিত্রের সংজ্ঞা দিয়েছেন। তন্মধ্যে ওয়েবস্টার এর মানচিত্র বিষয়ক সংজ্ঞাটি উল্লেখযোগ্য।

According to Webster, "a map as representation (usually on a flat surfac) of the surface of the earth or of some part of it, showing relative size and position, according to a scale or projection or position represented."

অর্থাৎ প্রচলিত সাংকেতিক চিহ্ন, নির্দিষ্ট স্কেল ও অভিক্ষেপের সাহায্যে সমতল কাগজের উপর অংকিত সমগ্র পৃথিবী অথবা এর কোন অংশের অথবা নভোমণ্ডলের প্রতিরূপকে মানচিত্র বলে।

অথবা সমগ্র পৃথিবীর বা তার অংশ বিশেষের প্রতিকৃতি বা আকৃতিকে অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাসহ নির্দিষ্ট স্কেল অনুসারে অংকন করা হলে তাকে মানচিত্র বলে।

মানচিত্রে নানা প্রকার চিহ্নের সাহায্যে ভূ-পৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থানগুলোকে পরস্পরের দুরত্ব, আয়তন ও সীমা অনুসারে ঠিক রেখে অংকন করা হয়। বিশেষ পরিমাপের দ্বারা এ চিত্র অংকন

করা হয় বলে একে মানচিত্র বলে। মানচিত্রে কেবল দেশ বা দেশাংশের সীমা, পাহাড়, পর্বত, নদ-নদী, হ্রদ, বন, প্রান্তর প্রভৃতির অবস্থান দেখানো হয় না, বিভিন্ন স্থানে স্থলভাগের বন্ধুরতা, পর্বতের উচ্চতা, সাগরের গভীরতা, নদী, বায়ু, সমুদ্র স্রোত প্রভৃতি কোন দিক থেকে কোন দিকে প্রবাহিত হয়, সমবর্ষণ, সমচাপ, সমোষ্ণরেখাসমূহের বিন্যাস প্রভৃতি নানা বিষয় মানচিত্রে দেখানো হয়। মানচিত্রে এসব বিষয় দেখাবার জন্য বিভিন্ন চিত্র, বর্ণ ও সংকেত ব্যবহৃত হয়।

৫.৩ মানচিত্রের প্রকারভেদ

মানচিত্র অনেক প্রকার হতে পারে। আকার ও স্কেল অনুসারে ভূ-চিত্রাবলি মানচিত্র, দেয়াল মানচিত্র, ক্যাডাস্ট্রাল মানচিত্র ও ভূ-সংস্থান মানচিত্র উল্লেখ করা যায়। আবার ব্যবহারিক বিশেষত্ব ও বিষয়বস্তুর উপর নির্ভর করে প্রাকৃতিক মানচিত্র, জলবায়ু মানচিত্র, রাজনৈতিক মানচিত্র, অর্থনৈতিক মানচিত্র, লোক সংখ্যা মানচিত্র, যাতায়াত মানচিত্র প্রভৃতি শ্রেণীভেদ করা হয়। বিভিন্ন প্রকার মানচিত্র বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। মানচিত্র বিশেষ বিশেষ ভৌগোলিক তথ্য প্রতীক চিহ্নের মাধ্যমে স্বল্প পরিসরে উপস্থাপন করে। অনুশীলনের মাধ্যমে যে কোন স্থানের পূর্ণ ভৌগোলিক বিবরণ পাওয়া যায়। নিচে বিভিন্ন প্রকার মানচিত্রের বিবরণ দেয়া হলো :

প্রাকৃতিক মানচিত্র (Physical Map) : ভূগোলের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো প্রাকৃতিক মানচিত্র। এ মানচিত্রের সাহায্যে ভূ-পৃষ্ঠ সম্বন্ধে ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক জ্ঞান অর্জন করা যায়। প্রাকৃতিক মানচিত্রে নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, হ্রদ, সাগর, উপসাগর, মরুভূমি, জলবায়ু, বৃষ্টিপাত, লোক বসতি, সমুদ্রস্রোত ইত্যাদি সন্নিবেশিত থাকে। এ মানচিত্রে ভূমির উচ্চতা দেখাবার জন্য সমোন্নতি রেখা ব্যবহৃত হয়। সমুদ্র সমতল হতে সমান উচ্চতাবিশিষ্ট স্থানসমূহকে যে কল্পিত রেখা দ্বারা যুক্ত করা হয় তাকে সমোন্নতি (Contour) রেখা বলে।

রাজনৈতিক মানচিত্র (Political Map) : একটি দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক এককের সীমা বা বিভিন্ন রাষ্ট্রের সীমা দেখানো হয়। এ মানচিত্রে বিভিন্ন দেশ, রাজধানী ইত্যাদি সঠিক অবস্থান নির্দেশিত থাকে।

অর্থনৈতিক মানচিত্র (Economic Map) : যে সকল মানচিত্রে প্রধানত কৃষিজ, খনিজ, প্রাণিজ ও শিল্পজ দ্রব্যের বণ্টন দেখানো হয় এবং তা উৎপাদনের উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র সমূহের পরস্পর যোগাযোগ ব্যবস্থা দেখানো হয় এবং বাণিজ্য স্থান প্রভৃতি সঠিকভাবে নির্দেশিত থাকে এগুলোকে অর্থনৈতিক মানচিত্র বলে।

ভূ-বিবরণী মানচিত্র (Topographical Map) : ভূ-পৃষ্ঠের যে কোন এক ক্ষুদ্র অঞ্চলের বিশদ আলোচনা এরূপ মানচিত্রের মাধ্যমে করা যেতে পারে, ভূ-বিবরণী মানচিত্রের স্কেল

বৃহদায়তন হওয়ায় খুঁটিনাটি ভৌগোলিক তথ্য পাওয়া যায়। ভূ-বিবরণীযুক্ত মানচিত্রে বিভিন্ন সংকেত চিহ্নের মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের ভৌগোলিক বিবরণ ও তথ্য দেখানো হয়। এই জাতীয় মানচিত্রে একত্রে একসংগে বিভিন্ন সংকেতের মাধ্যমে কোন অঞ্চলের বিভিন্ন প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য দেখানো হয়। ভূ-প্রকৃতির বিন্যাস নানাবিধ সংকেতের সাহায্যে প্রদর্শন করা হয়। বিশেষ কোন অঞ্চল কোথায় কিভাবে উঁচু হয়ে উঠেছে, পাহাড়-পর্বত কোথায় বিদ্যমান, কোথায় নিচু ভূমি, গিরিখাত ও হ্রদ সৃষ্টি করেছে, এ সবই ভূ-বিবরণীযুক্ত মানচিত্রে বিভিন্ন সংকেতের সাহায্যে যথাযথভাবে নির্দেশিত থাকে। এছাড়া বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোও প্রদর্শিত হয়।

ক্যাডাস্ট্রাল মানচিত্র (Cadastral Map) : ক্যাডাস্ট্রাল মানচিত্র বলতে সাধারণভাবে বোঝায় বৃহৎ স্কেলযুক্ত মানচিত্র, যেখানে জনসাধারণের জমির দাগ নম্বর চিহ্নিত থাকে। ফরাসি ভাষায় ক্যাডাস্ট্রাল থেকে এরূপ মানচিত্রের নামকরণ হয়েছে। রাজস্ব আদায় ও প্রশাসনিক কাজে এরূপ মানচিত্রের ব্যবহার অধিকতর কার্যকর।

অভিক্ষেপ মানচিত্র (Projection Map) : পৃথিবী গোলাকার সমতল পৃষ্ঠায় সমাক্ষরেখা এবং মধ্যরেখা অংকন সহজ নয়। তাই কাগজের উপর এসব রেখাকে নির্ভুলভাবে দেখানোর জন্য নানা রকম ব্যবস্থা নেয়া হয় এবং তার সাহায্যেই নানারকম মানচিত্র অংকন করা হয়। এসব উপায়কেই অভিক্ষেপ বলে। বিভিন্ন স্থানের মানচিত্র অংকনের সময় বিভিন্ন ধরনের অভিক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। কোন একটি অভিক্ষেপের সাহায্যে যখন কোন স্থানের মানচিত্র অংকন করা হয়, তখন তাকে বলে অভিক্ষেপ মানচিত্র।

স্থানীয় বৈচিত্র্যসূচক মানচিত্র (Topographical Map) : সুষ্ঠু জরিপের মাধ্যমে এইরূপ ক্ষুদ্র স্কেলের মানচিত্র অংকন করা হয় বলে যেকোন খুটিনাটি তথ্য এতে পাওয়া যায়। এরূপ মানচিত্রে স্বতন্ত্র জমির সীমানা না দেখিয়ে প্রচলিত সাংকেতিক চিহ্নের সাহায্যে সমোন্নতি রেখাসমুহের বিন্যাস, প্রধান ভূ-প্রকৃতি, পানি নিষ্কাশন প্রণালী, জলাভূমি, অরণ্য, গ্রাম, শহর, খেয়াঘাট, পরিবহণ ব্যবস্থা প্রভৃতি এতে উপস্থাপিত করা হয়। বিভিন্ন দেশের বৈচিত্র্যসূচক মানচিত্র একরূপ নয়, স্কেল ও পরিকল্পনার দিক দিয়ে এরা স্বতন্ত্র।

আন্তর্জাতিক মানচিত্র (Internatiional Map) : বিভিন্ন দেশের সহযোগিতায় অনুরূপ আকৃতির কাজে ২,২২২ খণ্ডে একই স্কেল, আকার প্রণালী সমগ্র পৃথিবীর মানচিত্র অংকন করবার এ পরিকল্পনাকে আন্তর্জাতিক মানচিত্র নামে অভিহিত করা হয়।

জলবায়ু মানচিত্র (Climate Map) : এরূপ মানচিত্রে বায়ুর তাপ, চাপ, প্রবাহ ও বৃষ্টিপাতের তথ্য কিংবা জলবায়ু অঞ্চলের বিবরণ জানা যায়। আঞ্চলিক ভূগোলের বিভিন্ন তথ্যও এরূপ মানচিত্রে পরিবেশিত হয়। এসব মানচিত্রে ঋতু বিশেষের আবহাওয়ার অবস্থা জানতে পারা যায়, একেই শীতের বা গ্রীষ্মের আবহ মানচিত্র বলে। কিন্তু যখন ৩০ বা ৪ বৎসরের আবহাওয়ার গড় অবস্থা মানচিত্রে উপস্থাপিত করা হয় তখন তাকে জলবায়ু বিষয়ক মানচিত্র বলে।

বণ্টন মানচিত্র (Distribution Map) : নির্দিষ্ট মানের বিভিন্ন দ্রব্য বণ্টনের মানচিত্রকে এই শ্রেণীভুক্ত করা হয়। প্রয়োজনবোধে কোন দ্রব্যের প্রকৃত অবস্থান না দেখিয়ে উৎপাদনকারী এলাকার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহ বণ্টন মানচিত্র দ্বারা উপস্থাপিত করা হয়।

ঐতিহাসিক মানচিত্র (Historical Map) : অতীত দিনের ঘটনাবলি ও তথ্যকালীন রাজনৈতিক সীমানা নির্দেশ করা হয় ঐতিহাসিক মানচিত্রে। ইতিহাস শিক্ষাদানের জন্য ঐতিহাসিক মানচিত্রের ব্যবহার খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সামাজিক মানচিত্র (Social Map) : সামাজিক সংঘ, গোত্র, জাতি, উপজাতি তাদের ভাষা, ধর্ম, রীতি নীতি প্রভৃতি তথ্য উপস্থাপিত করা হয় সামাজিক মানচিত্রে।

দেয়াল মানচিত্র (Wall Map) : এ মানচিত্রের মাধ্যমে ভূগোলের বিভিন্ন দিকের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অভিব্যক্তি আকর্ষণীয়ভাবে ব্যক্ত করা যেতে পারে। শ্রেণীকক্ষে ভূগোল পাঠদানের ক্ষেত্রে দেয়াল মানচিত্রের কতগুলো বৈশিষ্ট্যের প্রতি শিক্ষকের দৃষ্টি সর্বাগ্রে প্রয়োজন।

(১) দেয়াল মানচিত্র আয়তনে অবশ্যই বৃহৎ হবে।

(২) দেয়াল মানচিত্র পঠনীয় অংশের প্রতি লক্ষ্য রেখে শুধু বহিঃরেখা সম্বলিত হলে অযথা নানা অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের প্রতি শিক্ষার্থীদের মনোযোগ বিঘ্নিত হয়। দেয়াল মানচিত্র এরূপ হওয়া প্রয়োজন যাতে মানচিত্রের নিজস্ব গুণেই শিক্ষার্থীর কাছে শিক্ষা সহায়ক হবে। সর্বোপরি দেয়াল মানচিত্রটি হবে নাম সম্বলিত রঙিন এবং শক্ত ও মজবুত বাঁধাই সম্পন্ন।

অ্যাটলাস মানচিত্র (The Atlas) : অ্যাটলাস হলো অনেকগুলো মানচিত্রের একটি বিশেষ বই। এ থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের আয়তন, জনসংখ্যা, আবহাওয়া, সমুদ্র, পর্বত, উৎপন্ন দ্রব্য, উৎপাদন কেন্দ্র, যাতায়াত ব্যবস্থা, পণ্যদ্রব্য, খনিজ পদার্থ ইত্যাদি সম্পর্কে জানা যায়। শ্রেণীকক্ষে ভূগোল পাঠদানের বিষয়ে দেয়াল মানচিত্রের ভূমিকা যেমন অনন্য তেমনি অ্যাটলাস মানচিত্র প্রতিটি শিক্ষার্থীর ব্যক্তিকেন্দ্রিক নির্দেশনার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। উপযুক্ত মানের অ্যাটলাস মানচিত্রের অনুশীলন প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য অপরিহার্য।

লোক বসতির মানচিত্র : যে কোন দেশের বিভিন্ন স্থানে মাইল প্রতি অধিবাসীর সংখ্যা নির্দেশ করে বিভিন্ন রং বা বিভিন্ন রেখার ব্যবহার করে এই মানচিত্র অঙ্কন করা যায়। এই মানচিত্রে শহর, নগর এবং গ্রাম্য বসতি কেমন আছে তাও বর্ণনা করতে হয়। অর্থাৎ বসতি ঘন না মধ্যম রকমের, না স্বল্প এ বিষয়ে লিখতে হয়। এরপর বসতি গড়ে উঠার স্থানসমূহ এবং বসতি বিন্যাসের প্রকারভেদ (Pattern of Settlement) এই দুটি বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়।

উদ্ভিজ ও কৃষিজ দ্রব্যের মানচিত্র : এই মানচিত্র হতে বনভূমি, কৃষিযোগ্য ভূমি এবং যে সকল স্থানে যে সকল জিনিস জম্মে বা পাওয়া যায় তা অতি সহজেই চিনতে পারা যায়

বনভূমি দেখতে সাধারণত সবুজ রং এবং কৃষিযোগ্য ভূমি দেখাতে হলুদ রং ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন প্রকার বৃক্ষ, কৃষিজাত দ্রব্য, ফলের বাগান, সংরক্ষিত বনভূমি প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার সাংকেতিক চিহ্নের সাহায্যে দেখানো হয়ে থাকে।

যাতায়াত ব্যবস্থা মানচিত্র : এই ধরনের মানচিত্রে রেলপথ, পাকা রাস্তা, কাঁচা রাস্তা, পায়ে চলা পথ, গরুর গাড়ির রাস্তা, মরুভূমিতে উট চলার পথ প্রভৃতি নানা প্রকার যাতায়াতের উপায়গুলো বিভিন্ন সাংকেতিক চিহ্নের মাধ্যমে দেখানো হয়ে থাকে। প্রদত্ত অঞ্চলগুলোতে যোগাযোগ ব্যবস্থা কিরূপ আছে তা লক্ষ্য রাখতে হয়।

সমোন্নতি রেখা মানচিত্র : সমোন্নতি রেখা হলো কতকগুলো কাল্পনিক রেখা যেগুলো মানচিত্রে সমুদ্র-পৃষ্ঠ হতে একই উচ্চতায় অবস্থিত স্থান সমূহকে যুক্তকরে অঙ্কন করা হয়। অন্যভাবে বলা যায় যে, সমোন্নতি রেখা হলো এমন একটি রেখা যা একটি অপরিবর্তনীয় উচ্চতাকে নির্দেশ করে অর্থাৎ সমুদ্র পৃষ্ঠ হতে সমোচ্চতা বিশিষ্ট স্থান সমুহকে যুক্ত করে। মানচিত্রে বিভিন্ন বন্ধুরতা নিখুঁতভাবে দেখাতে (বিশেষ করে ক্ষদ্রায়তন বিশিষ্ট অঞ্চলসমূহে) এই পদ্ধতি সর্বাধিক কার্যকর হয়ে থাকে।

রৈখিক মানচিত্র : স্থানীয় বৈচিত্র্যসূচক মানচিত্র পাঠ ও অঙ্কন করতে হলে নানা প্রকার প্রতীক চিহ্নের সাহায্য নিতে হয়। এই সকল প্রতীক চিহ্নের দ্বারা নানাবিধ তথ্য পরিবেশন করা হয়। একে রৈখিক মানচিত্র বলা হয়। মানচিত্র অংকন ও পঠনের জন্য এই সকল সংকেত চিহ্নের সঙ্গে পরিচয় থাকা অপরিহার্য। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের স্থানীয় বৈচিত্র্য সূচক মানচিত্রে এই সকল সংকেত বা প্রতীক চিহ্ন ব্যবহার করবার কতকগুলো রীতি প্রচলিত আছে। এই কারণে এদেরকে আন্তর্জাতিক প্রচলিত প্রতীক চিহ্ন বলা হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ব্যবহৃত এই প্রতীক চিহ্নগুলো মোটামুটি অভিন্ন। এই প্রতীক চিহ্নগুলো মানচিত্রের নীচে কিংবা উপরের দিকে দুপার্শ্বে সূচকের (Index) মধ্যে দেয়া থাকে। এই প্রতীক চিহ্নগুলো সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকলে মানচিত্র পাঠ অতিসহজ হয়। নিচে কয়েকটি প্রধান চিহ্নগুলো সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকলে মানচিত্র পাঠ অতিসহজ হয়। নিচে কয়েকটি প্রধান প্রধান রৈখিক মানচিত্রের সংকেত চিহ্নের নমুনা দেয়া হলো :

১। আন্তর্জাতিক সীমা রেখা

২। প্রদেশ/রাজ্য সীমারেখা

৩। জেলা সীমারেখা

৪। মহকুমা/উপজেলা সীমারেখা ....

৫। নদী

৬। রেলপথ (ব্রড গেজ)

৭। রেলপথ (মিটার গেজ)

৮। সড়ক পথ (পাকা)

৯। সড়ক পথ (কাঁচা)

১০। পাকা সড়কের উপর রেলপথ

১১। রেলপথের উপর পাকা সড়ক

১২। পাকা সড়ক ও সেতু

১৩। বড় শহর বা বন্দর

১৪। ছোট শহর

১৫। পর্বত

১৬। গিরিশৃঙ্গ

১৭। গিরিপথ

১৮। হ্রদ

১৯। জলাশয়

২০। বনভূমি

২১। তৃণ ভূমি

২২। মরুভূমি

৫.৪ মানচিত্রাংকন পদ্ধতি (Cartographic Technique) : বিশেষ বিশেষ ভৌগোলিক তথ্য প্রতীক চিহ্নের মাধ্যমে স্বল্প পরিসরে উপস্থাপন করাই মানচিত্রের উল্লেখযোগ্য অবদান

বিভিন্ন স্থানের স্থলভাগের বন্ধুরতা, পর্বতের উচ্চতা, সাগরের গভীরতা, নদী বায়ু, সমুদ্রস্রোত প্রভৃতি কোন্ দিক থেকে প্রবাহিত হচ্ছে, সমবর্ষণ, সমচাপ, সমোষ্ণ রেখাসমূহের বিন্যাস প্রভৃতি নানা বিষয় দেখবার জন্য বিভিন্ন চিত্র, বর্ণ ও সংকেত ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এই মানচিত্রে এ সকল বিষয় দেখালে মানচিত্রটি অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হয়ে উঠে। সেজন্য সমজাতীয় বা প্রায় সমজাতীয় কয়েকটি বিষয় নিয়ে এক প্রকার মানচিত্র অংকন করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষাস্তরের শেষে মানচিত্রের প্রাথমিক 'বর্ণবোধ' আয়ত্ত করা দরকার। সাধারণ নক্সা অংকন, স্কেলের ব্যবহার, দূরত্ব, দিকনির্ণয়, অবস্থান, আয়তন, নামকরণ, সাংকেতিক চিহ্নের ব্যবহার প্রভৃতি হলো মানচিত্রের বর্ণবোধ। মানচিত্রাংকন বিদ্যার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো স্কেল নির্বাচন, অভিক্ষেপের মানোনয়ন, কি বিষয় দেখাতে হবে তা স্থির করা, রং ব্যবহার এবং শিরোনাম ও অন্যান্য তথ্য প্রদানের জন্য আদর্শ অক্ষর ব্যবহার।

ভূগোলবিদদের জন্য মানচিত্র একটি অপরিহার্য বস্তু। ইংরেজিতে একটি কথা আছে — Map is the tool of the Geography। সর্বজন স্বীকৃত নিয়মানুবর্তিতার মাধ্যমে বর্তমানে মানচিত্র অংকন করা হয়। এতে ব্যুৎপত্তি লাভ করতে হলে কায়িক দক্ষতা, নৈপুণ্য, তৎপরতা, যান্ত্রিক সহায়তা, অংকন কলাকৌশল সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। শিক্ষাকালীন মানচিত্র অংকন দুভাগে বিভক্ত।

(ক) সংগ্রহকরণ

(খ) মৌলিক।

মানচিত্রাংকনের জন্য স্কেল, নকশা, অভিক্ষেপ ইত্যাদি সম্বন্ধে ধারণা থাকা প্রয়োজন।

স্কেল : কোন স্থানের প্রকৃত আয়তন বা দুই বা ততোধিক স্থানের পরস্পর প্রকৃত দূরত্ব ছোট কাগজে দেখানো সম্ভব নয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে প্রকৃত আয়তন বা দূরত্ব পরিমাপ করে একে কাগজের মাপ এবং প্রয়োজন অনুসারে একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে ছোট করে অংকন করা হয়। এই অনুপাতকে স্কেল বলে। সুতরাং স্কেল দূরত্ব পরিমাপের একটি অনুপাত। যেমন — ১″ = ১ মাইল।

নকশা : দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও আয়তন নির্দেশ করে স্কেল অনুসারে কোন স্থানের প্রতিকৃতি অঙ্কন করলে উক্ত স্থানের আকার, অবস্থান প্রভৃতি সম্বন্ধে অবহিত হওয়া যায়। ভূগোল পাঠে সর্বদা এরূপ প্রতিকৃতির প্রয়োজন হয়। ক্ষুদ্রায়তন স্থানের প্রতিকৃতিকে নকশা বলে।

অভিক্ষেপ : সমতল উপরিভাগের উপর সমগ্র পৃথিবী বা তার কোন অংশের মানচিত্র অংকন করবার জন্য কোন সুনির্দিষ্ট মাপনিতে সুব্যবস্থিত পদ্ধতিতে অক্ষরেখাও দ্রাঘিমারেখাসমূহ দ্বারা সৃষ্ট জালের ন্যায় বিন্যস্ত ছককে অভিক্ষেপ বলে।

মানচিত্র অংকন করার জন্য বিভিন্ন প্রকার আধুনিক যন্ত্রপাতি ও অংকন সহায়ক বিবিধ সামগ্রী সম্বন্ধে যথেষ্ট ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়। ডিভাইডার, পেন্সিল-কম্পাস, কলম-কম্পাস, চাঁদা, রেখা অংকন কলম, T আকৃতির যন্ত্র, প্লাষ্টিক ত্রিভুজদ্বয়, পার্শ্বভাগ উন্নত স্কেল, সমান্তরাল রেখা অংকনের উপযোগী বেলনাকৃতি চাকাবিশিষ্ট রুলার, অঙ্কন টেবিল, বিভিন্ন আকৃতির অক্ষর ও সংখ্যা সম্বলিত U.N.O. স্টেনসিল পাত, Leroy কলম, বিন্দু দেবার উপযোগী Dot pen. কাগজ পেন্সিল, রবার, কালি, রং তুলি, আঠাযুক্ত প্লাস্টিকের ফিতা প্রভৃতি যন্ত্রপাতিও অংকন উপকরণসমূহ অত্যাবশ্যকীয়।

কোন দেশের মানচিত্র অংকন করতে হলে মানচিত্রটিকে পুনঃ পুনঃ দেখে তার বিভিন্ন দিকের মাপের একটি সামঞ্জস্য ও সমানুপাত লক্ষ্য করতে হয়। বিভিন্ন দেশের মানচিত্রের কোন কোন বিষয় বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষিত হয় সে অনুযায়ী অভিক্ষেপ, স্কেল ও নকশার সহায়তায় মানচিত্র অংকন করতে হবে। এরপর বিভিন্ন প্রকার প্রচলিত সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করে বিভিন্ন বিষয় প্রদর্শন করতে হয়।

১। ছকের সাহায্যে : যে দেশের মানচিত্র অঙ্কন করতে হবে প্রথমে সেই দেশের মানচিত্রের উপর একটি সাদা পাতলা কাগজ (Tracing Paper) রেখে তার উপর মানচিত্রের সীমারেখা (Out line) এঁকে নিতে হবে। ঐ সীমারেখা অঙ্কিত কাগজটির উপর লম্বালম্বি এবং আড়াআড়িভাবে রেখা টেনে সমচতুষ্কোণ ছক আঁকতে হবে, ছকের রেখাগুলোর উপরে এবং পার্শ্বে সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত করে দেখতে হবে সীমারেখা কোন ঘরের কোন কোন স্থান দিয়ে গিয়েছে। অনুরূপ আরও একটি কাগজে উপরিউক্তভাবে সমচতুষ্কোণ ছক হাল্কাভাবে এঁকে সীমারেখা যে ঘরের যে স্থান দিয়ে গিয়েছে সেভাবে টেনে দিয়ে ছকগুলো হতে মানচিত্র আঁকা সম্ভব হবে। ইচ্ছা করলে ছক ছোট বা বড় করে মানচিত্র ছোট বা বড় করা যায়।

২। অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশের সাহায্যে : পৃথিবীর আকৃতি গোলাকার। অথচ যে কাগজে আমরা পৃথিবী বা তার অংশবিশেষ আঁকি তা সমতল। একটি ভূগোলককে একখন্ড কাগজ দিয়ে সম্পূর্ণরূপে ঢেকে রাখা যেমন অসম্ভব তেমনি গোলাকার পৃথিবীকেও একখণ্ড কাগজের উপরে সঠিকভাবে আঁকা সম্ভব নয়। একারণে পৃথিবী বা তার অংশবিশেষের মানচিত্র যথাসম্ভব সঠিকভাবে আকার জন্য অভিক্ষেপের (Projection) প্রয়োজন হয়।

একখণ্ড কাগজের উপর অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমারেখাগুলো যথাসম্ভব সঠিকরূপে অংকন করাকে অভিক্ষেপ (Projection) বলে। অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমা দিয়ে খোপ বা ছক বিশিষ্ট অংশকে 'গ্র্যাটিকুলস্' (Graticules) বা গ্রিড (Grid) বলা হয়। এই খোপ বা ছকবিশিষ্ট গ্র্যাটিকুলস্-এর মধ্যেই মানচিত্র আঁকা হয়।একটি অ্যাটলাস (Atlas) লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, পৃথিবীর

বিভিন্ন অংশের মানচিত্র বিভিন্ন অভিক্ষেপের সাহায্যে দেখানো হয়েছে। কোন মানচিত্রে দেখা যাবে অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমারেখা উভয়ই সোজাসুজি অর্থাৎ পরস্পরের লম্বরূপে অবস্থান করছে, কোনটিতে অক্ষাংশগুলো সোজা কিন্তু দ্রাঘিমারেখাগুলো বাঁকা, অপর কোনটিতে অক্ষাংশগুলো সোজা কিন্তু দ্রাঘিমারেখাগুলো বাঁকা, অপর কোনটিতে অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমা উভয়েই বাঁকাভাবে অবস্থান করছে। এভাবে অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমা রেখাগুলোর বিভিন্ন পরিবর্তনের মাধ্যমে সম্ভবত কিছু কিছু সুবিধা পাওয়া যায় যার ফলে কোন কোন বিশেষ দেশ বা মহাদেশ কোন একটি বিশেষ অভিক্ষেপে অন্য যে কোন অভিক্ষেপ অপেক্ষা হয়তো আরও ভালভাবে দেখানো সম্ভব হয়।

ভূ-পৃষ্ঠের যে কোন অংশের সঠিক মানচিত্র আঁকা যদিও অসম্ভব তবুও কোন একটি অভিক্ষেপে কতকগুলো বিশেষ গুণ বজায় রাখা সম্ভব। এই গুণগুলো হলো —

১। আয়তন বজায় রাখা,

২। আকৃতি বজায় রাখা,

৩। স্কেল বজায় রাখা,

৪। দিক বজায় রাখা এবং

৫। আঁকার সুবিধা,

এখন অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ দিয়ে মানচিত্র আঁকতে হলে প্রথমে ছাপা ম্যাপটি দেখে দেশটি পূর্ব পশ্চিমে কত দ্রাঘিমাংশ এবং উত্তর দক্ষিণে কত অক্ষাংশের মধ্যে অবস্থিত তা জানতে হবে। এবং একই কাগজে তত দূরে দূরে উক্ত দ্রাঘিমা ও অক্ষরেখাগুলো আঁকতে হবে তারপর দ্রাঘিমা ও অক্ষরেখাগুলোর সংখ্যা অনুযায়ী সমভাবে ভাগ করে সমান দূরে দূরে দ্রাঘিমা ও অক্ষরেখাগুলো আঁকতে হবে। তারপর ছাপা মানচিত্রে বিভিন্ন দ্রাঘিমা ও অক্ষরেখা হতে দেশটির সীমা কত পূর্বে বা পশ্চিমে এবং উত্তরে ও দক্ষিণে তা দেখে কাগজটিতে কিছু দূরে দূরে কয়েকটি বিন্দু দিয়ে নির্দেশ করতে হবে এবং মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে বিন্দুগুলো যুক্ত করলেই দেশের সীমারেখা আঁকা হয়ে যাবে এবং মানচিত্র আঁকা সম্পূর্ণ হবে।

৩। **জ্যামিতিক কাঠামোর সাহায্যে :** ছকের সাহায্যে মানচিত্র অংকন যেমন সহজ, জ্যামিতিক কাঠামোর সাহায্যে মানচিত্র অংকন তত সহজ নয়। তবে এই পদ্ধতি সাময়িক কঠিন মনে হলেও পরীক্ষার ক্ষেত্রে এটি বিজ্ঞান সম্মত এবং বিধি সম্মত। কোন কোন দেশের মানচিত্রাংকনে তা বেশ সহজ বলে মনে হয় এবং শিখতেও বেশ সহজ হয়। এই প্রকার পদ্ধতি অবলম্বনে মানচিত্র অংকনের পূর্বে একটি জ্যামিতিক কাঠামো অংকন করা হয়। ভারতের মানচিত্র অংকনে এই পদ্ধতিটি বেশ উপযোগী।

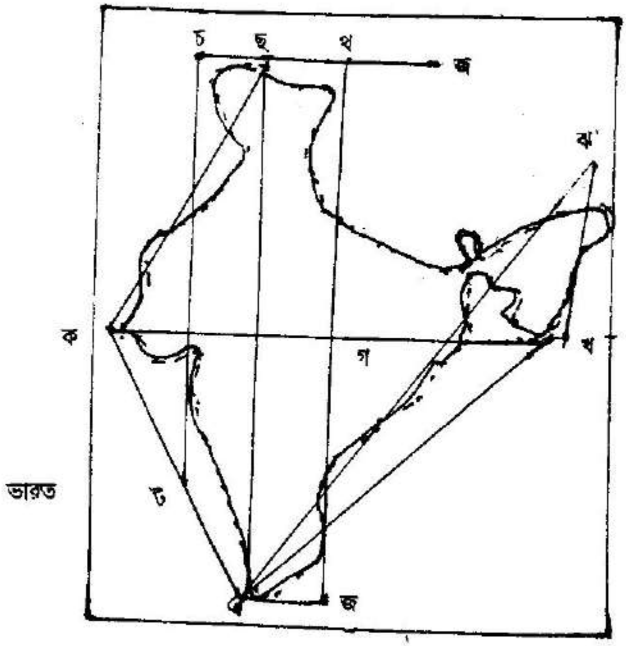

চিত্র - ৫.৭

৫.৫ মানচিত্রের প্রয়োজনীয়তা

(১) ভৌগোলিক পটভূমির সাথে সম্পর্কিত সকল বিষয়ে পঠন পাঠনে মানচিত্র বা গ্লোবের ব্যবহার অপরিহার্য।

(২) ভূগোল, ইতিহাস, অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান পাঠে মানচিত্রের ব্যবহার সর্বাধিক।

(৩) এটি একটি ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা উপকরণ (Traditional Teaching Aid)

(৪) ভূগোল ছাড়াও অন্যান্য সামগ্রিক বিজ্ঞানগুলো যেমন — ইতিহাস, অর্থনীতি, পৌরবিজ্ঞান, সমাজবিদ্যা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়গুলো ভৌগোলিক পটভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং এসব ভৌগোলিক পটভূমিকে দৃষ্টিগ্রাহ্য করবার একমাত্র উপায় হলো মানচিত্র ও গ্লোব।

(৫) রেখা মানচিত্রের সাহায্যে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন মতো নির্দিষ্ট পাঠ্যাংশের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে স্থান, কাল ও ঘটনা সন্নিবেশিত করতে পারেন।

(৬) যেসব শিক্ষক পাঠদানকালে শ্রেণীকক্ষে ব্লাকবোর্ড মানচিত্র আঁকতে পারেন তাঁদের পাঠদান অনেকবেশি হৃদয়গ্রাহী ও জীবন্ত হয়ে উঠে।

(৭) মানচিত্রের সাহায্যে পাঠদান করলে শিক্ষক/শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতা বৃদ্ধি পায় এবং শিক্ষা স্থায়ী হয়।

(৮) বাস্তব অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পায়।

(৯) যেসব শিক্ষক মানচিত্র আঁকায় পারদর্শী নন তাঁরা রেখা মানচিত্রের সাহায্যে প্রয়োজন মতে নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, শহর-নগর প্রভৃতির অবস্থান ব্লাকবোর্ডে লিখে দিলে বা নির্দেশ করলে ব্লাকবোর্ডে আঁকা মানচিত্রের উপযোগিতা কিছুটা লাভ করা যায়।

(১০) ভৌগোলিক ও গাণিতিক ভূগোল পাঠদানকালে গ্লোবের ব্যবহার খুবই কার্যকরী। কারণ এখানে উল্লেখযোগ্য প্রাকৃতিক বিষয়, অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ, আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা ও বিভিন্ন প্রাকৃতিক অঞ্চলের বিবরণ দেয়া থাকে। ফলে পৃথিবীর যেকোন স্থান নির্ণয় করতে গ্লোব খুবই অপরিহার্য। তবে ছোট সীমিত স্থানের বিবরণ পঠন পাঠনের সময় গ্লোবের কার্যকরিতা আপেক্ষিকভাবে কম। তবে পৃথিবীর আকৃতির সাথে সম্পর্কিত বিষয় সমূহ গ্লোবের কার্যকরিতা আপেক্ষিকভাবে কম। তবে পৃথিবীর আকৃতির সাথে সম্পর্কিত বিষয় সমূহ যেমন, দিন রাতের হ্রাস-বৃদ্ধি বা ঋতু পরিবর্তন প্রসঙ্গে বিভিন্ন ধরনের গ্লোবের ব্যবহার অপরিহার্য।

(১১) মানচিত্র কেবল যে ভূগোলবিদদেরই কাজে লাগে তা নয়। এটি প্রায় প্রতিটি নাগরিকের বিশেষত পর্যটক, প্রশাসক, পরিকল্পনা বিশারদ, স্থপতি, প্রকৌশলবিদ এমনকি সাধারণ মানুষেরও বিশেষ প্রয়োজনে লাগে। কারণ মানচিত্রে অল্প পরিসর স্থানের মধ্যে অতি নিখুঁতভাবে বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে খবর বা সংবাদের ভাণ্ডার পরিবেশিত হয়।

(১২) বিভিন্ন দেশের মানচিত্র পাশাপাশি রেখে তুলনামূলক আলোচনা করা যেতে পারে। তাছাড়া বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে একই দেশের মানচিত্র উপস্থাপন করে ঐ দেশ সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান দিতে পারে।

৫.৬ মানচিত্রের গুরুত্ব ও ব্যবহার

সামাজিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা পাঠ দেয়ার কার্যকর করার ক্ষেত্রে মানচিত্রের ভূমিকা অপরিসীম, মানচিত্র ব্যতিরেকে ভূগোল শিক্ষাদান অনেকটা বৈঠাহীন নৌকার মতো। অর্থাৎ ভূগোলের পাঠদানের জন্য মানচিত্রের প্রয়োজন অপরিসীম।

ভূগোল সম্বন্ধে ধারণা সম্পূর্ণ করতে হলে মানচিত্রের জ্ঞান অত্যাবশ্যক। ভূগোল শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে মানচিত্রের বহুল ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। ভূগোল শিক্ষাদানের বিভিন্ন স্তরে

শিক্ষাসহায়ক উপকরণ (Teaching Aids) হিসেবে মানচিত্র ব্যবহৃত হয়। উচু শ্রেণীতে মানচিত্র অংকন শিক্ষা দেয়া হয়। মানচিত্রে কেবল দেশ বা দেশাংশের সীমা পাহাড়–পর্বত, নদ–নদী, হ্রদ, বন, প্রান্তর প্রভৃতির অবস্থান দেখানো হয় না। বিভিন্ন স্থানে স্থলভাগের বন্ধুরতা, পর্বতের উচ্চতা, সাগরের গভীরতা, নদী–বায়ু, সমুদ্রস্রোত প্রভৃতি কোন দিক হতে কোন দিকে প্রবাহিত হচ্ছে, সমবর্ষণ, সমচাপ, সমোষ্ণ রেখাসমূহের বিন্যাস প্রভৃতি নানা বিষয় মানচিত্রে দেখানো হয়। অর্থাৎ পাহাড়–পর্বত,নদী, সাগর, উপসাগর, মহাসাগর প্রভৃতির যথাযথ অবস্থান মানচিত্রের মাধ্যমে করা যায়। বিভিন্ন আগ্নেয়গিরির অবস্থান ও ভূমিকম্প প্রধান এলাকাগুলো মানচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপিত করা যায়। বিভিন্ন ধরনের জলবায়ুকে মানচিত্রের মাধ্যমে অতি সহজেই দেখানো যায়, বিভিন্ন স্থানের বৃষ্টিপাতের তারতম্য মানচিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়। সমোচ্চরেখার মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের উচ্চতা দেখানো যায়, বিভিন্ন স্থানের স্বাভাবিক উদ্ভিদ ও জীবজন্তু মানচিত্রে প্রকাশ করা যায়। অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমারেখা যথাস্থানে সন্নিবেশিত করে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের যথাযথ অবস্থান অত্যন্ত সহজে ও বৈজ্ঞানিকভাবে মানচিত্রের মাধ্যমে দেখানো যায়। প্রাকৃতিক ভূগোলের ক্ষেত্রে মানচিত্র তাই অপরিহার্য, কারণ মানচিত্রের মাধ্যমে প্রাকৃতিক ভূগোলের বিভিন্ন বিষয় সুন্দরভাবে প্রকাশ করা যায়। মানচিত্রের মাধ্যমে প্রাকৃতিক ভূগোল শিক্ষাদান করলে শিক্ষার্থীরা সহজে যথাযথভাবে বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারে, পাঠদানও সহজ ও বৈজ্ঞানিক হয়। মানচিত্র সম্বন্ধে এরূপ ব্যাপক অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করতে পারে। ভূগোল শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে মানচিত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। তাই ভূগোল অনুশীলনের জন্য মানচিত্রের ব্যাপক ব্যবহার অপরিহার্য, ভূগোলের জ্ঞানকে দীর্ঘস্থায়ী করার উদ্দেশ্যে শ্রেণীকক্ষে মানচিত্রের ব্যবহার সর্বজনস্বীকৃত।

ভূগোল শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে মানচিত্রের বহুল ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়, ভূগোলের অনেক জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মানচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপিত করা যায়। সবচেয়ে বড় গুণ হলো মানচিত্রের সার্থক উপস্থাপনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মনোযোগ আকর্ষিত করা, যাতে জ্ঞান দীর্ঘস্থায়ী হয়। নিম্নে মানচিত্রের মাধ্যমে শিক্ষা শিক্ষার্থীকে কি সুবিধা দান করে তা উল্লেখ করা হলো :

(১) মানচিত্রের ব্যবহার ভূগোলের জ্ঞানকে সম্পূর্ণ করে, ধারণাকে স্পষ্ট করে।

(২) বিশাল পৃথিবীর নানাবিধ জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপলব্দি করতে মানচিত্র অনেকখানি সাহায্য করে।

(৩) মানচিত্র কোন স্থানের সঠিক অবস্থান জানতে সাহায্য করে।

(৪) মানচিত্রের সাহায্যে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের সঠিক অবস্থান ধারণা করা যায়।

(৫) মানচিত্রের সাহায্যে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের বন্ধুরতা জানা যায়।

(৬) মানচিত্রের মাধ্যমে পৃথিবীর গঠনের সম্পর্কেও জানা যায়।

(৭) মানচিত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন স্থানের বৃষ্টিপাতের তারতম্য জানা যায়। অর্থাৎ স্থানভেদে জলবায়ুর বিভিন্নতার হেতুগুলো জানা যায়।

(৮) মানচিত্রের মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের জনসংখ্যার ঘনত্বও দেখানো যায়। মানচিত্র ভূগোল শিক্ষার এমন একটি উপকরণ যা সম্পূর্ণ পৃথিবী সম্পর্কে শিক্ষার্থীকে ধারণা দেবার চেষ্টা করে। পৃথিবীর এক কোনে বাস করেও পুরো পৃথিবী সম্পর্কে একটা ধারণা মানসপটে স্থান করে নেয়।

৫.৭ মানচিত্র ব্যবহারের জন্য সর্তকাবলি

ভূগোল শিক্ষক তাঁর পঠনীয় অংশটি শিক্ষার্থীর কাছে প্রানবন্ত ও ফলদায়করূপে মানচিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরতে পারেন। কিন্তু মানচিত্র ব্যবহার করার সময় শিক্ষককে সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। যেমন —

(১) মানচিত্র সঠিক ও নির্ভুল হবে।

(২) মানচিত্রটি যে বিষয়ের জন্য ব্যবহৃত, ঐ বিষয়ের নামকরণ মানচিত্রে থাকা প্রয়োজন।

(৩) তথ্য যথাযথ হতে হবে।

(৪) স্কেল মেনে চলতে হবে।

(৫) মানচিত্র অংকন সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে হবে এবং পদ্ধতি গাণিতিক ও জ্যামিতিক নিয়মে অনুসৃত হবে।

(৫) মানচিত্র অংকনের সময় অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখা যথাযথ ও নির্ভুলভাবে বিন্যস্ত করতে হবে।

Mackindar-র ভাষায় As a teacher he would make map speak. মানচিত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষককে অবশ্যই দক্ষ এবং অভিজ্ঞ হতে হবে, অন্যথায় সমস্ত আয়োজনই বৃথা হয়ে যাবে। একই মানচিত্রে বিভিন্ন বিষয়ের অবতারণা করে জটিল করা যাবে না। মনে রাখতে হবে শিক্ষার্থীর শিখন কাজকে ত্বরান্বিত এবং দীর্ঘস্থায়ী করার জন্যই মানচিত্রের ব্যবহার, কাজেই এদিকে খেয়াল রাখতে হবে। এ ব্যাপারে Edgar Dale তাঁর Audio-visual Methods in teaching — এ মন্তব্য করেছেন —

"To a student, a map can be an instrument of enor mous aid and enrichment, a source of unending enlightenment throughout his entire life. Unfortunately some teachers introduce maps so formally and in so meaningoless a fashion that many children consider them a vague and unreal device of little practical value. Our duty as teachers is tomake the map what it is and what it should be an indispensable tool for understanding the whole earth or any part of its surface. We must approach the subjet of flat maps with genuine awareness of the possibilities as well as the problems."

উপরোক্ত মন্তব্য থেকে এটি স্পষ্ট যে মানচিত্রের ব্যবহারের দক্ষতার উপরই ভূগোলের জ্ঞানকে সহজ ও সুন্দর করার প্রয়াস পরিচালিত হয়। এক্ষেত্রে স্মরণ রাখতে হবে মানচিত্র শুধু নিছক একটি শিক্ষা উপকরণ নয়, এটি বিষয়বস্তুও বটে। অর্থাৎ বিষয়বস্তুর অনেকখানি মানচিত্র ধারণ করে থাকে। কাজেই শিক্ষকের কর্তব্য হবে সহজ সরল ভাষায় মানচিত্রের সাহায্যে বিষয়বস্তুকে উপস্থাপন করা। একাজে তিনি শিক্ষার্থীদেরও তাঁর সাথে মানচিত্র ব্যবহার করাতে পারেন। এতে তাদের অনুশীলন বাড়বে এবং মানচিত্র ব্যবহারের ভীতি দূর হবে। ছাত্ররা যদি বার বার অনুশীলন করে মানচিত্র ব্যবহার আয়ত্ত করে নিতে পারে তবে তাদের জ্ঞান আহরণ সহজ হবে এবং দীর্ঘস্থায়ী হবে। এতে মানচিত্র ব্যবহারের ভীতি দূর হবে।

৫.৮ মানচিত্র অংকনের কতিপয় সমস্যা

মানচিত্র অংকনের প্রধান সমস্যাগুলো হল :

১। যথাযথ স্কেল নির্বাচন।

২। যথাযথ অভিক্ষেপ নির্বাচন।

৩। মানচিত্রে বিভিন্ন তথ্য সন্নিবেশ করণ : যেমন —

(ক) ভূ-পৃষ্ঠের প্রাকৃতিক অবস্থা ও বৈশিষ্ট্য

(খ) মনুষ্য সৃষ্ট অবস্থা সমূহ — যেমন ভূমির ব্যবহার, যাতায়াত ব্যবস্থা, জন বসতি ইত্যাদি।

৪। রং এর ব্যবহার এবং মুদ্রণ।

৫। ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগ বক্র এবং ইহার উপরস্থ ভূ-প্রকৃতি, বনভূমি, ইমারত ইত্যাদি হচ্ছে ত্রিমাত্রিক (Three Dimensional) অথচ মানচিত্রে প্রদর্শিত খণ্ডসমূহ হচ্ছে দ্বিমাত্রিক (Two Dimensional)। অতএব ভূ-পৃষ্ঠের হুবহু চিত্রাংক মানচিত্রে সম্ভব হয় না। তবে ভূ-গোলকের সাহায্যে পৃথিবীর গোল আকার বা বক্রতা দেখান যায়।

৬। ভূ-পৃষ্ঠের খুঁটিনাটি তথ্য এক সাথে একই মানচিত্রে দেখানো যায় না।

৫.৯ মানচিত্রের স্কেল এবং উদ্দেশ্যভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ

ছকে মানচিত্রের স্কেলের ভিত্তিতে এবং প্রয়োজন বা উদ্দেশ্যভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ দেখান হলো :

মানচিত্রের শ্রেণীবিভাগ

স্কেলের ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাগ

১. নকশা বা খতিয়ান
(Cadastral map)

২. ভূ-সংস্থানিক বা ভূমির বন্ধুরতার মানচিত্র (Topographical map)

৩. দেয়াল মানচিত্র
(Wall map)

৪. মানচিত্রাবলি
(Atlas maps)

প্রয়োজন বা উদ্দেশ্যভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ

১. ভূ-প্রকৃতি বা বন্ধুরতার মানচিত্র
(Physical or Relief map)

২ ভূ-তাত্ত্বিক মানচিত্র
(Geological map)

৩. উদ্ভিজ্জ মানচিত্র
(Vegetation map)

৫. আবহাওয়া মানচিত্র
(Weather map)

৬. ভূমি ব্যবহারের মানচিত্র
(Land utilization)

৭. যাতায়ত মানচিত্র
(Communication map)

৮. মৃত্তিকা মানচিত্র
(Soil map)

৯. রাজনৈতিক মানচিত্র
(Political map)

১০. তথ্য সংক্রান্ত মানচিত্র
(Statistical map)

১১. সমুদ্রে চলাচলের মানচিত্র
(Navigational map)

১২ আন্তর্জাতিক মানচিত্র
(International map)

১৩. ঐতিহাসিক মানচিত্র
(Historical map)

১৪. সামাজিক মানচিত্র
(Social map)

১৫. লোক বসতির মানচিত্র
(Settlement map) ইত্যাদি।

৫.১০ বণ্টন মানচিত্র অংকনের কৌশলভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ

অংকনের কৌশল ভিত্তিতে বণ্টন মানচিত্রের পদ্ধতিগত শ্রেণীবিভাগ নিচে উল্লেখ করা হল :

১। রং এর সাহায্যে — Colour or Tint or Choroschematic.

২। প্রতীক এর সাহায্যে — Symbol or Choroschematic.

৩। সমান রেখার সাহায্যে — Isopleths.

৪। ছায়ার সাহায্যে — Shading or Choropliths.

৫। ফোঁটার সাহায্যে — Dot method.

৬। রৈখিক লেখ চিত্রের সাহায্যে — Line graph.

৭। স্তম্ভ লেখ এর সাহায্যে — Bargraph.

৮। বৃত্তের (পাইচার্ট) সাহায্যে — Pie-Diagram.

৯। বর্গের সাহায্যে — Square.

১০। গোলকের সাহায্যে — Sphere.

১১। তারকা চিত্রের সাহায্যে — Asterisk.

১২। অন্যান্য চিত্রের সাহায্যে — Others.

৫.১১ মানচিত্রে ব্যবহারের জন্য রংসূচি

মানচিত্রে ব্যবহার করার জন্য ভূগোলবিদগণ আন্তর্জাতিকভাবে একটি রং এর সূচি প্রণয়ন করেছেন। নিচে এই রং সূচি উল্লেখ করা হল :

	মানচিত্রের ভূমির ব্যবহার	ব্যবহৃত রং
১।	জন বসতি (Settlement)	ঘনলাল (Deep red)
২।	চাষ বহির্ভূত জমি (Associated nonagricultural land)	হালকা লাল (Light red)
৩।	চাষের জমি (Crop land)	বাদামি (Brown)
৪।	দীর্ঘস্থায়ী বৃক্ষ (Perennial trees)	রক্ত বেগুনি (Purple)
৫।	শাক-সব্জী ক্ষেত (Horticulture)	ঘনরক্ত বেগুনি (Deep purple)
৬।	বনভূমি (Forest)	সবুজ(Green)
৭।	অনুন্নত চারণ ভূমি (Un improved grazing land)	কমলা (Orange)
৮।	পাকা রাস্তা (Metalled road)	লাল রেখা (Red line)

৯।	কাঁচা রাস্তা (Unmetalled road)	লাল বিচ্ছিন্ন রেখা (Broken red line)
১০।	জলাশয় (Water bodies)	নীল (Blue)

৫.১২ মানচিতে ব্যবহৃত স্কেল ও উহার শ্রেণীবিভাগ

মানচিত্রের স্কেল কি :

ভূ-পৃষ্ঠস্থ দূরত্ব এবং মানচিত্রের অনুরূপ অংশের দূরত্বের অনুপাতকে স্কেল বলে। স্কেল তিন প্রকার। যথা —

১। লিখিত বা বর্ণনামূলক স্কেল (উদাহরণ — ১'' = ৫ মাইল, ১'' = ২৫ মাইল ইত্যাদি)

২। অঙ্কিত স্কেল (উদাহরণ একটি সরল রেখার ভূমির উপর দূরত্ব উল্লেখ করা হয়)

৩। প্রতীক ভগ্নাংশ Representative Fraction সংক্ষেপে R.F)

উদাহরণ — এক ইঞ্চিতে এক মাইল হলে R.F. কত হবে।

১'' = ১ মাইল

বা ১'' = ১ × ১৭৬০ × ৩ × ১২ ইঞ্চি

∴ R.F হবে ১:৬৩৩৬০

অনুরূপভাবে ৫ সেন্টিমিটারে এক কিলোমিটার হলে R.F কত হবে।

৫ সে.মি. = ১ কি.মি.

বা, ৫ সে.মি. = ১ × ১০০০ × ১০০ সে.মি.

বা, ১ সে.মি. = $\frac{১০০০০০}{৫}$ = ২০০০০ সে.মি.

∴ R.F হবে — ১ : ২০০০০

ষষ্ঠ অধ্যায়

পাঠ-পরিকল্পনা

৬.১ ভূমিকা

যেভাবেই শিক্ষাদান করা হোক না কেন তার মূল উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীকে নতুন ও কাঙ্ক্ষিত অভিজ্ঞতা অর্জনে সাহায্য করা। আধুনিক সভ্যসমাজে যোগ্য নাগরিক হয়ে বাস করতে হলে এবং নিজের অস্তিত্বকে তৃপ্তিকর করে তুলতে হলে প্রতিটি ব্যক্তিকেই নতুন নতুন জ্ঞান ও কৌশল আয়ত্ত করতে হয়। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে পৃথিবীতে জ্ঞান ও কৌশলের পরিমাণ সীমাহীন। কোন মানুষের পক্ষেই তা সম্পূর্ণ আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। বস্তুত ক্ষেত্রে আমরা যেভাবে জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার দেখা পাই সেগুলো নিতান্তই খণ্ড খণ্ড এবং বিশৃঙ্খলভাবে থাকে। এগুলোকে আহরণ করা অত্যন্ত কষ্টকর। বিশেষ করে শিশুকিশোরদের ক্ষেত্রে এক রকম অসম্ভব বললেও অত্যুক্তি হবে না। কাজেই সেগুলোকে শিক্ষার্থীদের আহরণের জন্য সহজ ও যোগ্য করে তুলতে হলে প্রয়োজন অবিন্যস্ত ও বিশৃঙ্খল জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে সুশৃঙ্খল ও পরিকল্পনার সঙ্গে সাজান, এজন্য শিক্ষার্থীর পূর্বজ্ঞান, মানসিক ক্ষমতা, বয়স, রুচি, আগ্রহ, পরিবেশ ইত্যাদি বিচার করে শিক্ষার্থীর অর্জিত অভিজ্ঞতাগুলোকে সুবিভক্ত ও সুবিন্যস্ত করা একান্ত আবশ্যক। আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষাদানের এই মৌলিক নীতিটিকেই পাঠ-পরিকল্পনা নাম দেয়া হয়েছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, সার্থক শিক্ষা যেমন একদিকে উপযুক্ত শিক্ষক এবং উন্নত পদ্ধতির উপর নির্ভর করে তেমনি অপর দিকে প্রচুর পরিমাণে নির্ভর করে পাঠদানের সুষ্ঠু পরিকল্পনার উপর। এজন্যই বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় পাঠ পরিকল্পনাকে কার্যকর শিক্ষাদানের অপরিহার্য অঙ্গ বলে ধরা হয়।

৬.২ পাঠ পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা

শিক্ষকের পাঠ পরিকল্পনার প্রয়োজন, কারণ —

১। এটি তার প্রতিদিনের কার্য-সূচির একটি পরিষ্কার ধারণা দেয়।

২। এটিতে তার শ্রেণি শিক্ষাদান কাজের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে।

৩। এটিতে তার পরিশ্রম ও সময় পরিকল্পিত ভাবে ব্যয় হয়। অর্থাৎ পরিশ্রম লাঘব হয় এবং সময়ের অপচয় হয়না।

৪। শিক্ষার্থীরা অধিক মনোযোগ ও মননশীলতার সাথে পাঠ গ্রহণ করতে পারে।

৫। উপকরণ ও শিক্ষাদানের জন্য প্রয়োজনীয় অন্য সব সামগ্রী সংগ্রহ করতে সাহায্য করে।

৬। এটি অতীতের সমস্ত অনুশীলনীর সাথে বর্তমান পাঠের অনুশীলনীর যোগসূত্র স্থাপন করে।

৭। এটির সাহায্যে সীমিত সময়ের মধ্যে পরিপূর্ণ তৃপ্তি সহকারে পাঠদান করতে সমর্থ হয়।

৮। এটি তৈরি করে পাঠদান করলে শিক্ষকের ব্যক্তিগত ত্রুটি-বিচ্যুতি শোধরিয়ে নিতে পারে।

৯। এটি শিক্ষককে উত্তম প্রশ্ন করার ব্যপারে যথেষ্ট সাহায্য করে।

১০। পাঠ টীকা ব্যতিত শ্রেণি কক্ষে এত স্বল্প সময়ের মধ্যে অধিক প্রশ্ন প্রস্তুত করে পাঠ পরিবেশন ও মূল্যায়ন করা যায় না।

৬.৩ সার্থক পাঠ পরিকল্পনার লক্ষণ/বৈশিষ্ট্য

১। একটি সুষ্টু পাঠ পরিকল্পনায় পরিকল্পনা আনুষ্ঠানিক ও লিখিত শর্তসহ পরিপূর্ণরূপে পরিবেশন করতে হয়। (লিখিত হবে)

২। সুষ্টু পাঠ পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হবে সুস্পষ্ট এবং বিষয়বস্তুর সাথে অর্থবহ ও ভাবধারার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। (বিষয়বস্তুর সাথে সংশ্লিষ্ট হবে)

৩। পাঠ পরিকল্পনার সোপান যতগুলো থাকুক না কেন তাদের পরস্পারের মধ্যে থাকবে ধারাবাহিকতা ও পারস্পরিকতা, যাতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে শিক্ষক শেষ সোপানের দিকে এগিয়ে যেতে পারেন। (ধারাবাহিকতা থাকবে)

৪। উত্তম পাঠ পরিকল্পনার প্রশ্নগুলো হবে সোপানভিত্তিক এবং উৎকৃষ্ট প্রশ্নের বৈশিষ্ট্যযুক্ত। যেমন অভিযোজন বা প্রয়োগ পর্বে যে প্রশ্ন থাকবে তার উত্তরের মাধ্যমে যেন পূর্ব নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলো সুস্পষ্ট হয়। (সুচিন্তিত প্রশ্নাবলি ও সংগতিপূর্ণ মূল্যায়ন কৌশল থাকবে।

৫। উত্তম পাঠ পরিকল্পনার বিষয়ের বৈশিষ্ট্য ও শিক্ষার্থীর প্রয়োজন অনুসারে বর্ণনা, ব্যাখ্যা, আলোচনা, শিক্ষোপকরণ ব্যবহার, শিক্ষার্থীর সক্রিয়তার সুযোগ প্রভৃতি লিখিত থাকবে। (উপকরণ, কৌশল বা পদ্ধতির উল্লেখ থাকবে)

৬। সার্থক পাঠ পরিকল্পনায় থাকবে রেফারেন্স পুস্তক, সহায়ক পুস্তক, পত্রপত্রিকা ইত্যাদি পাঠের নির্দেশ। (সহায়ক তথ্যাবলি প্রাপ্তির উৎস থাকবে)

৭। সার্থক পাঠ পরিকল্পনায় বিদ্যালয়ের পাঠদানের সময় সীমার অনুপাতে রচিত হবে (পরিকল্পিত সময়ের ব্যবহার উল্লেখ থাকবে।)

৮। সর্বোপরি শ্রেণি শিক্ষাদানকালে শিক্ষার্থীকে যাতে কর্মচঞ্চল রাখা যায় তার ব্যবস্থা থাকবে। (কর্ম চঞ্চলতা থাকবে)

৬.৪ পাঠ পরিকল্পনার গুণাবলি

১। এটি দিনের পাঠটিকে শিক্ষকের কাছে সুনির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ করে দেয়।

২। এটিতে শিক্ষকের আত্মপ্রস্তুতি ও শিক্ষাদান দুইই সহজ হয়ে উঠে।

৩। এতে অধ্যাপনার গতি ও পথের উপর শিক্ষক তাঁর সকল নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে পারেন।

৪। পাঠ পরিকল্পনায় আগে থেকে সময়ের বিভাজন ও বন্টনটিও স্থির করে রাখতে পারেন বলে শ্রেণি শিক্ষায় শিক্ষকের সময় এবং শ্রম দুয়েরই অপচয় কম হয়।

৫। পাঠ পরিকল্পনা শিক্ষাকে অনেক বেশি সার্থক ও কার্যকর করে তোলে এবং শিক্ষাদানের মানকে উন্নত করে।

৬। পাঠ পরিকল্পনার সাহায্যে শিক্ষক তাঁর নিজের যা কিছু উৎকৃষ্ট ও উত্তম তা সম্পূর্ণভাবে শিক্ষার্থীকে দান করতে পারেন এবং পাঠটিকে সম্পূর্ণ সার্থক করে তোলার প্রতি তাঁর মনোযোগ নিবদ্ধ রাখতে তৎপর থাকেন।

৭। পাঠ পরিকল্পনা সুনির্দিষ্ট ও সুপরিকল্পিত হওয়ায় শিক্ষার্থীর কাছে পাঠটি সহজ গ্রহণ যোগ্য ও তৃপ্তিকর হয়ে উঠে এবং তাদের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত শৃঙ্খলার জন্ম দেয়।

৮। সম্পূর্ণ শিক্ষা বর্ষের জন্য নির্দিষ্ট পাঠক্রমটি অল্পায়াসে এবং যথাসময়ে শেষ করা একমাত্র সুচিন্তিত পাঠ পরিকল্পনার সাহায্যেই সম্ভবপর হয়।

৯। প্যাঠ পরিকল্পনার পাঠ বিষয় বস্তুটির সংশোধন ও রসবোধে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করে।

১০। পাঠ পরিকল্পনার ক্ষেত্রেই শিক্ষা পদ্ধতির পূর্ণ ও সার্থক প্রয়োগ করা সম্ভব হয় এবং তার ফলে শিক্ষাদান বিজ্ঞানসম্মত হয়ে উঠতে পারে।

১১। একমাত্র পাঠ পরিকল্পনার ফলেই অবাস্তবতা, অপ্রাসংগিকতা, পুণরুক্তি ইত্যাদি দোষাবলি থেকে শিক্ষক তাঁর শিক্ষাদানকে মুক্ত রাখতে পারেন।

৬.৫ পাঠ পরিকল্পনার দোষাবলি

যথাযথ বিবেচনা এবং বিচার বুদ্ধির সাহায্যে পাঠ পরিকল্পনা রচনা করা না হলে পাঠ পরিকল্পনা শিক্ষাদানের প্রতিবন্ধকও হয়ে উঠতে পারে। যেমন —

১। শিক্ষকের নিজস্ব উপলব্ধি, অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি এই তিনের মিশ্রণ থেকে অতি স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষা প্রক্রিয়াটির জন্ম হয়। একে বাঁধা ধরা পরিকল্পনার ছকে ফেলা যায় না। ছকে ফেলার চেষ্টা করলে সম্পূর্ণ শিক্ষাদানটিই যান্ত্রিক ও কৃত্রিম হয়ে উঠবে।

২। পাঠ পরিকল্পনার একটি বড় দোষ হল যে, সাধারণত এর সংগঠনটি একঘেয়েমী হয়ে থাকে। অর্থাৎ এক বিদ্যার দ্বারা সমর্থিত সোপান অনুযায়ী পাঠ পরিকল্পনাটি রচনা হয়ে থাকে।

৩। জার্মান শিক্ষাবিদ — জোহান ফ্রেডারিক হার্বার্ট (১৭৭৬–১৮৪১) অবশ্য মনোবিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতিতে পাঠ পরিকল্পনার পঞ্চ সোপানের উদ্ভাবন করেছিলেন। কিন্তু আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের গবেষণায় হার্বার্টের সংখ্যাটি অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ বলে প্রমাণিত হয়েছে। সেদিক দিয়ে হার্বার্টিয় পন্থায় পাঠ পরিকল্পনা ত্রুটিপূর্ণ হতে বাধ্য।

৪। হার্বার্টের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে আর একটি অভিযোগ হলো যে, এটির মধ্যে শিক্ষার্থীর নিজস্ব প্রচেষ্টার কোনও স্থান নেই। জন ডিউই হার্বার্টিয় পরিকল্পনার এই নিষ্ক্রীয়তার তীব্র সমালোচনা করেছেন।

৫। সর্বশেষে আধুনিক শিক্ষাবিদদের মতে সক্রিয়তাভিত্তিক পাঠ পরিকল্পনাই শিক্ষাদানের একমাত্র কার্যকর পদ্ধতি। জন ডিউই (১৮৫৯–১৯৫২) হার্বার্টিয় পরিকল্পনার প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে তাঁর সক্রিয়তাভিত্তিক সমস্যা পদ্ধতির Problem method পাঠ পরিকল্পনাটি উপস্থাপিত করেন। পরে কিল প্যাট্রিক সেই সমস্যা পদ্ধতিটিকে ভিত্তি করেই তার প্রসিদ্ধ প্রজেক্ট পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন। প্রজেক্ট হলো সম্পূর্ণ সক্রিয়তা ভিত্তিক একটি পাঠ পরিকল্পনা।

৬.৬ পাঠ পরিকল্পনায় হার্বার্টের সোপান সমূহ

যে কোন বিষয়ে (Subject) পাঠ পরিকল্পনায় শিক্ষাবিদ হার্বার্টের (Herbart) সোপানগুলো বর্তমানে শ্রেণি-শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। তবে অবশ্যই কিছুটা সংশোধিত আকারে। হার্বার্টের সোপানগুলো হল :

১। স্পষ্টতা (Clearness)

২। সংযোগ (Association)

৩। সূত্র নির্ধারণ বা সাধারণীকরণ (Generalisation)

৪। পদ্ধতি (Method)

হার্বার্টের উপরিউক্ত সোপানগুলোর সংগে তাঁর সুযোগ শিষ্য Ziller আর একটি সোপান যুক্ত করে তার নাম দিয়েছেন উদ্দেশ্য (Aim)। বিগত কয়েক দশকে শিক্ষা ক্ষেত্রে পদ্ধতি নিয়ে

নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে এবং হার্বার্টের সোপানগুলোই সংশোধিত আকারে গৃহীত হয়েছে। বর্তমানে পাঠ পরিকল্পনার ক্ষেত্রে মুখ্যত চারটি সোপানের উপর বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়. এগুলো হলো :

১। উদ্দেশ্য (Aim) আধুনিককালে Objective বলে।
২। প্রস্তুতি বা আয়োজন (Preparation)
৩। উপস্থাপন (Presentation)
৪। অভিযোজন (Application)

উল্লেখযোগ্য যে "পাঠ পরিকল্পনার শেষ কথা বলে কোন কথা নেই।" তবু বর্তমানে শিক্ষাবিদদের দ্বারা সমর্থিত এবং ব্যবহৃত একটি আদর্শ পাঠ পরিকল্পনার ছকে বিভিন্ন সোপান গুলো দেখানো যেতে পারে।

একটি নমুনা পাঠ পরিকল্পনা

শিক্ষকের নাম	বিষয় — ভূগোল
বিদ্যালয়ের নাম	সাধারণ পাঠ — বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি
শ্রেণি — নবম	আজকের পাঠ — "পাহাড়িয়া অঞ্চল ও
শিক্ষার্থীর সংখ্যা	পুরাতন পলল গঠিত চত্বরভূমি"
শিক্ষার্থীদের বয়সের গড়	
পিরিয়ড — ৫ম	
সময় — ৪০ মিনিট	
তারিখ	

উদ্দেশ্য : ১। পাহাড়িয়া অঞ্চল ও পুরাতন পলল গঠিত চত্বরভূমির ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য
(আচরণিক) সম্পর্কে বলতে ও লিখতে পারবে।

২। মানুষের জীবন-যাত্রা প্রণালীতে ভূ-প্রকৃতি কি প্রভাব বিস্তার করে তার বিবরণ দিতে পারবে।

৩। বাংলাদেশের মানচিত্র অঙ্কন করে ভূ-প্রাকৃতিক বিভাগগুলোর অবস্থান চিহ্নিত করতে পারবে।

৪। বিভিন্ন মডেল — পাহাড়, চত্বরভূমি, সমভূমি ইত্যাদি তৈরি করতে পারবে।

ধারণা বা জ্ঞান

১। বাংলাদেশ একটি বিস্তীর্ণ সমতলভূমি হলেও এতে কিছু কিছু বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়।

২। দেশের উত্তরপূর্ব, পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্বে রয়েছে পাহাড়িয়া অঞ্চল, সমতল ভূমি হতে এদের উচ্চতা ৩০ থেকে ৬১০ মিটার।

৩। দেশের উত্তর পশ্চিম, মধ্য ও পূর্বদিকে এবং দক্ষিণ পূর্বে রয়েছে বরেন্দ্রভূমি, মধুপুর ও ভাওয়ালের গড়, লালমাই পাহাড় দিয়ে গঠিত চত্বরভূমি। এদের উচ্চতা ৬ থেকে ৪৫ মিটার।

৪। পাহাড়ি অঞ্চল কৃষিকাজের জন্য তেমন উপযোগী নয়, বরেন্দ্রভূমি ও মধুপুর গড়ের কিছু কিছু অংশ বেশ উর্বর।

উপকরণ : সাধারণ — শ্রেণিকক্ষের সাধারণ উপকরণ

বিশেষ – (ক) বাংলাদেশের ভূ-প্রাকৃতিক বিভাগ সম্বলিত মানচিত্র (হাতে আঁকা)।

(খ) বাংলাদেশের প্রাকৃতিক মানচিত্র প্রথম উপকরণের পরিপূরক হিসাবে ব্যবহৃত হবে।

(গ) বিভিন্ন মডেল – পাহাড়, চত্বরভূমি, সমভূমি বোঝানোর জন্য।

সোপান	বিষয়	পদ্ধতি: শিক্ষকের কাজ	শিক্ষার্থীর কাজ
প্রস্তুতি	পূর্বজ্ঞান পরীক্ষা ও মানসিক পরিবেশ সৃষ্টি	নিচের প্রশ্নগুলোর সাহায্যে পূর্বজ্ঞান পরীক্ষা করে শিক্ষক আজকের পাঠের উপযোগী মানসিক পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।	শিক্ষার্থীরা তাদের পূর্বজ্ঞান থেকে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবে।

	(১) তোমরা বাংলাদেশের কোন কোন জায়গায় বেড়াতে গেছ?	(১) চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, সোনার গাঁ, ময়নামতি ইত্যাদি।
	(২) চট্টগ্রাম এর ভূমি কি রকম?	(২) কোথায়ও সমতল ভূমি, কোথায়ও বা পাহাড়।
	(৩) সোনারগাঁ এর ভূমি কেমন?	(৩) সোনারগাঁ এর ভূমি সমতল।
	(৪) কোথাও উঁচু, কোথাও সমতল ভূমি, ভূমির এই বিভিন্ন প্রকৃতিকে ভূগোলের ভাষায় কি বলে?	(৪) ভূমির বিভিন্ন প্রকৃতিকে ভূগোলের ভাষায় ভূ-প্রকৃতি বলে
পাঠ ঘোষণা	"এসো আজ তাহলে আমরা বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতির প্রথম দুটি বিভাগ পাহাড়িয়া অঞ্চল ও পুরাতন পলল গঠিত চত্বরভূমি সম্পর্কে আলোচনা করি"। — এই বলে শিক্ষক পাঠ ঘোষণা করে বোর্ডে পাঠের শিরোনাম লিখে দিবেন।	শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ খাতায় পাঠের শিরোনাম লিখে নিবে।

পদ্মা, যমুনা, মেঘনা নদী পশ্চিম, উত্তর ও উত্তর পূর্ব থেকে দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে বাংলাদেশকে পৃথিবীর অন্যতম এক বিস্তীর্ণ ব-দ্বীপে পরিণত করলেও এর মাঝে সামান্য কিছু বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়।	নিচের প্রশ্নগুলোর মাধ্যমে এবং উপকরণের সহায়তায় আজকের পাঠ উপস্থাপন করবেন ও প্রয়োজনে আলোচনা করবেন। বোর্ডে মানচিত্র অঙ্কন করে ভূ-প্রাকৃতিক বিভাগগুলো দেখাবেন এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো বোর্ডে লিখে দিবেন।	শিক্ষার্থীরা মানচিত্র, মডেল দেখে উত্তর দেবার চেষ্টা করবে এবং বোর্ডে অঙ্কিত মানচিত্র ও অন্যান্য লেখাগুলো নিজ নিজ খাতায় তুলে নিবে।
ভূ-প্রকৃতির দিক থেকে বাংলাদেশকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়, যথা — ১। পাহাড়িয়া অঞ্চল ২। পুরাতন পলল গঠিত চত্বরভূমি। ৩। পলল গঠিত সমভূমি।	১। ভূ-প্রকৃতি অনুসারে বাংলাদেশকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়। ২। ভাগগুলো কি কি? ৩। কোন কোন অঞ্চল নিয়ে পাহাড়িয়া অঞ্চল গঠিত?	১। ভূ-প্রকৃতি অনুসারে বাংলাদেশকে ৩ ভাগে ভাগ করা যায়। ২। ভাগগুলো হল : ক) পাহাড়িয়া অঞ্চল খ) পুরাতন পলল গঠিত চত্বরভূমি গ) পলল গঠিত সমভূমি

১। পাহাড়িয়া অঞ্চল : পার্বত্য চট্টগ্রাম, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম জেলার পূর্বাংশ, সিলেট জেলার উত্তর পূর্বাংশ এবং মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলার দক্ষিণাংশ এ অঞ্চলের অন্তর্গত এই পাহাড়গুলোকে আসামের লুসাই ও বার্মার আরাকান পাহাড়ের সমগোত্রীয় বলে ধরা হয়।	(৪) পাহাড়গুলো কোন দিকে বিস্তৃত? (৫) পাহাড়গুলোকে কোন পাহাড়ের সমগোত্রীয় বলে ধরা হয়?	৩। পার্বত্য চট্টগাম, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম জেলার পূর্বাংশ, সিলেট জেলার উত্তর পূর্বাংশ এবং মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলার দক্ষিণাংশ নিয়ে পাহাড়িয়া অঞ্চল গঠিত। ৪। পাহাড়গুলো উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত। ৫। পাহাড়গুলোকে আসামের লুসাই ও বার্মার আরাকান পাহাড়ের সমগোত্রীয় বলে ধরা হয়।
বেলে পাথর, সেল পাথর এবং কাদা দিয়ে এই পাহাড়গুলো গঠিত। দক্ষিণ-পূর্বে এই পাহাড়গুলোর গড় উচ্চতা ৬১০ মিটার। কিন্তু পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে এদের উচ্চতা বৃদ্ধি পেয়েছে।	(৬) কি কি উপাদান দিয়ে পাহাড়গুলো গঠিত? (৭) দক্ষিণ-পূর্বদিকে পাহাড়গুলোর গড় উচ্চতা কত?	৬। বেলে পাথর সেল পাথর এবং কাদা দিয়ে গঠিত। ৭। দক্ষিণ-পূর্বদিকে পাহাড়গুলোর গড় উচ্চতা ৬১০ মিটার।
বাংলাদেশের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ কেওকারাডং (১২৩০ মিটার) এ অঞ্চলে অবস্থিত।	৮। বাংলাদেশের সর্বোচ্চ শৃঙ্গের নাম কি?	৮। বাংলাদেশের সর্বোচ্চ শৃঙ্গের নাম কেওকারাডং।

এ অঞ্চলের উচ্চভূমির মধ্যে দিয়ে ফেণী, কর্ণফুলী, সাঙ্গু, মাতামুহুরী প্রভৃতি নদী প্রবাহিত হয়েছে। মৌলভীবাজারে দক্ষিণের পাহাড়গুলো ২৪৪ মিটারের বেশি উচু নয়। উত্তরের পাহাড়গুলো স্থানীয়ভাবে টিলা নামে পরিচিত। এদের উচ্চতা ৩০–৯০ মিটার। কৃষিকাজের দিক থেকে এ অঞ্চলের তেমন কোন গুরুত্ব নাই। চাষযোগ্য জমি অত্যন্ত কম। সংকীর্ণ উপত্যকাগুলোতে 'জুম' পদ্ধতিতে কিছু কিছু চাষাবাদ হয়। সিলেট জেলায় অধিকাংশ চা বাগান এই পাহাড়গুলোতে অবস্থিত। পাহাড়গুলো অধিকাংশ বনভূমি দ্বারা আবৃত। লোকবসতি কম।

৯। এর উচ্চতা কত।

১০। পাহাড়িয়া অঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত নদীগুলোর নাম কি?

১১। মৌলভীবাজারের দক্ষিণের পাহাড়গুলোর উচ্চতা কত?

১২। কোনগুলো টিলা নামে পরিচিত?

১৩। তাদের উচ্চতা কত?

১৪। এ অঞ্চলে কি ধরনের চাষাবাদ ব্যবস্থা প্রচলিত?

১৫। এ অঞ্চলে লোক বসতি কি রকম?

৯। ১২৩০ মিটার।

১০। পাহাড়িয়া অঞ্চলের উপর দিয়ে প্রবাহিত নদীগুলো হল ফেণী, কর্ণফুলী, সাঙ্গু, মাতামুহুরী।

১১। মৌলভী-বাজারের দক্ষিণে পাহাড়গুলোর গড় উচ্চতা ২৪৪ মিটারের বেশি নয়।

১২। উত্তরের পাহাড়গুলো টিলা নামে পরিচিত।

১৩। এদের উচ্চতা ৩০–৯০ মিটার।

১৪। কেবল সংকীর্ণ উপত্যকাগুলোতে 'জুম' পদ্ধতিতে চাষাবাদ হয় এবং পাহাড়গুলোতে চা চাষ হয়।

২। পুরাতন পলল গঠিত চত্বর ভূমি : উত্তর পশ্চিমাংশে বরেন্দ্রভূমি, মধ্য ভাগে মধুপুর ও ভাওয়ালের গড় এবং কুমিল্লা জেলার লালমাই পাহাড় এই অঞ্চলের অন্তর্গত। প্লাইস্টোসিন (প্রায় ২৫ হাজার বছর আগে) কালে এই চত্বরগুলো গঠিত হয়েছিল। দেশের উত্তর–পশ্চিমাঞ্চলের রাজশাহী বিভাগে প্রায় ৯৩২০ বর্গকিলোমিটার এলাকায় বরেন্দ্রভূমি এবং গাজীপুর, ময়মনসিংহ ও টাংগাইল জেলার ৪১০৩ বর্গ কি.মি. এলাকায় মধুপুর ও ভাওয়ালের গড় অবস্থিত। সমভূমি থেকে বরেন্দ্রভূমির উচ্চতা ৬–১২ মিটার। মধুপুর ও ভাওয়ালের গড়ের উচ্চতা পশ্চিমাংশে প্রায় ৩০ মিটার, পূর্বাংশে এটা সমভূমির সাথে মিশে গেছে। লালমাই পাহাড় লালমাই থেকে ময়নামতি পর্যন্ত বিস্তৃত। এর আয়তন ৩৩.৬৫ বর্গ কি.মি. এবং গড় উচ্চতা ২১ মিটার। কিন্তু স্থান বিশেষে ৪৫ মিটার পর্যন্ত দেখা যায়। বরেন্দ্রভূমি ও মধুপুর গড়ে নদী অববাহিকা সমূহের মৃত্তিকা খুব উর্বর।

১৬। পুরাতন পলল গঠিত চত্বরভূমি কোন কোন অঞ্চল নিয়ে গঠিত?

১৭। কোন সময় এই চত্বরগুলো গঠিত হয়েছিল?

১৮। বরেন্দ্রভূমি কোথায় অবস্থিত?

১৯। এর আয়তন কত?

২০। সমতল ভূমির সংগে তুলনায় এর উচ্চতা কিরূপ?

২১। মধুপুর ও ভাওয়ালের গড় কোথায় অবস্থিত?

২২। এর আয়তন কত?

২৩। এর উচ্চতা কিরূপ?

২৪। লালমাই পাহাড় কোথায় অবস্থিত?

২৫। এর আয়তন কত?

১৫। লোকবসতি কম।

১৬। পুরাতন পলল গঠিত চত্বরভূমি উত্তর পশ্চিমাংশের বরেন্দ্রভূমি মধ্যভাগের মধুপুর ও ভাওয়ালের গড়।

১৭। প্লাইস্টোসিনকালে (প্রায় ২৫ হাজার বছর আগে) এই চত্বরগুলো গঠিত হয়েছিল।

১৮। দেশের উত্তর পশ্চিমে রাজশাহী বিভাগ অবস্থিত।

১৯। এর আয়তন ৯৩২০ বর্গ কি.ম.

২০। সমতল ভূমি থেকে এর উচ্চতা ৬ থেকে ১২ মিটার।

২১। মধুপুর ও ভাওয়ালের গড় গাজীপুর, ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইলে অবস্থিত।

২২। এর আয়তন প্রায় ৪১০৩ বর্গ কি.মি.।

২৪। লালমাই পাহাড় লালমাই থেকে ময়নামতি পর্যন্ত বিস্তৃত।

২৫। এর আয়তন ৩৩৬৫ বর্গ কি.মি.।

মূল্যায়ন	বিষয়	পদ্ধতি শিক্ষকের কাজ	শিক্ষার্থীর কাজ
		নিচের প্রশ্নগুলোর সাহায্যে শিক্ষক আজকের পাঠের অর্জিত জ্ঞানের মূল্যায়ন করবেন। ১। ভূ-প্রকৃতি অনুসারে বাংলাদেশকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়? ভাগগুলো কি কি? ২। পাহাড়িয়া অঞ্চল কোন কোন অঞ্চল নিয়ে গঠিত? ৩। এ অঞ্চলের ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য কি রকম? ৪। পাহাড়িয়া অঞ্চলে লোকবসতি কম কেন? ৫। পুরাতন পলল গঠিত চত্বরভূমি কোথায় অবস্থিত?	শিক্ষার্থীরা সঠিক উত্তর দিবেন।
পু ন রা লো চ না		নিচের প্রশ্নগুলোর সাহায্যে শিক্ষক আজকের পাঠের পুনরালোচনা করবেন। ১। পাহাড়িয়া অঞ্চল কোথায় অবস্থিত? ২। পাহাড়গুলো কি কি উপাদানে গঠিত? ৩। পাহাড়গুলোর গড় উচ্চতা কত? ৪। এ অঞ্চলের উপর দিয়ে প্রবাহিত নদীগুলে কি কি? ৫। এখানে কি কি ধরনের কৃষিকাজ হয়? ৬। পুরাতন পলল গঠিত চত্বরভূমি কোন কোন অঞ্চল নিয়ে গঠিত?	শিক্ষার্থীরা গ্রহণযোগ্য উত্তর দিবেন।

বাড়ির কাজ	নিচের প্রশ্নগুলো বাড়ি থেকে তৈরি করে আনার জন্য শিক্ষক বোর্ডে লিখে দিবেন। ১। বাংলাদেশের মানচিত্র অংকন করে ভূ-প্রকৃতিক বিভাগগুলো দেখাও। ২। পাহাড়, চত্বরভূমি ও সমভূমির মডেল তৈরি করে আনবে।	শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ খাতায় প্রশ্নগুলো লিখে দিবে।

উপরে বর্ণিত পাঠ পরিকল্পনার বিষয়বস্তু একটি আধুনিক পাঠ পরিকল্পনার নমুনা ছকে পরিবেশন করেও পাঠ পরিকল্পনা তৈরি করা যায়। এজন্য পরবর্তী পৃষ্ঠায় একটি আধুনিক পাঠ পরিকল্পনার ছকের নমুনা দেওয়া হল :

আধুনিক পাঠ পরিকল্পনার ছকের নমুনা

সাধারণ	পরিচিতি	পাঠ সংশ্লিষ্ট
• শিক্ষক :	পাঠ পরিকল্পনা	• বিষয় :
• স্কুল/মাদ্রাসা :	নং —	• সাধারণ পাঠ :
• শ্রেণি :		• শিক্ষাক্রম :
• শিক্ষার্থীর সংখ্যা :		• অদ্যকার পাঠ :
• উপস্থিত শিক্ষার্থীর সংখ্যা :		
• সময় :		
• পিরিয়ড :		
• তাং :		

উদ্দেশ্য	প্রস্তুতি	ধারণা/জ্ঞান	উপকরণ	শিক্ষকের কাজ		শিক্ষার্থীর কাজ
				বিষয়বস্তু উপস্থাপন	পদ্ধতি	
আচরণিক উদ্দেশ্য ১. ২. ৩. ৪. ৫.			১. সাধারণ উপকরণ ২. বিশেষ উপকরণ ক. খ. গ. ঘ.			

শিক্ষকের কাজ	• মূল্যায়ন :		
	• পুনরালোচনা :		
	• বাড়ির কাজ :		

গ্রন্থপঞ্জি

১. বাংলা গ্রন্থ :

আলী, মোহাম্মদ আজহার ও বেগম হোসনে আরা, শিক্ষানীতির স্বরূপ, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯১।

আলী, মোঃ আজহার, পাঠদান পদ্ধতি ও শ্রেণি সংগঠন, ঢাকা : লেখক কর্তৃক প্রকাশিত, ১২/৬ ফুলার রোড, ১৯৮৭।

আলম, শাহ মোহাম্মদ, জীবন ও বিবর্তন, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭।

আলী, সৈয়দ মোঃ ইকবাল, হক, মোঃ জহুরুল ও মোঃ খায়রুল (সম্পাদনায়), গ্রাফোস ম্যানের ভূ-চিত্রাবলি, ঢাকা : গ্রাফোসম্যানের পক্ষে মোঃ জহুরুল হক, ১৯৮৮।

আমিন, মোঃ সদরুল ও ভূঁইয়া, জহিরুল হক, মৃত্তিকা বিজ্ঞান (প্রথম সংস্করণ), ময়মনসিংহ : আমিন প্রকাশনী, ১৯৮২।

ইসলাম, মোহাম্মদ নজরুল, প্রাকৃতিক ভূগোল, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫।

উদ্দীন, আ. ফ. এম. কামাল, মাধ্যমিক ভূগোল, ঢাকা : জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সট বুক বোর্ড, ১৯৯২

কাজী, আবদুর রউফ, ফলিত ভূগোল, ঢাকা : সুজনেষু, ১৯৮১।

কাজী, আবদুর রউফ ও কাজী, আবদুল হালিম, ব্যবহারিক ভূগোল, ঢাকা : গোল্ডেন বুক হাউস, ১৯৭০।

কাজী, আবদুর রউফ, ভৌগোলিক জ্ঞানের ক্রমবিকাশ, ঢাকা : সুজনেষু, ১৯৮১।

কাজী, আবদুর রউফ, মানুষ ও সংস্কৃতি, ঢাকা : গোল্ডেন বুক হাউস, ১৯৭৬।

কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম ফারুকী, উচ্চ মাধ্যমিক বাণিজ্যিক ভূগোল, ঢাকা : কাজী প্রকাশনী, ১৯৮৭

খান, আবদুল হক ও অন্যান্য, ভূগোল, ঢাকা : বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডিস্ট্যান্স এডুকেশন (বাইড) ১৯৮৫।

খান, মোঃ আবদুল আউয়াল এবং সরকার, নির্মলচন্দ্র, সাধারণ ভূগোল, (১ম খণ্ড) ঢাকা : হাসান বুক হাউস, ১৯৮৮।

খান, মোঃ আবদুল আউয়াল ও সরকার নির্মলচন্দ্র, মানচিত্র গঠন ও অনুশীলন, ঢাকা : আইডিয়েল লাইব্রেরি, ১৯৮৪।

গুপ্ত, সুনীতা ও অন্যান্য, চিল্ড্রেন্স নলেজ ব্যাংক-২, দিল্লী : পুস্তক মহল, ১৯৯০।

গুপ্ত, সুনীতা ও অন্যান্য, চিল্ড্রেন্স নলেজ ব্যাংক-১, দিল্লী : পুস্তক মহল, ১৯৯০।

গুহ, জহরলাল, অর্থনৈতিক ভূগোল ও সম্পদ সমীক্ষা, কলিকাতা : ৩৭/এ কলেজ স্ট্রিট, ১৯৭৭।

ঘোষ, অরুণ, শিক্ষাবিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব, কলিকাতা : এডুকেশনাল এন্টার প্রাইজার্স, ১৯৮৬।

ঘোষ, নীলিমা ও কুণ্ডু, সন্তোষকুমার, আধুনিক শিক্ষণপদ্ধতি, কলিকাতা : প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরি, ১৯৭৭

ঘোষ, রণজিৎ, শিক্ষা পদ্ধতি ও পরিবেশ, কলিকাতা : সোমা বুক এজেন্সি, ১৯৭৫।

চৌধুরী, মফীজুল ইসলাম ও অন্যান্য (সম্পাদনায়), ভৌগোলিক পরিভাষাকোষ, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯০।

চৌধুরী, মোয়াজেম হোসেন, প্রাকৃতিক ভূগোল, ঢাকা : বাংলাদেশ বুক করপোরেশন লিঃ ১৯৮৭।

চৌধুরী, সিরাজুল ইসলাম, অর্থনীতিক ভূগোল বিশ্ব ও বাংলাদেশ, ঢাকা : দি সিটি প্রেস, ১৯৮৮।

তরফদার মমতাজুর রহমান, ইতিহাসের দর্শন, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৬৯।

তাহা, আবু মোহাম্মদ, রাজনৈতিক ভূগোল, রাজশাহী : বিনাপানি বুক ডিপো, ১৯৮৮।

দাসগুপ্ত, অমল, মানুষের ঠিকানা, কলিকাতা : লেখাপড়া, ১৯৮৭।

দাসগুপ্ত, জি, সচিত্র ব্যবহারিক শিশু ভূগোল, কলিকাতা : আশুতোষ লাইব্রেরি, ১৯২৪।

দাস শ্রী অনিল কুমার, ভুগোল শিক্ষণ পদ্ধতি, কলিকাতা, যোবুক এজেন্সী, ১৯৭৭।

বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণ কুমার এবং শীল অজিতকুমরা, আধুনিক ভূ-পরিচয়, কলিকাতা : রবীন্দ্র প্রকাশনী, ১৯৮২।

বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণ কুমার ও শীল, অজিত কুমার, উচ্চ মাধ্যমিক ভূগোল পরিচয়, কলিকাতা : রবীন্দ্র লাইব্রেরি, ১৯৯০।

বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী তরুণ কুমার, আধুনিক ভূ-পরিচয়, (১ম খণ্ড) কলিকাতা : ছায়া প্রকাশনী, ১৯৮২।

বর্মন, মনোমোহন, আধুনিক ভূগোল শিক্ষা পদ্ধতি, ঢাকা : করুণাময়ী বর্মন, নারান্দা, মনোহরদী, ১৯৬৭।

বিশ্বাস, মোঃ কিসমত আলী, ফলিত ভূগোল, ঢাকা : আইডিয়াল লাইব্রেরি, ১৯৮৫।

ভট্টাচার্য, অনিমা, সমাজ বিজ্ঞানীয় ভূগোল, কলিকাতা : পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৭৭।

রশিদ, কে. বি. সাজ্জাদুর, সাংস্কৃতিক ভূগোল, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭।

রহমান, আনিসুর, অর্থশাস্ত্র পরিচয়, (১৪শ সংস্করণ) ঢাকা : পুথিঘর লিঃ, ১৯৮৯।

রহমান, মোঃ শফিকুর, খান, আহমদ ও হালদার, দেলোয়ার হোসেন, মৃত্তিকা বিজ্ঞান, বরিশাল : নাহার কুটির, ১৯৮২।

রায়, অমরনাথ, স্টুডেন্টস সায়েন্স এনসাইক্লোপেডিয়া, কলিকাতা : শৈবা প্রকাশনী, ১৯৮৭।

রায়, সুশীল, শিক্ষণ ও শিক্ষা প্রসংগ, কলিকাতা : সোমা বুক এজেন্সী, ১৯৮৬।

সম্পাদকমণ্ডলী, ছোটদের বুক অব নলেজ, কলিকাতা : দেব সাহিত্য কুটির, ১৯৮৫।

সুকন্যা, নোপোলিয়ানবোনাপার্ট, কলিকাতা : মণ্ডল বুক হাউস, ১৯৭৬।

সেনগুপ্ত, শ্রী সুবোধ কুমার আধুনিক শিক্ষণ পদ্ধতি, কলিকাতা : প্রেসিডেন্সি শ্রী রমণী রঞ্জন সেনগুপ্ত লাইব্রেরি, ১৯৭৭।

সোম, অরুণ, মহাবিশ্বের কথা, (অনুবাদ), মস্কো : ১৯৮৩।

হক, মোঃ নুরুল ও উদ্দিন, মোঃ সালেহ, ভূগোল (দূর শিক্ষণে বি. এড. কোর্স ৩য় সেমিস্টার, ঢাকা : বাইড, ১৯৮৬।

হাকিম, আবদুল, ভূগোল শিক্ষক, ঢাকা : হাকিমস বুক শপ, ১৯৬১।

হালদার, শ্রী গৌরদাস, শিক্ষণ প্রসংগে পদ্ধতি ও পরিবেশ, কলিকাতা : ব্যানার্জী পাবলিশার্স, ১৯৮৫।

হালিম, আবদুল ও বেগম, নুরুন নাহার, মানুষের ইতিহাস, (প্রাচীন যুগ), ঢাকা : আগামী, প্রকাশনী, ১৯৭৭।

• তপন, শাহজাহান, টেলিভিশন, ভিসিআর ভিসিপি, ঢাকা : আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৯০।

২. ইংরেজি গ্রন্থ :

Armstrong, David G. Social Studies in Secondary Education. New York : Macmillan Publishing Co., Inc., 1980.

Barnard, H.C. Principles and Practice of Geography Teaching. (3rd edition London : London University Tutorial Press Ltd., Clifton House, 1949.

Barnard, H.C. Principles and Practice of Geography Teaching. (2nd edition), London : London University Tutorial Press Ltd., 1934.

Bining, C. Arthur and David H. Bining. Teaching the Social Studies in Secondary Schools. (3rd edition), Bombay : Tata Mcgraw-Hill Publishing Co.Ltd., 1952.

Biswas, A. and J.C. Aggarwal. Encyclopaedic Dictionary and Directiory of Education. Vol.1, New Delhi : The Academic Publishers (India), 1971.

Bowman, Isaiah. "Geography in Relation to the Social Sciences." Scribeners, New York : 1934, as quoted by : Scarfe, N.V. A Handbook of Suggestions on the Teaching of Geography. Paris : Unesco, 1954.

Braiult. E.W.H. and D.W. Shave, "Geography in and out of School", Harrap, 196[illegible], as quoted in Source Book for Geography Teaching. London : Longmans, Green and Co. Limited, 1965.

Brown, W, James, Lenrs, B. Richard and Harcleroad, F. Fred, Audio-Visual Instruction Materials and Methods, New York : McGraw-Hill Book Company Inc. 1956.

Dave, R.H. and Others. Teaching Units for Middle Stage Geography : Instructional Material Series. Vol. II, New Delhi : National Council of Educational Research and Training, 1972.

Department of Education and Science, Geography and Education : Education Pamphlet, (3rd edition). No, 39, London : Her Majesty's Stationary Office, 1961.

Department of Field Services, Improving Instruction in Geography. Vol. I, II, III and IV, New Delhi : National Institute of Education, 1969.

Fairgrieve, James. Geography in School. London : University of London Press Ltd., London, 1937.

Frederick, L. and A.M. Holtz. Principles and Methods of Teaching Geograp New York : The Macmillian Company, 1929.

Gopsill,. G.H. The Teaching of Geography, (2nd edition), London : Macmillar Co. Ltd., 1962.

Hanna. et al. Geography in the Teaching of Social Studies Concepts and Sk Boston : Houghton Miffin Company, 1966.

Khan, Md. Abdul Awal, A study of Teaching Geography at the Secondary Sch Level in Bangladesh, unpublished Ph. D. thesis, The M. S. Universit Baroda, Baroda, India, 1985.

Kinder, S. James, Audio-Visual Materials and Technique, New York : Ameri Book Company, 1959.

Kingsland, J.C. and W.B. Cornish. Teach Yourself Geography. Bungay : Rich Clay and Company Ltd., Great Britain, 1939.

Kolars, John F. and Nystuen, John D., Human Geography Spatial Design in W Society. New York : McGraw-Hill Book Company, 1974.

Long, M (ed). Handbook for Geography Teachers' (5th edition) London ; Met Co. Ltd. 1964

Long, M. and B.S. Roberson. Teaching Geography. Toronto : Bellhaven Ho Ltd., 1967.

Macnee. E.A. Teaching in India Series : The Teaching of Geography. (edition), Bombay : Oxford University Press, 1962.

Macnee. E.A. The Teaching of Geography. Bombay : Oxford University Pr 1971.

Mathias. Paul. The Teachers' Handbook for Social Studies. London : Bland Press, 1973.

Mehta, T.S. Prabhakar Singh and R.S. Vashist. Teaching of Geography National Integration. (2nd edition), New Delhi : National Counci Educational Research and Training, 1981.

Monkhouse, F.J. Principles of Physical Geography, London : Universit London Press Ltd., 1968.

Moore, W.G. A Dictionary of Geography, (4th edition). Middlesex : Pen Books, U.K. 1968.

Morris, John W. (ed.) Methods of Geographic Instruction. Massachuse Blaisdell Publishing Company, Waltham, 1968.

Olive, Garnett. Fundamentals in School Geography. London : George G. Ha and Co. Ltd., 1960.

188821

Rajagopal, M.P. "New Approaches to Teaching Geography in High Schools", The Geography Teacher (India). Vol. VIII, No. 2, Madras : The Association of Geography Teachers of India, 1973.

Riley, Starts and Harding, George Elbern, Elements of World Geography. Toronto, New York : D. Van Nostrand Company, 1967.

Scarfe, N.V, A Handbook of Suggestions on the Teaching of Geography. (3rd edition). Paris : Unesco., 1954.

Scholar, Geography Methods and Contents, Calcutta : Soma Book Agency 1984.

Singh, R.L., Elements of Practical Geography, New Delhi : Kalyani Publishers. 1979.

Strahler, A.N. and Strahler, A.H. Geography and Man's Environment New York : John Wilwy, 1977.

Sudame, G.R. B.Biswal and P.K. Sahoo. "Teaching Geography through Radiovision : An Experiment". National Journal of Education. Vol IV. No.2, Varanasi : Faculty of Education, Banaras Hindu University, 1982.

UNESCO. Source Book for Geography Teaching. London : Longmans. Green and Co. Ltd., 1965.

Vidal de La Blache. Quoted in the Report of the Commission on the Teaching of Geography. XIXth International Geographical Congress, Stockholm : August 6-13, 1960.

Willmore, Albert, The Ground Work of Modern Geography, (5th edition), London. G. Bell and Sons Ltd., 1961.

Worcester, Philip G. A Text Book of Geomorphology, New Delhi : Affiliated East-West Press Pvt. Ltd., 1969.